রাজদ্রোহী

রবিন জামান খান



মৌপি


ISBN 978-984-96260-1-5
9 789849 626015

খুব সাধারণ একটা মিসিং পারসোনের কেস। চট্টগ্রামে অ্যাক্সিডেন্টে মৃত প্রফেসর আবদেলের পার্টনার এবং বন্ধু প্রফেসর ইফতেখার মাহমুদ নামে এক আর্কিওলজিস্টকে খুঁজে বের করতে হবে। কাজে নামার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্সপেক্টর আহমেদ বাশার বুঝতে পারল কাজটা সহজ তো নয়ই বরং সাধারণ কিছুও নয়। খড়ের গাদা থেকে তাকে সুচ খুঁজে বের করতে হবে, যেখানে একদিকে সুচটা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তার ওপরে আবার সুচটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে একাধিক মানুষ। কেসে নামার সঙ্গে সঙ্গেই সে এমন এক ঝুঁকি নিয়ে নিলো যা তাকে নিয়ে যেতে পারে লক্ষ্যের খুব কাছে অথবা পুরোপুরি শেষ করে দিতে পারে সদ্য ধ্বংসস্তূপ থেকে তুলে নিয়ে আসা পুলিশি ক্যারিয়ারকে। কিন্তু ঝুঁকি নিয়েই সে বুঝতে পারল বিরাট ভুল হয়ে গেছে।

সময় : ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ। বাঙাল মুলুকে যুদ্ধের ঘনঘটা। একের পর এক বারোভূইয়াদের হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে মোঘল সম্রাট বাংলাকে বিদ্রোহী প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করে নিজের সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাপতিদের একজন মানসিংহকে বিশাল বাহিনীসহ বাংলায় পাঠাল বারোভূইয়াদের প্রধান ঈশা খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করে বন্দি হিসেবে আগ্রা নিয়ে যাওয়ার জন্য। বীর ঈশা খাঁ রুখে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। কিন্তু সৈন্য সংখ্যা থেকে শুরু করে সবকিছুই মোঘলদের প্রতিহত করার জন্যে অপ্রতুল। বাধ্য হয়ে সে নিজের বীর সেনাদের একজন মাসুম কাবুলী, যাকে পাঠান সেনাপতি শহবাজ খাঁ রাজদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা করেছে, তাকে ভাওয়ালের জমিদার ফজল গাজীর আশ্রয় থেকে ডেকে পাঠাল বিশেষ এক উদ্দেশ্য নিয়ে। মাসুম কবুলীকে পানি-জঙ্গল আর হাওর-বিধৌত এলাকা থেকে খুঁজে বের করতে হবে সদ্য বিধবা হওয়া এক সুবাদারের স্ত্রীকে। এই সুবাদারের স্ত্রীর কাছে আছে এমন কিছু যা বদলে দিতে পারে মোঘলদের সঙ্গে বারোভূইয়াদের যুদ্ধের গতিপথ। কাজে নেমেই মাসুম বুঝতে পারল এই বিশেষ মানুষটিকে খুঁজে বের করে ঈশা খাঁর নিকটে পৌঁছাতে হলে তাকে মোকাবেলা করতে হবে মোঘলদের শক্তিশালী বাহিনী, স্থানীয় বিদ্রোহী ডাকাত এবং ভয়ংকর জল ঠগী হিসেবে পরিচিত পাঙ্গুদের।

অতীত ও বর্তমানের মেলবন্ধন হিসেবে সুপরিচিত রবিন জামান খানের ইতিহাসআশ্রিত থ্রিলার সিরিজের বই সপ্তরিপু-ব্ল্যাক বুদ্ধা-মগরাজের ব্যাপক সাফলের পর এবার প্রকাশিত হতে যাচ্ছে সময় উপাখ্যান সিরিজের চতুর্থ বই রাজদ্রোহী, যেখানে ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসেছে বাংলার বুকে রাজত্ব করা বীর সেনানি বারোভূইয়াদের বীরগাথা।

রাজদ্রোহী

রাজদ্রোহী

রবিন জামান খান



অন্যধারা

প্রকাশক
মো. মনির হোসেন পিন্টু
অন্যধারা
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৭১২৩১৬৬, ০১৭১২৮০৭৯০১, ০১৯২০২১৬৯৬৮

প্রকাশকাল: মার্চ ২০২২
প্রচ্ছদ
আশরাফ ফুয়াদ

কম্পোজ
অন্যধারা কম্পিউটার্স
৪৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ
একাত্তর প্রিন্টার্স
৪১/৪২, রূপচাঁন দাস লেন, ঢাকা-১১০০
মূল্য
৬৪০.০০ টাকা মাত্র

Rajdrohi By Robin Zaman Khan
Published by Md. Monir Hossain Pintu, Anyadhara
38/2-Ka, Banglabazar, Dhaka 1100
Price: Tk. 640.00 Only US $ 20.00

ISBN 978-984-96260-1-5

উৎসর্গ

এই বইটার উৎসর্গের দাবিদার শুধুমাত্র একজন মানুষই হতে পারে।
আর সেটা আমি নিজে, রবিন জামান খান।
এই বইটা যখন আমি লিখছি, পড়ালেখা, সার্বিক জীবন-যাপন, পারিবারিক বিষয়াদি, প্রবাস জীবন, অ্যাকাডেমিক কাজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন দিক থেকে আমাকে এত বেশি চাপ সামলাতে হয়েছে যে, একটা পর্যায়ে আমার মনে হচ্ছিল আমি হয়তো লিখতেই পারব না। কিন্তু সব সামলে শতভাগ প্যাশনের সাথে বইটা শেষ পর্যন্ত ভালোভাবে লিখতে পেরেছি এটা আমার নিজের জন্যে রীতিমতো উৎসবের মতো একটা বিষয়। আর সেজন্যেই নিজেকে নিজেই উৎসর্গ করলাম রাজদ্রোহী

ভালো থাকো রবিন জামান খান, আরও ভালো লেখার চেষ্টা করে যাও।

ভূমিকা

সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে যখন সম্পূর্ণ সময় উপাখ্যান সিরিজের পরিকল্পনা করি, যার সাথেই শেয়ার করেছিলাম কেউই বিশ্বাস করেনি, অনেকে হাসাহাসিও করেছে। এমনকি শুরুর দিকে আমার নিজের কাছেও মনে হয়েছে চাকরি করে পরিবার সামলে এরকম বৃহৎ একটা পরিকল্পনা আসলে আমার দ্বারা বাস্তবায়ন করা সম্ভব কি না। ঠিক যেভাবে সিরিজের প্রথম দুটো বইয়ের সাফল্য এই সিরিজ বাস্তবায়ন করতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে, তেমনি প্রকাশনী সংক্রান্ত ঝামেলা, দেশ ছেড়ে বিদেশে আসা, নতুন জীবন শুরু করা ইত্যাদি আবার অনেক প্রতিবন্ধকতা হিসেবেও কাজ করেছে। সত্যি কথা হলো মগরাজ লিখে শেষ করার আগ পর্যন্ত আমি ভাবতেও পারিনি সিরিজটাকে সত্যিকার অর্থেই পরিণাম দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু রাজদ্রোহীর কাজ সম্পন্ন করার পর বইটার ভূমিকা লেখার সময়ে যখন অতীত এবং ভবিষ্যতের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে নিজের জায়গা থেকে পুরো পরিকল্পনাটা দেখার চেষ্টা করছি তখন খানিকটা দুঃসাহসীর মতোই মনে হচ্ছেঃ সময় উপাখ্যান সিরিজটা হয়তো একদিন লিখে শেষ করে ফেলব।

এই সিরিজ এবং সিরিজের বইগুলো নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের আলোচনার ভেতরে অন্যতম একটা আলোচনা হলো ইতিহাসের বাস্তবতা এবং কল্পনার সাথে তার মিশেল। এখানে একটা ব্যাপার আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই, আমি ইতিহাসের বই লিখতে বসিনি। আমি ইতিহাসের সময়কে আশ্রয় করে গল্প লিখছি। কাজেই শতভাগ বা বাস্তবে ঘটে যাওয়া ঘটনার সাথে সম্পূর্ণ মিল আশা না করাই শ্রেয়। সপ্তরিপু, ব্ল্যাক বুদ্ধা, মগরাজ এবং এবারের রাজদ্রোহীতে ইতিহাসের অনেক বাস্তব চরিত্রই স্থান পেয়েছে গল্পের প্রয়োজনে। একেবারে শতভাগ সত্যিকারের ঘটনার সাথে হয়তো বা কিছুটা কল্পনার আশ্রয় রয়েছে তাদের আচার-আচরণ কিংবা তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রবাহে। পৃথিবীর সব ভাষা কিংবা সাহিত্যেই ইতিহাস নিয়ে লিখতে গেলে এই ছাড়টুকু লেখকেরা পায়। ‘শার্লকিয়ানে’ বর্ণিত স্যার ডয়েল আর বাস্তবের স্যার ডয়েলের জীবনের ভেতরে পার্থক্য ছিল। ‘আ টেল অব টু সিটিজ’ বা ‘দ্য এইটে’ যেভাবে ফরাসি বিপ্লবকে দেখান হয়েছে তা নিয়ে

নানা মতামত নানা বিতর্ক রয়েছে। এমনকি শেক্সপিয়রের বর্ণিত অনেক ঐতিহাসিক চরিত্ররাও বাস্তব থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করার ঘটনাও বিরল নয়। মোদ্দাকথা আমি যা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো: ইতিহাসকে ইতিহাসের মতোই থাকতে দিন। যদি সত্যিকারের ইতিহাস জানতে এবং পড়তে চান, তাহলে হাজারো নন ফিকশন বই আছে, রিসার্চ পেপার আছে; সেগুলো বাস্তবের ইতিহাস জানার সেরা আশ্রয়স্থল হবে। আর যদি ইতিহাসের আবরণে গা ভাসিয়ে খানিকটা রোমাঞ্চযাত্রার সঙ্গী হতে চান তাহলে সময় উপাখ্যান সিরিজ আপনার জন্য। রাজদ্রোহী উপন্যাসে এই সিরিজের পূর্বের বইগুলোর মতো গল্পের বুননে কিছু সামঞ্জস্য যেমন আছে, তেমনি আমি কিছু নতুনত্বও আনার চেষ্টা করেছি। সেই সাথে এই বইটাতেই মূলত সিরিজের বাকি অংশের ভিত্তি রচনা করা হয়েছে।

সবশেষে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার পাঠকদেরকে এবং আমার প্রকাশককে। পাঠক যদি একজন লেখককের প্রকৃত আশ্রয় হয় তবে প্রকাশক সেই আশ্রয়স্থলে লেখককে পৌঁছে দেবার অন্যতম মাধ্যম। আমি সবসময় বলি আমি পাঠকের লেখক, পাঠকের জন্যেই লিখি। পাঠক ভালো না বাসলে সময় উপাখ্যান আমি লিখতে পারতাম না। চারপাশের সাজানো কৃত্রিমতা আর ফেইক সফলতা দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে ক্ষান্ত দিতাম হয়তো বা। প্রকৃত পাঠকের ভালোবাসাই অনেকটা শক্ত শেকড়ের মতো আটকে রেখেছে আমাকে লেখার জগতের সাথে। তারা যেভাবে আমাকে এবং সিরিজটাকে ভালোবেসেছে এই মূল্য অপরিসীম। এই ভালোবাসা জারি থাকুক। সবশেষে আমার প্রকাশককে ধন্যবাদ অপরিসীম ধৈর্য ধরে আমার সাথে কাজ করার জন্যে। সবাই ভালো থাকবেন, আমার ও আমার পরিবারের জন্যে দোয়া রাখবেন।

রবিন জামান খান
স্টিলওয়াটার,
ওকলাহোমা,
যুক্তরাষ্ট্র

পূর্বকথা

সময় : ৪৮১ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের কোনো এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে

যার শুরু আছে, তার একটা শেষ তো থাকেই।

কিন্তু পুরো ঘটনার শেষটা এমন হবে কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি সম্রাট পায়াম। প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে আনমনেই সে নিজের বাঁহাত দিয়ে কোমরে ঝোলানো তরবারিটার হাতলটা শক্ত করে চেপে ধরল। কিন্তু কাজটা করতে গিয়ে ব্যথার চোটে কবজিটা *খচ* করে উঠতে আপনাতেই তার একটা চোখ খানিকটা কুঁচকে উঠল। বাঁকানো ভ্রুর একপাশ দিয়ে মাথার ক্ষত থেকে এক ফোঁটা তাজা রক্ত চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়ল বর্মের ওপরে।

হাতের প্রায় সাদা হয়ে আসা ক্ষত কিংবা মাথার ডান পাশের আধ বিঘত বড়ো রক্তাক্ত ক্ষত–কোনোটাই সম্রাট পায়ামের মনোযোগ কেড়ে নিতে পারল না। আহত বাঁহাতে শক্ত করে তরবারির হাতলটা চেপে ধরে ভাঙাচোরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেই চলল, অনেকটা যেন স্থাণুর মতো, অনেকটা যেন খ্যাপা মানুষের মতো

অনেকটা শেষ আশ্রয়ের সারথির মতো।

ছিন্নভিন্ন ভিখারির কাঁথার মতো ছিঁড়ে-খুঁড়ে আছে পাথুরে সিঁড়ির ধাপগুলো, সেই সাথে দুপাশের পাথুরে দেওয়াল। তার ভেতরেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে ছিন্নবিছিন্ন মানব দেহ। চারপাশে ছড়ানো-ছিটানো মানব দেহের অংশ বিশেষ আর ধ্বংসপ্রাপ্ত জিনিসের পরিমাণ এত বেশি যে চোখে পীড়া দেয়। পায়াম আহত ক্লান্ত গ্রীবাটাকে যতটা সম্ভব উঁচু রেখে উঠে চলেছে ওপরের দিকে। কারণ চারপাশের ছিন্নভিন্ন দুর্গের অবয়ব যদি তাকে কষ্ট দেয়, তবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দেহাবশেষগুলো বিদীর্ণ করে ফেলছে তার হৃদয়। প্রতিটা মানুষ, কিংবা প্রতিটা টুকরো হয়ে যাওয়া অংশ তারই নিজের কোনো মানুষের অংশবিশেষ। তার ভাই, তার চাচা-মামা কিংবা খুব কাছের কোনো বন্ধুর। তীব্র বীভৎসতায় শেষ হয়ে গেছে বেশিরভাগ মানুষ। অনাকাঙ্ক্ষিত দানবের থাবায় সম্রাট পায়ামের পবিত্র মাতৃভূমি পরিণত হয়েছে মৃত্যুভূমিতে। কিন্তু এর শেষ এখনও বাকি, আর সেটার প্রস্তুতি নিতেই পায়ামকে শেষবারের মতো মুখোমুখি হতে হবে তার জীবনের সবচেয়ে নিষ্ঠুর সত্যের। নিতে হবে তার জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ সিদ্ধান্ত।

সিঁড়ির শেষ ধাপ পার হয়ে লালচে ধুলোমাখা ছাদের কিনারায় পা রাখতেই পায়ামের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। এই লাল রঙ তার মানুষদের রক্তে রঞ্জিত লাল। দুঃখ আর যাতনার চোটে পায়ামের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলেও সে জানে: খুব বেশি কিছু করার নেই আসলে তার। তবে শেষ ছোবল এখনও বাকি। দানব যত শক্তিশালী, বড়ো আর জনপ্রিয় আর উন্মত্তই হোক না কেন তারও বিনাশ আছে। আর সেই বিনাশ সাধন যদি করা সম্ভব নাও হয় তবে অন্তত সম্মানের সাথে সেই বিনাশ সাধনের চেষ্টার মাধ্যমে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়াও পবিত্র একটা ব্যাপার। আর সেই উদাহরণ কিছুদিন আগে রেখেও গেছে স্পার্টার রাজা লিওনাইডাস।

রাক্তাক্ত ধুলোমাখা ছাদের কিনারায় উঠে এসে দিগন্তের দিকে ফিরে তাকাল পায়াম। ভোর হতে আর খুব বেশি বাকি নেই। দিগন্ত রেখার দিকচক্রবালের কাছে সোনালি একটা আভা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। এই সোনালি আভা সুন্দর ঝলমলে একদিনের ঘোষণা নিয়ে আসছে। কিন্তু পায়াম জানে সে আর তার মানুষের জন্যে এটা দিনের ঘোষণা নয়, সত্যিকার অর্থেই মৃত্যু পরোয়ানা। শুধু মানুষদের জন্যে না, তার জন্মভূমির জন্যেও।

দুর্গের সবচেয়ে ওপরের অংশে উঠে আসতেই দৌড়ে এলো তার প্রধান সেনাপতিদের একজন, নিমানাল। পায়াম তার দিয়ে ফিরেও তাকাল না। বরং সে একটা হাত তুলে তাকে ব্যস্ত হবার জন্যে মানা করল। আগে নিজেকে স্থির করতে হবে, এরপর বাকি পৃথিবী। আরও দুপা সামনে এগিয়ে একেবারে দুর্গের কার্ণিশের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল সে। পায়াম জানে বিষয়টাতে খানিকটা ঝুঁকি আছে। কারণ দুর্গের এই দিকটাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, অন্যদিকে এইদিকটার ঠিক সামনেই অবস্থান করছে শত্রুপক্ষ। কাজেই দুর্গের ভঙ্গুর কাঠামো কিংবা শত্রুপক্ষ দুদিক থেকেই আসতে পারে বিপদ। কিন্তু, পায়াম ভেতরে ভেতরে এও জানে, এই মুহূর্তে তার ওপরে আক্রমণ হবে না। শুধু তার ওপরে কেন কারও ওপরেই আক্রমণ চালাবে না শত্রুপক্ষ, কারণ তারা শেষ ধ্বংসযজ্ঞের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

শত্রুশিবির থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আবারও দিগন্তের দিকে ফিরে তাকাল পায়াম। উদীয়মান সূর্যের সোনালি আভা এবার দিকচক্রবাল ছাড়িয়ে পাহাড়ের ওপরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। এই পাহাড়েই পায়ামের জন্ম, এই পাহাড়ই পায়ামের দেশ এবং এই পাহাড়েই হয়তো তার বিনাশ সাধন হতে যাচ্ছে। যদিও নিজের বিনাশ সাধন নিয়ে সে মোটেই চিন্তিত নয়, মোটেই ব্যথিত নয় এই পাহাড়ের কোলে মৃত্যুবরণ করা নিয়ে। আফসোস একটাই, তার সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে নিজের মাতৃভূমি, এমনকি নিজের মানুষেরাও, বলতে গেলে পুরো জাতি।

পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়া সূর্যকিরণের দিকে তাকিয়ে শৈশবের কথা মনে পড়ে গেল পায়ামের। একেবারে ছোটোবেলা থেকেই বাবার খুব নেওটা ছিল সে। আর তার বাপ সম্রাট হলেও ছেলেকে ভালোবাসত পাগলের মতো। ব্যাপারটা এমন নয় যে সম্রাট হলে নিজের সন্তানকে ভালোবাসা যাবে না। কিন্তু পায়ামের বাপ তাকে শুধু ভালোইবাসত না, বরং সম্রাট হবার পরও নিজের ছেলেকে সে অনেক সময় দিত। পায়ামের সবচেয়ে কাছের বন্ধু, সবচেয়ে কাছের খেলার সাথী এমনকি তার শিক্ষকও ছিল তার বাপ। একজন সম্রাট হিসেবে ব্যাপারটা যেমন ব্যতিক্রম ঠিক তেমনি একজন সম্রাটের ছেলে হিসেবেও বিষয়টা বেশ ভিন্ন। আর এই পুরো ব্যতিক্রম ব্যাপারটা গড়ে উঠেছিল পায়ামের একেবারে শৈশব থেকে। পায়ামের বাপই পায়ামকে ছোটোবেলা থেকে খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস করে তুলেছিল। আর প্রতিদিন ভোরে প্রহরীরা বাদে বাকি সবার আগে ঘুম থেকে উঠত সম্রাট নিজে এবং ডেকে তুলত তার ছেলেকে। গ্রীষ্ম আর শীত নেই, নেই বৃষ্টি কিংবা তুষারপাত। বছরের প্রতিটা দিন সবার আগে ঘুম থেকে উঠে পায়ামের বাপ, ঘুম থেকে ওঠার পর ছেলেকে নিয়ে চলে আসত দুর্গের ছাদে। ঠিক যেখানে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে পায়াম। পায়ামের বাপ পায়ামকে সবসময় বলত, প্রতিদিন এখানে উঠেই সে নিজের মাতৃভূমিকে পলক বুলিয়ে দেখতে চায় এবং এর প্রকৃতিকে উপলব্ধি করতে চায়, এতে নাকি নিজের মাতৃভূমি আর নিজের মানুষকে প্রতিদিন আরও একটু বেশি করে উপলব্ধি করতে পারে সে, আরও একটু বেশি করে ভালোবাসতে পারে, আরও একটু বেশি করে তাদের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে। একই অভ্যাসের ভিত্তি সে গড়ে দিতে পেরেছিল নিজের ছেলের ভেতরে এবং একই ভালোবাসা আর নিজেকে উৎসর্গ করার বীজ সে রোপণ করে দিতে পেরেছিল নিজের সন্তান পায়ামের মনের গহীনে। আর নিজে সম্রাট হবার পর সেই বীজকে দিন দিন বৃদ্ধি করে নিজের মানুষদের প্রতি ভালোবাসা আর দায়িত্বের মহীরুহে পরিণত হবার সুযোগ করে দিয়েছে পায়াম নিজেই। তবে মোটেই সহজ ছিল না তার এই যাত্রা।

পায়ামদের রাজ্যটা ছোটো কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে পার্সিয়া, গ্রিস, ইলাম আর মেসিডোনিয়ার বাণিজ্যপথ আর রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পায়ামের দাদার দাদা এক জিপসী গোত্রের বার্তাবাহক ছিল। পরিচিত পৃথিবীর ব্যাবসার একটা বড়ো অংশ পরিচালিত হয় সমুদ্রপথে আর সেই সমুদ্রপথে ব্যাবসার একটা বড়ো অংশ নিয়ন্ত্রণ করে আরব আর পার্সিয়ান ব্যবসায়ীরা। সারাজীবন নানা জায়গায় ঘুরে বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ অর্জন করার পর পায়ামের দাদা কোথাও থিতু হতে চাইছিল। আর সেটা করার জন্যে সে পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের এই ছোটো অঞ্চল বেছে নেয় সে। যেই সময়ের কথা বলা হচ্ছে সেই সময়ে কেউ

কোনো অঞ্চলে স্থায়ী হতে চাইলে একটাই উপায় ছিল। সেই অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলা। সেটা গায়ের জোরে হোক, সম্পর্কের জোরে হোক, আর রাজনীতির জোরে হোক। পায়ামের দাদার বলতে গেলে প্রায় সবই ছিল।

প্রশ্ন হলো, যে-মানুষটা সারাজীবন সমুদ্রে আর জাহাজে জাহাজে ঘুরে বেড়িয়েছে সেই লোকটা কেন একটা স্থলের জায়গা বেছে নিলো স্থায়ী হবার জন্যে, কেন কোনো দ্বীপ বা জলপথের কাছের জায়গা নয়। পায়ামের বর্তমান অবস্থা বুঝতে হলে এটা জানাটা জরুরি। পায়ামের দাদা যেমন অর্থবান ছিল ঠিক তেমনি সে ছিল বুদ্ধিমানও। আর তাই ঘুরতে ঘুরতে অনেকটা ইচ্ছে করেই সে এই জায়গাটা বেছে নেয়। পায়ামদের রাজ্যটা এমন এক জায়গায় যে অবস্থানগত কারণে একদিকে এর শক্তি অপরিসীম, অন্যদিকে স্রেফ অবস্থানের কারণেই এই জায়গার মূল্যও অপরিসীম। *কারণ কী?*

আগেই বলা হয়েছে পরিচিতি পৃথিবীর বাণিজ্যের একটা অংশ নিয়ন্ত্রিত হয় সমুদ্রপথে। সেই এশিয়া মাইন থেকে শুরু করে সুদূর ইউরোপের ভেনিস পর্যন্ত চলে গেছে এই সমুদ্রপথ। দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে উৎপাদিত এবং বহন করে নিয়ে আসা পণ্যের একটা অংশ বিভিন্নভাবে সমুদ্রপথে চলে যায় ইউরোপের শহর ভেনিসে, সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের বাজারে। এশিয়া থেকে আসা জিনিসপত্রের এই পণ্য চলাচলের জলপথের একটা বড়ো অংশ নিয়ন্ত্রণ করে আরবের ব্যবসায়ীরা। কিন্তু পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের একটা বড়ো অংশের জিনিসপত্রের নিয়ন্ত্রণ থাকে স্থলপথের যাতায়াতকারীদের হাতে। এই স্থলপথের যাতায়াতকারীদের একটা অংশ আবার স্থলপথ দিয়ে ভ্রমণ করে জিনিসপত্র পৌঁছে দেয় জলবন্দরগুলোতে। পায়ামদের সাম্রাজ্য ঠিক জলপথের কোথাও না হলেও অবস্থানগত কারণে এরকম পণ্য চলাচলের এক স্থলপথের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অবস্থিত। পায়ামদের সাম্রাজ্যের একদিকে পাহাড়ে ঘেরা, যেখানে অসংখ্য পাহাড়ি গোত্র বসবাস করে। এরা একদিকে পুরো পাহাড়ি এলাকা জুড়ে চাষাবাদ করে। আবার এখান থেকে অনতিদূরেই অবস্থিত জলবন্দর। দীর্ঘদিন যাবৎ স্থলপথের যাতায়াতকারী আর পাহাড়িদের ভেতরে যুদ্ধ লেগেই ছিল। লুট, ছিনতাই, ডাকাতি থেকে শুরু করে ছোটো এই জায়গাটা যেন বছরের পর বছর ধরে নরক হয়ে থাকত।

পায়ামের দাদা। ঘুরতে ঘুরতে এই জায়গায় এসে জায়গাটার অবস্থান এবং স্থানীয় রাজনীতি অনুধাবন করতে পেরে সে এখানেই গোড়াপত্তন করে। কিন্তু তার গোড়াপত্তনের ব্যাপারটা খুবই কঠিন ছিল। কারণ একদিকে এমন এক পাহাড়ি গোত্র, যাদের সাথে বছরের পর বছর কেউই আঁতাত করতে পারেনি। অন্যদিকে এদের ভিন্ন আরেক গোত্র পুরোটাই ডাকাত, যারা বছরের পর বছর ধরে ডাকাতি

করেই চলেছে, আবার অন্যদিকে স্থলপথে যাতায়াতকারী ব্যবসায়ীদের রাজনীতি। কোনো এক অদ্ভুত উপায়ে পায়ামের দাদা এই তিন দলকে এক করতে সমর্থ হয়।

পায়ামের বাবা যখনই সময় পেত ছেলের কাছে নিজের পরিবারের ইতিহাস, পরিবারের লোকজনের গল্প বলে যেত। মুগ্ধ হয়ে শুনত পায়াম। এখনও যখন নিজের কোনো প্রয়োজনে সে দিশেহারা বোধ করে বাবার সেই পারিবারিক ইতিহাসের দিকেই ফিরে তাকায় সে সমাধানের জন্যে এবং মনে মনে নিজের দাদার কূটনৈতিক জ্ঞানের প্রশংসা না করে পারে না। পায়ামের দাদা প্রথমেই সেই পাহাড়ি গোত্রকে হাত করে। কারণ সে জানত এদেরকে হাত না করতে পারলে কিছুই এগোবে না। হাত করার প্রয়াসটাও খুব সুন্দর ছিল, নিজের ছেলে মানে পায়ামের বাবাকে গোত্র প্রধানের মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে নিজের পারিবারকে তাদের পরিবারের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে ফেলে। এই প্রথা আজো চালু আছে। এমনকি সব ঠিক থাকলে পায়ামেরও একইভাবে বিয়ে হবার কথা ছিল। যাই হোক, দুই পরিবারকে বন্ধনে আবদ্ধ করে পায়ামের পরদাদা প্রথমেই দুই পরিবারকে এক করে। এরপরে দ্বিতীয় ধাপ ছিল, ব্যবসায়ীদের হাত করা, এটা কঠিন হলেও অসম্ভব ছিল না, ব্যবসায়ীদের হাত করার একটাই উপায় ছিল, আর সেটাই প্রয়োগ করে পায়ামের দাদা। তাদেরকে সে সোজা একটা কথা বলে, শত শত বছর ধরে এই পাহাড়ি পথ তাদেরকে পাড়ি দিতে হয় জলবন্দরে যাবার জন্যে আর এই শত শত বছর ধরে পঞ্চাশ মাইলের মতো পাহাড়ি রাস্তায় তারা খুন যখম ছিনতাইয়ের শিকার হয়ে আসছে। শত বছরেও তারা এর কোনো সমাধান করতে পারেনি, না পেরেছে নিজেদের লোকদের সুরক্ষা দিতে। ব্যবসায়ীরা যদি এই এলাকাতে তাদেরকে একটা দুর্গ গড়ে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে তবে এই ঝুঁকিপূর্ণ দীর্ঘপথের নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকবে তাদের ওপরে, বিনিময়ে তাদেরকে নামে মাত্র একটা শুল্ক দিতে হবে। ব্যবসায়ীরা প্রথমে অবিশ্বাস করলেও পায়ামের দাদার কথা ফেলে দিতে পারেনি। কারণ সত্যি যদি তারা এই দীর্ঘপথে নিরাপত্তা পেতে পারে তবে আখেরে তাদেরই লাভ। আর যে-শুল্কের কথা পায়ামের দাদা বলেছিল সেটা কিছুই নয়। তবে তারা তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাসও করেনি। বরং ব্যবসায়ীরা পায়ামের দাদাকে সময় ধরে দেয়, এর ভেতরে যদি তারা পাহাড়ি ডাকাত গোত্রদের সাথে কোনো সমঝোতায় এনে সত্যি সত্যি ওই পথের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে, তবে তারা তাকে দুর্গ নির্মাণে সহায়তা তো করবেই এমনকি শুল্ক দিতে তাদের কোনো আপত্তি থাকবে না।

পায়ামের দাদার জন্যে এরপর সবচেয়ে বড়ো বাধাটা এসে দাঁড়ায় পাহাড়ি ডাকাত গোত্রের ওপরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। বুদ্ধিমান মানুষটা জানত ব্যাপারটা এত

সহজ হবে না। তবুও সে প্রথমে প্রচলিত পথেই চেষ্টা করে। একাধিকবার তাদের কাছে বার্তা প্রেরণ করে কথা বলতে চায়। কিন্তু প্রতিউত্তর না পেয়ে সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় কঠিন পথেই যেতে হবে তাকে। কিন্তু কী সেই কঠিন পথ। নিজের পরিবারের লোকবল এই ডাকাতদের মোকাবেলার জন্যে যথেষ্ট নয়। অন্যদিকে যথেষ্ট নয় পাহাড়ি গোত্রের লোকজন। কাজেই সে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র অর্থের সাহায্য নেয়। দূর প্রাচ্য থেকে সমুদ্রপথে ভাড়াটে সৈনিক আমদানি করে। ব্যাপারটা খানিকটা অদ্ভুত শোনালেও সেই সময়ে এটার প্রচলন ছিল খুব বেশি। ভাড়াটে সৈনিক সৃষ্টির আদি থেকেই ছিল, এখনও আছে। যুগে যুগে স্রেফ নাম বদলেছে। এসব ভাড়াটে সৈনিকেরা প্রয়োজনে যে-কারও হয়ে লড়াই করবে। পায়ামের দাদা জানত সাধারণ ভাড়াটে সৈনিক দিয়ে এসব পাহাড়ি ডাকাতদের মোকাবিলা করা যাবে না। হিমালয়ের বিশেষ অঞ্চল থেকে সে পাহাড়ি যুদ্ধে পারদর্শী গোর্খাদের সেনাবাহিনী ভাড়া করে নিয়ে আসে এবং কাজটা করে সে খুব গোপনে। ভাড়াটে সৈন্যদের একটা অংশ পৌঁছানোর পর তাদেরকে ব্যবসায়ী সাজিয়ে সেই পাহাড়ি পথে পাঠিয়ে ডাকাত ধরার জন্যে টোপ দিয়ে ফাঁদ পাতে সে। বিস্ময়কর হলেও তাতে ধরা পড়ে বেশ কয়েকজন। আর ধরা পড়া ডাকাতদের থেকে তথ্য বের করে ধীরে ধীরে পাহাড়ে চোরা গোপ্তা অভিযান চালাতে শুরু করে তার ভাড়াটে বাহিনী। সেই অভিযানগুলো ছিল ভয়াবহ হিংস্র আর রক্তাক্ত। কারণ পায়ামের দাদা জানত বীভৎস হিংস্রতা দেখাতে না পারলে কোনোদিনই এদের সাথে পেরে ওঠা সম্ভব নয় এবং তার কথা যে ভুল ছিল না সেটার প্রমাণ পাওয়া যায় কিছুদিন পরেই। প্রথমে যেখানে তারা বার্তা পাঠিয়ে কোনো সুবিধা করে উঠতে পারেনি, সেখানে পরিস্থিতির চাপে পড়ে পাহাড়ি ডাকাত দলের সর্দার উলটো তাদের কাছে সন্ধি করার জন্যে বার্তা প্রেরণ করে। সর্দারের সাথে দেখা করতে যাবার পর ডাকাত সর্দারের সাথে খুব খোলামেলা আলাপ করে পায়ামের দাদা। তাকে সে সরাসরি জানিয়ে দেয়, যদি তাদের সাথে সে টক্কর দিতে যায় তবে যেকোনো মূল্যে সে এবং তার অধীনে থাকা ছোটো ছোটো ডাকাত বাহিনীর শেষ না দেখে ছাড়বে না সে। অন্যদিকে ডাকাত সর্দার যদি চায় তবে ওদের সাথে যোগ দিতে পারে। তারা যদি নিজেদের অতীত ভুলে গিয়ে তাদের সাথে যোগ দেয়, তবে এই পাহাড়ি পথের নিরাপত্তা রক্ষায় দায়িত্ব তাদের ওপরেই বর্তানো হবে। বিনিময়ে তাদেরকে পায়ামের দাদার অধীনে পরিচালিত রাজ্যের অধীনে বশ্যতা স্বীকার করে তাদের নিয়ম মেনে কাজ করতে হবে। আর তারা যদি সেটা করে তবে, এই স্থলপথের আদায়কৃত শুল্কের ভাগ তাদের সাথে যথাযথ উপায়ে ভাগ করে নেওয়া হবে।

কঠিন পথটা পাড়ি দেওয়ার পর বাকিটা তুলনামূলক সহজ হয়ে যায়। তিনদিক সামলে নেওয়ার পর অত্র এলাকাতে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা পায়ামের দাদার জন্যে তেমন কঠিন কিছু ছিল না। রাজ্যের প্রাথমিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার পর এটাকে শক্তিশালী করার দিকে নজর দেয় সে। একদিকে নিজের গোত্রের লোকজন, পাহাড়ি লোকজনের লোকবল আর বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়ে এই দুর্গ নির্মাণের কাজে নামে সে। দূরপ্রাচ্য থেকে আসে এর মূল নকশাকারী, পারস্য থেকে আসে এর মালমশলা আর মেসিডোনিয়ার বিশেষ অঞ্চল থেকে বিশেষ পাথর। সে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। দুর্গটাকে এমনভাবে নির্মাণ করা হয় যেন এর পেছন দিকটা থাকে ক্রমাগত ওপরের দিকে উঠে যাওয়া পাহাড়ের সারির দিকে। আবার মুখটা থাকে অন্যপাশের পাহাড় আর জঙ্গলের থেকে বিরাট আকারের এক ময়দানের দিকে মুখ করে। সেই সময়ে পারস্যের লোকেরা এভাবেই দুর্গ নির্মাণ করত। তবে পারস্যের ভিত্তির ওপরে মূল নকশাটা দূরপ্রাচ্যের নকশাকারী সৃষ্টি করাতে দুর্গটার অবস্থান, আকৃতি এবং ভিত্তিতে এমন এমনভাবে গড়ে ওঠে যে একে দমন করা বলতে গেলে প্রায় অসম্ভব। গত একশ বছর ধরে সেটাই প্রমাণিত হয়ে এসেছে আজকের আগ পর্যন্ত। দুর্গ নির্মাণের বিরাট কর্মযজ্ঞ শুরু করলেও দুর্গের কাজ সম্পন্নকরণ দেখে যেতে পারেনি পায়ামের দাদা। এর আগেই মৃত্যু হয় তার। দুর্গ নির্মাণের ভার এসে পড়ে পায়ামের বাবার ওপরে। নিজের বাপের চেয়ে ভালো কাজ দেখায় সে। একটা পর্যায়ে শেষ হয় দুর্গ নির্মাণ। দুর্গ নির্মাণ শেষ করেই পায়ামের বাবা মনোযোগ দেয় নিজের সাম্রাজ্যের ভিত্তি শক্ত করার দিকে। একদিকে পাহাড়ি গোত্রের লোকজনকে তাদের কাজের জন্যে আরও বেশি উপাদান সরবরাহ করে। আরও ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলে সেই পাহাড়ি ডাকাত দলের সাথে, তারা ততদিনে এই সাম্রজ্যের সামরিক শক্তির প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের সাথেও সে গড়ে তোলে দারুণ সম্পর্ক। ফলে সবদিক থেকেই রাজ্যে বলতে গেলে সুসম্পর্ক উন্নয়ন আর সাফল্যের জোয়ার বইতে থাকে। একই ধারা বজায় থাকে পায়ামের শাসনকালেও।

পায়াম তার শাসনামলে আরও বেশি সাফল্য দেখায়। এক কথা বলতে গেলে যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি সে রচনা করেছিল তার দাদা সেই সাম্রাজ্যের সাফল্যের মুকুটে এক এক করে রাজনৈতিক শক্তির পালক যোগ করে সে। সুদূর মেসিডোনিয়া থেকে গ্রিস, সাইপ্রাস থেকে পারস্য, সবদিকের শাসকদের সাথে সুম্পর্ক গড়ে তোলে সে। আর সেই সম্পর্ক এতটাই জোরালোভাবে প্রতিষ্টিত হয় যে এই ছোট্ট রাজ্যের সুরক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে ব্যাবসায়িক বিষয়াদিরও সুনাম ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে, সেই সাথে তাদের সামরিক সামর্থ্যের কথাও। কিন্তু পায়াম নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়তে শুরু

করে অন্যদিক থেকে। পায়ামের বাবার শাসনামলের শেষ দিকে এক বিশেষ শাসকের উত্থান ঘটতে শুরু করে পারস্যে। তার নাম রাজা জেরেক্সিস।

রাজা জেরেক্সিস যখন পারস্যের শাসন ব্যবস্থার ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে সেই সময়ে পায়ামের বাবা বেশ বৃদ্ধ, একরকম বলা যায় মৃত্যুশয্যায়। পায়ামের পরিষ্কার মনে পড়ে এমনকি মৃত্যুশয্যাতেও সে পায়ামকে রাজা জেরক্সিসের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিল। বাবার মৃত্যুর পর তার একমাত্র ছেলে এবং রাজ্যের যোগ্য উত্তরসূরি সম্রাট হিসেবে শপথ নেয় পায়াম। সে যেদিন রাজা হিসেবে শপথ নেয় পুরো রাজ্য খুশির হাসিতে ঝলমল করে উঠেছিল। কারণ পায়ামকে ছোটোবেলা থেকে রাজ্যের সবাই পছন্দ করত। সবাই জানত নিজের বাপ দাদারা যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে সেই ধারা বজায় রেখে পায়াম রাজা হিসেবে নিজেকে এবং পুরো রাজ্যকে সাফল্য এবং উন্নতির ভিন্ন এক শিখরে নিয়ে যাবে। সত্যিকার অর্থে হতেও শুরু করে সেটাই। নিজের বাপ-দাদার যে-শিক্ষা পায়াম নিজের ভেতরে বেশ ভালোভাবেই লালন এবং ধারণ করেছে সেটা সে প্রমাণ করতে শুরু করে নিজের শাসনামলের একেবারে গোড়া থেকেই।

রাজনৈতিক সুসম্পর্ক এবং শক্তির কথা তো বলা হয়েছেই, এর পাশাপাশি একদিকে সে রাজ্যের অর্থনীতির দিকে মনোযোগ দেয় এবং সেই সাথে রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করে হাতে কলমে কাজ শেখার কিছু প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে তার বাপের ইচ্ছে ছিল দূরদেশ থেকে কিছু বৈদ্যকে স্থায়ীভাবে নিজের দেশে নিয়ে আসার, কিন্তু জীবিত অবস্থায় সেটা সে করে যেতে পারেনি। বাপের এই স্বপ্নকে সে পূরণ করে। তবে এসব প্রাথমিক কাজগুলোর পরেই সে সবচেয়ে বেশি জোর দেয় যেই কাজটাতে সেটা হলো সামরিক শক্তি বৃদ্ধি। মৃত্যুশয্যায় বাপের বলে যাওয়া কথাগুলো সে ভোলেনি এবং নিজেও খুব মনোযোগ দিয়ে প্রত্যক্ষ করছিল পুরো পারস্যের রাজনীতির প্রেক্ষাপট। পুরো পারস্যে তখন সম্রাট জেরেক্সিসের জয় জয়কার। প্রথম খুব ভালোভাবে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করার পর ধীরে ধীরে সম্রাট জেরেক্সিস নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে নজর দিতে শুরু করে আশপাশের রাজ্যগুলোর ওপরে। যদিও পায়ামের উপদেষ্টারা তাকে আশ্বাসবাণী শুনিয়েছিল যে সম্রাট জেরেক্সিস যাই করুক কোনোদিনই এই রাজ্য আক্রমণ করবে না। কারণ সে যত শক্তিশালী সম্রটাই হোক না কেন, এই রাজ্য আক্রমণ করে এর আকৃতি এবং অবস্থানগত কারণে সে খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারবে না, আর রাজনৈতিক বিষয়াদি তো আছেই। কিন্তু পায়াম মনে মনে স্বস্তি বোধ করেনি, বরং সে ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ভুল প্রমাণিত হয় সে।

দিন দিন তার সাম্রাজ্য আর ক্ষমতা বৃদ্ধি করলেও সম্রাট জেরেক্সিস কখনোই তাদের রাজ্যের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। সেটা সামরিক কারণেই হোক, যুদ্ধগত কারণেই হোক কিংবা এর অবস্থানগত শক্তির কারণেই হোক। জেরেক্সিস নিজের মতো একের-পর-এক রাজ্য দখল চালিয়ে যেতে থাকে, অন্যদিকে পায়ামের রাজ্যের লোকেরা তাদের নিজেদের মতো জীবন চালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু এরপরেই ঘটে এমন এক ঘটনা যা বদলে দেয় পারস্যসহ বিশ্ব ইতিহাসের একাংশ।

স্পার্টার রাজা লিওনাইডাসের সাথে টক্কর লাগে সম্রাট জেরক্সিসের। দিন দিন নিজের সাম্রাজ্য আর শক্তি বৃদ্ধি করতে করতে এক পর্যায়ে জেরক্সিস নিজেকে *রাজাদের রাজা* থেকে শুরু করে *খোদা* উপাধিতে ভূষিত করে। আর নিজের সাম্রাজ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে বিশ্বজয়ের স্বপ্নে বিভোর তখন সে। নিজের রাজ্য ছাড়িয়ে বিভিন্ন দিকে সে তখন দূত প্রেরণ করতে শুরু করেছে তার বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়ার জন্যে। এরই অংশ হিসেবে যোদ্ধা জাতি হিসিবে খ্যাত স্পার্টায়ও সে বার্তা প্রেরণ করে। খুব স্বাভাবিকভাবেই স্পার্টার মতো যোদ্ধা জাতি, যারা কখনোই কারও বশ্যতা স্বীকার করেনি, তারা জেরেক্সিসের বশ্যতাও স্বীকার করার কথা নয়; করেওনি তারা। আর এখানেই জেরেক্সিসের সাথে স্পার্টার রাজা লিওনাইডাসের বাহিনীর সংঘাত হয়। মজার বিষয় হলো, স্পার্টার সাথে জেরেক্সিসেস বাহিনীর একটা সংঘাত লাগতে যাচ্ছে এটা পুরো পারস্য আর পশ্চিমের লোকেরা জানত। কিন্তু সেটা এমন হুট করে হয় যাবে কেউ ভাবতে পারেনি এবং যেভাবে হলো সেভাবে হবে এটা কেউই ভাবতে পারেনি।

স্পার্টানদের যুদ্ধবাজির কথা সবাই জানে। ইতিহাসের সেরা যোদ্ধাদের একটা বড়ো অংশ তাদের জাতি থেকেই জন্ম হয়েছে, এটাও অনেকের জানা। এমনকি স্পার্টানরা নিজেদের অর্থনীতির চেয়েও সমরনীতির দিকে মনোযোগ দেয় অনেক বেশি। আর তাই ওরা জন্ম থেকেই সেরা যোদ্ধা হিসেবে গড়ে ওঠে। আর একারণেই জেরেক্সিসিসের নজরও সবসময় ছিল স্পার্টার দিকে। জেরেক্সিস জানত সে যদি নিজেকে সত্যিকার অর্থেই পুরো পৃথিবীর অধিপতি হিসেবে দেখতে চায় তবে, গুটিকয় যে কয়টা জাতিকে তার অবশ্যই বশ করতে হবে তাদের ভেতরে স্পার্টানরা অন্যতম। সে অনুযায়ী তাদেরকে প্রস্তাবও পাঠানো হয় কিন্তু স্পার্টার রাজা লিওনাইডস বেঁকে বসে। সে মাত্র তিনশো সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে দিনের-পর-দিন ঠেকিয়ে রাখে জেরেক্সিসের বিরাট বাহিনীকে। রাগে-ক্রোধে উন্মত্ত জেরেক্সিস যখন ভাবতে বসেছে সে আর লিওনাইডাসকে পরাজিত করতে পারবে না এমন

সময় বেঈমানির শিকার লিওনাইডাসকে অবশেষে সে ধ্বংস করতে সমর্থ হয়। সত্যি কথা হলো লিওনাইডাস আর তার লোকেরা বশতা স্বীকার করেনি, বরং তারা যুদ্ধ করতে করতেই মৃত্যুবরণ করে।

কিন্তু জেরেক্সিসের জন্যে সেটাই অনেক বড়ো পাওয়া। কারণ একটা পর্যায়ে সে ভাবতে শুরু করেছিল লিওনাইডাসকে আর পরাজিত করতে পারবে না। কিন্তু লিওনাইডাসকে পরাজিত করার পর জেরেক্সিস আক্ষরিক অর্থেই নিজেকে ঈশ্বর ভাবতে শুরু করে। এবার সে ধীরে ধীরে নজর দিতে শুরু করে বাকি রাজ্যগুলোর দিকে। তার বক্তব্য একটাই, পৃথিবীর যে কাউকেই সে বশ করতে পারবে। জেরেক্সিস যখন তার থাবা চারপাশে বৃদ্ধি করতে শুরু করে, পায়াম জানত একসময় জেরেক্সিসের নজর এই রাজ্যের দিকে পড়বেই। কিন্তু সেনাপতি থেকে শুরু করে তার পরিষদবর্গের কেউই এতে সম্মতি প্রদান করেনি। বরং সবাই বলেছে, এই রাজ্যের সাথে জেরেক্সিসের দরবারের সবসময়ই সুসম্পর্ক ছিল। আর তাছাড়া অবস্থানগত কারণে জেরেক্সিস ঠিক যেভাবে স্পার্টানদের বাধার সম্মুখীন হয়েছে ঠিক একইভাবে এখানে তারচেয়ে দ্বিগুণ বাধার সম্মুখীন হবে সে। কাজেই এই রাজ্য আক্রমণ করার কোনো কারণই নেই তার।

কিন্তু পরিষদ বর্গের কথা ভুল প্রমাণিত করে ঠিকই একদিন জেরেক্সিসের দূত এসে হাজির হয় পায়ামের রাজ দরবারে। ফরমান খুব সহজ, পৃথিবীর অধিপতি জেরেক্সিসের অধীনে মাথা নত করতে হবে তাদেরকে। একদিকে তাকে বছরে বিরাট একটা কর তো দিতেই হবে, সেই সাথে যে-জঙ্গল পথ তারা নিয়ন্ত্রণ করে আসছে অর্ধ-শত বছর যাবৎ সেটার নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিতে হবে জেরেক্সিসের অধীনে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই উৎকট প্রস্তাব মেনে নেবার কোনো কারণই ছিল না। ওরা মেনে নেয়ওনি। এরপর থেকেই শুরু হয় তাদের ওপরে অত্যাচার। প্রথমে পাহাড়ি জঙ্গুলে পথে ওদের সৈন্যবাহিনীর ওপরে চোরাগুপ্তা হামলা হতে শুরু করে। দূর প্রাচ্য থেকে নিয়ে আসা জেরেক্সিসের বাহিনীর একাশংকে বলা হয়ে থাকে কালো মশাল। কালো মশাল বাহিনী চোরাগুপ্তা হামলা চালানোয় ওস্তাদ। তারা হামলা চালিয়ে পায়ামের বাহিনীর ক্ষতি করতে শুরু করে। একটা পর্যায়ে অবস্থা এমন হয় জঙ্গুলে পথের বেশ অনেকটা অংশ পায়ামের বাহিনী ছেড়ে দিয়ে পিছু হঠতে বাধ্য হয়। পায়ামের পরিকল্পনা ছিল জঙ্গুলে পথের খানিকটা পিছু হটে তারা শক্ত অবস্থানে আসামাত্রই আবারও পূর্ণ শক্তিতে আক্রমণ এবং প্রতিরোধে যাবে। কিন্তু সেটা করে ওঠা সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে। তার আগেই জেরেক্সিসের সেনাবাহিনীর একটা বিরাট অংশ পৌঁছে যায় পায়ামের রাজ্যের একেবারে দোরগোড়ায়।

জেরেক্সিসের বাহিনীর বড়ো অংশটা তাদের জঙ্গুলে পথের সৈনিকদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাতের গভীরে। পায়ামরা প্রস্তুত থাকলেও এরকম কিছুর জন্যে তারা

তখনও প্রস্তুত হতে পারেনি। পায়াম জানত জেরেক্সিসের বাহিনী যেকোনো সময় পৌঁছে যাবে, কিন্তু তারা এত দ্রুত এভাবে আক্রমণ চালাবে এটা কেউই বুঝে উঠতে পারেনি। সৈন্যবাহিনী আক্ষরিক অর্থেই পাহাড়ি ঢলের মতো পায়ামের জঙ্গল পথের প্রহরীদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই স্রেফ কচুকাটা হয়ে যায়। গুটিকয়েক যারা পালাতে সক্ষম হয় তারা কোনোমতে দুর্গে পৌঁছায় ভোর রাতের দিকে। কী ঘটেছে সেটা বুঝে উঠে প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই ভোরের আলো ফোঁটার সাথে সাথে পায়াম এবং তার রাজ্যের লোকেরা দেখতে পায়ঃ দুর্গের উলটোদিকের জঙ্গুলে পথ তো বটেই, দুর্গের সামনের দিগন্ত বিস্তৃত ভূমি কালো হয়ে ছেয়ে গেছে জেরেক্সিসের সৈন্যবাহিনীর লোকে।

খবর পৌঁছে যায় রাজ্যের কোনায় কোনায়, জারি করা হয় যুদ্ধের সতর্ক বার্তা। খবর এসে পৌঁছায় হাতি-ঘোড়া, বন্য বাঘ থেকে শুরু করে দূরপাল্লার পাথর ছোড়ার ভারী ক্ষেপণাস্ত্র, এমনকিছু নেই যা জেরেক্সিসের বাহিনী নিয়ে আসেনি। আর পুরো দলের নেতৃত্বে আছে জেরেক্সিসের সেনাবাহিনীর সবচেয়ে কুখ্যাত কসাই হিসেবে পরিচিত সেনাপতি দাভুদ। দাভুদ এই বিশেষ বাহিনীর নেতৃত্বে আছে শোনার সাথে সাথে পায়াম বুঝতে পারে সামনে খুব ভয়াবহ দিন অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে। নিজের বাহিনীর সবচেয়ে দক্ষ সেনাপতিকে যেহেতু এখানে পাঠিয়েছে, কাজেই জেরেক্সিস খুব ভালোভাবেই তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে ময়দানে নেমেছে। আর তারা যে-সমস্ত অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে এসেছে বলে খবর পৌঁছেছে তাতে এটাও পরিষ্কার বোঝা যায় যেকোনো মূল্যে দুর্গের পতন ঘটিয়ে ছাড়বে তারা। তবে এটাও ঠিক যে এই দুর্গই তাদের প্রথম এবং প্রধান হাতিয়ার হতে যাচ্ছে। পায়াম এবং তার লোকেরা সব ভেবে ঠিক করার আগেই দূত এসে পৌঁছায় ওদের সমর্পণের বার্তা নিয়ে। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। দূত চলে যাবার কিছু সময় পরেই উপহার পাঠানো হয় সেনাপতি দাভুদের তরফ থেকে রাজা পায়ামের জন্যে। উপহার দেখে শিউরে ওঠে প্রতিটা মানুষ.। গাধায় ঠেলা গাড়ি ভরতি করে পাঠানো হয়েছে জঙ্গল পথে রাজা পায়ামের বন্দি লোকদের কর্তিত মস্তক।

শিউরে ওঠে সমস্ত রাজ্য। কিন্তু এই বিষয়ে পায়ামের প্রতিক্রিয়া হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিজের ভেতরে যতটুকু দ্বিধা ছিল সেটাকে পুরোপুরি পরিহার করে শক্তভাবে নিজের সভাসদদেরকে সে জানিয়ে দেয়–কোনো অবস্থাতেই সে বশতা স্বীকার করবে না, প্রয়োজনে জীবন দিবে। তার পরিষদের লোকেরাও একবাক্যে মেনে নেয় তার কথা। এই বার্তা পাঠিয়ে দেওয়া হয় দাভুদের কাছেও। বিনিময়ে উলটো বার্তা পাঠায় সেনপতি দাভুদ। যাতে উল্লেখ করা ছিল পায়াম চাইলেও আর তার

বশ্যতা মেনে নেওয়া হবে না। তার দুর্গ পুরোপুরি ধ্বংস করে রাজ্যের তিন গোত্রের প্রতিটা পুরুষকে হত্যা করা হবে, হত্যা করা হবে বৃদ্ধ এবং শিশুদেরকে, সেই সাথে ধর্ষণ করা হবে প্রতিটা নারীকে, সমস্ত যুবক-যুবতীকে বন্দি করে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হবে। দাঁতে দাঁত চেপে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে পায়ামের বাহিনী। কিন্তু খুব বেশি সময় আসলে ছিল না।

একভাবে বলতে গেলে নিজেদেরকে সোজা করে দাঁড় করানোর আগেই শুরু হয়ে যায় আক্রমণ। এমন এক আক্রমণ যেটার বিরুদ্ধে আসলে কোনো প্রতিরোধ নেই। দাভুদের বাহিনীর লোকেরা বিরাট শুঁয়োপোকার আঁকশির মতো দেখতে তাল গাছের মতো লম্বা যন্ত্র নিয়ে আসে নিজেদের বাহিনীর সামনে। জিনিসগুলো কী বুঝে ওঠার আগেই দুর্গের দিকে সেগুলো দিয়ে পাথর ছুড়ে মারতে শুরু করে দাভুদের বাহিনীর লোকেরা। ছোটোখাটো এক-একটা ঘোড়ার মতো সাইজের বিরাটাকায় এক একটা পাথর একের-পর-এক আছড়ে পড়তে শুরু করে দুর্গের ওপরে। আক্রমণ চলতেই থাকে। সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল। একের-পর-এক বিরাটাকার পাথর আছড়ে পড়তে থাকে দুর্গের সামনের দেওয়ালে, দেওয়ালের ওপরে, কখনও দেওয়াল ছাড়িয়ে দুর্গের মূল অংশের ভেতরে। কিছু কিছু পাথর এতটাই গতি নিয়ে ছুটে আসে যে দুর্গের প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে সেগুলো পেছনের পাহাড়ের ফসলের ক্ষেতগুলোরও বারোটা বাজিয়ে দেয়।

যে-মুহূর্তে পাথর ছোড়ার শুঁয়োপোকার আকশির মতো যন্ত্রগুলোকে সাজানো শুরু করেছে দাভুদের, বাহিনী সেই মুহূর্ত থেকেই চিৎকার করে নিজের লোকদেরকে আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দিতে শুরু করে পায়াম আর তার প্রধান সেনাপতি নিমানাল। পাথরের বর্ষণ শুরু হতেই যে যার মতো আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করলেও খুব একটা লাভ হয় না। পাথরগুলো এতটাই বিশাল আর এতটাই গতি নিয়ে ছুটে আসে যে যেখানে আঘাত করে তার বারোটা বাজিয়ে দেয়; একমাত্র দুর্গের মোটা দেওয়াল বাদে আর যেকোনো আকৃতিকেই প্রায় গুঁড়িয়ে দেওয়ার সামর্থ্য রাখা পাথরগুলো ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে দুর্গের দেওয়াল থেকে শুরু করে মূল কাঠামো, এমনকি দুর্গের ভেতরের অনেক স্থাপনায় একের-পর-এক আঘাত করে গেলেও মূল যে-উদ্দেশ্য নিয়ে দাভুদের বাহিনী এত কষ্ট করে এই যন্ত্র এবং এতগুলো পাথর এতদূর থেকে বহন করে নিয়ে এসেছে সেটা অধরাই রয়ে যায়। অটুট রয়ে যায় দুর্গের দেওয়াল। এই ব্যাপারটা পায়াম জানত। যতই আঘাত করা হোক না কেন, পাথরের আক্রমণ দুর্গের দেওয়ালের বা কাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি করলেও সেটাকে গুঁড়িয়ে দিতে পারবে না এর আকৃতিগত কারণে। এটা এমন এক

প্রযুক্তি যা দূরপ্রাচ্যের লোকেরা তাদের কাঠামো নির্মাণে ব্যবহার করে। দুর্গর মূল কাঠামোর ভেতরে এক শক্ত পাথরের পাশাপাশি একধরনের গুঁড়ো পাথর ব্যবহার করা হয় যেকারণে আঘাতে এক অংশ বসে গেলেও ভেতরের পাথরের গুঁড়ো সেই অংশকে পূরণ করে ফেলে। যে-কারণে আকৃতির যতই ক্ষতি হোক না কেন, সেটা ভেঙে পুরোপুরি ধসে যায় না।

আর একারণেই পাথরের আক্রমণ শুরু হতেই পায়াম জানত দাভুদ যে উদ্দেশ্য নিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে সেটা সফল হবে না, বরং সে চাইছিল দাভুদের লোকেরা আরও বেশি করে পাথর ছুড়ে মারুক, কারণ এতে তাদের পাথরের মজুদ দ্রুত শেষ হবে। আর হয়ও তাই। দিন শেষ হবার আগেই পরিসমাপ্তি ঘটে দাভুদের বাহিনীর পাথর আক্রমণ। প্রথম দিনের আক্রমণের শুরুতে ঠিক যে হাসি নিয়ে দাভুদের লোকেরা আক্রমণ শুরু করেছিল, সেই হাসি মিটে যায় তাদের দিন শেষেও দুর্গের সামনের দেওয়াল ধ্বসিয়ে দিতে না পেরে। প্রথমদিনের যুদ্ধ শেষ হয় এভাবেই।

পায়াম জানত মূল আক্রমণ শুরু হবে পরের দিন থেকে এবং হয়ও তাই। দিনের আলো ফুটে ওঠার আগেই হাজার হাজার সৈনিক পায়ে হেঁটে এগিয়ে আসতে থাকে দুর্গের দিকে। সেই সাথে তারা বহন করে নিয়ে আসতে থাকে দুর্গের দেওয়াল বেয়ে ওঠার জন্যে কাঠের বানানো বিশেষ কাঠামো। আক্রমণের দ্বিতীয় ভাগেও পায়ামের বাহিনী দূরদর্শীতার পরিচয় দেয়। পায়াম জানত তার লোকবল দাভুদের সেনাবাহিনীর চার ভাগের এক ভাগ, কাজেই শুধু শক্তি না বুদ্ধি খাটাতে হবে তাকে যুদ্ধ জিততে হলে। প্রথম ধাপের আক্রমণে পানি না পেয়ে দাভুদ যে এবার দ্বিতীয় ধাপে তার সৈন্যবাহিনীকে কাজে লাগাবে সেটাও অনুমান করতে পেরেছিল সে, আর প্রস্তুতিও নেওয়া ছিল সেভাবেই। পিল পিল করে সৈন্যরা এগিয়ে আসতে শুরু করা মাত্রই পায়ামের তিরন্দাজ বাহিনী আর দেওয়ালের ওপর থেকে পাথর ছোড়া বাহিনী সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু স্রোতের মতো এগিয়ে এসে সৈনিকেরা ঠিকই দুর্গের দেওয়ালে দেওয়ালে বাক্স আর সিঁড়ির মতো কাঠের কাঠামো বসিয়ে উঠে আসতে শুরু করে। পায়ামের বাহিনীকে শুধুমাত্র তির আর পাথর ছুঁড়তে দেখে দাভুদ ভেবেছিল এই তাদের প্রস্তুতি। কিন্তু কাঠের কাঠামোগুলো দুর্গের দেওয়ালে বসিয়ে তার সৈনিকেরা যেই উঠে যেতে শুরু করে, দুর্গের অর্ধবৃত্তাকার আকৃতির দুপাশ থেকে একে একে ছুটে আসতে শুরু করে ভারী বর্শার মতো বিরাট আকৃতির মতো তির। কাঠের কাঠামোগুলো ভেদ করে নোঙরের মতো জিনিসগুলো আটকে যায় দুপাশে, সেই সাথে দুর্গের ভেতরের দিকে ছুড়ে দেওয়া হয় নোঙরের মতো অকৃতিগুলোর সাথে আটকানো ভারী বস্তাগুলো। তীব্র হ্যাঁচকা টানে একে একে

হেলে পড়তে শুরু করে কাঠের কাঠামোগুলো। আধডজন কাঠামোর বেশিরভাগগুলোই ভেঙে পড়ে বেলা শেষ হবার আগেই, আর যেগুলো আস্ত থাকে সেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয় পায়ামের বাহিনী। দ্বিতীয় দিনও হৃত উদ্যমে ফিরে যায় দাভুদের বাহিনী।

তৃতীয় দিনে আরও তীব্র আক্রমণের সাথে ধেয়ে আসে তার বাহিনী। এবার বড়ো আকৃতি নয়। দুর্গের সামনের অংশে সারি গাছের কাণ্ড জোড়া লাগিয়ে সেগুলো বেয়ে পিল পিল করে উঠে আসতে শুরু করে সৈন্যরা। পায়াম বুঝতে পারে প্রথম দুই দিনের ধাক্কায় দাভুদের মতো হিংস্র লোকের সম্মানে আঘাত লেগেছে আর একারণেই সে তার লোকবল ব্যবহার করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। ধারে নয় ভারে কাটার চেষ্টা করছে দাভুদ। কিন্তু যেটা সে বুঝতে পারেনি সেটা হলো, দুর্গের সামনের ভাগে এই তীব্র আক্রমণের মূল লক্ষ্য আসলে দেওয়াল বা দেওয়ালের ওপরের অংশ দখল নয়, বরং দুর্গের প্রধান ফটক দখল করা। তীব্র আক্রমণ সামলাতে গিয়ে পায়াম সেটা খেয়াল করতে পারেনি, কিন্তু ব্যাপারটা ধরতে পারে পায়ামের পাহাড়ি গোত্রের প্রধান এবং তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু, হুমান সাদি। চারপাশে আক্রমণে সবাই বিধ্বস্ত হলেও হুমান সাদি মূল জায়গা থেকে সরে পড়ে। সে ঠিকই অনুধাবন করতে পেরেছিল বিরাট একটা লোহার দণ্ড নিয়ে মূল ফটকের ওপরে আক্রমণ চালাতে থাকা বাহিনী এই আক্রমণের মূল হোতা। হুমান সাদি তার বিশেষ বাহিনী নিয়ে দুর্গের দেওয়ালের ওপর থেকে সরে ফটকের ভেতরের দিকে অবস্থান নেয়।

ঠিক যখন ফটকের সামনের অংশ লোহার দণ্ডের ক্রমাগত আক্রমণে অনেকটাই ধসে পড়ে পিল পিল করে ভেতরে ঢুকতে শুরু করে দাভুদের বাহিনী, খুশির বন্যা বয়ে যায় দাভুদের শিবিরে, কিন্তু তারা জানত না এটা ছিল স্রেফ একটা ফাঁদ মাত্র। মূল ফটকের একাংশ ভেঙে ফেলার আনন্দের আতিশয্যে ভেতর প্রবেশ করা বাহিনী ফটক ভেদ করে ভেতরে ঢুকে ফাঁদটা ধরতে পারে। আসলে দুর্গের যে ফটকটা বাইরে থেকে দেখা যায়, সেটা মূল ফটক নয়, ওটা আসলে একটা কৃত্রিম ফটক, সেটা দিয়ে প্রবেশ করলে দুর্গের ভেতরের দিকে আরেকটা ফটক আছে, ওটা মূল ফটক। ফটক ভেঙে ভেতরে ঢোকা বাহিনী ছোটো আঙিনাটা প্রবেশ করা মাত্রই হুমান সাদির বাহিনী ভেতরের ফটক বন্ধ করে দিয়ে বাইরের দিকে ঘিরে ফেলে, ফলে আনন্দের তোড়ে ভেতরে ঢুকে পড়া শ'খানেক সৈন্য আটকা পড়ে ভেতরে। স্রেফ কচুকাটা করা হয় তাদেরকে।

তৃতীয় দিনের আক্রমণও শেষ হয় দাভুদের বাহিনীর পরাজয় দিয়ে। তৃতীয় দিনের শেষে সারা বিকেল জয়ের আনন্দে দুর্গের দেওয়ালের ওপরে দাঁড়িয়ে আনন্দে চিৎকার করতে থাকে ওরা। পায়ামের বাহিনীর প্রতিটি আনন্দ চিৎকার দাভুদের

কানে অপমানের চাবুক হয়ে ঝরে পড়তে থাকে। তিনদিনের টানা যুদ্ধের পর খানিকটা স্বস্তি নিয়ে বিশ্রামে যায় পায়ামের বাহিনী। কিন্তু পায়ামের মনে শান্তি ছিল না। সে জানত দাভুদ এভাবে থেমে যাবার মতো লোক নয়। কিন্তু পায়াম এটাও বুঝতে পারছিল না, এবার দাভুদের বাহিনীর চালটা আসলে কী হবে, এবার সে কোনো প্রক্রিয়া ধরে আগাবে। ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে যায় সে। কিন্তু মাঝরাতে ঘুম ভাঙে বাতাসে ভেসে বেড়ানো ধোঁয়া আর মৃত্যুর গন্ধে। প্রায় লাফিয়ে বাইরে এসে দেখতে পায় সে দাউ দাউ করে জ্বলছে তার রাজ্যের বিভিন্ন অংশ।

দাভুদের বাহিনী যথেষ্ট হিংস্র এবং জয়ের জন্যে করতে পারে না এমন কোনো কাজ নেই। কিন্তু তারা এতটা নিচে নেমে যাবে এটা পায়াম ভাবতে পারেনি। তৃতীয় দিনের পরাজয়ে হিংস্র হয়ে তারা যুদ্ধের সমস্ত নিয়ম ভেঙে রাতের আঁধারে আক্রমণ চালিয়েছে। তাও বিচিত্র ও বীভৎস এক উপায়ে। যুদ্ধে সে যতই হিংস্র আর খারাপ হোক তারও কিছু নিয়ম থাকে, তাতেও পরস্পরকে সম্মান করার, শত্রুকে সমানভাবে খেলতে দেওয়ার ব্যাপার থাকে। কিন্তু নীচ দাভুদ সেসবের ধার না ধরে স্রেফ কসাইয়ের পথ বেছে নিয়েছে। দাভুদ জানে পায়ামের লোকবল কম, কাজেই দিনের বেলা টানা যুদ্ধ শেষে তার বেশিরভাগ লোকে ঘুমোবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু দাভুদের বিরাট বাহিনীর জন্যে এটা কোনো সমস্যা না। এমনকি সে তার সৈন্যবাহিনীর একটা অংশ এখনও কাজেই লাগাতে পারেনি। কাজেই তৃতীয় দিনের পরাজয়ের পরেই সে রাতে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে–রাতের আঁধারেই নিজের বাহিনীর এক অংশ দিয়ে সে আক্রমণ চালাবে। পায়ামের লোকেরা সন্ধে নামার পর যখন বিশ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছে দাভুদের লোকেরা তখন প্রস্তুতি নিয়েছে রাতের গভীরে আক্রমণ চালানোর। আগের দিনে আঁকশির মতো বড়ো বড়ো যন্ত্র যেগুলোতে করে পাথর ছোড়া হয়েছে সেগুলোতে শুকনো শস্যের বল বানিয়ে তাতে জ্বালানি দিয়ে আগুন ধরিয়ে মাঝরাতে ছুড়ে মারতে শুরু করে তার লোকেরা।

বিচিত্র আগুনের বল রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিয়ে আগুনে বাতির মতো বিচিত্র সৌন্দর্য নিয়ে মৃত্যুর প্রতিনিধি হয়ে একে একে আছড়ে পড়তে শুরু করে পায়ামের রাজ্যের ওপরে। দুর্গের ওপরে ঘুমন্ত পায়ামের বাহিনীর একাংশ পুড়ে ছারখার হয়ে যায় কিছু টের পাবার আগেই। পায়াম বাইরে এসে দেখে চারপাশে আগুন লেগে গেছে, লোকজন দিশেহারা হয়ে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করতে শুরু করেছে। কে কী করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। অর্ধক্লান্ত শরীরে বাইরে এসে এই দৃশ্য দেখে পায়াম নিজেও মুহূর্তের জন্যে বুঝে উঠতে পারে না আসলে কী করবে। কিছুক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ একটা ব্যাপার তার মাথায় ঝিলিক দিয়ে ওঠে, কেন জানি তার কাছে মনে হয় এই আক্রমণের উদ্দেশ্য যদি

দিনের বেলার মতো ভিন্ন কিছু হয়, তবে সর্বনাশ হবে। এক করতে হবে তার বাহিনীকে। কিন্তু কীভাবে? পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে সে হুমান আর নিমানালকে খুঁজে বের করে। কিন্তু সেনাবাহিনীকে একসাথে করবে কীভাবে? কারণ সবাই আগুন সামলাতে ব্যস্ত। এমন সময় এগিয়ে আসে রাজ্যের মহিলারা। পুরুষদের প্রায় সবাই রণক্লান্ত হলেও মহিলারা সমর্থই আছে। তারা নিজ থেকে এগিয়ে এসে আগুন নেভাতে শুরু করে, আর অন্যদিকে নিজের বাহিনীকে নিয়ে দুর্গের সম্মুখ দেওয়ালের ওপরে উঠে আসে পায়াম, হুমান আর নিমানাল। এবং পায়ামের অনুমানকে সত্য প্রমাণ করে দেখতে পায়–দুর্গের দেওয়ালের বাইরে শত শত সৈনিক দড়ি আর সরু গাছের কাণ্ড নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে উঠে আসার জন্যে। এই প্রথমবারের মতো নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারায় পায়াম।

নিজের লোকদেরকে নির্দেশ দেয় একজন শত্রুরও যেন কল্লা না থাকে। যদিও ওরা ক্লান্ত বিধ্বস্ত অন্যদিকে আগুনের গোলার আক্রমণে বিপর্যস্ত, কিন্তু দাভুদের সৈনিকেরা উঠে আসা মাত্রই দুই বাহিনীর মধ্যে শুরু হয় তীব্র যুদ্ধ। ভোর পর্যন্ত চলতে থাকে সেই লড়াই। কেউই কাউকে এক ইঞ্চি ছাড় দিতে রাজি না। তীব্র লড়াইয়ের তোড়ে পরাজিত হতে হতে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে সমর্থ হয় পায়ামের বাহিনী। চতুর্থবারের মতো পিছু হটতে বাধ্য হয় দাভুদের সৈনিকেরা। আবারও উল্লাস ধ্বনি ভেসে বেড়াতে থাকে দুর্গের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। কিন্তু এবার তার জোর অনেক কম, কারণ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর। হাজারো সৈনিক নিহত এবং আহত, স্বজন আর সম্পদ সব হারানোর শোকে হাহাকার সবার মাঝে। আপাতত জয়ী হলেও ওরা সেই সাথে এটা বুঝতে পেরেছে দাভুদের বাহিনী পিছু হটবে না। কিন্তু এটাও স্থির হয়ে গেছে লড়াই চলবেই কোনো এক বাহিনী শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

এমন অবস্থায় পরদিন সকালে দাভুদের দূত এসে জানায়–পায়ামের সাথে কথা বলতে আগ্রহী সেনাপতি দাভুদ। নিজের লোকদের সাথে পরামর্শ করার পর কথা বলার সিদ্ধান্ত নেয় পায়াম এবং সম্ভবত জীবনের সবচেয়ে বড়ো ভুলটা করে সে এখানেই। কথা ছিল: দুর্গ সংলগ্ন বনভূমি আর খোলা প্রান্তরের একেবারে সন্ধিক্ষণে একেবারে নিরস্ত্র অবস্থায় পায়াম এবং হুমান দেখা করবে দাভুদ এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে। তার লোকেরা জায়গা পরীক্ষা করে আসার পর দাভুদের লোকেরা জায়গা পরীক্ষা করে দুপক্ষ নিশ্চিত হবার পর দেখা করতে যায় তারা। দাভুদের মুখোমুখি হয়ে যেই আলোচনা শুরু করবে ঠিক তখুনি মাটি ফুঁড়ে তাদের ওপরে আক্রমণ হয়। এটাও দাভুদের কূটচালের অংশ। সে কিছুতেই ওদেরকে বাগে আনতে না পেরে আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে মাটির নিচে বিশেষ পদ্ধতিতে

নিজের লোক লুকিয়ে রেখে পায়াম এবং সেনাপ্রধানকে মেরে ফেলার জন্যে ফাঁদ পেতেছিল মাত্র। আর তাতে বোকার মতো ধরা দিয়েছে পায়াম। হঠাৎ আক্রমণের চমকে প্রতিরোধ করলেও খুব বেশি কিছু করার ছিল না ওদের। খালি হাতে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে পায়ামকে পালানোর উপায় করে দেয় হুমান। আক্রমণে আহত পায়াম হুমানের প্রাণের বিনিময়ে কোনোমতো পালিয়ে আসে নিমানালকে নিয়ে। দুর্গে ফিরে সব জানানোর পরও তাদের কিছুই করার ছিল না। এবার আর দাভুদও কোনোকিছুর তোয়াক্কা না করে, ত্রিমুখী আক্রমণ চালায়।

তিনদিন ধরে টানা আক্রমণের পর আজ ভোররাতের দিকে খানিকটা বিরতি দিয়েছে দাভুদের লোকেরা। তাদের কোনো ক্লান্তি নেই, নেই কোনো বিরাম। অন্যদিকে এই তিনদিন একের-পর-এক আক্রমণ প্রতিরোধ আর ধ্বংসযজ্ঞের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে পায়ামের বাহিনী এবং তার দুর্গের পতন এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার।

উদীয়মান সূর্যের আলোক রশ্মির দিকে তাকিয়ে পায়ামের কালিঝুলিতে মাখা গালের ওপরে অশ্রু গড়িয়ে নেমে এলো। কিছুই কি করার নেই তার? কোনোভাবেই কী রক্ষা করা সম্ভব নয় নিজের লোকদেরকে? ঠিক আছে, যদি তাই হয় তবে মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করে নেবে সে সম্মানের সাথে। দাঁতে দাঁত চেপে সে ফিরে তাকাল পাশে দাঁড়ানো নিমানালের দিকে। 'আমরা আক্রমণ চালাব এগিয়ে গিয়ে,' ক্লান্তির শেষ পর্যায়ে হলেও পায়ামের গলায় দৃঢ়তার কোনো অভাব নেই।

মুহূর্তের জন্যে নিমানালের মনে হলো সে ভুল শুনেছে। 'সেটা কি ঠিক হবে?' সে এখনও অবিশ্বাসের সাথে পায়ামের দিকে তাকিয়ে আছে।

'এটাই একমাত্র উপায়,' নিমানালের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সে ফিরে তাকিয়েছে আবারও দিগন্তের দিকে। পায়াম জানে, সেখানেই সৈন্যবাহিনীর ভিড়ের ভেতরে কোথাও-না-কোথাও দাভুদও হয়তো তার দিকেই তাকিয়ে আছে। একটাই পার্থক্য দুজনার তাকিয়ে থাকার ভেতরে। পায়ামের দৃষ্টিতে অসহায়ত্ব, নিজের মানুষদের রক্ষা করার আকুতি আর দাভুদের চোখে যুদ্ধজয়ের হিংস্র আনন্দ, নিজের সাফল্যের কাছাকাছি পৌঁছে যাবার আনন্দ। আবারও দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল পায়াম, 'যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাই হবে। সৈনিকদের প্রস্তুত হতে বলো। ঘোড়ওসওয়ার বাহিনী থেকে শুরু করে সব প্রস্তুত করো। অসহায় বৃদ্ধ আর শিশুদেরকে পেছনের পাহাড়ে চলে যেতে বলো। যদিও সম্ভাবনা কম, তাও যদি ওরা কিছুদিন টিকতে পারে বা কোনোভাবে পাহাড় আর খাড়ি টপকে পাশের রাজ্যে চলে যেতে পারে, তবে ওরা সহায়তা পাবে। সমস্ত সৈন্যদেরকে এক হতে বলো। আমরা দুর্গের বাইরে গিয়ে আক্রমণ চালাবো। এতে করে ওরা পেছনে সরে পড়ার

জন্যে অন্তত অর্ধদিন সময় পাবে। আর নারীদেরকে কী করতে হবে তা তো তুমি জানো,' বলে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও ফিরে তাকাল সে। 'নিমা, তুমি শুধু আমার সেনাপতি নও, বন্ধু এবং পরিবারও, তোমার সাথে যুদ্ধ করতে পারাটা আমার জন্যে অনেক বড়ো সম্মানের,' কথাটা বলে বুকে হাত রেখে সামান্য ঝুঁকে রাজা হয়েও সে রীতি ভেঙে নিজের বন্ধু ও সেনাপতিকে সম্মান জানাল।

প্রতিউত্তরে নিমাও হাঁটু গেড়ে পায়ামের সামনে বসে, বুকের ওপরে একটা হাত ভাঁজ করে মাথা নিচু করে সম্মান জানিয়ে বলে উঠল, 'রাজা পায়াম, আপনার জন্যে যুদ্ধ করাটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি, পরজন্মে যেন আপনার বন্ধু বা সেনাপতি নয়, বরং আপনার দাস হয়ে জন্ম নিতে পারি।'

নিমার কাঁধ চেপে ধরে তাকে টেনে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরল পায়াম। দুই বন্ধুরই মুখে কোনো ভাষা নেই। পায়াম নিচের দিকে নামতে নামতে শুনতে পেল দুর্গের চূড়ায় ঘণ্টা ধ্বনি বেজে চলেছে। পায়ামের রাজ্যের সবাই তো বটেই, এমনকি দাভুদের শিবিরেও সবাই অবাক হয়ে ফিরে তাকাল ঘণ্টাধ্বনি শুনে। পরবর্তী আধাঘণ্টায় নিজের পরিবার থেকে শুরু করে কাছের সব মানুষদের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে দুর্গের ফটকের বাইরে এলো পায়াম। পুরোপুরি যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে আছে পুরো বাহিনী। আরও অবাক হয়ে সে দেখল কাল পর্যন্ত প্রতিটা মানুষকে আহত বিধ্বস্ত লাগছিল। আজ তাদের সবাইকে কেমন জানি অদ্ভুত উজ্জীবিত লাগছে এই মুহূর্তে। পুরো বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে সমরসাজে সজ্জিত নিমানাল।

'পায়াম,' বলে সে দুর্গের একপাশের ছোটো একটা ফটকের দিকে দেখাল। সেটা দিয়ে দলে দলে বেরিয়ে আসছে সাদা পোশাক পরিহিত এক বাহিনী। 'ওরা?' পায়াম খুব অবাক হয়ে দেখল রাজ্যের নারীরা তাদের বিশেষ যুদ্ধের পোশাকে সজ্জিত। সবার হাতে হয়তো অস্ত্র নেই কিন্তু যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে এসেছে। 'ওরা?' আবারও একই শব্দ উচ্চরণ করে পায়াম ফিরে তাকাল নিমার দিকে।

'ওরা ভিতুর মতো আত্মাহুতি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে,' নিমার চোখে অদ্ভুত এক গর্বে জ্বল জ্বল করছে। 'বরং ওরাও লড়াই করে মরবে।'

গর্বে বুকটা ফুলে উঠল পায়ামের। তার জন্যে নিয়ে আসা ঘোড়ায় চড়ে সে চলে এলো নিজের অবশিষ্ট বাহিনীর সামনে। হাতের বিরাট ফলাটা উঁচিয়ে ধরে চিৎকার করে বলে উঠল, 'মাতৃভূমির জন্যে,' তার সাথে সাথে সৈনিকেরাও চিৎকার করে বলে উঠল, 'মাতৃভূমির জন্যে।'

পায়াম ঘোড়া দাবিয়ে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। তার সাথে ঘোড়সওয়ার বাহিনী, পেছনে দৌড়ে আসছে পদাতিকেরা। এগোনোর সাথে সাথে গতি বাড়তে

লাগল। পায়ামের মনে একটাই নিয়ত, মৃত্যুর আগে যতটা সম্ভব ক্ষতি করবে সে দাভুদের বাহিনীর। আর স্রষ্টা যেন তাকে একটা সুযোগ দেয় একটা ফলা দাভুদের কণ্ঠনালী ভেদ করানোর।

ওদেরকে আক্রমণ চালাতে দেখে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে গেছে দাভুদের বাহিনী। অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দেওয়ালের মতো হয়ে প্রতিরোধ তৈরি করে ফেলেছে নিজেদের শিবিরের সামনে। পায়ামের বাহিনী এগিয়ে যেতে শুরু করেছে। আর আধমাইলেরও কম দূরত্বে দুই বাহিনী মুখোমুখি হবে। পাঁচশো গজও বাকি নেই। হই হই রব তুলে আসন্ন সৈনিকদের দেওয়ালের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছে তাদের। আক্রমণের আর কয়েকশো গজ বাকি আসন্ন মৃত্যুরও। পায়াম সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠল।

হঠাৎ পুরো আকাশ কালো হয়ে গেল। প্রকম্পিত হয়ে উঠল পুরো সমভূমি। পায়ের নিচে কেঁপে উঠল মাটি। ঘোড়ার ওপরে থাকা প্রতিটা লোক তো বটেই এমনকি পদাতিকেরাও মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গেল। ধুলো আর এক ধরনের কালো ছাইয়ের মতো বস্তুতে ছেয়ে গেল চারপাশ।

তীব্র আঘাতের চোটে মাটিতে পড়ে গেছিল পায়াম। জ্ঞানও হারিয়ে ফেলেছিল সে ক্ষণিকের জন্যে। কিন্তু অল্প সময় পরেই সোজা হয়ে বসতে পারল সে। কাশতে কাশতে উঠে দাঁড়াল বহু কষ্টে। কিছুই বুঝতে পারছে না, হলোটা কী? চারপাশে তার সৈনিকেরা এদিক-সেদিক ছিটকে পড়ে আছে। অন্ধকারের ভেতরেই নিমার নাম ধরে ডাকল সে। সৈনিকদের আহাজারিতে ভরে উঠেছে চারপাশ।

'পায়াম, পায়াম,' অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা গলা বলে উঠল, সেদিকে ফিরে তাকাতেই, একটা হাত এগিয়ে এসে খপ করে ধরে ফেলল তাকে। ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নেওয়ার আগেই অনুধাবন করতে পারল হাতটা আর কারও নয়, নিমার। 'পায়াম পায়াম

'নিমা, হলোটা কি আসলে এমন করে–'

সে কথা শেষ করতে পারল না, তার আগেই বিচিত্র আধো অন্ধকারের ভেতরেই তাকে চুপ থাকতে বলে সামনের দিকে টেনে নিয়ে চলল নিমানাল।

'ওদিকে তো শত্রু

'শশশ,' আবারও চুপ থাকতে বলে তাকে অন্ধের মতো টেনে নিয়ে চলল সে। কয়েক গজ সামনে এগিয়ে কেন যেন উন্মাদের মতো দৃষ্টিতে পায়ামের দিকে তাকিয়ে নিমা বলে উঠল, 'ওদিকে দেখ।'

পায়াম কী দেখবে বুঝতে না পেরে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। কিন্তু তারপরই ব্যাপারটা ধরতে পারল সে। অনেকটা উন্মাদের মতো সামনের দিকে এগিয়ে যা

দেখতে পেল সে, পৃথিবীর ইতিহাসে জীবিত খুব কম মানুষেরই সেটা দেখার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয়েছে। দাভুদের পুরো সেনাবাহিনীর শত শত সৈনিক

'এরা   এরা তো সবাই–' হতভম্বের চূড়ান্ত হয়ে পায়াম ফিরে তাকাল নিমার দিকে।

'এরা সবাই বদলে গেছে, পুরো বাহিনীর সবাই।'

অবিশ্বাস আর আতঙ্কের সাথে নিমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল পায়াম।

গল্পের শুরু

সময়: ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ
কিশোরগঞ্জ, জঙ্গলমহাল দুর্গ

জীবনের বিভিন্ন প্রান্তে কখনও কখনও এমন সময় আসে যখন ভবিতব্যকে মেনে নিতে হয়। কিন্তু সমস্যা হলো আপনি যদি এমন মানুষ হোন যে ছোটোবেলা থেকে কঠিন পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ে নিজের ভাগ্য এবং ভবিষ্যৎ নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন তবে এমন মানুষের জন্যে ভবিতব্যকে মেনে নিয়ে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়াটা অসম্ভবই বটে।

সুবাদার আসলাম শেঠের জন্যে আজকের রাতটা এমনই এক রাত। না চাইলেও মনে হচ্ছে নিজেকে তার ভাগ্যের হাতেই সঁপে দিতে হবে। তবে যত বিপদই আসুক না কেন, স্রষ্টার প্রার্থনা থেকে নিজেকে কখনও বিরত রাখতে পারে না সে। দুপাশে সালাম ফিরিয়ে মোনাজাতের জন্যে চোখের সামনে হাতটা তুলে ধরে বিড়বিড় করে স্রেফ একটা জিনিসই চাইল সে স্রষ্টার কাছে। নিজের নিরাপত্তা নয়, পরিবারের নিরাপত্তা নয়, নিজের মানুষদের রক্ষা করার সুযোগ কিংবা প্রতিজ্ঞা নয়। এমনকি নিজের প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর সুরক্ষাও নয়, বরং সে বিড়বিড় করে বলে উঠল,

যেন আমি প্রতিজ্ঞাটা রক্ষা করতে পারি।' কারণ সুবাদার আসলাম শেঠ জানে, তার এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার ওপরে অনেককিছু নির্ভর করছে, নির্ভর করছে অনেক মানুষের প্রাণ, এমনকি এই বাঙাল মুল্লুকের ভবিষ্যতও, হয়তো সমগ্র মানবতারও।

মোনাজাত সম্পন্ন করেই জলচৌকিতে সোজা হয়ে বসল সে। জলচৌকি থেকে উঠে প্রথমেই যে-কাজটা করল, নিজের পরিধেয়ের ওপরে চড়িয়ে নিলো যুদ্ধের পোশাক। পরিধান শেষ করে তরবারি আর নিজের লম্বা ছুরি হাতে সে যখন শোবার ঘরে প্রবেশ করল দেখতে পেল তার স্ত্রী, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

তাকে দেখে কোনোরকম আবেগের বহিঃপ্রকাশ না ঘটিয়ে বরং খুব শান্ত গলায় সে বলে উঠল, 'সময় উপস্থিত, তাই না?'

স্ত্রী যতই আবেগহীনভাবে কথাটা বলে উঠুক না কেন, সুবাদার আসলাম শেঠ নিজেকে সামলাতে পারল না। তরবারি আর ছুরিটা একটা চৌপায়ার ওপরে রেখে দ্রুত গতিতে এগিয়ে গিয়ে শক্ত করে দুহাতে জড়িয়ে ধরল নিজের স্ত্রীকে, কতটা সময় অতিবাহিত হলো সেট ধরতে না পারলেও একটা সময় অনুভব করতে পারল, তার স্ত্রীও তার মতো ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মুহূর্তের জন্যে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল সুবাদারের স্ত্রী। একটা হাত তুলে মুছে দিলো, আসলাম শেঠের চোখের পানি। 'সারাজীবন শক্তির সাধনা করে এসেছ তুমি, তোমার মতো মানুষের চোখে পানি মানায় না,' এরকম করুণ এক সময়েও স্ত্রীর অদ্ভুত টানের বাংলা শুনে মৃদু হেসে উঠল আসলাম শেঠ। 'তোমার বাংলাটা আজো ঠিক হলো না,' কথাটা বলামাত্রই আসলাম শেঠের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। আর কোনোদিনই হয়তো এই চোখজোড়ার দিকে তাকিয়ে আবেগে ভেসে যাওয়া হবে না, আর কোনোদিনই হয়তো ভালোবাসায় জড়িয়ে ধরা হবে না প্রিয় মানুষটাকে, কথাটা মনে আসতেই নিজের স্ত্রীকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল সে আরেকবার। কতক্ষণ এভাবেই আবেগের স্রোতে ভেসে যাওয়া বহমান থাকত সেটা হয়তো দুজনার কেউই অনুধাবন করতে পারত না। কিন্তু পেছনে পায়ের শব্দ শুনে দুজনে পরস্পরকে ছেড়ে দিলো।

সুবাদার আসলাম শেঠের স্ত্রীর একান্ত ব্যক্তিগত পরিচারিকা এবং তার দেহরক্ষী এবং আসলাম শেঠের স্ত্রীর অধীনে পরিচালিত নারী বাহিনীর প্রধান, রায়েলি দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটার দিকে ফিরে তাকাতেই সে চোখ নামিয়ে নিলো 'দুঃখিত,' তার বাংলা উচ্চারণও আসলাম শেখের স্ত্রীর মতোই, যেন মুখে পানি নিয়ে কথা বলছে অনেকটা সেরকম। কারণ তারা দুজনে একই এলাকার লোক। 'সুবাদার, সেনাপতি মোহরাম আপনার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছে।'

সুবাদার আসলাম শেঠ চৌপায়ার ওপরে রাখা তরবারি আর ছুরিটা উঠিয়ে নিয়ে আড়চোখে মেয়েটাকে একবার দেখে নিলো। একজন পরহেজগার মুসলিম হিসেবে চাইলেও সে মেয়েটার দিকে সরাসরি তাকাতে পারে না। যদিও এটার প্রয়োজন আছে, বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিচার। কিন্তু অভ্যাস তো আর বিশেষ অবস্থা মানে না। আড়চোখে তাকালেও মেয়েটাকে দেখে সে খুশি হয়ে উঠল, একেবারে প্রয়োজনমতো প্রস্তুতিমূলক পোশাক পরিধান করেই এসেছে মেয়েটা।

'শুকরিয়া, রায়েলি,' বলেই সে তার স্ত্রীর দিকে একবার দেখে নিয়ে আবার রায়েলির দিকে ইশারা করে বলে উঠল, 'তোমরা দুজনেই মন দিয়ে শোনো আমি কী বলি।'

বর্তমান সময়ের তিন বছর আগে

রেলওয়ে কলোনি বস্তি, কমলাপুর, ঢাকা

চিন্তা-ভাবনা করাটাও এক ধরনের চর্চা করার মতো বিষয়, যারা এটা জানে না তাদেরকে বোকা মনে হয় তার কাছে। অবশ্য সেভাবে ভাবলে দুনিয়ার বেশিরভাগ মানুষই বোকা। কিন্তু সমস্যা হলো দুনিয়ার বেশিরভাগ মানুষ তার ব্যাপারে বরং উলটো মনে করে, অন্তত বোকা না হলেও উদ্ভট তো বটেই। শেষ বাক্যটা মাথায় আসতেই মেডিটেশনের গভীর স্তরে থাকার পরেও সে ফিক করে হেসে উঠল।

পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ, আসলে বেশিরভাগ মানুষ নয় বরং প্রায় সব মানুষই সবকিছু বিচার বিবেচনা করে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। যার জগৎ যত ছোটো হয়, তার দৃষ্টিভঙ্গিও ততটাই ছোটো হবে–এটাই খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। আর সে সূত্র ধরেই প্রচলিত সমাজের সংজ্ঞার সাথে যা মেলে না সেটাকেই তারা উদ্ভট, পাগল, ব্যতিক্রম এবং ক্ষেত্রবিশেষে বোকা হিসেবেও আখ্যায়িত করতে পিছপা হয় না। যেকোনো ব্যাপারের গহীনে সবাই যেতে পারবে না, এটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে তার মতো জিনিয়াসের জন্যে পুরো পৃথিবীটা ব্যতিক্রম হবে এটাও খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। যা ভাবছিল সেটা থেকে সরে এসে এই ফালতু তত্ত্বকথা মাথার ভেতরে ঘুরপাক খেতে শুরু করাতে ইফতেখার মাহমুদ খানিকটা বিরক্ত হলো নিজের ওপরে। বড়ো করে একবার দম নিয়ে সে আবারও চিন্তা-ভাবনায় একটা ফোকাস নিয়ে আসার চেষ্টা করল।

একজন গবেষক হিসেবে ইফতেখার মাহমুদের নানাবিধ কাজের পাশাপাশি নিজের জগৎ এবং কাজ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করাটা খুব জরুরিভাবেই তার পেশার একটা অংশ। কিন্তু চাইলেও সময়ের অভাবে হোক, আর নানাবিধ কাজের ব্যস্ততায় হোক সবসময় মাথাটাকে খাটানো সম্ভব হতো না তার পক্ষে। আর তাই নিজের জগৎ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করত সে মূলত তিনটা সময়; সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দৌড়ানোর সময়ে, একজন ডিভোর্সি ব্যাচেলর হিসেবে রান্না করার সময়ে এবং রাতে ঘুমাতে যাবার সময়ে। এটা ছিল তার স্বাভাবিক জীবনে, নিজের কাজ আর গবেষণার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার প্যাটার্ন। শুধুমাত্র ইফতেখার মাহমুদ নয় বরং অনেক শিল্পী, সাহিত্যিক, লেখক ও গবেষকরাই এটা করে থাকেন। ইফতেখার মাহমুদও তাই করত তার স্বাভাবিক জীবনে। কিন্তু কয়েক মাসের বন্দি এবং পলাতক জীবনে সব পালটে গেছে।

নিজের পলাতক জীবনে দিনের বেশিরভাগ সময় তাকে রেলওয়ে কলোনি বস্তির একটা ট্রেনের পুরনো ভাঙা বগির ভেতরেই কাটাতে হচ্ছে। কাজেই চাইলেই সে সারাদিন চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। কিন্তু সেটা আসলে হয়ে ওঠে না। আর

তাই সে চিন্তা-ভাবনার জন্যে সকালে দুঘণ্টা মেডিটেশনে বসে, আবার রাতে দুঘণ্টা মেডিটেশনে বসে। এই চার ঘণ্টা সময় সে ভাবনা চিন্তা করে, নিজের কাজ ভবিষ্যৎ এবং নিজের কাজের জন্যে সম্ভাব্য স্ট্র্যাটেজি বের করে বসে বসে। যদিও গত কিছুদিন যাবৎ সব কিছুই ভুল প্রমাণিত হতে হতে সে একেবারে কোণঠাসা হয়ে গেছে। আর আজ রাতেই সেই কোণঠাসা পরিস্থিতির সর্বশেষ পরিণতি ঘটতে যাচ্ছে সম্ভবত। হয় আজ রাতে তার এবং তাদের মুক্তি ঘটবে, আর নাহয় আজ রাতে তারা ধরা পড়ে যাবে। বাকিরা ধরা পড়ে গেলেও সে ধরা পড়বে না, ধরা পড়ার চেয়ে সে মৃত্যুবরণ করবে। আনমনেই নিজের মাড়ির গোড়ায় থাকা শেষ দাঁতটায় একবার জিভ বুলিয়ে নিলো সে। কে জানে হয়তো এটারই প্রয়োজন পড়বে আজ রাতে সবচেয়ে বেশি।

তাও, মনে মনে আরেকবার বিরক্ত হলো ইফতেখার মাহমুদ। কোথায় আজ রাতে তাকে ঠান্ডা মাথায় সব ভাবা উচিত সেখানে আজ রাতে কি না চিন্তা-ভাবনা সব ওলট-পালট হয়ে গুলিয়ে যাচ্ছে। বড়ো করে আরেকবার দম নিয়ে চোখ খুলে উঠে দাঁড়াল সে। ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে আরেকটু হলে চমকে উঠত সে। ঠিক তার পেছনেই একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারের ভেতরে।

'আবদেল!' চমকে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলো ইফতেখার। 'তুমি আরেকটু হলে চমকে দিয়েছিলে আমাকে,' নিজের বন্ধু বিশিষ্ট আর্কিয়োলজিস্ট এবং গবেষক হাসান আবদেলের দিকে দুইপা এগিয়ে গেল ইফতেখার মাহমুদ। 'কোনো খবর?'

'সরি, আমি তোমাকে চমকে দিতে চাইনি,' বলে সে ট্রেনের পুরনো দুটো সিট জোড়া দিয়ে বানানো ইফতেখার মাহমুদের বিচিত্র খাটটার এক কিনারায় বসে পড়ল। পুরনো ট্রেনের কামরাটার আরেকপাশে কাছাকাছি টাইপের আরেকটা বিছানায় প্রফেসর আবদেল থাকে। সিট কাম বিছানাটায় বসে সে চোখ তুলে তাকাল ইফতেখার মাহমুদের দিকে। 'বন্ধু, তোমার কী মনে হয় আমরা পারব?'

'হয় স্বাধীনতা, না হয় মৃত্যু,' বলে মৃদু হেসে উঠল ইফতেখার মাহমুদ। 'মনে আছে চে গুয়েভারার এই ডায়লগটা?' প্রিয় বন্ধুর কাঁধে একটা হাত রাখল সে। 'অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি আমরা, আবদেল। আমাদের পিছু ফেরার আর কোনো উপায় নেই। আমরা যা করতে চেয়েছি, যা করতে যাচ্ছি সেটা করার জন্যে ঝুঁকি তো কম নিইনি। মৃত্যুর কাছাকাছিও তো কমবার পৌঁছাইনি। এসব কিছু তো আমাদের জন্যে একেবারে নতুন নয়। তুমি-আমি দুজনেই এই খেলায় বহু পুরনো খেলোয়াড়।'

কথা বলতে বলতে বগির ভাঙা কাচের খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল সে। আবদেলের কাঁধে রাখা হাতটা হঠাৎ কাঁপতে শুরু করাতে বেশ খানকিটা চমকে গেল ইফতেখার মাহমুদ। আবদেলের মাথাটা তার বুকের ওপরে

ঝুঁকে পড়েছে, আর থেকে থেকে সেটা কেঁপে উঠছে কান্নার দমকে। শক্তিশালী পুরুষ মানুষ যখন ভেঙে পড়ে, সেই দৃশ্য খুব সুখকর হয় না। প্রায় কোনো ভাবনা ছাড়াই নিজের প্রিয় বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরল ইফতেখার মাহমুদ। 'শান্ত হও, বন্ধু, সব ঠিক হয়ে যাবে। যদিও সে জানে যে পথে তারা পা বাড়িয়েছে তাতে আসলে ঠিক হবার মতো আর কিছু বাকি নেই। যদি কিছু বাকি থেকে থাকে তবে সেটা হলো হ্যাঁ অথবা না।

'শান্ত হও, বন্ধু

ইফতেখারকে ছাড়িয়ে নিয়ে মাথা তুলে টকটকে লাল দুচোখ মেলে তাকাল প্রফেসর হাসান আবদেল। 'আমরা যা করতে চাচ্ছি, আদৌ কি সেটার কোনো মূল্যায়ন হবে? আদৌ কি আমরা আর কোনোদিন নিজেদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারব? আমার একটামাত্র মেয়ে, তোমার

আবদেলের দুকাঁধ শক্ত করে চেপে ধরল ইফতেখার মাহমুদ। 'তুমিই তো বলতে সবকিছু আসলে মূল্য দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। সবকিছু সফলতা বা ব্যর্থতা দিয়েও মাপা যায় না। কিছু কাজ করতে হয় স্রেফ নিজের কর্তব্য আর দায়িত্ববোধ থেকে। আর তুমি জানো আমরা যা পেয়েছি, যা করতে চাচ্ছি সেটার চেয়ে বড়ো দায়িত্ববোধ এই পৃথিবীতে আর কিছু হতে পারে না। আমাদের কর্তব্য এবং করণীয় তুমি, আমি, আমার মেয়ে, তোমার মেয়ে বা আমাদের পরিবারের চেয়ে অনেক বড়ো কিছু। আর সেটা তোমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না,' বলে ইফতেখার মাহমুদ বাইরে তাকাল।

সময় যত গড়িয়ে যাচ্ছে, ঝুঁকি তত বাড়ছে। যত দ্রুত সম্ভব কাজ সারতে হবে। আর আজ রাতে কাজের জন্যে তার আবদেলের সহায়তা লাগবে, তাকে শক্ত হতে হবে সেই সাথে শক্ত করতে হবে আবদেলকে। 'শোনো, আবদেল, আজ রাত আমাদের জন্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমার বিশ্বাস চৌধুরীকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেটা সে করতে পারবে। কিন্তু চৌধুরী তার কাজ সেরে ফিরে আসার আগে তোমাকে আমার কিছু কথা বলার আছে। মন দিয়ে শোনো আমার কথা।'

আবদেল খানিকটা স্থির হতেই বিড়বিড় করে প্রফেসর ইফতেখার মাহমুদ বলতে শুরু করল তার কথা। মাঝে মধ্যে প্রশ্নোত্তর চলল, সেই সাথে চলল মতামত আদানপ্রদান। তাদের আলোচনা যখন শেষ পর্যায়ে এমন সময় বাইরে একাধিক পায়ের শব্দ শোনা গেল।

আলোচনা থামিয়ে ইফতেখার মাহমুদ একবার মাথা উঁচু করে শোনার চেষ্টা করল বাইরের পদধ্বনি। মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। আবদেলের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'চৌধুরী চলে এসেছে। মনে থাকবে তো যা যা বলেছি?'

আপনাতেই মাথা নেড়ে সায় জানাল প্রফেসর হাসান আবদেল।

অতীত

সুবাদার আসলাম শেঠ বাইরে বেরিয়ে দেখল তার সেনাপতি মোহরাম প্রধান দুই সঙ্গীকে নিয়ে কামরার ঠিক বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। মোহরাম শুধু তার সেনাপতিই নয় বরং বন্ধুও বটে। কিন্তু সুবাদার আসলাম শেঠ নিশ্চিত যে এই জঙ্গলমহাল দুর্গের বসতভিটার এই অংশে এর আগে এত ভেতরে আসতে পারেনি মোহরাম। কিন্তু আজ রাতের হিসাব ভিন্ন।

'কী খবর, মোহরাম?' একেবারে রণসাজে সজ্জিত রণক্লান্ত মোহরামকে দেখে খানিকটা মায়াই লাগল সুবাদারের। গত কয়েকদিনের টানা যুদ্ধ এবং আজ রাতে এর শেষ পরিণতি তাকে ক্লান্তির শেষ পর্যায়ে নিয়ে গেছে। তবে আসলাম শেঠ জানে এই ক্লান্তি আসলে রণক্লান্তি নয়। এই ক্লান্তি সম্ভাব্য পরাজয়ের ক্লান্তি। যেকোনো সৈনিক যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত হয় পরে, আগে সে পরাজিত হয় নিজের মাথার ভেতরে, নিজের মনের ভেতরে। আসলাম শেঠ জানে কয়েকদিনের তীব্র আক্রমণের তোড়ে তার বাহিনী নিজেরদের ভেতরে আগে আগেই পরাজিত হয়ে গেছে। এখন শুধু বাহ্যিক পতনটা বাকি। এরকম বাহিনী নিয়ে মৃত্যুমুখে ঝাঁপ দেওয়া যায়, যুদ্ধ জয় করা সম্ভব হয় না। আর মোহরাম যখন মুখ খুলল ঠিক এটাই যেন ঘোষণা করল সে।

'খবর ভালো না, সুবাদার। মোঘলদের বাহিনী সর্বাগ্রে আগায়া আসছে। জঙ্গলমহালের পতন এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার,' শেষ কথাগুলো উচ্চারণ করতে গিয়ে মোহরামের গলাটা যেন ভেঙে এলো। আসলাম শেঠ জানে জঙ্গলমহাল তার সম্পত্তি হলেও এই দুর্গের প্রতি মোহরামের ভালোবাসা তারচেয়ে অনেক বেশি। কারণ এই দুর্গের ভেতরেই জন্ম মোহরামের, এখানেই বেড়ে উঠেছে সে। আর তাই জঙ্গলমহালের সাথে তার আত্মার টান।

স্বাভাবিক অবস্থায় যে-কাজটা সে কখনোই করত না, আবেগের আতিশয্যে ঠিক সেটাই করে বসল। আনমনেই একটা হাত রাখল সে মোহরামের কাঁধে। 'নিজেকে সামলে নাও, সেনাপতি। মনে রেখ সুসময়ে নয় দুঃসময়ে যেমন প্রকৃত বন্ধুর পরিচয়, ঠিক তেমনি খারাপ সময়েই প্রকৃত সেনাপতির পরিচয় পাওয়া যায়। জঙ্গলমহালের যদি পতন হয়, তবে সেই পতন যেন শুধু দুর্গেরই হয়, শেখ সুবাদার আসলাম শেঠের পরিবারের কিংবা তার সেনাবাহিনীর সুনামের পতন যেন না হয়–সেটা দেখতে হবে আগে। বুঝতে পেরেছ?' শেষ কথাগুলো বলার সময়ে মোহরামের কাঁধে শক্ত করে একটা ঝাঁকি দিলো আসলাম শেঠ।

আসলাম শেঠের ঝাঁকি খেয়ে সোজা হয়ে মুখ তুলে তাকাল সে। নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছে মোহরাম, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন প্রকৃত সৈনিকের পেশাদরিত্বের ভাব ফুটে উঠতে শুরু করেছে তার চোখে-মুখে। 'জি সুবাদার, বলুন আমার করণীয় কী? শুধু আমি না, আমার অধীনে থাকা প্রতিটা লোক তার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত বিলিয়ে দিবে আপনার জন্যে, জঙ্গলমহাল এবং আপনার পরিবারের সুনামের জন্যে,' বাক্যগুলো শেষ হয়ে আসতে আসতে অপরিসীম দৃঢ়তা ফুটে উঠল তার চোখে মুখে। 'আমার চিন্তা শুধু বেগম সাহেবা আর তার সাথের–'

সুবাদার আসলাম শেঠ ঘুরে দাঁড়িয়ে বসতভিটার বাইরের দিকে এগোতে শুরু করেছে। মোহরাম শেষ কথাগুলো কেন বলেছে সেটা সে বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে। কারণ জঙ্গলমহালে আক্রমণ হবার সাথে সাথে জঙ্গলমহালকে শত্রুরা পুরোপুরি ঘিরে ফেলার আগেই নারী, বৃদ্ধা ও সমস্ত শিশুদেরকে আগে সরিয়ে ফেলা হয়েছে আসলাম শেখের বন্ধুসম রসুল খাঁর এলাকায়। জঙ্গলমহালে রয়ে গেছে শুধুমাত্র আসলাম শেঠের স্ত্রী এবং তার সঙ্গীরা। সেটারও বিশেষ কারণ আছে।

পরাজয় নিশ্চিত জেনেও বারবার বলার পরও বেগম সাহেবাকে সরায়নি সে এবং এখন একদিকে দুর্গের চূড়ান্ত পতনের সময়ে চলে এসেছে, সেই সাথে শত্রুরাও ঘিরে ধরেছে জঙ্গলমহালকে। যদি জঙ্গলমহালের পতন হয় এবং তারা পরাজিত হয় তবে বেগম সাহেবার কী হবে–সেটাই মোহরামের চিন্তার বিষয়। মোহরাম কেন এই কথা বলেছে সেটা বুঝতে পারলেও সেই বিষয়ে কিছুই বলল না আসলাম শেঠ। বরং সামনে এগোতে এগোতে সে একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলে উঠল।

'মোহরাম, আমাকে সার্বিক পরিস্থিতির বিষয়ে জানান দাও। পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে হলে আমাকে আগে পরিস্থিতি বুঝতে হবে।'

সুবাদার আসলাম শেঠের ঠিক পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে পরিস্থিতির বয়ান দিয়ে চলল মোহরাম। 'হুজুর, জঙ্গলমহালের সামনের প্রধান তিন বুরুজের দুইটারই অবস্থা কাহিল। একটার একদিক ধইসা পড়ছে। ওটা আমরা ছাইড়া দিছি, ওই অংশের দখল নিয়া নিছে শত্রুপক্ষ।

'আর বাকি দুটো?' আসলাম শেখের ভ্রু কুঁচকে উঠেছে শুনতে শুনতে।

'বাকি দুটোর মধ্যে একটার অবস্থা খুবই খারাপ। যেকোনো সময়ে সেটা শত্রুপক্ষের হাতে চলে যেতে পারে। আমি ভেতরে আসার আগেও প্রাণপণে লড়াই চলছিল। তবে আমাদের সৈন্যরা এতক্ষণে হয়তো ' ইচ্ছে করেই সে বাক্যটা সমাপ্ত করল না।

মোহরাম আর তার সঙ্গীকে নিয়ে দুর্গের তৃতীয় বুরুজের ওপরে এসে সামনের দিকে তাকিয়ে আসলাম শেঠ অন্ধকারের ভেতরে বোঝার চেষ্টা করল দ্বিতীয় বুরুজে

আসলে হচ্ছেটা কি। প্রথম বুরুজে উড়তে থাকা শত্রুপক্ষের পতাকা দেখে এটা পরিষ্কার যে সেটা ইতিমধ্যেই বেদখল হয়ে গেছে। কিন্তু আধো অন্ধকারের ভেতরে দ্বিতীয় বুরুজের দিকে তাকিয়ে ঠিক পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না ওখানে প্রকৃতপক্ষে হচ্ছেটা কী? এই রাতের বেলা দূরবীক্ষণও যে খুব বেশি কাজ করবে না, সেটাও তো জানা কথা।

'মোহরাম, আমাদের কি ওইখানে লোকবল পাঠানো উচিত?' প্রায় আর্তনাদের গলায় বলে উঠল সুবাদার। যদিও সে আগে থেকেই জানত কী ঘটছে ওখানে এবং সম্ভবত একই ব্যাপার ঘটতে চলেছে ওদের সাথেও, তবুও নিজের লোকদেরকে সে কখনও পর কিংবা শুধুমাত্র কাজের লোক কিংবা সৈন্য হিসেবে দেখেনি। বরং সবসময়ই নিজের একান্ত আপন এবং কাছের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেছে।

'হুজুর,' মোহরামের মাথা আপনাতেই নিচু হয়ে গেল। 'আপনেও জানেন ওইখানে আরও লোক পাঠানো মানে তাগোরেও সরাসরি মৃত্যুর মুখে ঠেইলা দেওয়া,' মোহরামের গলাতেও কষ্টের ছাপ।

হঠাৎ বাজ পড়ার মতো তীব্র শব্দে কেঁপে উঠল পুরো জঙ্গলমহাল। আগুন ঝলসে উঠল দ্বিতীয় বুরুজের একপাশে, সেই সাথে অসংখ্য মানুষের হই হই রব ভেসে এলো। না চাইতেও আপনাতেই সামনের দিকে দুই পা এগিয়ে গেল সুবাদার আসলাম শেঠ। তীব্র শব্দ, আগুনের উত্তাপ আর অসংখ্য মানুষের আর্তনাদের সাথে সড়সড় করে দ্বিতীয় বুরুজের ওপরে উঠে গেল শত্রুদের পতাকা। যদিও সবই জানা, তবুও দুঃখে পানি চলে এলো আসলাম শেঠের চোখে। আনমনেই সেদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে একবার মোহরামকে দেখে নিয়ে সে ফিরে দেখল বুরুজের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা নিজের লোকদেরকে। কারও ভাই, কারও বন্ধু কারও বাবা কিংবা আপনজন মারা পড়ছে ওইখানে, পবিত্র জন্মভূমি পদদলিত হচ্ছে শত্রুর করতলে, তবুও কিছুই করার নেই। আসলেই কি কিছু করার নেই!

একটাই করণীয়, মনে মনে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল আসলাম শেঠ। যদিও নিজের বিচিত্র আর বাহুল্যময় জীবনে সে বহু দেশ, বহু জায়গাতে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু মোহরামের মতোই এই জঙ্গলমহাল তারও জন্মভূমি, তারও মাতৃভূমি। তবে আসলাম শেঠ এটাও জানে যেদিন সে নিজের স্ত্রীকে এখানে নিয়ে এসেছিল সেদিন জঙ্গলমহাল, কিংবা নিজের মাতৃভূমির চেয়েও অনেক অনেক বড়ো এক পবিত্র দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল। এমনকি নিজের মাতৃভূমির বিনিময়ে হলেও এই পবিত্র দায়িত্ব তাকে পালন করতেই হবে। আর নিজের কিংবা নিজের মানুষদের জীবনাবসান করে হলেও সেটা সে পালন করবে। বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্রতর বিসর্জন।

মনে মনে সে একবার পুরো জঙ্গলমহালের আকৃতিটা ঝালাই করে নিলো। তিনদিকে ভূমি আর একদিকে জলপথের সাথে সংযুক্ত কেল্লাটা আক্ষরিক অর্থেই চারপাশে জঙ্গল আর জলভূমির মাঝখানে অবস্থিত; পুরো জঙ্গলমহালের দুর্গটাকে ঘিরে আছে পরিখা। পুরো দুর্গের রক্ষণভাগ নিয়ন্ত্রণ করা হয় মূলত তিনটে বুরুজ থেকে। প্রথম বুরুজটা প্রবেশ পথের একেবারে সম্মুখভাগেই এবং সেটাই সবচেয়ে শক্তিশালী। আর বিগত দশদিনের যুদ্ধে প্রথম বুরুজটারই পতন হয়েছে সবার আগে। আর সেটা ঘটার সাথে সাথেই অরক্ষিত হয়ে পড়েছে পুরো দুর্গ। কিন্তু এটাও ঠিক, হয়তো প্রথম বুরুজের সাথে প্রায় সমান্তরালে দ্বিতীয় বুরুজ। যেটার পতন হলো এইমাত্র। দ্বিতীয় বুরুজ অতটা শক্তিশালী না হলেও দুর্গের ভেতরে বসতবাড়িগুলোকে আগলে থাকা তৃতীয় বুরুজ অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে গড়ে তোলা। আর প্রথম দুটো বুরুজের সাথে তৃতীয় বুরুজের দূরত্বও বেশ অনেকটা। একটাই উপায় আছে তাদের সামনে। মনে মনে নিজের করণীয় ঠিক করে নিয়েই মোহরামের দিকে ফিরে তাকাল আসলাম শেঠ।

'মোহরাম, শত্রুপক্ষের অবস্থান বর্ণনা করো আমার কাছে।'

'হুজুর, অনুমতি দিলে আমি জানাইতে পারি,' মোহরামের পাশ থেকে সৈনিকদের প্রধান বয়স্ক লোকটা বলে উঠল। 'হুজুর, পরিখার বাইরে আমাদের দুর্গের সম্মুখভাগ পুরাটাই আগলে আছে শত্রুপক্ষ। তিনকোনা দুর্গের সম্মুখভাগ এবং দুইপাশে অর্ধবৃত্তাকারে ছড়ায়ে আছে সৈনিকেরা। জঙ্গলের ভেতরের সমস্ত পথ আগলে আছে ওরা, যাতে বাইরের কোনো সাহায্য আমাদের নিকটে পৌঁছাতে না পারে। আর দুর্গ থেকে একটা পক্ষীও ওই পথে পলাইতে না পারে।'

এই তথ্য আসলাম শেঠ জানে। আর এ-কারণেই রসুল খাঁর কোনো সাহায্য তাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। 'আর পেছনের জলপথ?'

'হুজুর, পেছনের জলপথে সরাসরি কোনো প্রহরার খবর পাওয়া যায়নি। তবে আমি নিশ্চিত, জলপথের ওপাশেও তাদের বাহিনী প্রস্তুত আছে। জলপথে কেউ বেরোলে মূল নদীতে পড়ামাত্রই ধরা পইড়া যাবে। এছাড়াও ওরা স্থানীয় মোঘল জলচৌকির সহায়তা পাইব।'

বয়স্ক সৈনিক প্রধানের শেষ কথাটা শুনে সুবাদারের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। 'মোহরাম, তোমার অধীনে সৈন্য যারা আছে তাদেরকে তৃতীয় বুরুজের নিচে নামিয়ে বসতবাড়ি আগলে একটা সাময়িক প্রতিরক্ষা দেওয়াল তৈরি করে ফেলতে বলো।'

আসলাম শেঠের কথা শুনে মোহরাম তো বটেই এমনকি বয়স্ক সৈনিকও অবাক হয়ে চোখ তুলে তাকাল তার দিকে। 'হুজুর, কী বলছেন আপনি। এই দুর্গে আর শত্রুপক্ষের বিজয়ের ভেতরে এখন একটাই বাধা আর সেটা হলো এই তৃতীয় বুরুজ। এটা ছাইড়া দিলে তো

'মোহরাম, যা বলছি করো,' আসলাম শেঠের গলায় পাহাড়সম দৃঢ়তা।

'গোস্তাকি নিবেন না, হুজুর, আমাদের হাতে কিন্তু খানিকটা সময় আছে, আমার মনে হয় না শত্রুপক্ষ দ্বিতীয় বুরুজ দখলের পর সকালের আগে আর আক্রমণ চালাবে কারণ ওরা জানে আমরা ফাঁদে আটকে পড়ে গেছি। আমরা যদি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি–'

'আমি চাই ওরা সকাল নয়, রাতেই আক্রমণ করুক,' আসলাম শেঠ মৃদু হেসে বলে উঠল। 'ঠিকভাবে বলতে গেলে রাতেই আক্রমণ করতে প্রলুব্ধ হোক।'

মোহরামসহ সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। 'তাহলে কি তৃতীয় বুরুজ থেকে.

'সব সৈনিক নিচে নামিয়ে বসতবাড়ি আগলে সাময়িক দেওয়াল তৈরি করতে বলো, বসতবাড়িতে তোমার বেগম সাহেবার কাছে একটা বিশেষ বার্তা পাঠাও–'

'হুজুর, এই বুরুজের প্রহরা–'

মোহরামকে কথা শেষ করতে দিলো না আসলাম শেঠ। 'দরকার নাই,' বলে সে ফিরে তাকাল নিজের বন্ধুসম সেনাপতি ও সৈনিক প্রধানের দিকে। 'কারণ এই বুরুজে আমরাই আগুন ধরায়ে দিব। মৃত্যু আলিঙ্গনের সময় এসে গেছে, বন্ধু।'

বর্তমান সময়ের তিন বছর আগে
কমলাপুর রেলওয়ে কলোনি বস্তি

পুরনো লাইনচ্যুত যে বগিটায় বিগত বেশ কিছুদিন ধরে তারা থাকছে সেটার ঠিক বাইরে পায়ের শব্দ শুনে ইফতেখার মাহমুদ আর হাসান আবদেল দুজনেই ফিরে তাকাল সেদিকে।

'আবদেল, চৌধুরী চলে এসেছে, যা যা বলেছি মনে রেখ,' বলে সে উঠে দাঁড়াতেই ভেতরে প্রবেশ করল পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়সের একজন মানুষ। সদ্য যৌবনের কোঠা পার হয়ে মধ্যবয়সের দিকে রওনা দেওয়া মানুষটার বয়স প্রফেসর আবদেল আর প্রফেসর ইফতেখারের অর্ধেকের চেয়ে কিছু বেশি হলেও তাকে দেখতে লাগে অনেক বেশি বয়স্ক; আর বিগত কয়েক মাসের মানসিক চাপ এবং বাজে পরিস্থিতি তাকে আরও বেশি এলোমেলো আর বয়স্ক করে তুলেছে। বয়সে কম হলেও সে একজন গবেষক, চোর-বাটপাড় কিংবা আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার লোক নয় যে দিনের-পর-দিন চোরের মতো পালিয়ে বেড়াবে লোকজনের চোখে ধুলো দিয়ে। অথচ সেটাই তাকে করতে হচ্ছে বিগত বেশ কিছুদিন ধরে।

'চৌধুরী, কী অবস্থা বাইরে? যা করতে বলেছিলাম সেটা করতে পেরেছো?' যদিও সে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথার মানুষ কিন্তু এই মুহূর্তে তার গলায় চাপা উদ্বেগ কোনোভাবেই আর চাপা থাকল না।

কিন্তু সে যত উৎকণ্ঠার সুরেই প্রশ্ন করুক না কেন, চৌধুরী হাসান শেখ কোনো জবাব দিলো না। তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেকোনো মুহূর্তে সে ক্লান্তি আর চিন্তার চোটে ধসে পড়বে। প্রফেসর ইফতেখারের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সে অদ্ভুত সেই সিট বিছানার এক কোনায় গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল।

'চৌধুরী, তুমি ঠিক আছ?' প্রফেসর আবদেল চিন্তিত দৃষ্টিতে একবার ইফতেখার মাহমুদের দিকে দেখে নিয়ে সে ফিরে তাকাল চৌধুরীর দিকে। কিন্তু কিছু বলার আগে চৌধুরীই কথা বলে উঠল। 'স্যার, আপনি যা বলেছিলেন সেটাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে।'

ইফতেখার মাহমুদ তার বন্ধু আবদেলের দিকে তাকিয়ে একবার কাঁধ ঝাঁকাল। তার মুখ এবং শরীরের ভাষা পরিষ্কার বলছে, আমি আগেই জানতাম। 'শান্ত হও, চৌধুরী, এরকমটা হবারই কথা ছিল।'

'স্যার, আমরা ধরা পড়ে গেছি। এতদিন ধরে লুকিয়ে থেকে তবে কি.

প্রফেসর আবদেল ট্রেনের বগির জানালার দিকে এগিয়ে গেল। 'ধরা পড়ে গেছি মানে? ওরা কি এখানে চলে এসেছে নাকি?' সে অস্থির হয়ে উঁকি দিয়ে জানালার বাইরে দেখার চেষ্টা করছে।

'শান্ত হও, আবদেল,' ইফতেখার মাহমুদ শান্ত গলাতেই কথা বলে উঠল। 'আমরা এই এলাকাতে আছি–এটা ওরা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু একেবারে নির্দিষ্টভাবে কোথায় আছি সেটা ওরা এখনও বের করতে পারেনি।'

'তুমি এতটা নিশ্চিন্ত হচ্ছো কীভাবে?' প্রফেসর আবদেলের গলার দুঃশ্চিন্তা কিছুতেই কমছে না। সে আবারও জালালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে অন্ধকারের ভেতরে বোঝার চেষ্টা করছে–আসলে বাইরে কেউ তাদেরকে ধরার জন্যে ওঁত পেতে আছে কি না।

'আবদেল!' এবার খানিকটা রাগের সাথেই সে বলতে গেলে ধমক দিয়ে উঠল প্রফেসর আবদেলকে। 'বললাম না শান্ত হতে। আমি নিশ্চিত ওরা বের করতে পারেনি আমরা নির্দিষ্টভাবে কোথায় আছি। যদি সেটা পারত তবে চৌধুরীও আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত না, আর আমরাও এখনও মুক্ত থাকতাম কি না সন্দেহ আছে,' প্রফেসর আবদেলকে এটুকু বলে ইফতেখার মাহমুদ এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল তার ছাত্র এবং পারসোনাল সেক্রেটারি চৌধুরীর সামনে।

'চৌধুরী, তুমি ঠিক করে বলো তো কী দেখে এসেছ বা শুনেছ?' ইফতেখার মাহমুদ বাঁহাতের তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলি এক করে ভ্রুর ওপরে ঘষতে শুরু করেছে।

এটা অনেকটা তার মুদ্রাদোষের মতো। বিশেষ করে ভাবনা চিন্তা করার সময়ে সে এমনটা করে।

'স্যার, আপনি ঠিক যেভাবে বলেছিলেন সেভাবেই আমি টোকাই আর কমলাপুরের ফকির বাহিনীর প্রধানকে টাকা খাইয়েছিলাম। সে আজ রাতে জানান দিয়েছেঃ তার বাহিনী নাকি এই এলাকাতে পুলিশের ইনফরমারদেরকে ঘুরঘুর করেত দেখেছে।'

'এটা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার,' ইফতেখার মাহমুদ ভ্রু থেকে হাত নামিয়ে নিলো। 'কমলাপুর এলাকা খুব বিজি এবং কম্পলিকেটেড একটা এরিয়া। তার ওপরে ক্রাইম এবং ড্রাগ এগুলোরও আখড়া। কাজেই এখানে পুলিশের চর আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার লোকেরা বেশি বেশি চারপাশে ঘুরঘুর করবে এটাই স্বাভাবিক।'

'আপনি ভুল বুঝছেন স্যার,' চৌধুরী মাটি থেকে একটা পানির বোতল তুলে নিতে নিতে বলে উঠল। 'এই এলাকাতে পুলিশের চরেরা ঘোরাঘুরি করছে এটা স্বাভাবিক ঘটনা হলেও একেবারে নির্দিষ্টভাবে আমাদের এই বগির আশপাশেও গতকাল থেকে এই এলাকায় পুলিশের সবচেয়ে কুখ্যাত ইনফরমার মন্টুকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। শুধু মন্টু না, মন্টুর ডান হাত হিসেবে খ্যাত দুবলা নামের একজনকে দুবার এই বগির সামনে দেখেছে আপনার নিয়োগ দেওয়া টোকাইদের একজন। টোকাইদের নেতা দুলাল আজকে আমাকে লোকটাকে দেখিয়েছেও।'

ইফতেখার মাহমুদ বাইরের দিকে তাকিয়ে আনমনেই বলে উঠল, 'লোকটা কি হ্যাংলা-পাতলা ছোটো করে, একটা কান নেই?' এই প্রথমবারের মতো চৌধুরীর কথা শুনে ইফতেখার মাহমুদের গলায় মেঘ জমতে শুরু করেছে।

'স্যার, আপনি কীভাবে জানলেন?' চৌধুরী পানি খেতে খেতে খুব অবাক হয়ে জানতে চাইল। প্রফেসর আবদেলও বেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ইফতেখার মাহমুদের দিকে।

'তোমার কি ধারণা, এতদিন ধরে আমরা এখানে লুকিয়ে আছি, সবকিছু আমি সামলাচ্ছি; শুধু ছোটোখাটো কাজগুলো তোমাকে করতে দিয়েছি, চৌধুরী। তাহলে আজ কেন হঠাৎ করে তোমাকে পাঠালাম টোকাই আর ভিক্ষুকদের দলটার সাথে যোগাযোগ করার জন্যে?' এই পর্যন্ত বলে সে ফিরে তাকাল আবদেল আর চৌধুরীর দিকে। 'কারণ আমি গতকালই টের পেয়েছি কিছু একটা ঠিক নেই। গড়বড় হয়ে গেছে কোথাও,' বলে সে বিছানার পাশ থেকে একটা সিগারের প্যাকেট তুলে নিয়ে তা থেকে সিগার বের করে ধরাল। নিজেদের পরিচয় গোপন করে লুকিয়ে থাকার

জন্যে সবকিছু করলেও শুধু ভালো সিগার খাবার ব্যাপারটা ছাড়তে পারেনি ইফতেখার মাহমুদ। প্রথম কয়েকদিন চেষ্টা করেছিল সিগারেট খাবার জন্যে, কিন্তু কাজ হয়নি। পারেনি, এরপর সেই চেষ্টা বাদ দিয়ে সে আবারও পুরনো সিগার টানার অভ্যাসে ফিরে গেছে।

'কারণ যে-লোকটার কথা তুমি বললে,' সিগারেটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ইফতেখার মাহমুদ বলে উঠল। 'তাকে আমি গত দুই দিনে একাধিকবার এদিকে দেখেছি। তবে সে সম্ভবত এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেনি, কারণ আমি কিংবা আবদেল কেউই আমরা এই বগি থেকে বের হইনি বলে,' ইফতেখার মাহমুদ নিশ্চিত ভঙ্গিতে সিগারেট টানছে। প্রফেসর আবদেল অস্থির হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই সে একটা হাত তুলে থামিয়ে দিলো তাকে।

'অস্থির হয়ো না,' বলে সে নিজেই মৃদু হেসে উঠল। 'যদিও অস্থির হবার মতো কারণ যথেষ্টই আছে আসলে। ওরা এই পর্যন্ত যেহেতু চলে এসেছে এবং চৌধুরীর নিয়ে আসা তথ্য অনুযায়ী আমি ধারণা করতে পারি বড়োজোর আজকের রাতটা আমরা এখানে টিকতে পারবো। কাল ধরা পড়ে যাবো।'

'তাহলে এখন করণীয় কি, স্যার?'

'এতদিনে পালিয়ে বেড়ানো কি তবে কোনো কাজেই আসবে না?' প্রফেসর আবদেলের গলায় অস্থিরতা। 'আমরা

'আবদেল, আমি মানা করছি অস্থির হয়ো না। আমাদের হাতে সময় খুব কম, আর বড়োজোর চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা আছে, সম্ভববত তাও নেই। কাজেই এরকম সময়ে অস্থির হলে চলবে না। মনে রেখ, আমরা একটা বিরাট উদ্দেশ্য নিয়ে লড়ছি,' বলে সে নিজে বিড়বিড় করে বলে উঠল। বিরাট নয়, সবম্ভবত ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো উদ্দেশ্য নিয়ে। বিড়বিড় করে কথাটা বলেই সে হঠাৎ ঝট করে দুজনার দিকে ফিরে তাকাল। 'এক মিনিট, আমি বিরাট একটা ভুল করে ফেলেছি, শিট,' বলে সে অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের সিগারেটটা মেঝেতে ছুড়ে ফেলল। 'আমি এতবড়ো ভুল কীভাবে করলাম? শিট!'

'কী ব্যাপার হঠাৎ—'

'আবদেল, দুঃখিত বন্ধু, আমাদের হাতে আসলে কোনো সময়ই নেই, যেকোনো সময়ে ধরা পড়ে যাব আমরা। ইতিমধ্যেই যে পড়িনি সেটাই অনেক বড়ো বিষয়!'

'কারণ কী? হঠাৎ হলোটা কী সেটা তো বলো!' ইফতেখারের উত্তেজনা প্রফেসর আবদেল আর চৌধুরীর ভেতরেও সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে।

'পুলিশের লোকেরা যদি আমাদেরকে ট্রেস করে থাকে, তবে নিশ্চয়ই ওরা আমাদের ওপরে নজর রাখছে। সেক্ষেত্রে ওরা আজ রাতে চৌধুরীকে বের হতে দেখেছে এবং ফিরে আসতেও দেখেছে। তারমানে ওরা কয়েক ঘণ্টা আগেই নিশ্চিত হয়েছে আমরা এখানে আছি।'

'সেটা নাও হতে পারে, কারণ আমি বা তুমি তো বাইরে বের হইনি, ওরা আমাদেরকে দেখতে পায়নি,' আবদেল বলে উঠল।

'সেটা ঠিক, কিন্তু চৌধুরী বের হবার পরও এখানে আলো জ্বলেছে তারমানে এখানে কেউ-না-কেউ আছে এই ব্যাপারে ওরা নিশ্চিত। অন্তত চৌধুরী এই মুহূর্তে এখানে আছে এটা তো পুরোপুরি নিশ্চিত। তাহলে ওরা এখনও কিছু করেনি কেন?'

প্রফেসর আবদেল এবং চৌধুরী দুজনেই চুপ। দুজনেই বুঝতে পারছে না কারণটা কী?

'এর পেছনে একটাই কারণ হতে পারে। ওরা আমাদেরকে ধরবেই না।'

'কেন, আর যদি না ধরে তবে তো ভালোই .

'ভুল, ওরা ধরবে না মানে ওরা সম্ভবত টাকা খেয়ে সুযোগ করে দিবে অন্য কাউকে ধরার জন্যে। আমি নিশ্চিত আমাদের ওপরে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার যারা নজর রাখছে, ওরা জানেই না কেন আমরা গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এদেরকে টাকা দিয়ে কেনা–'

'রেলিক–,' প্রফেসর আবদেলের গলায় ঠান্ডা আতঙ্ক।

'অথবা নেক্রপলিস,' ইফতেখার মাহমুদ ছোটো জায়গাটায় পায়চারি করতে করতে বলে উঠল।

'এখন করণীয় কী, স্যার?' অনেকক্ষণ পর চৌধুরী কথা বলে উঠল। তার গলা শুনে মনে হচ্ছে যেকোনো সময় কেঁদে ফেলবে সে।

ইফতেখার মাহমুদ কিছু না বলে আরেকটা সিগার ধরালো। তাকে আবারও বেশ শান্ত দেখাচ্ছে। 'ওয়েল, জাদু দেখেছ তোমরা কখনও?' বলে সে ফিরে তাকাল প্রফেসর আবদেল আর চৌধুরীর দিকে। দুজনেই হাঁ করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মনে মনে ভাবছে লোকটা অধিক মানসিক চাপে পাগল হয়ে গেল নাকি?

'যাক গে, জাদুর কথা না বলি,' বলে সে সিগারেটে কষে আরেকটা টান দিলো। 'আমরা সেটাই করব ওরা, মানে আমাদের অদৃশ্য শত্রুপক্ষ যেটা আশাই করছে না,' বলে সে আবারও থামল। আবদেল আর চৌধুরীর অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে যোগ করল। 'ওরা আমাদের দিকে ধেয়ে আসার আগে আমরাই ওদের দিকে ধেয়ে যাব,' বলে সে মৃদু হেসে উঠল।

অতীত

কাউকে হত্যা করার সময়ে মোঘল সেনাপতি বাহরাম খাঁর ভেতরে অদ্ভুত এক দোদুল্যমানতা কাজ করে। বিষয়টা এমন না যে সে কাউকে আঘাত করতে ভয় পায়, কিংবা কারও গলা কাটতে তার হাত কেঁপে ওঠে, বরং কাউকে মারতে গেলে উলটোটা ঘটে। যখন কারও শরীরে নিজের বিরাট তরবারিটা প্রবেশ করায়, কিংবা সেটার তীব্র আঘাতে মাংস কেটে হাড় ভেঙে মানুষটার শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় সেটা বরং তাকে বিচিত্র এক আনন্দ দেয়। আর বাহরাম খাঁর দ্বিধাটাও ঠিক এখানেই। সমাজের খুবই দরিদ্র অংশ থেকে উঠে আসা বাহরাম খাঁ নিজেকে খুব ধার্মিক মানুষ মনে করে। সে মনে করে সমাজের যে চাপা পড়া অংশ থেকে উঠে এসে আজকে একজন মোঘল সেনাপতি হতে পেরেছে এটার পেছনে একমাত্র কারণ হলো তার স্রষ্টার অনুগ্রহ। তার ওপরে স্রষ্টার অপরিসীম কৃপা ছিল বলেই সে আজ মোঘল বাহিনীর মতো ভারতের সর্ববৃহৎ সেনাবাহিনীর একটা বড়ো দলের সেনাপতি হতে পেরেছে। সমস্যা হলো একদিকে সে স্রষ্টার প্রতি অপরিসীম নিগ্রহ অনুভব করে। আবার সেই স্রষ্টার সৃষ্টির প্রাণ হরণ করতে গিয়ে সে এক বিচিত্র আনন্দ অনুভব করে। এই পরস্পরবিরোধী অনুভূতির তল সে আজো খুঁজে পায়নি। তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা বন্দির মাথার পেছনের চুল ধরে তার সৈনিক যখন লোকটার গলা উন্মুক্ত করে ধরল মানুষটা চোখে অসহায় মৃত্যুভয় দেখে নিজের ভেতরে সেই বিচিত্র-বিকৃত আনন্দ অনুভব করতে লাগল বাহরাম খাঁ। মুহূর্তের জন্যে তার মনে হলো সে নিজেই আসলে ঈশ্বর সমতূল্য। এমনকি, সেই ক্ষণিক মুহূর্তের ভেতরে সে নিজের ভেতরে খানিকটা যৌন উত্তেজনাও অনুভব করল। তবে তার ভেতরের লড়াইটা খুব বেশি স্থায়ী হলো না, স্রষ্টার অনুকম্পার জায়গাটা খুব দ্রুতই দখল করে নিলো আসন্ন হত্যার আনন্দ। নিজের বিরাট তরবারিটা চালিয়ে দিলো সে বন্দির গলা বরাবর। লোকটার কণ্ঠনালী ভেদ করে লোহার পাতটা ঢুকে গিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে শুরু করতেই আসন্ন মৃতের বুক বরাবর লাথি মেরে দেহটা বুরুজ থেকে নিচে ফেলে দিলো সে। মুহূর্তের জন্যে তার মনে হলো: জয় এবং হত্যার তীব্র আনন্দে চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু সেটা না করে চোখ বন্ধ করে ফেলল সে। মনে মনে একবার তওবা করে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলতে লাগল।

তারপর চোখ খুলে জঙ্গলমহাল নামের এই দুর্গের দখল করা দ্বিতীয় বুরুজের ওপরে পত পত করে তার বিশেষ বাহিনীর পতাকা উড়ছে। খুশিতে মনটা আনচান করে উঠল তার। সমস্ত অপেক্ষার অবসান হতে যাচ্ছে, আর কিছুটা সময়; এরপরেই সে দখল করে নেবে পুরো জঙ্গলমহাল, যা আজ অব্দি কোনো বহিরাগত

দখল করতে পারেনি। তবে সেই সাথে নিজেকে সে স্মরণ করিয়ে দিলো তার মূল উদ্দেশ্য জঙ্গলমহাল দখল করা নয়, বরং ভিন্ন কিছু। আর সেটা ঠিকঠাক করতে পারলে সে শুধু বাঙাল মুলুক নয়, পুরো মোঘল বাহিনীতে সবচেয়ে ক্ষমতাবান এবং প্রভাবশালীদের একজন হয়ে উঠবে।

পতাকা থেকে চোখ নামিয়ে উল্লাসের সাথে চিৎকার করতে থাকা নিজের লোকদেরকে হাত নেড়ে শান্ত হতে বলল সে, হাতের ইশারায় কাছে ডেকে পাঠাল তার বাহিনীর দ্বিতীয় প্রধান, সরাফতকে।

সরাফতের হাতে-মুখে-শরীরে রক্ত লেগে আছে, সমস্ত শরীরেও কালিঝুলি মাখা। হাতে এখনও খোলা তলোয়ার। বাহরাম খাঁর কাছে এসে সে তরবারিটা কোষে ঢুকিয়ে আপনাতেই সামান্য মাথা নিচু করে বলে উঠল, 'হুজুর, হুকুম।'

'সব বন্দিদেরকে নিকেশ করা হয়েছে?' যদিও সে জানে জবাবটা কী হবে তবুও একবার বলে উঠল।

'জি হুজুর, আপনার নির্দেশ অনুযায়ীই সব বন্দিদেরকে নিকেশ করে লাশগুলো পরিখায় ফেলে দেওয়া হয়েছে,' সরাফত মাথা নিচু করেই কথা বলছে। বাহরাম খাঁ চোখে চোখ রেখে কথা বলতে ভয় পায় সে। বিশেষ করে যুদ্ধাবস্থায় তো আরও না, এই লোকের মেজাজ মর্জির কোনো আগা-মাথা নেই। আর তলোয়ার চলে হাওয়ায় উড়তে থাকা বাঁশপাতার মতো। 'আর কোনো হুকুম, হুজুর?'

'শত্রু পক্ষের কী অবস্থা?' সে নিজে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে তৃতীয় বুরুজের দিকে। ওটাতে একটু আগেও আলো জ্বলছিল। এখন একেবারে অন্ধকারে ঢেকে আছে পুরো বুরুজ। *ব্যাপার কি, শালারা ভয়ে পালাল নাকি?* কথাটা মনে মনে বললেও সে জানে ওদের পালাবার কোনো পথ নেই। যদি থাকতও, তবুও আসলাম শেঠের মতো লোক নিজের জন্মভূমি ফেলে কাপুরুষের মতো পালাবে না, এটা সে ভালোই জানে, *শালা ভেতো বাঙালি হলেও মনের জোর আছে ব্যাটার*। আর একারণেই ধ্বংস হবে সে বাহরাম খাঁর হাতে। *তোকে আমি গলা টিপে মারব, আসলাম শেঠ।*

'হুজুর, দ্বিতীয় বুরুজ দখলের পরই ওরা পিছু হটে গেছে। আমার হিসেব বলে, ওরা দ্বিতীয় আর তৃতীয় বুরুজের মধ্যিখানে একটা শক্ত অবস্থান গড়ে তুলবে, সেই সাথে নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবে তৃতীয় বুরুজে। কারণ ওটার পতন হলেই জঙ্গলমহালের পতন হবে।'

সরাফতের কথা শুনে জোরে হেসে উঠল বাহরাম খাঁ। 'মাথায় যদি সামান্যতম বুদ্ধি থেকে থাকে তবে তাই করবে। আর ওটাই ওদের ধ্বংস ডেকে আনবে। আমার বাহিনীর অবস্থা বর্ণনা করো। বিশেষ করে প্রহরার কী অবস্থা?'

'দুর্গ চারিপাশ থেকে ঘিরে রাখা হয়েছে, বিশেষ করে দুর্গের পিছনের ভাগ, সম্মুখভাগ এবং জঙ্গলের পথ এই তিনদিক দিয়ে একটা পক্ষীও পালাইতে পারবে না। আর জলপথ–' সরাফতকে কথা শেষ করতে দিলো না বাহরাম। তার আগেই বলে উঠল, 'জলপথের খবর আমি জানি। এক কাজ করো, সরাফত। দ্বিতীয় বুরুজে প্রহরার ব্যবস্থা করো, আর তোমার লোকদের কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে নির্দেশ দাও আর সকালের প্রথম প্রহরেই আমরা আক্রমণ চালাব। আমার হিসেব বলে ওদের খুব বেশি মানুষ অবশিষ্ট নেই। আর যারা আছে তারাও এক এবং দুই বুরুজের মাঝের সুরক্ষা শক্ত করতে ব্যস্ত, কাজেই সকাল হতে হতে ওরা সুরক্ষা দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারলেও ওরা থাকবে ক্লান্ত। আর ওদের ওই সুরক্ষা ব্যবস্থা কীভাবে ভাঙতে হবে সেটা আমার জানা আছে,' এটুকু বলতেই বাহরাম খাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। দিব্যদৃষ্টিতে সে পরিষ্কার নিজের বিজয় দেখতে পাচ্ছে। 'আর একবার ওদের সুরক্ষা ভেঙে গেলে ওদের তৃতীয় বুরুজ নিয়ে আমার বিশেষ পরিকল্পনা আছে–' বাহরাম খাঁর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল সামনের দৃশ্য দেখে সে চমকে উঠল।

শুধু সে না, উপস্থিত প্রতিটা সৈনিক হাঁ হয়ে তাকিয়ে দেখল, বলতে গেলে আচমকাই দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে জঙ্গলমহালের তৃতীয় বুরুজ।

'শালারা পাগল হয়ে গেল নাকি, নিজেদের বুরুজে নিজেরাই আগুন লাগিয়ে দিয়েছে–' কিন্তু এর পরের দৃশ্য দেখে সে আরও চমকে উঠল। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা বুরুজের অগুনের আলোয় পরিষ্কার দেখল, মশাল আর তলোয়ার হাতে আসলাম শেঠের অবশিষ্ট সৈনিকেরা দৌড়ে আক্রমণ করতে আসছে ওদেরকে।

'এরা আসলেই পাগল হয়ে গেছে, না হলে মরার জন্যে এত উতলা হয় কেউ

বর্তমান সময়ের তিন বছর আগে

প্রফেসর ইফতেখার মাহমুদ খুব মনোযোগের সাথে তারা যেখানে আছে, মানে সেই কমলাপুর রেলওয়ে বস্তির পুরো এলাকাটার অবস্থান এবং চারপাশটা জরিপ করার চেষ্টা করছে। কমলাপুর স্টেশন থেকে খিলগাঁওয়ের দিকে যেতে মূল যে রেললাইনগুলো আছে, সেগুলোর দুপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পুরনো রেলের বগি আর রেললাইনের বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে এই রেলওয়ে বস্তি। মূলত

লাইনগুলোকে কেন্দ্র করে দুপাশে ছড়িয়ে আছে। দুপাশে দুটো পুরনো, বাতিল রেললাইনকে সমান্তরালে ধরে লাইনের দুপাশে অসংখ্য ছোটো ছোটো ঝুপড়ি। এর একপাশে মাইলখানেক গেলে স্টেশন, উলটোদিকে মাইলখানেক গেলে খিলগাঁও রেল ক্রসিং। ক্রসিংয়ের তুলনামূলক কাছে রেলের একটা পুরনো বগিতে বিগত বেশ কিছুদিন যাবৎ লুকিয়ে আছে প্রফেসর ইফতেখার, প্রফেসর আবদেল এবং তাদের সহকারী চৌধুরী।

রেলের বগির ধুলোময় মেঝের ওপরে একটা কাঠি দিয়ে দুটো দাগ টানল প্রফেসর ইফতেখার। 'এই দুটো হলো মূল রেললাইন,' লাইনের একপাশে দেখাল সে। 'এদিকটা ধরে কিছুদূর এগোলে স্টেশন। একদিকে রেলগেইট আর ওদিকে মূল সড়ক,' এইটুকু বলে ইফতেখার একবার চৌধুরীকে দেখল।

'স্যার, ওই আপনি যেদিকটাতে স্টেশনের ইশারা করলেন, আপনার লোকের দেওয়া খবর অনুযায়ী ওইদিকেই দুজনকে দেখা গেছে, মানে পুলিশের লোক আর কি,' চৌধুরী চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে উঠল।

ইফতেখার মাহমুদ ম্যাপটা দেখছে। দেখতে দেখতে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে সে মৃদু হেসে উঠল। 'ঠিক আছে, দুজনেই মনোযোগ দিয়ে দেখ। আমি গুজা কামালকে খবর দিয়েছি,' কামাল লোকটা এই বস্তির ক্যাডারের মতো, তাকে সবাই 'গুজা কামাল' নামে ডাকে। মূলত এই লোকটাকেই হাত করে এই রেলের বগিটাতে লুকিয়ে আছে তারা।

'তোমার এই লোকটাকে কি বিশ্বাস করা যায়?' প্রফেসর আবদেল জানতে চাইল।

'বিশ্বাস তো করতে চাই না,' ইফতেখার মাহমুদ এখনও ম্যাপ দেখছে। 'কামালকে অনেক টাকা খাওয়ানো হয়েছে। আর সে আমার কাছে অতীতের একটা ঘটনায় কৃতজ্ঞ। কাজেই তার ওপরেই ভরসা করতে হবে। শোনো, সে দুজন লোক পাঠাবে আর কিছুক্ষণের ভেতরেই। ওরা এলে কী করতে হবে বুঝে নাও।' বলে সে চৌধুরী আর আবদেলকে করণীয় বুঝিয়ে দিলো।

তারা কথা বলতে বলতে কিছুক্ষণ পরেই বাইরে থেকে কেউ একজন শিস বাজিয়ে উঠল। 'লোক চলে এসেছে,' বলে ইফতেখার মাহমুদ প্রফেসর আবদেলকে একবার শক্ত করে আলিঙ্গন করল। 'প্রিয় বন্ধু, সাবধানে থেকো, আর ' বলে সে কথাটা শেষ করল না। এবার জড়িয়ে ধরল চৌধুরীকে। 'চৌধুরী, মনে আছে তো কী করতে হবে?'

'জি, স্যার,' চৌধুরী মাথা নেড়ে সায় জানাতেই তিনজনেই যার যার ছোটো ব্যাগগুলো উঠিয়ে নিলো। 'চলো, লোকগুলোকে বুঝিয়ে দিতে হবে কী করবে।'

অতীত

বিষয়টা বাহরাম খাঁ আর তার সৈনিকেরা যেমনটা ভেবেছিল, অতটা সহজ হলো না। বাহরাম খাঁর লোকেরা জঙ্গলমহালের দ্বিতীয় বুরুজ দখল করার পর যখন ভেবেছিল আজকে রাতের মতো আর কিছু করবে না, বরং সকাল পর্যন্ত বিশ্রাম নিয়ে কাল সকালে তৃতীয় বুরুজে আক্রমণ চালাবে সমস্ত শক্তি নিয়ে। এমন সময় উলটো সুবাদার আসলাম শেঠের লোকেই উলটো তাদের ওপরে আক্রমণ চালায়। বলতে গেলে সাথে সাথে পালটে যায় যুদ্ধের গতিপথ।

বাহরাম খাঁ ভেবেছিল পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে থাকা আসলাম শেঠের সৈনিকদেরকে সে কোণঠাসা করে তারপর একের-পর-এক উপর্যুপরি আক্রমণ চালিয়ে ঘায়েল করে ফেলবে, তারপর প্রবেশ করবে বসতবাড়িতে, যেটা তার এই জঙ্গলমহাল আক্রমণ করার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু ঘটনা ঘটলো উলটো। আসলাম শেঠের সৈনিকেরাই তাদেরকে আক্রমণ করে বসল। আসলাম শেঠের সৈনিকদেরকে আক্রমণ করতে দেখে বাহরাম প্রথমে হেসে উঠেছিল। কিন্তু সৈন্য-সংখ্যায় কম হলেও প্রথম দফায় খুব হিংস্র এবং ভয়ঙ্কর আক্রমণ চালাল তারা। বাহরামদের সৈনিকের সংখ্যায় অনেক বেশি হলেও তারা এই হঠাৎ এবং অনাকাঙ্ক্ষিত আক্রমণে রীতিমতো ঘাবড়ে গেল। কারণ বাহরাম খাঁসহ সেনাপতিদের প্রায় সবাই ছিল সদ্য দখল করা দ্বিতীয় বুরুজের ওপরে। কাজেই চট করে অপ্রস্তুত আক্রমণের কারণে সৈন্যদের অনেকেই প্রথম ধাপে কচুকাটা হয়ে গেল। বাহরাম খাঁ এবং তার সঙ্গীরা নেমে এসে যখন প্রতিরোধ গড়ে তুলল ততক্ষণে প্রাথমিক আক্রমণ করে আসলাম শেঠের সৈনিকেরা পিছু হটে গেছে।

বাহরাম খাঁ যখন নিচে নেমে এসে সৈনিকদের দায়িত্ব নিলো ততক্ষণে জঙ্গলমহালের সৈনিকেরা পিছু হটে গেছে বসতবাড়ির দিকে। 'পরিস্থিতি কী?' বাহরাম খাঁ রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে তলোয়ার হাতে সবার সামনে এসে দাঁড়াল। 'কাপুরুষগুলো পালিয়েছে? আমরা বসে আছি কেন?' নিজের দ্বিতীয় সেনাপতির দিকে তাকিয়ে রীতিমতো গর্জন করে উঠল বাহরাম খাঁ।

'হুজুর, এদেরকে যত সহজে বশ করা যাবে ভেবেছিলাম, তত সহজে কাবু করা যাবে না, ওরা বসতবাড়ির সামনে অস্থায়ী প্রতিরোধ তুলে ওটার অড়ালে অপেক্ষা করছে।'

'ঠিক আছে, যদি তাই চায় এরা তবে তাই হোক,' বাহরাম খাঁ আঘাত পেয়ে খেপে গেছে পুরোপুরি। সরাফত ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। কারণ সে এর আগেও দেখেছে বাহরাম খাঁ খেপে গেলে পুরোপুরি অমানুষে পরিণত হয়। 'হুজুর, এখন

করণীয়? এরা সংখ্যায় কম হলেও যেভাবে অবস্থান নিয়েছে তাতে হুট করে আমরা যদি আক্রমণ করি, তবে আমাদেরই ক্ষতি হবার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। আবার কিছু না করলেও এরাও হুটহাট এভাবে ঝাঁপায় পইড়া ক্ষতি করতে পারে।'

'বুঝছি,' বলে সে মাথা নাড়ল। 'সরাফত, আমাদের সমস্ত সৈনিকদের খবর দাও। এরা এমনেও পলাইতে পারবে না। কাজেই, দুর্গের বাইরে খালি জঙ্গল পথের দিকে পাহারা রাখো। আর বাকি সব সৈনিক এইখানে নিয়া আসো। এমন আক্রমণ চালাবো, একটা পিঁপড়াও ছাড়বো না।'

সরাফত একবার আসলাম শেঠের দিকে দেখে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল সৈনিকদের খবর দিতে।

বর্তমান সময়ের তিন বছর আগে

স্পেশাল সেলের ডিউটি অফিসার আকবর জাকারিয়ার জন্যে আজকের রাতটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত কয়েক মাস ধরে সে যে-মানুষগুলোকে ধরার জন্যে হন্যে হয়ে আছে আজ রাতে সুযোগ চলে এসেছে তাদেরকে ধরার। কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে এরকম একটা সময় যখন তার সবচেয়ে বেশি মাথা ঠান্ডা রাখা উচিত এমন সময় তার মাথাটা হয়ে উঠেছে সবচেয়ে বেশি গরম, আর এর পেছনে দায়ী তার পার্টনার আর তার ডিপার্টমেন্ট।

নিজের রাগ প্রশমিত করার জন্যে হাতের ওয়াকিটকিটা বেশ জোরের সাথে সামনের গাড়ির ড্যাশবোর্ডের ওপরে ছুড়ে মারল সে। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাতে ধরাতে হঠাৎ একটা অদ্ভুত চিন্তা খেলে গেল তার মাথার ভেতরে। *কেউ একজন ভেতরে ভেতরে তার অপারেশন স্যাবোটাজ করার চেষ্টা করছে না তো!*

কথাটা মনে হতেই বেশ একটা উত্তেজনার শিহরণও খেলে গেল তার ভেতরে। অবশ্যই এমন কিছু একটা ঘটছে। বিষয়টা আরও আগে কেন তার মাথায় আসেনি, সেটা ভেবে বেশ বিরক্ত বোধ করল সে নিজের ওপরেই। বিগত বেশ কিছু দিনের অদ্ভুত কিছু বিষয় হঠাৎই যেন খানিকটা পরিষ্কার হয়ে আসতে শুরু করল তার মনের ভেতরে। মনে মনে একটা বিষয়ে সে নিশ্চিত—যাই ঘটতে থাকুক না কেন, এর সাথে তার পার্টনারের অবশ্যই সংযোগ আছে। সিগারেটটা বাঁহাতে নিয়ে গাড়ির দরজা খুলে সাবধানে বাইরে বেরিয়ে এলো সে। গাড়ির দরজাটা শব্দ না করে সাবধানে বন্ধ করে দিয়ে আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে নিজের পার্টনারকে। লোকটা ফোনে কথা বলছে। গত আধাঘণ্টা ধরে বলেই চলেছে, বলেই চলেছে। যে-লোকটা নিজের ক্যারিয়ার আর টাকা ছাড়া কিছুই বোঝে না। যে লোকটা এমনকি নিজের বউয়ের সাথেও ঠিকঠাক কথা বলে না, সে আজ সন্ধ্যা থেকে কার সাথে এত কথা বলছে?

নিজের পার্টনারকে একঝলক দেখে নিয়ে গাড়িতে হেলান দিলো স্পেশাল অফিসার আকবর জাকারিয়া। এই কেসটা গোড়া থেকেই তাকে ঝামেলা দিচ্ছে। অনেক কিছুই পরিষ্কার না, আবার একাধিক মহলের সংযোগ, কাজের চেয়ে বেশি জবাবদিহিতা, সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক কেস। প্রথমে যখন তাকে কেসের দায়িত্ব দেওয়া হলো এবং বলা হলো তিনজন ফেরারি আসামিকে খুঁজে বের করতে হবে, বেশ খানিকটা অবাক হয়েছিল সে। কিন্তু এটা বুঝতে পারেনি, তার মতো একজন অভিজ্ঞ অফিসারকে কেন এরকম দায়িত্ব দেওয়া হলো। কিন্তু কেসে নেমে সে বুঝতে পারে যা ভাবছিল কেসটা মোটেই সেরকম কিছু না। ট্র্যাক ডাউন শুরু হতেই মানুষগুলোর পরিচয় আবিষ্কার করে, সাথে সাথে বেশ অবাক হয়ে যায়। *ফেরারি আসামি* বলে যাদেরকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এরা যে আসলে অ্যাকাডেমিক জগতের লোক, এটা জেনে হেডঅফিসকে রীতিমত চার্জ করতে শুরু করে সে। হেডঅফিস তাকে এটা সেটা বুঝিয়ে আবারও কাজে নেমে যেতে বলার পর সে পূর্ণ উদ্যমে কাজে নেমে পড়ে কিন্তু এটা বুঝতে পারে, তার ওপরে নজরদারি করা হচ্ছে এবং এরপরেই পার্টনার হিসেবে তাকে এমন এক লোককে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় যার সাথে তার কোনো সংযোগই নেই বলতে গেলে। এরপর ট্র্যাক করতে গিয়ে তারা আরেক বিপদ অনুভব করে। যখন আকবর শুনেছিল যাদেরকে সে ট্র্যাক করার চেষ্টা করছে এরা অ্যাকাডেমিশিয়ান, সে ভেবেছিল এরা আর কতটা পালাতে পারবে? কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে দুই-দুইবার অন্তত তারা তার হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে যায়। এরপর আরেকটু গভীরে গিয়ে আকবর জানতে পারেঃ এদের ভেতরে প্রফেসর ইফতেখার নামে একজন আছে যে কি না প্রফেসর হলেও তার বিচিত্র আর ভিন্ন সব ব্যাক গ্রাউন্ড আছে, যে-কারণে এদেরকে ধরা সহজ হবে না। এরপর বিগত টানা কিছুদিন, চেষ্টা করার পর অবশেষে সে তাদেরকে ট্র্যাক করতে সক্ষম হয় এবং এখন যখন এদেরকে প্রায় ধরে ফেলার প্রান্তে এমন সময় কি না তার কাজে বাগড়া দেওয়া হচ্ছে! কথাটা মনে আসতেই আবারও মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। নাহ, এভাবে হবে না, এবার শক্ত হতে হবে।

সিগারেটটাকে পিষে ফেলে দিয়ে দ্রুত পায়ে এগোল সে প্লাটফর্মের কাছে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলতে থাকা তার পার্টনার মোশতাকের দিকে। ওকে এগোতে দেখে মোবাইলে কথা বলতে বলতে মোশতাক মোবাইলের ওপাশে থাকা মানুষটাকে কিছু একটা বলে ফোনটা নামিয়ে ফেলল।

'কী ব্যাপার, বস ?' তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে কিছুই জানে না।

'মোশতাক, ফোন কাটো,' বেশ গম্ভীর ভঙ্গিতে প্রায় ধমকের সুরে কথা বলে উঠল আকবর। মোশতাক তড়িঘড়ি করে মোবাইলের কলটা কেটে দিয়ে ফোনটা

পকেটে রেখে দিলো। 'কী ব্যাপার, বস?' মোশতাকের কথা এক সুরে আটকে গেছে। একই বাক্য রিপিট করছে সে পুরনো দিনের ক্যাসেটে ফিতা আটকে যাবার মতো।

'শোনো, মোশতাক, আমি জানি ওপরের লেভেলে তোমার অনেক কানেকশন, কিন্তু তোমাকে একটা ব্যাপার বুঝতে হবে, এটা আমার কেস এবং এখানে আমার কথামতোই সব হবে।'

'অবশ্যই, বস,' মোশতাকের টকি খরখর করতে শুরু করেছে। কিন্তু সেটার পরোয়া না করে সে ফিরে তাকাল আকবরের দিকে। চালু মাল মোশতাক, সে ঠিকই অনুধাবন করেছে কিছু একটা ঠিক নেই, আকবর সম্ভবত পিসড অফ তার ওপরে। 'বস, কোনো সমস্যা?'

'মোশতাক, যা বলব সিরিয়াসলি শুনবা,' মোশতাকের চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে তাকিয়ে মুখের সামনে একটা আঙুল তুলে বলে উঠল। 'আর শোনো, নাটক করবা না। আমি নাটক সহ্য করতে পারি না,' আকবরের গলায় চূড়ান্ত বিরক্তি। দিনের-পর-দিন সৎ থেকে পরিশ্রম করে এক একটা কেস সলভ করে আর সেটার থেকে ফায়দা লোটে এসব চোরগুলো। মোশতাক হাত মুখ নেড়ে নাটুকে ভঙ্গিতে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু আকবরের গলার টোন শুনে আর তার সিরিয়াস ভাব দেখে চুপ করে রইল। 'শোনো, মোশতাক, এই কেসের অথরিটি আমার। তোমরা যে নাটক শুরু করেছ, এগুলো আমার ভালো লাগছে না। বারবার তোমাদের এসব আল-বাল নাটকের কারণে আসল অপরাধী পার পেয়ে যায়।'

'বস, নাটক মানে?' মোশতাক খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলে উঠল। সে সাধারণত এরকম টোনে কথা বলে না।

'নাটক মানে? তুমি আর তোমার ওপরওয়ালারা যা শুরু করেছ!' মোশতাক কিছু বলার আগেই আকবর ধমকে উঠল, 'আমার কথা শেষ হয়নি, মোশতাক। তোমরা যা মন চায় করো, আমার অপারেশন যদি বিগড়ায় এবার তোমাদের খবর আছে।'

'বস, আমি তো নিজে থেকে–'

কথা শেষ করে আকবর ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল মোশতাকের কথা শুনে ফিরে দাঁড়াল। আকবরের ঘুরে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা এতটাই বিপজ্জনক দেখে ভয় পেয়ে গেল মোশতাক। 'নিজে থেকে তো করছ না, তোমাকে ধরে কলের পুতুলের মতো নাচাচ্ছে যারা তাদের কথা বলছি। খুব সাবধান, মোশতাক, এবার এরা হাত ফসকালে তোমার বাপেরাও কিন্তু তোমাকে–'

আকবর আর মোশতাক দুজনেরই ওয়াকিটকি খরখর করে উঠল। ওদের পাশ থেকে তারস্বরে কেউ একজন চেঁচাচ্ছে। 'স্যার, টার্গেট স্পট থেকে মুভমেন্ট শুরু হয়েছে। তিনজন লোক বগিটা থেকে বেরিয়ে বাইরের তিনদিকে দৌড়াতে শুরু করেছে।'

'সর্বনাশ,' কথাটা আকবরের মুখ থেকে আপনাতেই বের হয়ে গেল। 'আগেই বলেছিলাম। জলদি মোশতাককে নির্দেশ দেওয়ার আগেই দেখল ঝড়ের বেগে মোশতাক দৌড়াতে শুরু করেছে। 'ফাক!' বলে নিজেও দৌড়াতে শুরু করল আকবর।

অতীত

দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা তৃতীয় বুরুজের ঠিক নিচেই মুখোমুখি হলো সুবাদার আসলাম এবং মোঘল সেনাপতি বাহরামের বাহিনী। যুদ্ধটা যতটা স্থায়ী হবার কথা ছিল তারচেয়ে অনেক বেশি সময় স্থায়ী হলো এবং যা ভাবা হয়েছিল তারচেয়ে অনেক বেশি রক্তক্ষয়ী হলো।

আসলাম শেঠের বাহিনীর প্রতিটা লোক রক্তচক্ষু করে খোলা অস্ত্র হাতে তাদের তৈরি করা প্রতিরোধের ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। মানুষগুলোকে দেখলেই বোঝা যায় এদের আর হারাবার মতো কিছুই নেই। প্রতিটা লোকের চেহারায় অপরিসীম ক্লান্তি আর তাদের দেহাবয়বে সব ধ্বংস করে দেবার প্রবণতা। আর অন্যদিকে রাগে ফুঁসতে থাকা মোঘল সেনাপতি বাহরাম খাঁর বাহিনী।

বাহরাম খাঁ যেই মুহূর্তে বুঝতে পারল, তাকে খুঁচিয়ে শেষ মুহূর্তে বীরত্ব দেখাতে চাইছে সুবাদারের লোকেরা, আরও বেশি রাগে অস্থির হয়ে ওঠে সে। সাথে সাথে দুর্গের চারপাশ থেকে লোকবল সরিয়ে নিয়ে আসে এই তৃতীয় বুরুজের নিচে। সুবাদারের পঞ্চাশ-ষাটজনের বাহিনীর ওপরে আক্ষরিক অর্থেই স্রোতের মতো গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাহরাম খাঁর বাহিনী। শক্তি যতই থাক, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যতই থাক, লোকবলের সামনে একটা সময় সবই ফিকে হয়ে আসতে শুরু করল। প্রথম ধাক্কার শক্ত প্রতিরোধ সময়ের সাথে সাথে পরিণত হলো দুর্বল বাধায়। ধীরে ধীরে রূপ বদলে সেটা পালটে গেল টিকে থাকার সংগ্রামে। কিন্তু ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সেটাও আর রইল না। ভোরের আলো যতক্ষণে জঙ্গলমহালের আঙিনায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে ততক্ষণে আলোর বন্যার চেয়ে বেশি লাশের বন্যা বয়ে গেছে।

পরিস্থিতি শেষ পর্যায়ে দেখে হাতেগোনা গুটিকয়েক সৈনিক নিয়ে আসলাম শেঠ বসতবাড়ির আঙিনায় উঠে গেল। সেখানে আঙিনার নামেমাত্র আড়ালে অবস্থান

নিয়ে বলতে গেলে শেষ পরিণতির অপেক্ষা করতে লাগল তারা। ইতিমধ্যেই আসলাম শেঠের প্রধান সেনাপতিসহ প্রায় সবাই নিহত হয়েছে। বাকি যারা অবশিষ্ট আছে এরা সবাই সাধারণ সৈনিক। সবাই আহত-বিধ্বস্ত-ক্লান্ত এবং ইতিমধ্যেই মানসিকভাবে পরাজিত। এদেরকে নিয়ে যুদ্ধে জেতা কিংবা প্রতিরোধ তো দূরে থাক, এমনকি পলায়নও সম্ভব নয়। আর আসলাম শেঠ এটা বেশ ভালোই জানে। কিন্তু সে নিজে পলায়ন প্রত্যাশাও করছে না। বরং সে দুটো জিনিস চাইছে মনে মনে। প্রথমত, আর অল্প খানিকটা সময়। আর দ্বিতীয়ত সম্মানজনক মৃত্যু।

আসলাম শেঠ রক্তে রঞ্জিত তরবারি হাতে তার বসতবাড়ির আঙিনার সম্মুখভাগে এসে দাঁড়াল। তার তরবারির রক্ত শুধু শত্রুদের রক্ত নয়, বরং এতে তার নিজের পাঁজর আর কাঁধ থেকে গড়িয়ে নেমে আসা রক্তের পরিমাণও হয়তো বা বেশি। তরবারিটা ডান হাত থেকে বাঁহাতে নিয়ে নিলো সে। পাঁজরের পাশের গভীর এক ক্ষতের কারণে ডান হাতটা বলতে গেলে অকেজো প্রায়। আসলাম শেঠ চারপাশে একবার নজর বুলাল। এই জঙ্গলমহাল তার জন্মভূমি, এখানেই সে বড়ো হয়েছে। এখানেই সে তার শৈশব আর যৌবন কাটিয়েছে। দুনিয়ার নানা প্রান্ত ঘুরেও এই জঙ্গলমহালের প্রতি তার ভালোবাসা এতটুকু কমেনি। সে তার জন্মভূমিকে যতটা ভালোবেসেছে, তার জন্মভূমিও তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে দ্বিগুণ ভালোবাসা। কিন্তু সবকিছুরই শেষ আছে। সে তার জন্মভূমিকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করতে পারেনি। কিন্তু তার বিনিময়ে সে আরও বড়ো কিছু করার সুযোগ পাচ্ছে।

নিজের বাঁহাতে কোনোমতে ধরে তরবারিটাকে সামনের দিকে তুলে ধরল আসলাম শেঠ। সেখানেই জড়ো হয়েছে মোঘল সেনাপতি বাহরামের বাহিনী। তরবারিটাকে সোজা দলের পেছনে থাকা বাহরামের দিকে নির্দেশ করে সে চিৎকার করে উঠল, 'এই তোমাদের দম! আমাদের গুটিকয়েকজনকে কায়দা করতে পারছ না,' বলে সে উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠল, সেই সাথে হেসে উঠল সে। তার সাথে সাথে চিৎকার করে উঠল তার বাকি সৈন্যরা।

রাগের সাথে চিৎকার করে আসলাম শেঠের প্রতিটা লোকে কচুকাটা করে ফেলার নির্দেশ দিলো সেনাপতি বাহরাম। 'শোন,' সরাফত এগিয়ে যাচ্ছিল, তার পোশাকের কাঁধের কাছটা খামচে ধরে থামাল সে। 'ওই আসলাম শেঠরে তুই ধরবি, তবে ওরে জানে মারবি না। মাইরা মাইরা জিন্দা রাখবি। ওর পরিবাররে যখন আমি ধরব তখনও ও যেন জিন্দা থাকে।'

মোঘল সৈন্যরা ইতিমধ্যেই আসলাম শেঠের অবশিষ্ট বাহিনীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সরাফত সোজা এগিয়ে গেল আসলাম শেঠের দিকে। নিজের প্রায় অকেজো হাত শরীরের সাথে আটকে ধরে একজন মোঘল সৈনিকের মোকাবিলা

করার চেষ্টা করছিল সে, সরাফত এগিয়ে গিয়ে সৈনিকটাকে ঠেলে সরিয়ে দিলো তার সামনে থেকে। তরবারির প্রথম ধাক্কাটাকে স্রেফ এড়িয়ে গিয়ে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারল আসলাম শেঠকে। সরাফত ভেবেছিল আসলাম শেঠ আহত শরীর নিয়ে তার শক্তিশালী ধাক্কা সামলাতে পারবে না। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে লোকটা শক্তিশালী ধাক্কা খেয়ে অনেকটা পিছিয়ে গেলেও পড়ে গেল না। বরং নিজেকে সামলে নিয়ে বাঁহাতে তলোয়ারটা শরাফতের দিকে তলোয়ারটা উঠিয়ে বলে উঠল, 'রাজা তাহলে,' বলে সে আঙিনার ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাহরামকে দেখাল, 'তার পেয়াদাকে পাঠিয়েছে আসল রাজাকে কাহিল করার জন্যে,' বলে লোকটা আবারও হেসে উঠল। সরাফত বুঝতে পারছে না এরকম আহত বিধ্বস্ত আর মৃতপ্রায় লোকটা কীভাবে এরকম অবস্থায় হাসতে পারে। কিন্তু নিজের ভাবনাটা সে সম্পূর্ণ করার আগেই আহত আসলাম শেঠ তরবারি নাড়িয়ে এত দ্রুত আক্রমণ করে বসল শরাফতের জন্যে প্রথম ধাক্কাটা সামলাতে খানিকটা কষ্ট হলো। হয়তো কিছুই না তবুও তার মনে হলো লোকটা আহত না হলে চিত্রটা ভিন্ন হতে পারত। যদিও শত্রু কিন্তু মনে মনে লোকটার যোদ্ধা সত্তার প্রশংসা না করে পারল না সরাফত।

আসলাম শেঠ একের-পর-এক আক্রমণ চালিয়ে গেল আর সরাফত ঠেকিয়ে গেল। কিন্তু সে বুঝে উঠতে পারছে না–লোকটাকে আর আহত না করে কীভাবে কাবু করবে। কারণ মানুষটা আহত হলেও তার ক্ষিপ্রতার কোনো শেষ নেই। আবার মানুষটাকে থামাতে গিয়ে যদি তাকে মেরে ফেলে, তবে বাহরাম তাকেও মেরে ফেলতে পারে। 'আত্মসমর্পণ করুন, জানে বাঁচবেন,' সরাফত কথাটা শেষ করার আগেই আসলাম শেঠ খপ করে শরাফতের কবজি ধরে ফেলল। 'তোমার কি মনে হয়, তোমার সেনাপতি আমাকে বাঁচতে দিবে?' সরাফত অবাক হয়ে দেখল এই আহত মানুষটা এমনভাবে আহত হাতে তার কবজি চেপে ধরেছে যে সে তরবারি নাড়াতে পারছে না। বহু যুদ্ধের দক্ষ যোদ্ধা সরাফত, আতঙ্কের সাথে অনুভব করল সে তার শত্রুকে ঠিকভাবে নেয়নি, যে-কারণে আহত হয়েও লোকটা তার কবজি ধরে ফেলেছে এবং সে চাইলেই তার তরবারিটা শরাফতের গলায় কিংবা বুকে সেঁধিয়ে দিতে পারে। কিন্তু আসলাম শেঠ ওরকম কিছু না করে বরং তার চোখের দিকে তাকিয়ে আবারও বলে উঠল, 'বলো সৈনিক, কী মনে হয়?'

সরাফত আবারও নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করার আগেই তীক্ষ্ণ একটা শব্দের সাথে পাশ থেকে একটা তরবারি ঢুকে গেল আসলাম শেঠের পেটে। সেই সাথে তীব্র লাথির সাথে লোকটা শরাফতের কাছ থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ল দরজার ওপরে। বসতবাড়ির দরজাটা ভেঙে ভেতরে পড়ে গেল সে। সরাফত তাকিয়ে দেখল তার ঠিক পাশেই তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে সেনাপতি বাহরাম।

'বেকুব কোথাকার! যা, ভিতরে গিয়ে ধর বাকিদেরকে,' সরাফত ধমক খেয়েও চট করে নড়তে পারল না। ঘটনার ঘনঘটায় সে চমকে গেছে, আসলাম শেঠ তাকে মারল না কেন? এবং বাহরাম এভাবে লোকটাকে পেছন থেকে আঘাত করায় তার মস্তিষ্ক এখনও প্রক্রিয়া করে উঠতে পারছে না পুরো বিষয়টা। নিজের তরবারিটাকে সামলে নিয়ে আশপাশে দেখল সে একবার। আঙিনার এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে জঙ্গলমহালের সৈনিকদের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ। 'কী হলো? সবাইকে নির্দেশ দাও বসতভিটার ভেতরে ঢুকতে, মহিলাদের কাউকে যেন মারা না হয়। সবাইরে আমি জীবিত চাই,' বাহরামের গর্জনরত নির্দেশ শুনে দ্রুত নড়ে উঠল সরাফত।

ইতিমধ্যেই মোঘল সৈনিকেরা পিল পিল করে ঢুকে পড়তে শুরু করেছে বসতবাড়ির ভেতরে। সরাফত এগিয়ে গিয়ে দেখল দুজনে ধরে শক্ত হাতে মাটি থেকে উঠিয়ে আনছে মৃতপ্রায় অসলাম শেঠকে। লোকটার প্রাণশক্তি সরাফতকে শুধু অবাকই করে চলেছে। 'সবাই ছড়িয়ে পড়, একজনও যেন পালাতে না পারে।'

কিন্তু অল্প সময়ের ভেতরেই বাহরাম খাঁর মুখের হাসি হারিয়ে গেল, যে-মুহূর্তে পুরো বসতবাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে একটা লোককেও পেল না ওরা। না মহিলা, না আসলাম শেঠের স্ত্রী কিংবা অন্য কাউকে। বাহরাম খাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সৈনিকেরা জানাল, বাড়ির ভেতরে কাউকেই পাওয়া যায়নি।

বাহরাম খাঁ উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠল, 'কীভাবে সম্ভব? একটা পক্ষীও পালানোর কথা না,' বাহরামের মনে হচ্ছে সে পাগল হয়ে যাবে! এতদিনের প্রচেষ্টা, এত এত লোকের মৃত্যু–এত কষ্ট সব কি তবে জলে যাবে? এই জঙ্গলমহাল দিয়ে সে কী করবে, যদি আসল কাজই না হয়? 'এরা পালালো কীভাবে? কে অবহেলা করছে পাহারা দিতে?'

সৈনিকেরা কেউই কোনো জবাব না দিয়ে তাকিয়ে রইল সরাফতের দিকে। সরাফত তরবারিটা খাপে ঢুকিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। মৃত্যুর ঝুঁকি থাকলেও তাকেই সত্যটা বলতে হবে। 'হুজুর, এইখানে সৈনিকদের কোনো অবহেলা নেই। সবাই নিজের কাজ ঠিকমতোই করছে। কিন্তু আপনি যখন বসতভিটা আক্রমণের জন্যে পিছন থেইকা সব সৈনিক সরায়া আপনার সিদ্ধান্ত নিলেন সম্ভবত ওইখানেই ভুল হইছে। হইতে পারে ওরা ওই সময়েই পিছন দিয়া পলাইছে। হইতে পারে এইটার জন্যেই তারা আগ বাড়ায়া আক্রমণ করছিল, যাতে বাকিরা পিছন দিয়া সইরা পড়তে পারে।'

মুহূর্তের জন্যে সবার মনে হলো সরাফতকে মেরেই ফেলবে বাহরাম, কারণ এরকম অবস্থায় সেনাপতির ভুলের কথা সরাসরি ধরিয়ে দিয়েছে সে। বাহরামকে দেখে মনে হলো সে ভস্ম করে ফেলবে সরাফতকে, কিন্তু সবাই অবাক হয়ে গেল অদ্ভুত এক শব্দ শুনে। দুই সৈনিকের ধরে থাকা বাহুর মাঝখানে প্রায় ঝুলে আছে

মৃতপ্রায় আসলাম শেঠ। লোকটা কাশির সাথে রক্ত উগরে দিতে দিতে হেসে উঠেছে এই অবস্থায়। উপস্থিত প্রতিটা লোক অনুভব করতে পারল আসলাম শেঠের জঙ্গলমহাল দখল করে নিতে পারলেও বসতবাড়িতে থাকা মানুষগুলোকে বাহরামের লোকেরা ধরতে পারেনি কারণ শেষ মুহূর্তে আসলাম শেঠের বুদ্ধির কাছে হেরে গেছে বাহরাম খাঁ। লোকটাই কৌশলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে বাহরাম খাঁ খেপে গিয়ে সব সৈনিক নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে। আর এই কাজটা সে করেছে যাতে সে বসতবাড়ির লোকজনকে পালানোর ব্যবস্থা করে দিতে পারে। আসলাম শেঠ খিক খক করে হেসেই চলেছে।

বাহরাম খাঁ এগিয়ে গিয়ে খোলা তলেয়ার দিয়ে এক কোপে আসলাম শেঠের মাথাটা নামিয়ে দিলো। তারপর চিৎকার করে উঠল রাগে-ক্ষোভে।

বর্তমান সময়ের তিন বছর আগে.

'বন্ধু, তোমার কী মনে হয় কাজ হবে?' প্রফেসর আবদেলকে দেখে মনে হচ্ছে অন্ধকারের ভেতরে সে আরও সেঁধিয়ে নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এরকম পরিস্থিতিতেও সে প্রফেসর ইফতেখারের হাসি শুনে অবাক হয়ে গেল। একটু অবাক হয়েই অন্ধকারের ভেতরে সে ফিরে তাকাল প্রফেসর ইফতেখারের দিকে।

'আবদেল, তুমি তো আমাকে চিন কম দিন হলো না। তোমার কাছে কী মনে হয়?' কথাটা বলে সে অন্ধকারের ভেতরেই প্রফেসর আবদেলের দিকে তাকিয়ে রইল সে। প্রফেসর আবদেল আর চৌধুরী দুজনেই অন্ধকারের ভেতরে বসে এতটাই ভয়ে আছে যে কোনো জবাব না দিয়ে বরং তাকিয়ে রইল প্রফেসর ইফতেখারের দিকে। ইফতেখারই কথা বলে উঠল, 'তোমাদের কাছে কি মনে হয় এই হোমিওপ্যাথির শিশিতে ধরে যাবে এরকম মস্তিষ্ক নিয়ে এরা আমার সাথে পারবে?' বলে সে একবার থেমে উঁকি দিয়ে বাইরে দেখে নিলো। 'তা সেটা যত বড়ো বিপদেই থাকি না কেন আমি। আমাকে হারানো এদের কম্ম নয়। খালি একটাই অনুরোধ, তোমরা আমার সাথে তাল রেখো। গুলিয়ে ফেলো না আমার নির্দেশগুলো। এক সেকেন্ড,' বলে সে হুট করে আড়াল ছেড়ে পুরোপুরি কালি গোলানো অন্ধকারের ভেতর থেকে উঠে আধো অলোতে চলে এলো।

প্রফেসর ইফতেখার যে-মুহূর্তে বুঝতে পারল তাদের হাতে আসলে খুব একটা সময় নেই–যেকোনো মুহূর্তে হয় পুলিশ না হয় অন্য কোনো গ্রুপ তাদের ওপরে হামলা চালাবে–সেই মুহূর্তেই সে একটা পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলে। প্রথমেই সে ফোনে খবর দেয় গুজা কামালকে, যার শেলটারে সে এখানে অবস্থান করছিল।

তাকে খবর দিয়ে দ্রুত তিনজন লোক পাঠাতে বলে বগিতে, যতটা সম্ভব আড়াল নিয়ে আসার জন্যে বললেও এটাও জানায় আড়াল না নিলেও আসলে খুব একটা সমস্যা নেই। তাদের সাথে জিনিসপত্র খুব বেশি না থাকলেও লোকগুলো আসতে আসতে যা আছে সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে অনেকটা পোঁটলার মতো বানিয়ে ফেলে। লোকগুলো আসতেই তাদেরকে বিশেষ কিছু নির্দেশনা দিয়ে বগি থেকে নেমে ওরা লুকিয়ে পড়ে বগির পেছনেই ঝোপেঝাড়ে।

প্রফেসর ইফতেখারের পরিকল্পনা খুব সহজ কিন্তু কার্যকরী হবার সম্ভাবনা অনেক। তার পরিকল্পনাটা অনেকটা এমন: যে লোকগুলোকে খবর দিয়ে আনা হয়েছে তারা প্রফেসরদের পোশাক পরে নিয়ে কিছু পোঁটলা-পাটলি নিয়ে তিনজন বগি থেকে বেরিয়ে তিন দিকে রওনা দিবে। রওনা দিবে বলতে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করবে। যদিও এতে ঝুঁকি আছে, কারণ ওরা জানে না পুলিশে আদৌ তাদের পিছু নিবে কি না। কিন্তু সম্ভাবনা আছে পুলিশ বা শত্রুপক্ষ যারাই হোক না কেন, এতে অন্তত ডিসট্র্যাকটেড হবে, আর এই সুযোগটাই নিতে হবে তাদের তিনজনকে। যেই মুহূর্তে পুলিশ কিংবা শত্রুপক্ষ ডিসট্র্যাকটেড হবে সেই মুহূর্তে তারা সটকে পড়ার চেষ্টা করবে। ইফতেখারের মতো ঝানু মাল জানে, তার পরিকল্পনা নিখুঁত নয়, এবং এতে অনেক ফাঁক আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে জানে বাঁচতে হলে এটাই সেরা মনে হয়েছে। এছাড়া একটা ব্যাকআপ প্ল্যানও আছে তার।

অন্ধকারের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই দেখতে পেল তাদের ঠিক করে রাখা লোকগুলা বগি থেকে বেরিয়ে তিনদিকে দৌড়াতে শরু করেছে। লোকগুলো দৌড়াতে শুরু করার সাথে সাথে প্রফেসর ইফতেখার হাতের কড়ে আঙুল গুনতে শুরু করল।

এক দুই তিন অপেক্ষা করছে সে। ষাট বাষট্টি মাঠের একপাশ থেকে একজনকে দৌড়ে বেরোতে দেখে হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। পরিকল্পনা কাজে দিচ্ছে। কারা পালাচ্ছে বুঝতে না পেরে পুলিশ বা অন্যরা ডিসট্র্যাকটেড হবে। 'জলদি জলদি ' চৌধুরী আর প্রফেসর আবদেলের দিকে ফিরে ইশারা করল সে। সাথে সাথে আড়াল থেকে বেরিয়েই তিনজনে নিজেদের মাথা মুড়িয়ে নিয়ে যতটা সম্ভব অন্ধকারের ভেতরে কলোনি মাঠের একপাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। তিনজনেরই পরনে সেই লোকগুলোর পোশাক। মাঠের অন্যদিকে হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। 'জলদি জলদি হাঁটো। একবার স্টেশনের ভিড়ে মিশে যেতে পারলে কিংবা মূল রাস্তায় উঠে যেতে পারলে আর ধরতে পারবে না।'

তিনজনেই জানপ্রাণ দিয়ে হাঁটছে, কিন্তু চাইলেও দৌড়ানো কিংবা অন্যকিছু করা সম্ভব হবে না। তাতে বরং উলটোটা হতে পারে, বাকিদের নজরে পড়ে যাবার

সম্ভাবনা আছে। যদিও রাত প্রায় ভোরের দিকে কিন্তু বস্তি আর মাঠের কোনা যেখানে মিশেছে সেখানে বেশ কিছু টং দোকার আছে। দোকানগুলোতে ভিড় না হলেও টুকটাক লোকজন আছে। আর তারাও কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করছে এদিকে কী হচ্ছে। প্রফেসর ইফতেখার, প্রফেসর আবদেল আর চৌধুরী এগিয়ে চলেছে। আর দুইশো গজ যেতে পারলেই মিশে যেতে পারবে ভিড়ের ভেতরে। 'জলদি জলদি,' আবারও তাড়া দিলো প্রফেসর। হঠাৎই পিছনে একজনের দৌড়ে আসার শব্দ শুনতে পেল সে। চৌধুরী ঘুরে তাকাতে যাচ্ছিল তার আগেই ইফতেখার ধমকে উঠল। 'সোজা হাঁটতে থাকো, আর একটু পথ বাকি।'

কিন্তু তার কথায় কাজ হলো না। পেছনে বাড়তে থাকা ধুপধুপ শব্দ শুনে চৌধুরী আর নার্ভ ধরে রাখতে পারল না। চট করে পেছনে ফিরে তাকাল সে। মাথা ঢেকে রাখা কাপড়টা পড়ে গেল। সাথে সাথে পেছনে আসতে থাকা একাধিক পায়ের শব্দ আরও বেড়ে গেল। কেউ একজন চিৎকার করে উঠল। 'হল্ট, পুলিশ। মাথার ওপরে হাত তুলে দাঁড়াও।'

***

ইন্সপেক্টর আকবর তার পার্টনারদের পিছু নিয়ে যখন কলোনি মাঠের কিনারায় পৌঁছায় তখন তিনজনে তিনদিকে ছুটতে শুরু করেছে। প্রহরায় যারাই ছিল সবাই ছুটন্ত মানুষগুলোর পিছু নিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে ততক্ষণে। প্রথমে কী হচ্ছে বুঝতে না পেরে ইন্সপেক্টর আকবরও দৌড়াতে শুরু করে কিন্তু হঠাৎই তার মাথায় ভিন্ন কিছু একটা খেলে যায়। মাঠের একেবারে কিনারায় না গিয়ে সে বরং অপেক্ষা করতে থাকে এবং একটু পরেই দেখে তিনটে ছায়ামূর্তি বগির পেছনের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুত এগোতে শুরু করেছে অন্যদিকে। সাথে সাথে পিছু নিতে শুরু করে সে। কিন্তু প্রথমে সে বুঝতে পারছিল না, এরা কি ভিন্ন কেউ? নাকি বস্তিরই সাধারণ মানুষ? ওদের চলাচলের ভাব দেখে খানিকটা সন্দেহ হতেই সে দৌড়াতে শুরু করে। আর একবার একজন পিছু ফিরে তাকাতেই সাথে সাথে চিনতে পেরে দৌড়াতে দৌড়াতে বের করে নিয়ে আসে নিজের পিস্তল।

***

প্রফেসর ইফতেখার দৌড়াতে দৌড়াতে প্রফেসর আবদেলের একটা হাত খামচে ধরে তাকে নিয়ে দৌড়াতে শুরু করল। ওদিকে অতিরিক্ত নার্ভাস হয়ে চৌধুরী থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

'চৌধুরী,' প্রফেসর আবদেল চিৎকার করে উঠল।

'ভুলে যাও ওর কথা, দৌড় দাও,' প্রফেসর আবদেলের হাত জোরে চেপে ধরে সে দৌড়াতে শুরু করেছে। 'হল্ট হল্ট, এই থামো,' পেছন থেকে চিৎকার ভেসে আসছে। কিন্তু থামার বদলে উলটো গতি বাড়িয়ে দিলো প্রফেসর ইফতেখার। এতক্ষণে খেয়াল করল চৌধুরী আবারও হুঁশ ফিরে পেয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে চলে আসে তাদের কাছাকাছি।

প্রফেসর ইফতেখার আর আবদেল প্রাণপণে দৌড়ে চলেছে, চৌধুরী তাদের ঠিক পেছনে। সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'স্যার, ওরা প্রায় চলে এসেছে। আমরা পালাবো ক্যামনে?' অতি উত্তেজনায় তার আঞ্চলিক ভাষা বেরিয়ে এসেছে মুখ দিয়ে।

প্রফেসর ইফতেখার দৌড়াতে দৌড়াতে নিজের গতি কমিয়ে আনল। 'একটাই উপায় আছে,' বলে সে চট করে দৌড়াতে দৌড়াতেই ল্যাঙ মারল চৌধুরীকে। উলটে-পালটে পড়ে যেতে যেতে চিৎকার করে উঠল চৌধুরী।

'জলদি দৌড়াও,' প্রফেসর ইফতেখার আবারও আবদেলের হাত চেপে ধরল।

'ছেলেটাকে–' ওরা ভিড়ের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। স্টেশনের লোকজন কৌতূহলী জনতা আর মানুষের হুড়োহুড়ির ভেতরে ঢুকে পড়তেই আড়ালে চলে এলো ওরা। ইফতেখার আড়চোখে পেছনে তাকিয়ে দেখল চৌধুরীকে ঠেসে মাটিতে শুইয়ে ফেলেছে পুলিশ।

'ছেলেটাকে এভাবে ধরিয়ে দিলে!' হাত নামিয়ে আনতে আনতে প্রফসর আবদেল হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল।

'আবদেল, আমরা যা করতে চাইছি তা এই ছেলে বা আমি-তুমি এমনকি আমাদের চেয়েও অনেক বড়ো। আমাকে যদি আমার প্রাণ বাজি রাখতে হতো আমি তবে তাই করতাম। এখন জলদি পালাতে হবে,' দুজনে ভিড় পার হয়ে মূল স্টেশন এলাকায় ঢুকে পড়ল। ওদিকে মাটিতে পড়ে চোখের জল নাকের জল এক করে তখনও তারস্বরে চিৎকার করেই চলেছে চৌধুরী, 'এইভাবে ধোঁকা দিলো। এইভাবে!'

প্রফেসর আবদেল আর প্রফেসর ইফতেখার তখন নিজেদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে পার হয়ে গেছে অনেকটা পথ।

প্রথম অংশ: কল্পযাত্রা

অধ্যায় এক

সময়: ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ

খিজিরপুর দুর্গ, সোনারগাঁ

খুব ধীরে ধীরে নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দুর্গের বিরাট জানালা দিয়ে বাইরের দিকে ফিরে তাকাল সে। নিজের শক্তিশালী অবয়ব নিয়ে চাইলেই চোখের পলক ফেলার আগেই নড়ে উঠতে পারে মানুষটা। কিন্তু শারীরিক শক্তি আর ক্ষিপ্রতার তুলনায় তার সার্বিক নড়াচড়া অত্যন্ত ধীরগতির। ধীর পদক্ষেপে এসে দুর্গের জানালা দিয়ে বাইরে ফিরে তাকাল সে। একে তো রাত, তার ওপরে তীব্র বর্ষণের কারণে বাইরে বলতে গেলে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বর্ষণমুখর সন্ধ্যার ভেজা অন্ধকারের ভেতরে তাকিয়েও সে বলে দিতে পারে বাইরে ঠিক কোথায় কী আছে, কী হচ্ছে। কারণ এই সাম্রাজ্যের প্রতিটা ধূলিকণার সাথে তার আত্মার সম্পর্ক। আর এই মুহূর্তে তার এই আত্মার ওপরেই শকুনের নজর পড়েছে। কিন্তু তার জন্যে এসব কিছু নতুন নয়।

তার জীবনটাকে শুধু বৈচিত্র্যময় বললে কম বলা হবে, এ-যেন এক মহাকাব্যিক উপাখ্যান। ষোড়শ শতক যখন ত্রিশ বছরের কোঠা পূরণের দ্বারপ্রান্তে ঠিক সেই সময়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে জন্মেছিল সে। তার মা ছিল একজন রাজকুমারী আর বাবা ছিল একজন দেশত্যাগী। কালীদাস গজদানী ভাগ্যান্বেষণে অযোধ্যা থেকে পাড়ি দিয়েছিল এই বাঙাল মুলুকে। যে ভাগ্যের অন্বেষণে সে এসেছিল সেই ভাগ্যবিধাতা তাকে হতাশ করেনি। সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের দরবারে নিজের কর্মপন্থা, কঠিন পরিশ্রম আর বুদ্ধির বলে সে ঠিকই জায়গা করে নিতে সফল হয়েছিল। একেবারে শূন্য থেকে শুরু করে সুলতানের দরবারে সে রাজস্বমন্ত্রীর পদে আসীন হয়। পরবর্তীতে ধর্ম বদলে নাম ধারণ করে সুলাইমান খাঁ। মন্ত্রী হিসেবে কর্মদক্ষতা, ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধিমত্তা মুগ্ধ করেছিল খোদ সুলতানকেও। আর তাই নিজের মেয়ের সাথে সে বিয়ে দেয় সুলাইমান খাঁর। শুধু বিয়েই নয়, বিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল পরগনা ও পূর্ব মোমেনশাহী অঞ্চলের জায়গীরদারির দায়িত্বও সঁপে দেয় সুলাইমান খাঁর ওপরে। ভাগ্য অন্বেষণে বাংলায় আসা সুলাইমান খাঁর জন্যে এ-যেন ছিল রাজ্য এবং রাজকন্যা দুটোই একসাথে

প্রাপ্তি। এই সুলাইমান খাঁর ঔরসেই জন্ম হয়েছিল তার। বিরাট রাজ্য, স্নেহময় পিতা-মাতা একভাবে বলতে গেলে অর্থ, বিত্ত, ভালোবাসা আর সুখের সাগরের মাঝেই যেন জন্ম হয়েছিল তার।

কিন্তু সব গল্পের একটা অন্ধকার দিক থাকে। আর তার জীবনের অন্ধকার দিকটার শুরু হয়েছিল তার কৈশোরেই, যখন সে এমনকি জীবনের অন্ধকার দিক কী–সেটাই ঠিকমতো বুঝে ওঠার মতো যোগ্য হয়ে ওঠেনি। এমনই এক সময় ঘোরতম কালো মেঘে ছেয়ে যায় সে এবং তার পরিবারের আকাশ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কখনই চিরস্থায়ী শান্তি বিরাজমান ছিল না। সম্ভবত পৃথিবীর কোথাও এমনটা থাকে না, তবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেন অস্থিরতার মাত্রা বরাবরই খানিকটা বেশি। সময়টা ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি। মোঘলদের পায়ের নিচের মাটি তখন টালমাটাল। এমনই এক সময় শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহ দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করে। এই আরোহণ যেন ভারতবর্ষের বুকে বিরাজমান অস্থিরতার ভেলায় আরেকটা স্রোতের ধাক্কার মতো।

আর সেই ধাক্কা বেশ জোরেসোরেই এসে লাগে তার পরিবারের ওপরে। শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহ দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করার পর তার পিতা সুলাইমান খাঁ দিল্লির আনুগত্য স্বীকার করে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। জীবনের একটা সময় পর্যন্ত সে নিজের পিতার এই সিদ্ধান্তকে মনে মনে অভিশাপ দিত। বিশেষ করে এই সিদ্ধান্তের জন্যে তার পরিবারকে যে-ধরনের কষ্ট আর যাতনার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে সেটার কারণেই সে নিজের পিতাকে মনে মনে ধিক্কার জানাত বোকার মতো দিল্লির এই বিরোধিতা করার জন্যে। কিন্তু একটা অদ্ভুত বিষয় হলো জীবনের ঠিক যে প্রান্তে এই মুহূর্তে সে অবস্থান করছে এখানে দাঁড়িয়ে ঠিকই অনুধাবন করতে পারে, কেন তার পিতা এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আরও অদ্ভুত ব্যাপার হলো ঠিক যে-কারণে একটা সময় সে নিজের পিতাকে অভিশাপ দিত, মনে মনে ঠিক সেই কারণেই সে মনের গভীর থেকে নিজের পিতাকে সম্মান করে জীবনের এই প্রান্তে দাঁড়িয়ে। কেন তার মানসিকতার এই গভীর পরিবর্তন, সেটা বুঝতে হলে তার জীবনের প্রায় মহাকাব্যিক উপাখ্যানটা জানা জরুরি।

যেই সময়ের কথা বলা হচ্ছে সেই সময়ে দিল্লির মসনদে একটা পিঁপড়েও যদি চড়ে বেড়াত তবে সেটার প্রভাব পড়ত পুরো ভারতবর্ষের ওপরে। আর দিল্লির সিংহাসনের মানুষটা বদলে যাবে আর তাতে পুরো ভারতবর্ষে অনেক কিছু উলটে-পালটে যাবে না, সেটা তো হতেই পারে না! দিল্লির সিংহাসনে শের শাহের ছেলে ইসলাম শাহ ক্ষমতায় আসীন হওয়ামাত্রই তার পিতা সুলাইমান খাঁ দিল্লির আনুগত্য অস্বীকার করে। সোজা কথায় বলতে গেলে নিজেকে এক ধরনের স্বাধীন ঘোষণা করে বসে সে। সেই সময়ে বাঙাল মুল্লুকে এটা বেশ সাধারণ একটা ব্যাপার ছিল।

প্রায়ই স্থানীয় শাসকেরা সুযোগ পেলে কেন্দ্রীয় শাসন থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের স্বাধীন রাজা হিসেবে ঘোষণা করে বসত। আর একারণেই বাঙাল মুল্লুককে বলা হতো *বিদ্রোহের দেশ*। দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসনে এমন কোনো শাসক নেই যাদের এই বিষয় নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয়নি। এমনকি পরাক্রমশালী সম্রাট বাবরও এর থেকে মুক্ত ছিল না। বাঙালি বিদ্রোহী রাজাদের নিয়ে তাকে এমন ঝামেলা পোহাতে হয়েছে যে এক পর্যায়ে সে রাগের চোটে বলেই বসেছিল 'বাঙালিদেরকে সে দেখে নেবে'। অর্থাৎ দিল্লির সাথে স্থানীয় রাজাদের এই খোঁচাখুঁচি নতুন নয়। তবে এই বিষয়টা কখনও বাঙালিদের জন্যে ভালো ফল বয়ে আনে তো আবার কখনও চূড়ান্ত বিপর্যয়। তার পিতা সুলাইমান খাঁর জন্যে বিষয়টা হয়ে দাঁড়িয়েছিল দ্বিতীয়টা।

ইসলাম শাহের শাসন অস্বীকার করামাত্রই ইসলাম শাহের প্রধান সেনানায়ক তাঁজ খা কররানীর সাথে সুলাইমান খাঁর যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধে সুলাইমান খাঁ নিহত হয়। আবার এমনও জনশ্রুতি আছে তাকে নাকি কৌশলে হত্যা করা হয়। সুলাইমান খাঁর মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল সেটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হলো সে মারা যাবার সাথে সাথে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয় তাদের পুরো পরিবারকেই। তবে সবচেয়ে খারাপ বিষয়টা ঘটে সম্ভবত তার এবং তার ভাইয়ের ভাগ্যে। তাদের পিতাকে হত্যা করে তাদেরকে কৌশলে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হয় একদল তুরানি বণিকের কাছে। তুরানি বণিকদের দলটা ছিল অনেকটা যাযাবর ব্যবসায়ীদের মতো। এরা দেশে বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াত আর ব্যাবসা করত। তারা ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গার পণ্য আরেক জয়গায় নিয়ে যেত, এক জায়গা থেকে দাস কিনে আরেক জায়গায় বিক্রি করে দিত। জন্ম হয়েছিল রাজপুত্র হিসেবে কিন্তু শৈশবের গণ্ডি পেরিয়ে কৈশোরের দারপ্রান্তে পৌঁছানোর আগেই স্থান হয় তার তুরানি বণিকদের কাফেলা দলের দাস হিসেবে। কিন্তু এক অর্থে দাস হিসেবে বিক্রি হলেও যে দলটা তাকে আর তার ভাইকে খরিদ করে নেয় তাদের সাথে কোনো এক বিচিত্র উপায়ে এবং বলা যায় প্রায় অদ্ভুতভাবেই বেশ এক ধরনের সখ্যতা গড়ে ওঠে তাদের দুজনার। আর সে সুবাদেই যাযাবর দলটা যেখানে এক জায়গার দাস আরেক জায়গায় বিক্রি করে দেয়, তাকে আর তার ভাইকে নিয়ে যায় নিজেদের দেশে। কিন্তু বণিক দলের প্রধান আর্থিক প্রয়োজনে তাকে আর তার ভাইকে আবারও বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। এবার তার আর তার ভাইয়ের স্থান হয় তুরানের এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে। সময়টা কেমন ছিল তার জন্যে, কিংবা তার ভাইয়ের জন্যে? আসলে কি এর কোনো জবাব আছে, একজন দাসের জীবন আসলে কেমন হয়, কেমন ছিল তার সেইসব দিনগুলো–এই জবাব এমনকি তারাও জানা আছে। কিন্তু যখনই সেইসব দিনগুলোর কথা ভাবে সে, মনের ভেতরে কোথায় যেন একটা শক্তির উদগীরণ ঘটে। কে জানে জীবনের সবচেয়ে উচ্ছল আর

আনন্দের দিনগুলোতে সবচেয়ে কঠিন সময়ে পার করাতেই হয়তো আজকে তার ভেতরে অদ্ভুত এক আগ্নেয়গিরি জমা হয়েছে। বণিক দলের কাছ থেকে বিক্রি হয়ে হয়তো তাদের জীবনের বাকি দিনগুলো তুরানের মরুতেই দাস হিসেবে কাটিয়ে দিতে হতো। কিন্তু তা হয়নি, কারণ তাকে নিয়ে ভবিতব্যের আরও বড়ো পরিকল্পনা ছিল।

সে আর তার ভাই যখন তুরানের মরুতে দাস হিসেবে বন্দি জীবন-যাপন করছিল, সেই সময়ে বাঙাল মুল্লুকে তাদেরই রাজ্যে ঘটে চলেছিল আরও অসংখ্য ঘটনার প্রবাহ। আর সেইসবের প্রবাহেই এক সময় আবারও তাদের সিংহাসনে ক্ষমতাসীন হয় তার চাচা কুতুব খাঁ। বহু পাথর ভেঙে মানুষটা ক্ষমতায় আসীন হলেও নিজের পরিবারের কথা সে ভুলে যায়নি। ভুলে যায়নি তার মৃত ভাইয়ের কথা এবং তার হারিয়ে যাওয়া দুই ছেলের কথা। কিন্তু তার পক্ষেও সেইসময়ে চাইলেই চট করে হাজার মাইলের পথ পাড়ি দিয়ে নিজের হারিয়ে যাওয়া দুই ভাইপোকে খুঁজে বের করে ফেলা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ওই যে, কথায় বলে না নিয়তেই বরকত, কিংবা বলা যায় খুঁজলে নাকি খোদাকেও পাওয়া যায়, শুধু খোঁজনেওয়ালার নিয়তে যথেষ্ঠ বরকত থাকতে হয়। কুতুব খাঁর নিয়ত ছিল পাহাড়ের মতোই অটল। আর সেই অটল নিয়তের বরকতেই সে নিজের দুই ভাইপোকে ঠিকই দূরদেশের তুরানি বণিকের বাড়ি থেকে খুঁজে বের করে চড়া মূল্য দিয়ে কিনে বাঙাল মুল্লুকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। সেই সময়ে তার বয়স মাত্র সাতাশ বছর। এই বয়সেই সে জীবনের সুন্দর আর কুৎসিত দুটো দিকই ভালোভাবে দেখে ফেলেছে। বুঝতে শিখেছে নিজের ভেতরে শক্তি লালন করার উপায়, বুঝতে শিখেছে সম্পর্কের মূল্য, উপলব্ধি করতে শিখেছে ধৈর্যের ফলে কত অসম্ভবকে সম্ভব করা যেতে পারে, তবে সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা যেটা পেয়েছে সেটা হলো স্রষ্টার ওপরে ভরসা রাখার শিক্ষা। ওই সাত আসমানের ওপরে যিনি আছেন, তিনি কত অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন, তার ঝলক সে ওই বয়সেই বেশ ভালোভাবেই বুঝতে শিখেছে। মারামারি কাটাকাটি, হিংস্রতা আর লালসায় ভরা এই পৃথিবীতে কুতুব খাঁ এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নিজের দুই ভ্রাতুষ্পুত্রকে দূর দেশ থেকে নিজভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে এসে। শুরু হয় তার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়।

সুলতান তাজ খাঁ কররানী ক্ষমতায় আসীন হয়ে তাকে তার পিতার জায়গীরদারি ফেরত দেবার ব্যবস্থা করে দেন। আর নিজেকে সে সুলতানদের শাসনের জন্যে বিলিয়ে দেয়। ভাস্কররা যেমন এক একটু করে পাথর কেটে কেটে মূর্তি নির্মাণ করে, ঠিক তেমনি একটু একটু করে নিজের ভবিতব্যকে নির্মাণ করতে শুরু করে সে। শৈশব কেটেছে একজন রাজপুত্র হিসেবে, কৈশোর কেটেছে একজন দাস হিসেবে। এবার সে নিজেকে ধীরে ধীরে একজন যোদ্ধা এবং শাসক হিসেবে

গড়ে তুলতে শুরু করে। বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান দাউদ খাঁ কররানীর রাজত্বকালে সে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে তার অসাধারণ বীরত্বের জন্যে। কারণ সে তখন জানত সামনে অনেক বড়ো কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে আর নিজেকে সেভাবেই প্রস্তুত করতে শুরু করে সে। শুধু নিজেকে বললে ভুল হবে নিজেকে, নিজের রাজ্যকে এবং বলতে গেলে নিজের লোকদেরকেও।

ষোড়শ শতকের যখন চারভাগের তিনভাগ পার হয়েছে সেইসময়ে বাংলার সুবাদার মুনিম খাঁর মৃত্যু হলে আফগান নেতা দাউদ খাঁ কররানী স্বাধীনতা ঘোষণা করে নিজ নামে বাংলা ও বিহারে খুতবা পাঠ করাতে শুরু করে। তাদেরকে অনুসরণ করতে শুরু করে বাংলার বুকে শাসন করতে থাকা আরেকদল শাসক, ইতিহাস যাদেরকে *বারো ভূঁইয়া* নামে চেনে। দাউদ খাঁ কররানী নিজেকে স্বাধীন করামাত্রই স্বাধীন ভূঁইয়ারাও নিজেদের নামে খুতবা পাঠ শুরু করে। আর এই ব্যাপারটার পুরোভাগের উদ্যোক্তা ছিল সে নিজে। বিগত কয়েক বছর ধরেই সে আসলে এই ব্যাপারে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। রাজা টোডরমল সমগ্র বাংলাকে উনিশটি সরকার ও ছয়শো বিরাশিটি পরগনায় ভাগ করেছিল। সরকার বাজুহা ও সরকার সোনারগাঁওয়ের দুটি সরকারের সৃষ্টি হয়েছিল, আর তাতে সরকার বাজুহা ছিল বত্রিশটি পরগনা ও সরকার সোনারগাঁওয়ে ছিল বায়ন্নটি পরগনা। এর ভেতরে তার সরকার সেনারগাওঁয়ে বাজুহার বাইশটি পরগনার এবং ছয়টি দুর্গের আধিপত্য গ্রহণ করেছিল। এগুলোর আয়তন একেবারে পূর্বে আসামের প্রান্তভাগ থেকে শুরু করে একদিকে পশ্চিমে আর অন্যদিকে বৃহত্তর মোমেনশাহীর ব্রক্ষপুত্র বিধৌত এলাকা ছাড়িয়ে একবারে পদ্মার দক্ষিণভাগে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিশেষ করে উত্তরের ভাটি এলাকার একটা বড়ো অংশই তার নিয়ন্ত্রণে ছিল। নিজের এই বিস্তৃত রাজ্য পরিচালনার জন্যে সে প্রথমে ব্রাক্ষণবাড়িয়ার সরাইলে নিজের পরিচালনা কেন্দ্র স্থাপন করে, তারপর সেইটাকে সরিয়ে নিয়ে আসে সুবর্ণগ্রামে, অর্থাৎ বর্তমানে যেখানে আছে সেখানে। অনেক আগে থেকেই এখানে সে গড়ে তুলেছে মোঘল আর শত্রুদের জন্যে সব ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। কিন্তু সে জানত এটা যথেষ্ট নয়। কারণ খুতবা পাঠ মাত্রই সব বদলে যেতে শুরু করবে, আর হয়ও তাই।

যেই মুহূর্তে ভূঁইয়ারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে নিজেদের নামে খুতবা পাঠ শুরু করে, সাথে সাথে সমগ্র বাঙাল মুলুকে হই হই রব পড়ে যায়। আর সেই উচ্চনাদের ধাক্কা গিয়ে লাগে দিল্লিতে। প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে নিজেদের অবস্থান পোক্ত করতে সমর্থ হয় ভূঁইয়ারা। কিন্তু সে জানত এটা যথেষ্ট নয়, আরও শক্তিশালী আঘাত আসতে যাচ্ছে তাদের ওপরে। আর তাই সে প্রস্তুতিও নিচ্ছিল সেভাবেই। নিজের দীর্ঘ আর বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতায় সে জানত শক্তি ব্যাপারটা সবসময় দ্বিমুখী হয়ে থাকে, একটা হলো সত্যিকারের শক্তি যেটা দিয়ে সামর্থ্যের প্রমাণ করা

যায় কিংবা করতে হয়। কিন্তু এই শক্তির মূল নিহিত থাকে অন্য আরেকটা ব্যাপারে, সেটা হলো সম্পর্কে। আর তাই সে বহু আগে থেকেই নিজের সম্পর্কের ক্ষেত্র বিস্তৃত করছিল সামসময়িক ভূঁইয়াদের সাথে। যাদের ভেতরে ছিল ভাওয়াল এলাকার গাজীরা। তার পিতা সুলাইমান খাঁ এবং গাজীদের প্রধান ফজল গাজীর পিতার ভেতরে সবসময় সুম্পর্ক ছিল। সে ক্ষমতায় আরোহণ করেই পুরনো সেই সম্পর্ক ফিরিয়ে আনার জন্যে গাজীদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করে। বলতে গেলে বন্ধু হয়ে ওঠে সে আর ফজল গাজী। দুজনেই ছিল মোঘল শাসন বিরোধী এবং স্বাধীনতাকামী মানুষ। উভয়েই মনে প্রাণে স্বাধীনতার উচ্চাশা পোষণ করত, উভয়েই নিজ এলাকা আর সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা ভাবত। স্বাধীনতার চেতনা থেকে তারা বুঝতে পেরেছিল একক প্রতিরোধে বাইরের শত্রুদের ঠেকানো যাবে না। তাই তারা দুজনেই অনুভব করতে পারছিল টিকে থাকতে হলে নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে হলে এবং জনগণের মঙ্গল করতে হলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তাই দুজনের বন্ধুত্ব খুব সহজেই গভীর থেকে গভীরতম রূপ লাভ করে। আর তাদের এই বন্ধুত্বের প্রভাব পড়ে শীতলক্ষ্যা পাড়ের জনগণ থেকে শুরু করে সমগ্র বাঙাল মুল্লুকের জনগণের ভেতরে। আর এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে বারো ভূঁইয়াদের উত্থানের ভেতর দিয়ে।

একদিকে ভাওয়াল এলাকা কালীগঞ্জের অন্তর্গত শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম তীরে চৌরা নামক গ্রামে ছিল গাজীদের আবাসস্থল। এই চৌরা গ্রাম থেকেই গাজীরা ভাওয়াল পরগনা শাসন করত। অন্যদিকে সে ব্রহ্মপুত্রের পাড় ধরে একেবারে উত্তর থেকে শুরু করে পদ্মার পাড় পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিল নিজেদের শাসন এলাকা, যার ভেতরে বৃহত্তর ব্রহ্মপুত্র বিধৌত এলাকা তো ছিলই, সেখান থেকে দেশের মধ্যভাগে মহেশ্বরদী ও সোনারগাঁও পরগনা, ত্রিপুরা জেলার সরাইল ও বরদাখাত পরগনা মিলিয়ে এক বিস্তৃত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয় সে। তার প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের একটা বড়ো অংশের নাম ছিল মহেশ্বরদী পরগনা। ভাওয়াল ও মহেশ্বরদী পরগনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছিল ব্রহ্মপুত্র ও শীতলক্ষ্যা নদী। অসংখ্য খাল-বিল আর নদী নালায় বিস্তৃত এই দুই পরগনা। যোগাযোগের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দ্রুততম মাধ্যম জলপথ। আর সেই প্রয়োজনেই তারা গড়ে তুলেছে শক্তিশালী নৌবাহিনী। আর একারণেই একেবারে উত্তরাঞ্চল থেকে শুরু করে বাংলার মধ্যভাগ হয়ে দক্ষিণে দুইপাশে বিস্তৃত অঞ্চলের সবচেয়ে দাপুটে বাহিনীতে পরিণত হয়েছে তাদের নৌবাহিনী। বিশেষ করে নিজের সরাইল পরগনা, মহেশ্বরদী পরগনা, ভাওয়াল পরগনা এবং বৃহত্তর ব্রহ্মপুত্র এলাকায় বিস্তৃত জঙ্গলমহাল এলাকার যেকোনো জায়গায় যেকোনো সময়ে দ্রুততম সময়ে নিজের বাহিনী নিয়ে যাতায়াত করার মতো সামর্থ্য তাদের রয়েছে। আর রয়েছে তাদের এসব ক্ষিপ্রগতির ছিপ নৌকার

সুনাম। দ্রুত গতির কারণে এসব ছিপ নৌকা নিয়ে একদিকে যেমন দ্রুত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাতায়াত করা যেত ঠিক তেমনি, দ্রুততম সময়ে এক জায়গায় থেকে আরেক জায়গায় সরে পড়া সম্ভব হতো। এমনকি বর্ষার উত্তাল সময়েও এসব নৌকার উপকারিতার কোনো সীমা নেই। একদিকে তার এবং গাজীদের নৌবাহিনীর খ্যাতি তো ছড়িয়ে পড়েই, অন্যদিকে এর প্রভাব পড়তে থাকে বাঙাল মুল্লুকের অন্যান্য শাসকদের ওপরে। আগে থেকেই বাঙাল মুল্লুককে বলা হতো বিদ্রোহী রাজাদের এলাকা, তার রাজ্যের বিস্তৃতি, গাজীদের সাথে সুসম্পর্ক এবং শক্তিশালী নৌ এবং ডাঙার বাহিনীর কারণে তার স্বাধীনতার স্বপ্ন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে সবার মাঝে। আর সেখান থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে শুরু করে বারো ভূঁইয়াদের শাসন ব্যবস্থা। এদের উত্থান ছিল দেশপ্রেম এবং ঐতিহ্যের, ভ্রাতৃত্ব এবং স্বাধীনতার। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন তো এত সহজে সব মেনে নেওয়ার কথা ছিল না এবং হলোও তাই। শুরু হলো একের-পর-এক আক্রমণ।

ছোটো-বড়ো সব যুদ্ধের কথা বলতে গেলে সে এক আলাদা উপাখ্যান তৈরি হয়ে যাবে। ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে মোঘল সেনাপতি খান-ই জাহান যখন এগারো সিন্ধুর কাছাকাছি এক জায়গায় তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, সেই বিশেষ মুহূর্তে তার পাশে ছিল ফজল গাজীর পিতা তিলগাজী। তিলগাজীর মৃত্যুর পর তার সন্তান ফজল গাজী তার বন্ধুসম হয়ে ওঠার পর দুজনে মিলে বারবার মোঘলদের প্রতিহত করতে থাকে সফলতার সাথে। তাদের সাথে ধীরে ধীরে যোগ দিতে থাকে বারো ভূঁইয়াদের বাকিরা।

অন্যদিকে পরিবর্তন হতে থাকে দিল্লির শাসন ব্যবস্থা। সম্রাট আকবর দিল্লির সম্রাট হবার পর সবকিছু গুছিয়ে খানিকটা থিতু হবার পরই মনোযোগ দিতে শুরু করে ভারতবর্ষের চারপাশে তার মূল শাসন এলাকার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর দিকে। খুব স্বাভাবিকভাবেই তার নজর পড়ে বাঙাল মুল্লুকের দিকে। ১৫৮২ সনে শাহবাজ খাঁ, ১৫৮৫ সনে সাদিক খাঁ, ১৫৮৬ সনে উজির খাঁকে পাঠিয়ে একের-পর-এক আক্রমণ চালাতে থাকে বাংলার শাসনভার পুরোপুরি দিল্লির অধীনে করার জন্যে; কিন্তু কোনো কাজ হয় না। তার এবং বারো ভূঁইয়াদের শক্তিশালী বাহিনী প্রতিরোধ করে দিতে থাকে সমস্ত আক্রমণ। কিন্তু কোনো যুদ্ধেই তাকে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। সম্রাট আকবরের আনুগত্য স্বীকার না করেও সে বারবার নিজের ও নিজের লোকদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। তার দুঃসময়ে অসংখ্য নৌ-সেনা নিয়ে পাশে থেকেছে তার বন্ধু ফজল গাজী থেকে শুরু করে বারো ভূঁইয়ারাও। দিন দিন সাধারাণ মানুষের চোখে সে মানুষ থেকে নায়ক, নায়ক থেকে প্রতীকের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। তার ও ফজল গাজীর যৌথ সামরিক বাহিনীর

সামরিক শক্তির কাছে বারবার পরাজিত হয়েছে মহাপরাক্রমশালী মোঘল বাহিনী। মোঘলদের বিরুদ্ধে এই বীরত্ব-গাথা রচনার কারণে তাকে দেওয়া হয়েছে 'মসনদ-ই-আলা' উপাধি।

বিচ্ছিন্ন পাঠান শক্তি বিভিন্ন স্বাধীনতা প্রিয় ব্যক্তির সহযোগিতায় একত্রিত হয়ে বাংলায় পাঠান শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এক হচ্ছে–এই সংবাদ দিল্লিতে পৌঁছানো মাত্র মোঘল রাজদরবারে দেখা দেয় চরম উৎকণ্ঠা। দিল্লির দরবারের এই অস্থিরতার খবর বাংলায় এসে পৌঁছাতে সময় লাগেনি। যেকোনো সময় আক্রমণ হতে পারে এই আশঙ্কায় ফজল গাজীসহ বাকিদেরকে একসাথে করে ফরমান পাঠায় সে। তারা নিজেরা নিজেরা যখন যেকোনো যুদ্ধ কিংবা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এমন সময় তাদের আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণ করে মোঘল সেনাপতি শাহবাজ খাঁ বাংলা আক্রমণ করে। আর তার সাথে গোলযোগ বাধতে সময় লাগেনি ভূঁইয়াদের। যদিও শাহবাজ খাঁর সাথে মূল গোলযোগটা বাধে তার নিজের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও আরেক বারো ভূঁইয়ার; কিন্তু নিজের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাকে বাঁচাতে সে পিছপা হয়নি এক বিন্দু। কারণ সে জানত–এই ভয়ঙ্কর বিপদের সময় তার নিজের লোককে তারই রক্ষা করতে হবে। সেই ঝামেলা সামলে নেবার চেষ্টা করছে এমন সময় খবর এসে পৌঁছায় অবশেষে রাগে ক্রোধে বিরক্ত সম্রাট আকবর তার সেরা সেনাপতি মানসিংহকে বাংলায় পাঠাচ্ছে।

সাথে সাথে সমস্ত ভূঁইয়ারা থেকে শুরু করে সবাই সাবধান হয়ে ওঠে। সমস্ত জায়গায় সচেতন অবস্থা জারি করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সে জানত মানসিংহ আগের মোঘল সেনাপতিদের মতো নয়। তার সাথে টক্কর দেওয়ার মতো শক্তি তার নিজের তো নেই; এমনকি বারো ভূঁইয়াদের মিলিত শক্তিও মানসিংহের বাহিনীর কাছে অসহায়। তার সাথে যুদ্ধে জিততে হলে তার আরও অনেক বেশি কিছুর প্রয়োজন। এমন সময় তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সুবাদারদের একজন জঙ্গলমহালের অধিপতি তাকে বিশেষ এক প্রস্তাব পাঠায়। প্রথম বিষয়টা শুনে সে চমকে ওঠে, পরবর্তীতে এর সম্ভাবনা যাচাই করে সে খুশি হয়ে ওঠে। কিন্তু ভয়ঙ্কর বিষয় হলো সুবাদার নিজেকে সামলে নিয়ে তার কাছে পৌঁছানোর আগেই তাদের জঙ্গলমহালে আক্রমণ হয়। মোঘল বাহিনী এত দ্রুত এত ভিতরে গিয়ে জঙ্গলমহালে আক্রমণ করে বসবে–এটাও সে ভাবতে পারেনি।

সে বাস্তববাদী মানুষ, লোকে তাকে যতই নায়ক কিংবা দেবতা ভাবুক না কেন, নিজে খুব ভালোই ধারণা রাখে সে নিজের শক্তি আর সামর্থ্যের। সেই সাথে নিজের জীবনের দীর্ঘ আর বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সাহস আর বোকামির ভেতরে পার্থক্য করতেও সে শিখেছে বেশ ভালোভাবেই। কাজেই সে এটা জানে মানসিংহের

বাংলায় আগমন এবং নিজেদের চিরাচরিত নিয়ম ভেঙে মোঘলদের জঙ্গলমহালে আক্রমণ একেবারেই ভিন্ন কিছুই ইঙ্গিত দেয়। এসমস্ত কিছুর পেছনে একটাই কারণ থাকতে পারে। যা সে নিজে জানে মোঘলরাও সেটা জানে। আর যদি সেটা হয়ে থাকে তবে

'হুজুর, কিছু তো বলুন,' হঠাৎ পেছন থেকে ভেসে আসা আওয়াজে নিজের সভাসদদের দিকে ফিরে তাকাল মসনদ-ই-আলা উপাধিপ্রাপ্ত বারো ভূঁইয়াদের অন্যতম প্রধান নেতা ঈশা খাঁ।

বাইরের ভেজা অন্ধকার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিজের লোকগুলোর দিকে তাকালেও সে প্রথমে কিছু বলল না। সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে, তারও দৃষ্টি মানুষগুলোর ওপরে কিন্তু সে আসলে তাদেরকে দেখছে না, নিজের ক্ষুরধার মস্তিষ্কের ভেতরে তার ভাবনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

'হুজুর–' সামনে পশমিনার দস্তরখানের ওপাশে বসা মানুষটা কিছু একটা বলতে যাচ্ছে কিন্তু নিজের একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো ঈশা খাঁ, তারপর ধীর পায়ে সে গোল করে সাজিয়ে রাখা পশমিনার আবরণের ওপরে এসে বসে পড়ল হাঁটু মুড়ে। সামনে রাখা গড়গড়ার নলটা হাতে নিয়ে ফিরে তাকাল যে-মানুষটা কথা বলতে চাইছিল তার দিকে। 'দুঃখিত, সরফরাজ, তোমাকে কথার মাঝে থামিয়ে দেওয়ার জন্যে।' সরফরাজ তার ডান হাতদের একজন, তুখোড় সেনাপতি এবং দুর্দান্ত যোদ্ধা। ঈশা খাঁ মনে মনে ভাবল: সরফরাজকে সে নির্দ্বিধায় নিজের সেরা যোদ্ধা বলে ভাবত যদি না–

'হুজুর, আমি বলছিলাম যে আপনার নির্দেশনা অনুযায়ী পুরো পরিস্থিতি বয়ান করা হলো, এখন আপনার বিচক্ষণ নির্দেশ ছাড়া আমরা কিছু ভাবতেও পারছি না। তাই জানতে চাইছিলাম আপনার মতামত এবং নির্দেশনা কি এই অবস্থায়?' সরফরাজ কথাগুলো ঈশা খাঁর উদ্দেশ্যে বলে সমর্থনের আশায় ফিরে তাকাল উপস্থিত বাকি মানুষগুলোর দিকে। এটা আসলে ঈশা খাঁর মূল দরবার নয়, বরং এখানে সন্ধের পর দরবারের নির্দিষ্ট কিছু মানুষ নিয়ে নিজের কাচারির বৈঠকখানায় বসেছে সে বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ আলোচনার জন্য। সরফরাজ কথা শেষ করতেই সবাই সমর্থন জানাল।

তাও ঈশা খাঁ চট করে কথা বলল না। সে আরাম করে গড়গড়া টানতে লাগল। গড়াগড়া টানা শেষ করে নলটাকে হুঁকোর সাথে আটকে দিয়ে ঈশা খাঁ বড়ো করে দম নিলো একবার, তার ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি। হাসিটা মুখে নিয়েই নিজের লোকদের দিকে তাকিয়ে সে দেখল, সবাই বেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এরকম বিপজ্জনক অবস্থায় সে হাসছে কীভাবে! নিজের লোকদের দিকে তাকিয়ে গর্বে তার বুকটা ফুলে উঠল, এরা কেউই তার রক্তের

আত্মীয় না হয়েও এরা সবাই তার ভাই, এরা সবাই এক একজন বীর সেনানি। নিজের হাতের ওপরে ভরসা না করে সে এদের ওপরে ভরসা করতে পারে নির্দ্বিধায়। এদের কারণেই সে বাঙাল মুল্লুকের একজন সাধারণ রাজ্য শাসক হয়েও দিনের-পর-দিন টক্কর দিয়ে যেতে পারছে মোঘলদের সাথে এবং সাফল্যও পাচ্ছে একের-পর-এক। কিন্তু এবার খেলা অনেকটাই বদলে যাবে, কিংবা কে জানে হয়তো বদলে গেছে ইতিমধ্যেই জঙ্গলমহালের পতনের ভেতর দিয়ে।

'তোমরা আমার কাছে যা বয়ান করলা সেসব মিলায়ে যদি বলি তবে মূল বিষয় হলো কয়েকটা,' বলে সে নিজের একটা হাত তুলে দাড়িতে বুলাতে লাগল। তারপর অন্য হাতটা ওপরে তুলে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলিটা কনে আঙুলের কড়ে ঠেকাল। 'প্রথম কথা হলো শাহবাজ খাঁর সাথে টক্করের ফলাফলটা খুবই বিপজ্জনক দিয়ে মোড় নিছে,' বলেই সে সরফরাজের দিকে ফিরে তাকাল। 'আমি জানি তোমরা কী ভাবছ বা মনে করছ। তোমরা হয়তো ভাবছ শাহবাজ খাঁর সাথে টক্করটা সরাসরি আমাদের সাথে ছিল না, ওটার ভেতরে ঢোকা আমার উচিত হয়নি ইত্যাদি। কিন্তু সত্যি কথা হলো আমি যা করেছি বুঝেই করেছি। কারণ শাহবাজ খাঁ যা শুরু করছিল তা থেকে আমার নিজের মানুষটাকে রক্ষা করা না হলে ওদের সাহস আরও বাড়তো এবং ধীরে ধীরে ওরা আমাদের দিকে নজর দিত। বাধা দেওয়ার পরও নজর দিচ্ছে, আর বাধা না দিলে তো যাই হোক দ্বিতীয় বিষয়, মানসিংহ বাংলায় পদার্পণ করছে এবং সে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করছে। রাজধানী স্থাপন করছে। যেকোনো সময় আক্রমণ চালাবে, ঠিক?' সবাই সায় জানাল। 'আর মানসিংহ আক্রমণ চালালে তাকে বাধা দেওয়ার মতো শক্তি আমাদের হবে কি না সেই ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই, এখানেই আসে তৃতীয় বিষয়, সুবাদার আসলাম শেঠ এবং জঙ্গলমহালের পতন। তোমরা তো আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ, তোমরা তো জানই আজ থেকে কিছুদিন আগে আমরা যখন আশঙ্কা করছিলাম সম্রাট আকবর তার সেরা সেনাপতি মানসিংহকে বাংলায় পাঠাবে, তখন সুবাদার আসলাম আমাদের কাছে একটা প্রস্তাব নিয়া আসে।'

'হুজুর, সম্মানের সাথে বলছি, সুবাদার আসলাম আপনার কাছে কী প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল তা কিন্তু আপনি আমাদের খুলে বলেননি,' ঈশা খাঁর সভাসদদের মধ্যে যুদ্ধ বিষয়ে সবচেয়ে অভিজ্ঞ সেনাদের একজন অনেকটা মন্তব্য করার মতো বলে উঠল।

'সে যাই প্রস্তাব নিয়ে আসুক,' ঈশা খাঁ এবার বিষয়টা খোলাসা করল না। 'সেটা এমন কিছু ছিল যা খুব সহজেই মানসিংহের সাথে যুদ্ধের মোড় ঘুরায়ে দিতে পারত কিন্তু,' বলে সে গড়গড়ার নলটা আবার হাতে নিয়ে ওটাকে তাদের দিকে তাক করে বলে উঠল, 'ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো সুবাদার আসলাম আমার এখান থেকে

ফিরে যাবার ঠিক পরপরই তার জঙ্গলমহালে মোঘলরা আক্রমণ করে। সেই আক্রমণের ভয়াবহতা কেমন ছিল সে খবর তো সবার জানা। একদিকে জঙ্গলমহালে আক্রমণ হলো, অন্যদিকে আমাদেরকে চেয়ে চেয়ে তা দেখতে হলো। না আমরা, না রসুল খাঁর বাহিনী কেউই তাকে কোনো মদদ দিতে পারলাম না কারণ বাহরাম খাঁর বাহিনী অবরোধ করে রইল পুরো জঙ্গলমহাল। প্রশ্ন হলো তারা এত পরিকল্পনা করে আমাদের ওপরে আক্রমণ না চালিয়ে জঙ্গলমহালে আক্রমণ কেন চালাল? এর একটাই অর্থ হইতে পারে,' বলে সেন একুট থামল। 'তারাও জানে সুবাদারের কাছে কী ছিল।'

'এত বড়ো সর্বনাশের কথা,' লতিফ খাঁ চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে উঠল। 'এর মানে সুবাদারের কাছে যা ছিল সেটা যদি আমাদের দিকে যুদ্ধের মোড় ঘুরায়ে দিতে পারে তবে সেটা অবশ্যই শত্রুপক্ষের হাতে পড়লে–'

'তুমি ঠিকই ধরেছ লতিফ,' ঈশা খাঁ আবারও উঠে দাঁড়াল। 'প্রথমত, বাঙাল মুল্লুক বাঁচাতে হলে আমাদের নিজেদের শক্তিতে কুলাবে না। একটা দৈব শক্তি লাগবেই। দ্বিতীয়, হলো সুবাদারের শক্তির উৎস আমার চাই। কোনোভাবেই ওটা শত্রুর হাতে পড়া চলবে না।'

'জনাব,' এবার তৃতীয় সভাসদ চন্দ্র ভূঁইয়া কথা বলে উঠল। সে সামরিক দিক থেকে খুব বিজ্ঞবান না হলেও, রাজ্যের অর্থনীতির মূল চালিকা মাধ্যম সেই। 'আমরা কী করে নিশ্চিত হচ্ছি যে সুবাদারের শক্তির উৎস ইতিমধ্যেই শত্রুর হাতে পড়ে যায়নি?'

'কারণ,' ঈশা খাঁ বলে উঠল। 'সুবাদার আসলাম অনেকটা ইচ্ছে করেই জঙ্গলমহালের পতন ঘটিয়েছে।'

'মানে?' সবাই নিজেদের ভেতরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

'মানে হলো গোপন সূত্রে আমাদের কাছে খবর এসেছে, মানে এরকম খবর ছড়িয়ে পড়েছে সুবাদার আসলাম যখন বুঝতে পেরেছে যে জঙ্গলমহালের পতন স্রেফ সময়ের ব্যাপার এবং সে বাইরে থেকে কোনো সাহায্যও আর পাবে না, তখন ইচ্ছে করেই সে প্রতিরোধ না করে আক্রমণে গেছে। এতে সে জানত তার জঙ্গলমহালের পতন দ্রুততর হবে কিন্তু এতে আরেকটা সুবিধা সে পাবে–'

'তার কিছু লোককে সে পালাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে–'

'লোক নয়, তার স্ত্রী। জঙ্গলমহালের আক্রমণের সময় গোপন জলপথে তার স্ত্রীকে পালাবার ব্যবস্থা করার জন্যে সে এমন কায়দা করেছে যাতে শত্রুরা তার ওপরে আক্রমণ চালায় এই সুযোগে তার স্ত্রী নিজের গুটিকয় লোকদের নিয়ে পালিয়েছে এবং–'

আবারও বিজ্ঞবান লতিফ শেঠ কথা বলে উঠল। 'সম্ভবত সুবাদারের কাছে যা-ই ছিল সেটা সহই সব পালিয়েছে তারা। ঠিক? কিন্তু তারা এখন আছে কোথায় ইতিমধ্যে ধরা পড়ে যায়নি তো?'

'ঠিক বলেছ, লতিফ খাঁ,' ঈশা খাঁকে এই প্রথম চিন্তিত দেখাল। 'ধরা তারা এখনও পড়েনি। পড়লে সেই খবর আমি পেতাম। তারা জঙ্গলমহাল থেকে বেরিয়ে জলবিধৌত জল-জঙ্গল এলাকায় লুকিয়ে পড়েছে সম্ভবত। স্থানীয়দের জন্যেই সে এক বিচিত্র আর ভয়াবহ জায়গা। আর মোঘলদের জন্যে তো বটেই। কাজেই এত সহজে তারা তাদেরকে ধরতে পারছে না। অন্তত খুব দ্রুত নয়।'

'আপনি কি ভাবছেন এখন, মশাই?'

'সমাধান খুব সহজ,' বলে ঈশা খাঁ আবারও ফিরে তাকাল তার সভাসদদের দিকে। 'আমাদের কাউকে পাঠাতে হবে। কোনো বাহিনী নয়। বড়োজোর ছোটো একটা দল হতে পারে। অত্যন্ত বিচক্ষণ যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত এক দল, যার নেতৃত্বে থাকবে এমন একজন যে-শুধু সেরা যোদ্ধাই নয় অসাধারণ মাল্লা এবং পানিবিধৌত এসব জায়গা খুব ভালোভাবেই চেনে এবং বোঝে।'

সরফরাজ ছটফটিয়ে খুব আগ্রহের সাথে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ঈশা খাঁ তাকে থামিয়ে দিলো। 'তুমি নও, সরফরাজ,' বলে সে থেমে যেতেই লতিফ খাঁ কথা বলে উঠল। 'হুজুর, আপনি কি মাসুমের কথা ভাবছেন?' সে খুব মৃদু স্বরে কথা বলে উঠল। কারণ জানে তার এই মৃদুস্বরে বলা বাক্যটাই প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে এবং হলোও তাই। ঈশা খাঁ মাথা নেড়ে সায় জানাতেই কামরার প্রায় সবাই অসন্তোষের সাথে মাথা নাড়ল।

'অসম্ভব–'

'এই ছেলেটা আগেও আমাদের বিপদে ফেলেছে–'

'সে যোদ্ধা ভালো হতে পারে কিন্তু–'

ঈশা খাঁ একটা হাত তুলে থামিয়ে দিলো। 'সে কেমন মানুষ আমি জানি। কিন্তু এই কাজের জন্যে সে এবং তার দল ছাড়া আমাদের আর উপায় নাই।' আর কেউ কিছু বলার আগেই সরফরাজ কথা বলে উঠল, তাকে খানিকটা ম্লান দেখাচ্ছে। 'হুজুর, সব বুঝলাম কিন্তু সে তো একজন রাজদ্রোহী–'

'এই কাজের জন্যে রাজদ্রোহীই সই,' বলে সে বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'এই কাজের জন্যে এমন কাউকে লাগবে যে সমস্ত বৃত্তের বাইরে চিন্তা করতে পারে। মাসুমরে খবর পাঠাও, আমি তার সাথে দেখা করবো–'

অধ্যায় দুই
বর্তমান সময়
পিবিআইএস হেড অফিস
ধানমন্ডি, ঢাকা

যে দুজন তার সাথে দেখা করতে এসেছে তাদের সামনে নিজের ইমেজটা তার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তার হাতে ধরা দামি কোহিভা সিগারের ডগা থেকে খানিকটা ছাই মেরুন রংয়ের কার্পেটের ওপরে খসে পড়তেই বেশ বিরক্তির সাথে ফিরে তাকাল সে সেদিকে। অত্যন্ত পরিপাটি এবং পরিচ্ছন্ন মানুষ সে। পোশাক-পরিচ্ছদ হোক, জীবন-যাপন কিংবা কর্মক্ষেত্র সে হলো সেইসব মানুষদের একজন যারা নিজের কাপড়ের ভাঁজ নষ্ট হবার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডিল বাতিল করাটা বেশি শ্রেয় বলে বলে মনে করে। একই কথা প্রযোজ্য তার কর্মক্ষেত্রেও। সে হলো এমন ধরনের মানুষ যারা বাক্সের ভেতরে প্রবেশ করে বাক্সের ভেতরটা কেমন সেটা আগে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করে, তারপর সেই বাক্স থেকে কীভাবে বাইরে লাফিয়ে পড়বে সেই চিন্তা করতে থাকে। তবে পুরো ব্যাপারটাতে তার প্রাধান্য থাকে নিজের কর্তৃত্ব এবং নিজের মানুষদের নিরাপত্তা, আর এসবের চেয়েও বেশি গুরুত্ব বহন করে আরেকটা ব্যাপার, সেটা হলো পরিস্থিতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা। আর তাই তার মতো মানুষের জন্যে কার্পেটে ছাই খসে পড়া হোক কিংবা নিজের প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট এমন ঘটনা হোক যেটা সে বুঝে উঠতে পারছে না কিংবা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না, দুটোই সমান বিরক্তিকর।

সিগারেটের চেয়ে সরু দেখতে গাঢ় খয়েরি রংয়ের সিগারটাতে বেশ জোরে একটা টান দিয়ে সে জানালার বাইরে দিয়ে দূর দিগন্তের দিকে তাকানোর চেষ্টা করল। ধানমন্ডি চার নম্বরে অবস্থিত নয়তলা অফিস ভবনের জানালা দিয়ে আসলে খুব বেশি দূরে দেখা সম্ভব নয়, আর যতই দূরে তাকানো হোক না কেন একঘেয়ে ভবনের মাথা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। তাও ঢাকা শহরের এই এলাকাতেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে খানিকটা হলেও সবুজের দেখা মেলে। অন্যান্য এলাকাতে সেটারও উপায় নেই। সিগারে আলতো করে আরেকটা টান দিয়ে সে

বাতাসে দুলতে থাকা সবুজ গাছের ডগার ওপর দিয়ে ঢাকা শহরের ভিন্ন প্রান্তের দিকে তাকানোর চেষ্টা করল সে। এই সবুজে ঘেরা প্রকৃতি ঢাকার প্রকৃত চেহারা নয়। এর অন্যপাশে রয়েছে ধূসর এক ঢাকা, সেই ঢাকাই হলো প্রকৃত ঢাকা। সেই ঢাকার রূপটা অনেক বেশি নগ্ন, অনেক বেশি কঠোর, অনেক বেশি নিষ্ঠুর। পরিপাটি স্যুট পরে ঠান্ডা এসিরুমে বসে সিগার টানতে থাকলেও সেই ঢাকাকে সে খুব ভালো করেই চেনে। কারণ ওখান থেকেই উঠে এসেছে সে।

তার জন্ম হয়েছিল খুবই নিম্ন মধ্যবিত্ত এক পরিবারে। আসলে বলা উচিত নিম্ন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে। দিন আনে দিন খায়, কথাটা বেশিরভাগ মানুষ শুনলেও কয়জন জীবনে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সন্দেহ আছে। কিন্তু তার জন্ম হয়েছিল এমন এক পরিবারে যেটা সত্যিকার অর্থেই দিন আনে দিন খায় টাইপের পরিবার। তাদের পরিবার থাকত কাকরাইলের বস্তি সংলগ্ন এক বাড়িতে। সংলগ্ন বলার কারণ হলো, তাদের বাড়িটা ঠিক মূল বস্তির ভেতরে ছিল না বরং ছিল বস্তির সাথে লাগানো। আসলে তাদের পরিবারের সামর্থ্য ছিল না বস্তির বাইরে থাকার; কিন্তু তার বাপের সামর্থ্য না থাকলেও ইচ্ছে ছিল, আর সে কারণেই তার বাপ চেষ্টা করত পরিবারকে যতটা সম্ভব ভালো রাখার। আর তাই বস্তির অভ্যন্তরে না থেকে তার বাপ বাসা ভাড়া করেছিল বস্তির সংলগ্ন এলাকাতে। কারণ তার বাপ জানত–নিজের ছেলে এবং মেয়েকে ভালো রাখতে হলে বস্তির পরিবেশ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো তার বাপ দিনরাত মেহনত করে যে পরিবেশ থেকে নিজের সন্তানদেরকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করত, শৈশব পেরোনোর আগেই ঠিক সেই পঙ্কিল জগতে নিমজ্জিত হয় সে ভাগ্যের ফেরে। কিংবা কে জানে হয়তো নিয়তিরও খেলা ছিল সেটা।

তার বাপ ছিল দিনমজুর। স্থানীয় একটা করাত কলে কাজ করত, আর মা ছিল স্থানীয় এক সুতা কারখানার শ্রমিক। তারা ছিল দুই ভাই বোন। আগেই বলা হয়েছে তাদের পরিবার আক্ষরিক অর্থেই দিন আনে দিন খায় টাইপের পরিবার ছিল। কিন্তু মজার বিষয় হলো তার বাবা আর মা মিলে যে-টাকা আয় করত তাতে তাদের পরিবার একেবারে দিন আনে দিন খায় টাইপের হবার কথা ছিল না। কিন্তু তাদের পরিবারটা এমন হবার পেছনে কারণ ছিল তার বাবা-মা দুজনেই নিজেদের আয়ের চেয়ে ভালো জীবন-যাপন করার চেষ্টা করত। তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে-ধরনের বাড়িতে থাকা উচিত সেটায় না থেকে থাকত আরেকটু ভালো বাড়িতে, তাদের সামসময়িক পরিবারগুলো যখন সন্তান খানিকটা বড়ো হওয়ামাত্রই কাজে লাগিয়ে দিত, সেখানে তার পরিবার তাদের দুই ভাই বোনকেই পড়ালেখার ব্যবস্থা করেছিল। শুধু তাই না যেখানে ওই ধরনের পরিবারগুলো ছেলেমেয়েদেরকে শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা দিয়েই যথেষ্ঠ মনে করত সেখানে তার বাবা-মা তাদেরকে

রীতিমতো ভালো স্কুলে পাঠাতো। শুধু তাই না, ছেলেমেয়েদেরকে দামি না হলেও সবসময় পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ পরাত তারা। মাঝে-মধ্যেই ভালো ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করত। এমনকি মাঝে-মধ্যেই তাদেরকে নিয়ে ঘুরতে বের হতো। মোটকথা তাদের পরিবার অত্যন্ত গরিব হলেও গোছানো সুখী পরিবার ছিল। কিন্তু এই সুখ মনে হয় প্রকৃতির সহ্য হবার কথা ছিল না। তাই বিপর্যয় নামতে খুব বেশি সময় লাগেনি।

যখনই সে নিজের ফেলে আসা শৈশবের দিকে ফিরে তাকায়, খুব দোদুল্যমান কিছু অনুভূতি হয় তার ভেতরে। সে এমন একজন মানুষ যে কি না বাস্তবিকের চেয়েও বেশি বাস্তবিক, সে মেধায় বিশ্বাস করে না, সে ভাগ্যে বিশ্বাস করে না, যদি সে কিছুতে বিশ্বাস করে তবে বিশ্বাস করে একমাত্র পরিশ্রম এবং স্ট্র্যাটেজিতে। সে মনে করে যদি কারও ভেতরে পরিশ্রম করার স্পৃহা থাকে এবং সে সেটা করতে পারে সঠিক কৌশলে, তবে যেকোনো অসাধ্য সাধন করা সম্ভব। কিন্তু যখনই সে নিজের শৈশবের দিকে ফিরে তাকায় তখনই নিজের এই নিরেট বিশ্বাসের কঠিন প্রস্তরের ওপরে অদ্ভুত এক দোদুল্যমানতা দেখতে পায়। সে সবসময়ই মনে করে আজকে সে যে অবস্থানে আছে এর পেছনে মূল চালিকাশক্তি তার শৈশব। জীবনের প্রতিটা স্তরে প্রতিটা ক্ষেত্রে সে যখনই কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে যায় প্রতিবারই সে শৈশবের দিকে ফিরে তাকায়।

একদিকে সে চিন্তা করে তারা বাবা কিংবা মা যদি যে-বস্তিতে সে শৈশব কাটিয়েছে সেখানকার অন্যান্যদের মতোই হতো তবে কি সে এখন যে অবস্থানে রয়েছে সেখানে আসতে পারত? কিংবা তার চিন্তা-ভাবনা এমন হতো কি না? সোজা কথা সে কি তবে ভিন্ন কিছু হতে পারত? আবার সে এটাও চিন্তা করে যদি তারা বাবা-মা বাকিদের মতোই চিন্তা-ভাবনা করত তবে হয়তো তার বাবার মৃত্যুর পর তাদের পরিবার যে ধরনের সমস্যায় পড়েছিল কিংবা যেভাবে পুরো পরিবার বলতে গেলে প্রায় ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছিল, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছিল তার এবং তার বোনের জীবন—সেটা আদৌ হতো কি না। কে জানে নাও হতে পারত।

তবে সেটা মূল পয়েন্ট নয়, মূল পয়েন্ট হলো মানুষের কি আসলে তার সাধ্যের বাইরে চিন্তা করা উচিত? আরও সহজ ভাষায় বলতে গেলে মানুষের জন্যে নিজের সাধ্যের বাইরে চিন্তা করাটা তার নিজের জন্যেই ক্ষতিকর কি না? যদি ধরে নেওয়া যায় মানুষের নিজের জন্যে নিজের সাধ্যের বাইরে চিন্তা করাটা ক্ষতিকর, সেক্ষেত্রেও একটা বড়ো প্রশ্ন রয়ে যায়—মানুষ যদি নিজে থেকে তার সাধ্যের বাইরে চিন্তা না করত তবে হয়তো আজকের এই সভ্যতার সৃষ্টিই হতো না। আজ মানুষ পুরো পৃথিবীকে জয় করতে পেরেছে হয়তো সে বার বার নিজেকে নিজের সাধ্যের বাইরে ঠেলে দিয়েছে বলেই।

তো তার বাবার মৃত্যু তো হলো এরপর

'পরিস্থিতি কী, বলো তো, হাবিব?' পেছন থেকে ভারী গলার স্বর শুনে জানালার বাইরে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে পিবিআই স্পেশাল উইংয়ের প্রধান হাবিব আনোয়ার পাশা ফিরে তাকাল কামরার ভেতরের দিকে।

আজ থেকে পাঁচ বছর আগে গাজীপুরের একটা অপারেশনের পর যখন সে গবেষণার জন্যে ছুটিতে যায়, এরপরে ফিরে এলে তাকে প্রমোশন দিয়ে পিবিআইয়ের স্পোশাল উইংয়ের ডিরেক্টর হিসেবে ধানমন্ডির এই শাখাতে ট্রান্সফার করা হলো, তখন থেকে এই সুন্দর কামরাটায় তার অফিস। কামরাটা খুব আহামরি না হলেও বেশ পরিপাটি করে সাজানো। এমাথা-ওমাথা কার্পেটে মোড়ানো কামরাটায় তার সবচেয়ে প্রিয় অংশ হলো এর বিরাট জানালাটা।

তার নিজের ভারী সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে দামি কার্পেটের ওপরে সাধারণ চেয়ারের ওপরে বসে থাকা মানুষটার হাতে একটা স্বচ্ছ কাচের কাপের ভেতরে সোনালি তরল। তাতে সে আরেকবার চুমুক দিয়ে দেশের অন্যতম ধনী ব্যাবসায়িক পরিবারের কর্ণধার মাহবুব তালুকদার চোখ তুলে তাকাল হাবিব আনোয়ার পাশার দিকে। কিন্তু পাশা এবারও কিছু না বলে সিগারে আরেকটা টান দিয়ে জিনিসটা খানিকটা উঁচু করে ধরল। 'মাহবুব, তুমি কি একটা ব্যাপার জানো? আমার এই পুরো অফিস ভবনে সিগারেট খাবার নিয়ম নেই এবং এই অফিসে কোনো নিয়ম ভাঙারও নিয়ম নেই,' বলে সে সিগারে কষে আরেকটা টান দিলো, তার মুখে মৃদু একটা হাসি ফুটে উঠতে শুরু করেছে। সাধারণত তার মুখের হাসি বেশিরভাগ সময় চোখে না পৌঁছালেও এখন সেটা পৌঁছাতে শুরু করেছে। কারণ মাহবুব তালুকদার শুধু তার প্রতিষ্ঠানের ফিন্যানশিয়াল ইনভেস্টরই নয়, তার বন্ধুও বটে। আনোয়ার পাশা দেখতে পেল মাহবুব তালুকদারের মুখেও হাসির ছোঁয়া ফুটে উঠতে শুরু করেছে। কারণ সে যে তার সাথে দুষ্টামিটা করতে যাচ্ছে এটা সে বেশ ধরতে পেরেছে। 'কিন্তু স্রেফ তোমার জন্যে এবং তোমার জন্যে এই নিয়মটা ভাঙা হয়,' বলে সে অ্যাশট্রের একপাশে সিগারটা নামিয়ে রেখে মুখটা সামান্য এগিয়ে ধরল। 'কেন যেন এই সিগার তুমি যতবার এনে দাও, কোনোবারই আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারি না,' বলে সে জোরে জোরে হেসে উঠল।

তার হাসির সাথে সাথে মাহবুব তালুকদারও হেসে উঠল। 'পাশা, তুমি ঠিক আগের মতোই চালু রয়ে গেছ,' বলে সে তার পাশের চেয়ারে বসে থাকা হালকা-পাতলা ম্যানেজার হামিদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। 'পাশা, শুধু আজকে চালু না, ও সেই কলেজ জীবন থেকেই চালু,' চুপচাপ মধ্যবয়স্ক ম্যানেজার হামিদ কিছু না বলে স্রেফ একবার মাথা ঝাঁকিয়ে তার জবাব দিলো। মাহবুব তালুকদার হাবিব আনোয়ার পাশার দিকে ফিরে বলে উঠল, 'পাশা, কাজের প্রোগ্রেস বলো। তোমার

নতুন উইংয়ের কী অবস্থা?' এবার তার গলা সিরিয়াস হয়ে উঠেছে, গলায় ফুটে উঠেছে একজন প্রফেশনাল ব্যবসায়ীর সুর। 'তুমি তো জানো, সেই প্রজেক্টের প্রধান ফাইন্যানশিয়ার হিসেবে আমার অধিকার আছে তোমাদের কাজের প্রোগ্রেস জানার।'

হাবিব আনোয়ার পাশা সরাসরি তাকিয়ে আছে মাহবুব তালুকদারের দিকে, 'তালুকদার, তুমি তো জানোই আমি তোমার কাছে কিছুই লুকাব না কিংবা বলতে পারো একমাত্র তোমার কাছেই কিছুই লুকাব না,' বলে সে টেবিলের একপাশে ইন্টারকমের বাট চেপে মৌসুমিকে কিছু ডকুমেন্টস নিয়ে রুমে আসতে বলল। 'একজন ব্যবসায়ী হিসেবে তুমি যেমন জানো টাকা-পয়সা নিয়ে বিশ্বাস রাখা যায় এমন লোকের সংখ্যা যেমন বেশি হয় না, ঠিক তেমনি আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার লোক হিসেবে আমি তোমাকে বলতে পারি গোপন কথা শেয়ার করা যায় এমন লোকের সংখ্যাও আসলে খুব বেশি হয় না,' শেষ কথাটা বলতে বলতে সে অ্যাশট্রের একপাশে ঠেস দিয়ে রাখা সিগারটা উঠিয়ে নিতে নিতে মাহবুব তালুকদারের ম্যানেজার হামিদের দিকে তাকাতেই হামিদ সামান্য মাথা নেড়ে সায় জানাল। দরজায় সামান্য নক করে বেশ কয়েকটা ফাইল হাতে কামরার ভেতরে ঢুকল আনোয়ার পাশার ব্যক্তিগত সেক্রেটারি মৌসুমি। 'এসো, মৌসুমি, যা যা বলেছি এনেছ?'

'জি, স্যার,' বলে মৌসুমি হাতের ফাইলগুলোর দিকে ইশারা করল কিন্তু সেগুলো টেবিলেও রাখল না বা মাহবুব তালুকদার কিংবা তার ম্যানেজারের দিকে এগিয়েও দিলো না। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। আনোয়ার পাশা তাকে ইশারা করতে, একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল সে। 'সবগুলো ফাইলই এনেছি।'

আনোয়ার পাশা তার দিকে সামান্য মাথা নেড়ে মাহবুব তালুকদারের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করল। 'তোমাকে সত্যি কথা বলি। আজ থেকে চার বছর আগে আমি যখন থেকে ভাবতে শুরু করি বিশেষ ধরনের কাজ এবং মিশনের জন্যে পিবিআইয়ের সেরা কিছু অফিসারদের নিয়ে আমি একটা স্পোশাল উইং খুলব ব্যাপারটা তখন সবার আগে তোমার সাথে শেয়ার করেছিলাম, কারণ আমি জানতাম আমার একজন বড়ো মাপের ফাইন্যানশিয়ার লাগবে। তুমিও তাতে বেশ দ্রুত সাড়া দাও এবং বলতে গেলে বেশ পজিটিভলি সাড়া দাও।'

'এখানে একটু কারেকশন আছে,' মাহবুব তালুকদার চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে একটা আঙুল তুলে বলে উঠল। 'আসলে তোমার প্রস্তাবটার ভেতরে আমি প্রথমে খুব বেশি পটেনশিয়াল দেখতে পাইনি। আমার ম্যানেজার হামিদই প্রথম এই বিষয়ে আমাকে হাইলাইট করে আমাকে কনভিন্স করে যে এতে অনেক পটেনশিয়াল আছে। সেজন্যে হামিদকে খানিকটা ধন্যবাদ। কারণ ও আমাকে

কনভিন্স না করলে হয়তো আমি এই প্রজেক্টের সাথে ইনভলভড হতাম না,' বসে সে হামিদের দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা ঝাঁকালে, স্বল্পভাষী ম্যানেজার হামিদ এবারও তেমন কিছু না বলে স্রেফ মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিলো।

'যাই হোক, তুমি ভালো করেই জানো এসব বিষয় কতটা কঠিন। বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে যেখানে প্রতি পদে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা প্রকট সেখানে এমন একটা উইং চালু করা কতটা ঝামেলার ব্যাপার। একেবারে সত্যি কথা বলতে গেলে আমার নিজেরও কনফিউশন ছিল অনেক। কিন্তু এই বিষয়ে একেবারে গোড়া থেকে আমি যেসব সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছি এখন এসে সবগুলো এখন সঠিক মনে হচ্ছে। প্রথমত, তানভীর এবং শারিয়ারকে এই উইংয়ের যোগ্য করে তোলার জন্যে ট্রেনিংয়ে পাঠানো এবং পরবর্তীতে ওদেরকে মাঠে নামানো প্রতিটি সিদ্ধান্তই সঠিক প্রমাণিত,' বলে সে মৌসুমির দিকে ইশারা করতেই মৌসুমি তার সামনে রাখা ফাইল খুলে কয়েকটা কাগজ এগিয়ে দিলো মাহবুব তালুকদারের দিকে। আনোয়ার পাশা আবারও বলতে শুরু করল, 'এক হিসেবে বলতে পারো হাতে এই মুহূর্তে দুর্দান্ত একটা টিম আছে যারা দেশের অভ্যন্তরের যেকোনো পরিস্থিতি সামলানোর ক্ষমতা রাখে। এই টিম পরীক্ষিত এবং প্রস্তুত,' বলে সে মাহবুব তালুকদারের দিকে তাকাল, 'তবে এটাই মূল সফলতা নয়। সবচেয়ে বড়ো সফলতা হলো আমি অফিসিয়ালি এখনও উইংয়ের ঘোষণা দেইনি, কিন্তু ইতিমধ্যেই আমার টিম এমন কিছু কাজ করেছে যা দেশের আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর ইতিহাসে বিরল একটা বিষয়,' বলে সে সিগারটাকে ঠোঁটে লাগিয়ে নিজের বুকের ওপরে একটা হাত রাখল। 'ট্রাস্ট মি, আমি কথাটা বুঝে এবং জেনে বলছি, না জেনে নয়। আমার টিমের অপারেটররা কাজ শুরু করা মাত্র বাংলাদেশের মাটিতে দুই দুটো আন্তর্জাতিকভাবে কুখ্যাত সংস্থার অস্তিত্ব অবিষ্কার করেছে যারা এখানে অপারেট করছিল এবং দেশের আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর এই বিষয়ে কোনো ধারণাই ছিল না!'

আবারও মৌসুমি মাহবুব তালুকদারের দিকে কয়েকটা কাগজ এগিয়ে দিলো।

কাগজগুলোতে চোখ বুলাতে বুলাতে মাহবুব তালুকদার বলে উঠল, 'রেলিক এবং নেক্রপলিস। এরা কারা?' তার ভ্রু কুঁচকে উঠেছে।

'ইন্টারপোল লিস্টেড আন্তর্জাতিক অ্যান্টিক চোরাচালানি সংস্থা,' আমাদের আগে এদের নামও ঠিকমতো শোনেনি লোকে। আমরাই এদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছি, মানে আমাদের দেশে ওদের অপারেট করার প্রমাণ পেয়েছি। যাই হোক, এমনকি এটাও আমাদের মূল সাফল্য নয়,' বলে সে ইচ্ছে করেই একটু নাটকীয়ভাবে থেমে গেল।

মাহবুব তালুকদার, তার ম্যানেজার এবং সে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। 'মাস্টার ডি এবং মাস্টার ইউ নামে দুই দুইজন ভয়ঙ্কর আন্তর্জাতিক অপরাধী যারা এই দেশে অপারেট করছিল ছদ্মবেশে, আমাদের টিম স্রেফ এদের অস্তিত্বই আবিষ্কার করেনি, তানভীর সিলেট থেকে মাস্টার ডি এবং চট্টগ্রাম থেকে শারিয়ার আলট্রা মাস্টার অর্থাৎ মাস্টার ইউকে গ্রেপ্তারও করতে সমর্থ হয়েছে। আমি চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারি সাম্প্রতিক সময়ে কোনো আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা এতটা সফলতা দেখাতে পারেনি,' বলে সে নিজেকে খানিকটা এগিয়ে নিয়ে গেল মাহবুব তালুকদারের দিকে। 'আর পুরো টিমকে অ্যাকুমুলেট করে এখন পুরো উইং খোলা স্রেফ সময়ের ব্যাপার। কাজেই আমি মনে করি তোমার ফাইন্যানশিংয়ের সেরা সময় এখনই। বলো, তোমার মতামত কী?'

মাহবুব তালুকদার মনোযোগ দিয়ে কাগজগুলো দেখে হামিদের দিকে এগিয়ে দিলো। চোখ থেকে নিজের দামি রিডিং গ্লাস খুলে সেটাকে নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপরে। 'আমি বুঝতে পেরেছি তুমি দারুণ কাজ করছ।'

'আমি না, আমার টিম,' বলে আনোয়ার পাশা একটা হাত তুলল।

'ওই,' বলে সে মাথা নাড়ল সামান্য। 'যদিও আমি আমার কোম্পানির সিইও, তবুও তো তুমি জানো এরকম ডিলে অনেক ডিসিশন মেকিংয়ের ব্যাপার থাকে। কাজেই আমরা দ্রুতই আমাদের সিদ্ধান্ত জানাবো। তবে আমি তোমাকে আনঅফিসিয়ালি বলতে পারি, ব্যাপারটা ইয়েসই হবে। কী বলো, হামিদ?' মাহবুব তালুকদারের ম্যানেজার হামিদ স্রেফ একবার মাথা নেড়ে সায় জানাল।

'ওকে আমি তবে আজকের মতো উঠব। বলে মাহবুব তালুকদার উঠে দাঁড়িয়ে নিজের টান টান হয়ে থাকা থ্রি-পিস নেভি ব্লু স্যুট টেনে ঠিক করে নিলো। তার স্যুটের ভেতরে সাদা শার্টের সাথে গোল্ডেন মেরুন নিটেড টাই, কাফে গোল্ডের কাফ লিঙ্ক আর হাতে মিক্সড গোল্ডের রোলেক্স ঠিক করে নিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই আনোয়ার পাশা এগিয়ে এসে তার স্যুটের কলারটা ঠিক করে দিলো। তারপর তার একটা হাত ধরে বলে উঠল, 'ধন্যবাদ, বন্ধু।'

'অ্যান্ড আ'ম প্রাউড অব ইউ,' মাহবুব তালুকদার হাতটাকে ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে যাচ্ছিল আনোয়ার পাশা হাতটা ছাড়ল না। 'শারিয়ার,' নামটা উচ্চারণ করতেই মাহবুব তালুকদারের ভ্রু কুঁচকে উঠল।

'কী করেছে আবার ও?'

আনোয়ার পাশা হেসে উঠল, 'আচ্ছা তুমি, তোমার ভাতিজার ওপরে সবসময় এত খেপে থাক কেন বলো তো? এবার কিছু করেনি ও। বরং উলটো আমি বলতে চাচ্ছিলাম অসাধারণ কাজ দেখিয়েছে সে চট্টগ্রামে। তার কারণেই বলতে পারো আমরা পুরো রহস্যটা তো সলভ করতে পেরেছিই সেই সাথে কেসটা কোনোদিকে মোড় নিবে সেই লিডও বের করতে পেরেছি।'

'গুড ফর হিম,' প্রায় নিরাবেগী গলায় কথাটা বলে পিবিআইয়ের স্পেশাল উইংয়ের ফিল্ড এজেন্ট শারিয়ারের চাচা মাহবুব তালুকদার আনোয়ার পাশার কাঁধে চাপড় দিয়ে বেরিয়ে গেল। তার পেছন স্বল্পভাষী ম্যানেজার হামিদ একবার আনোয়ার পাশা আরেকবার মৌসুমির দিকে মাথা নেড়ে হাসিমুখে অনুসরণ করল তাকে।

মানুষ দুজন বেরিয়ে যেতেই *ফুসস* করে শব্দ করে নিশ্বাস ছাড়ল আনোয়ার পাশা, তারপর মৌসুমির দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিয়ে কোটের নিচে নিজের শার্টের কলার খুলে ঢিলে করে দিলো টাইটা। 'বলো মৌসুমি, কী অবস্থা?'

বলে সে ধপ করে বসে পড়ল নিজের চেয়ারে। চশমা খুলে টেবিলের ওপরে রেখে মৌসুমির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে উঠল, 'একটা কথা কি জানো, মৌসুমি, ব্যবসায়ীদের সাথে ডিল করা রাজনৈতিক নেতাদের সাথে ডিল করার চেয়েও কঠিন,' বলে সে আনমনে একবার মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'বলো তো, পরিস্থিতি কী?'

মৌসুমিও হেসে উঠল তার কথা শুনে। 'কোন পরিস্থিতি বলব, স্যার, আপনি যেটা মাহবুব স্যারকে বললেন ওটা? নাকি সত্যিকারের পরিস্থিতি যেটা সেটা?' বলে সে মৃদু হেসে উঠল।

তার সাথে আনোয়ার পাশাও হেসে উঠল। 'মৌসুমি, তুমিও মজা নিতে শিখে গেছ। সত্যিকারের পরিস্থিতি কী বলো?'

'স্যার, পরিস্থিতি নিয়ে আমি কোনো কমেন্ট করব না, সেই এখতিয়ারও আমার নেই। আমি শুধু পরিস্থিতি বয়ান করতে পারবো এবং,' বলে সে খানিকটা থেমে গেল। মৌসুমি কাজ করে অত্যন্ত প্রফেশনালভাবে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে সে নেগেটিভিটি অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করে কিন্তু এখন পরিস্থিতি এতটাই ঘোলাটে যে চাইলেও সেটা করতে পারছে না। আনোয়ার পাশা কিছু না বলে একবার হাত নাড়ল। এর অর্থ মৌসুমি খুব ভালোভাবেই জানে। তাকে বয়ান করে যেতে বলছে আনোয়ার পাশা।

ভণিতা না করে সে টেবিলের সামনে থেকে দ্বিতীয় ফাইলটা তুলে নিলো। মৌসুমি খুব ভালোভাবেই জানে কেসের সমস্ত আপডেটেড রিপোর্টগুলোতে কী আছে। কারণ সে নিজেই এগুলো কম্পোজ এবং অ্যানালাইসিস করেছে। এটা আসলে তার দায়িত্বেরই একটা অংশ এবং সে এটা করার জন্যেও সবচেয়ে উপযুক্ত মানুষ। কারণ সে ডেস্কে কাজ করলেও তার ক্রিমিনোলজিতে বেশ উচ্চতর পড়ালেখা রয়েছে। যে কারণে যেকোনো সময় যেকোনো পরিস্থিতিতে হাবিব আনোয়ার পাশার যেকোনো মিটিং বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কেস ফাইল সাজিয়ে সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস করে জায়গামতো নোট নিয়ে রাখে সে আগে থেকেই।

'স্যার, আমি গোড়া থেকেই শুরু করি। আপনি তো দীর্ঘদিন যাবৎই নিজের ডিপার্টমেন্ট খোলার জন্যে ভেতরে ভেতরে পরিকল্পনা করে যাচ্ছেন। আর সে পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই ফিল্ডে কাজ করার জন্যে তানভীর আর শারিয়ারকে ইউরোপে পাঠানো হয়েছিল ট্রেনিংয়ের জন্যে। ওদের ট্রেনিং যখন প্রায় শেষ দিকে এমন সময় সিলেটে একটা বিশেষ পরিস্থিতি দেখা দেয়। আর সেটা প্রথমে পুলিশ হ্যান্ডেল করার চেষ্টা করলেও আপনার মনে হয়েছিল এই বিশেষ কাজের মাধ্যমেই আমাদের উচিত নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেওয়া আর সেটারই অংশ হিসেবে তানভীরকে ট্রেনিং থেকে দ্রুত ডেকে এনে মিশনে পাঠানো হয় সিলেটের উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে প্রথমে খুব হাবুডুবু খেলেও তানভীর তার মিশন সম্পন্ন করে খুব ভালোভাবেই এবং আমাদের প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গিয়ে ওখানে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটে। প্রথমত, বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো নেক্রপলিস এবং রেলিক নামে আন্তর্জাতিকভাবে কুখ্যাত দুটো অ্যান্টিক চোরাচালানি গোপন সংগঠনের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং নেক্রপলিসের এশিয়া জোনের অন্যতম কর্ণধরার কুখ্যাত অপরাধী মাস্টার ডি, যে আসামে ব্ল্যাক বুদ্ধা নামে বিখ্যাত এক লেজেন্ডারি মূর্তি উদ্ধার করেছিল সেটা বের করা যায় এবং মাস্টার ডি-ও ধরা পড়ে, সেই সাথে আমরা ব্ল্যাক বুদ্ধাও করায়ত্ত করতে পারি। তানভীর সিলেটের পরিস্থিতি সামলানোর জন্যে এখনও সেখানেই আছে।'

হাবিব আনোয়ার পাশা অ্যাশট্রের এক পাশ থেকে সিগারটা তুলে নিয়ে তাতে টান দিয়ে সুগন্ধি নীলচে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে উঠল, 'মৌসুমি, এসব তো আমি জানি আবার রিপিট করছ কেন?'

'স্যার, পুরো পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে হলে ব্যাপারগুলো আবার আলোচনা করাটা জরুরি,' মৌসুমির গলায় কোনো তাড়াহুড়ো নেই। যদিও সে মনে মনে জানে হাবিব আনোয়ার পাশা খানিকটা বিরক্ত হচ্ছে তার বয়ানে, কিন্তু সে বলে যাবেই ঘটনা তার মতো করে। কারণ এর শেষে তাকে অ্যানালাইসিস যোগ করতে হবে। 'স্যার, এই ঘটনার রেশ না কাটতেই চট্টগ্রামে আরেকটা ঘটনা ঘটে। ওখানকার পতেঙ্গা রোডে, অ্যাক্সিডেন্টে মারা পড়ে প্রফেসর আবদেল নামে এক ব্যক্তি। সে মারা যাবার সাথে সাথেই সক্রিয় হয়ে ওঠে একাধিক মহল এবং জানা যায় লোকটা আসলে একজন আর্কিয়োলজিস্ট এবং ওখানকার এক বাড়িতে দীর্ঘদিন যাবৎ লুকিয়ে থেকে সে কিছু একটা নিয়ে গবেষণা করছিল। ওখানেও কেসটা প্রথমে ডিবি এবং পিবিআইয়ের চট্টগ্রাম ব্যুরো হ্যান্ডেল করলেও খুব দ্রুতই সেখানে আমাদের অভিজ্ঞ ফিল্ড এজেন্ট শারিয়ারকে পাঠানো হয়। ওখানে অনেক জল ঘোলা হবার পর জানা যায় ওখানেও নেক্রপলিসের হাত ছিল, মূলত নেক্রপলিস

এবং রেলিকের হাত থেকে বাঁচার জন্যে, যিনি রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা পড়েছেন উনি, মানে প্রফেসর আবদেল লুকিয়ে গবেষণা করছিলেন কিছু একটা নিয়ে এবং মিশনের শেষে শারিয়ার সেটা উদ্ধার করতেও সমর্থ হয় চট্টগ্রামের এক প্রত্যন্ত দ্বীপ থেকে।'

'রাজদ্রোহী,' হাবিব আনোয়ার পাশার মুখ থেকে নীলচে ধোঁয়ার সাথে সাথে শব্দটা বেরিয়ে এলো। 'রাজদ্রোহী নামে এক অসমাপ্ত রহস্য।'

'জি, স্যার, রাজদ্রোহী,' বলে মৌসুমি মৃদু বিরতি দিয়ে আবারও বলতে শুরু করল। 'রাজদ্রোহীর রহস্যে পরে আসছি। সত্যি কথা হলো, রাজদ্রোহীর রহস্যই আমাদের আজকের আলোচনার মূল বিষয়। কিন্তু সেই আলোচনায় যাবার আগে আমাকে প্রফেসর আবদেলের ব্যাপারে কিছু জিনিস বলতে হবে। উনি একজন আর্কিয়োলজিস্ট ছিলেন এবং বলা যায় উনার ফিল্ডে বিশ্ব সেরা আর্কিয়োলজিস্ট ছিলেন। বেশ কয়েক বছর আগে উনি উনার ফিল্ড অব স্টাডি বদলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন পুরনো আনসলভড রহস্য নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং উনার সাথে একটা সময় পরিচয় ঘটে আরেক পাগলাটে প্রফেসর ইফতেখার মাহমুদের। তারা দুজনে মিলে ভারতবর্ষের পুরনো এক রহস্য নিয়ে কাজ করতে শুরু করেন। একটা পর্যায়ে এই বিষয়ে তারা বাংলাদেশ সরকারের কাছে সাহায্য চাইলে তাদেরকে কেউই বিশ্বাস তো করেইনি, এমনকি প্রফেসরদের আর্কিয়োলজিস্ট হিসেবে লাইসেন্সও কেড়ে নেওয়া হয়। সম্ভবত এরপরই তারা রিসোর্সের জন্যে নেক্রপলিস বা রেলিকের কারও সাহায্য নেয় এবং সম্ভবত একটা পর্যায়ে তারা ওদেরকেও ধোঁকা দিয়ে স্রেফ গায়েব হয়ে যান। এটা আজ থেকে তিন বছর আগের ঘটনা। ওই সময় থেকে প্রফেসর আবদেল সেই চট্টগ্রামের সেই পুরনো বাড়িতে লুকিয়ে নিজে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনি যা আবিষ্কার করেছেন সেটাকে একটা কোডের আকারে কনভার্ট করে একটা চিপের ভেতরে রেখেছিলেন যেটা শারিয়ার তার চট্টগ্রামের অপারেশনে আবিষ্কার করেছে। মজার বিষয় হলো শারিয়ার যে-চিপ আবিষ্কার করেছে সেটা একটা বিশেষ কোডেই স্রেফ খুলবে এবং এই কোডের ক্লু হিসেবে বলা আছে স্রেফ রাজদ্রোহীর নাম। কিন্তু এটা কী বা কোথায় আছে বা বিষয়টা আদতে কি এ সম্পর্কে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। অন্যদিকে শারিয়ার যখন এই অপারেশন চালায় সেই সময় সে শুধু এই চিপটাই আবিষ্কার করেনি, বরং চট্টগ্রামে অ্যাকটিভ নেক্রপটলিসের বেশ বড়োসড়ো এক কর্মকর্তা মিস্টার ইউকেও সে বন্দি করতে সমর্থ হয়। এই বিষয়গুলো নিয়ে শারিয়ার এখনও চটগ্রামে অবস্থান করছে সেখানকার পরিস্থিতি আরও ভালোভাবে বুঝে পরবর্তী পদক্ষেপে আসলে সে কী করবে সেই ব্যাপারে আমাদের নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছে সে। এই হলো

সার্বিক পরিস্থিতি,' কথা শেষ করে মৌসুমি ফাইলটা বন্ধ করল। সে কিছু বলল না। কারণ জানে হাবিব আনোয়ার পাশা শেয়ারড প্লাটফর্মে ইতিমধ্যেই ফাইলটাতে চোখ বুলিয়েছে।

মৌসুমি কথা শেষ করার পর হাবিব আনোয়ার পাশা কিছু বলল না। চুপচাপ কিছুক্ষণ সিগার টানল। মৌসুমিও কিছু বলল না, কারণ সে জানে আনোয়ার পাশা যখন সময় হবে তখনই কথা বলবে। 'শারিয়ার,' বলে সে সে আবারও থেমে গেল। 'ও ঠিকঠাক আছে তো?' বলে সে সরাসরি তাকাল মৌসুমির দিকে। মৌসুমিও তাকিয়ে আছে আনোয়ার পাশার দিকে। মৌসুমি জানে আনোয়ার পাশা শারিয়ারের শরীরিক অবস্থার কথা জানতে চায়নি। আনোয়ার পাশা জানে মৌসুমির সাথে তানভীর বা শারিয়ারের সম্পর্ক ছোটো ভাই-বোনের মতো। কাজেই প্রতিটা এজেন্টের ব্যাপারে বিশদ সব খবর সে মৌসুমির মাধ্যমেই রাখে।

'জি, স্যার। সে ভালো আছে,' বলে সে মৃদু কাশি দিয়ে বলে উঠল। 'স্যার, আপনারা কিন্তু এই কেসে ওর সাথে খুব ভালো আচরণ করেননি।'

'সে কেসের প্রথমে যে পরিমাণ গুবলেট করেছিল তারপরও কিন্তু ভরসা করেছি ওর ওপরে,' আনোয়ার পাশার গলায় কাঠিন্য, সে এখনও মৌসুমির দিকেই তাকিয়ে আছে। মৌসুমিও তার দিকে তাকিয়ে আছে। 'স্যার, ও কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালো কাজ দেখিয়েছে।'

আনোয়ার পাশা কিছু না বলে সামান্য মাথা ঝাঁকাল। হঠাৎ সে সামান্য হেসে উঠল। 'সূর্যের চেয়ে বালি গরম কথাটা শুনেছ, মৌসুমি?' বলে সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আবারও সেই জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। 'আমার কাছে এই মুহূর্তে সেরকম মনে হচ্ছে। প্রথম যখন ডিপার্টমেন্ট শুরু করার পরিকল্পনা করি আমি ভেবেছিলাম আমরা কী ধরনের কেস নিয়ে কাজ করবো বা আদৌ কাজ পাবো কি না! এখন তো মনে হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট শুরু করার আগেই নিজেদের সাধ্যের চেয়ে বড়ো বড়ো সব কাজ এসে হাজির হয়ে গেছে। ভয়ঙ্কর সব আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল, অদৃশ্য আন্তর্জাতিক কুখ্যাত সংগঠন, ইতিহাসের পুরনো রহস্য! হচ্ছেটা কী আসলে?' বলে সে টেবিলের কাছে ফিরে এসে খানিকটা রাগের সাথেই সিগারটা অ্যাশট্রেতে চেপে নিভিয়ে দিলো। 'হোয়াট দ্য হেল আর দিজ অর্গানাইজেশনস? নেক্রোপলিস, রেলিক? এরা দেশের সব জায়গায় নিজেদের লোক নিয়োগ করে বসে আছে আমাদের নাকের ডগায়। আমারা এমনকি ওদের অস্তিত্বের কথাও জানি না! এ-কেমন কথা?'

'স্যার, এখন আমাদের করণীয় কী? একদিকে তানভীর সিলেটে, অন্যদিকে শারিয়ার চট্টগ্রামে। একদিকে ওরা আমাদের নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছে।

আবার চট্টগ্রামে রাজদ্রোহীর যে রহস্য পেঁচিয়ে উঠেছে সেটার কিছুই আমরা বুঝতে পারছি না।'

'তোমার অ্যানালাইসিস কী বলে?' হাবিব আনোয়ার পাশা টেবিলের ওপর থেকে ট্যাব তুলে নিয়ে তাতে ফাইলটা ওপেন করে চোখ বুলাতে শুরু করেছে।

'স্যার, আমার অ্যানালাইসিস বলে আমাদের এই মুহূর্তে খুব শক্তভাবে কাজে নামতে হবে দুটো কারণে। প্রথমত, আমরাদের ডিপার্টমেন্ট খোলার প্রস্তাব বিবেচনাধীন, এই মুহূর্তে আমাদের কোনোভাবেই ভুল করা যাবে না। বিশেষ করে তানভীর আর শারিয়ারের পরে যে ইমপ্রেশন আমাদের তৈরি হয়েছে সেটা কোনোভাবেই ব্রেক করা যাবে না। তার ওপরে, রাজদ্রোহীর রহস্য যাই হোক না কেন, আমরা কিছুই না জানলেও আমাদের শত্রুরা এর ব্যাপারে সবই জানে এবং একটা ব্যাপার কি জানেন, স্যার? সিলেটের ঘটনাটা ঠিক পরেই চট্টগ্রামের ঘটনা অ্যাকটিভেট হয়ে উঠল এবং চট্টগ্রামের ঘটনার পর অবশ্যই আমাদের শত্রুরা নিশ্চিত আরও আঁটসাঁট বেঁধে কাজে নেমে পড়েছে। আর আমরা পুরোপুরি অন্ধ অবস্থায় আছি। আমরা এখন শক্ত হয়ে না নামলে শত্রুরা আরও এগিয়ে যাবে এবং . '

'আমাদেরকে কোনো জায়গা থেকে কাজ শুরু করতে হবে সেটা আমি ইতিমধ্যেই বের করে ফেলেছি। বলে সে নিজের হাতে ধরা ট্যাবের একটা জায়গাতে জুম করে সেটা এগিয়ে দিলো মৌসুমির দিকে।

'প্রফেসর ইফতেখার মাহমুদ,' নামটা দেখে নিয়ে মৌসুমি ভ্রু কুঁচকে চোখ তুলে তাকাল আনোয়ার পাশার দিকে। 'প্রফেসর আবদেলের ফ্রেন্ড। যে কি না তিন বছর আগে প্রফেসর আবদেলের সময়েই হারিয়ে গেছিল!'

আনোয়ার পাশা মাথা নাড়ল। 'ঠিক, রাজদ্রোহীর রহস্য যাই হোক না কেন সে-ব্যাপারে যদি কেউ ধারণা রেখে থাকে তবে একমাত্র এই প্রফেসরই পারবে।'

'এখানে আমার দুটো প্রশ্ন আছে, স্যার?' মৌসুমিকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'তাকে কোথায় খুঁজব আমরা? এভাবে হারিয়ে যাওয়া একজন মানুষকে খুঁজে বের করা

'তুমি ভুল প্রশ্ন করেছ, মৌসুমি,' আনোয়ার পাশার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। 'দেখি তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ঠিক হয় কি না!'

মৌসুমিও মৃদু হেসে উঠল। 'দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই মুহূর্তে আমাদের নিজেদের তো অ্যাকটিভ এজেন্ট নেই। আমরা তবে কাজে লাগাব কাকে। আবারও কি আমরা পিবিআই থেকে কাউকে হায়ার করবো?'

'এবার ঠিক প্রশ্ন করেছ তুমি,' বলে সে চেয়ারটাকে খানিকটা পেছনে ঠেলে দিয়ে এক পায়ের ওপর থেকে ভর অন্য পায়ে সরাল। 'এই ব্যাপারটা খানিকটা

জটিল। আমি কাকে কাজে লাগাতে চাচ্ছি সেই ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি, কিন্তু এবার ব্লাইন্ড খেলতে হবে আমাকে। আর তাছাড়া ' বলে সে থেমে গেল। মৌসুমি কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'আমি যার কথা ভাবছি সাম্প্রতিক সময়ে সে বেশ ভালো কাজ দেখালেও তার অতীতের রেকর্ড খুব একটা সুবিধা না। যদিও আমার বন্ধু এসপি আমজাদ আনোয়ার তাকে রিকমেন্ড করেছে এবং পুরোপুরি ভরসা রাখতে বলেছে। কিন্তু তারপরও। আসলে

'স্যার, আপনি কি ইন্সপেক্টর আহমেদ বাশারের কথা ভাবছেন?' মৌসুমির ভ্রুজোড়াও কুঁচকে উঠেছে।

হাবিব আনোয়ার পাশা মাথা নেড়ে সায় জানালেও তার দৃষ্টিতেও দ্বিধা এবং সে বলেই ফেলল। 'একেবারেই অচেনা ছেলেটার ওপরে কি ভরসা করাটা ঠিক হবে? বিশেষ করে তার অতীতে যেখানে খুবই বাজে একটা রেকর্ড আছে?'

'নিজের বন্ধুকে খুন করার ব্যাপারটা বলছেন, স্যার?' মৌসুমি হাবিব আনোয়ার পাশার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল।

আনোয়ার পাশা কিছু না বলে আনমনেই মাথা নাড়ল।

অধ্যায় তিন

সময়: ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ

চৌরা, বৃহত্তর ভাওয়াল গড় এলাকা, ফজল গাজীর শাসন অঞ্চল

আনমনেই নিজের মাথাটাকে একপাশে কাত করে অন্ধকারের ভেতরে দেখার চেষ্টা করছে মাসুম। 'তগো কি মনে অইতাছে আমরা ঠিক জায়গাতে আছি?' নিজের লম্বা দাড়িতে আলতো করে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে মাসুম খাঁ কাবুলি অন্ধকারের ভেতরে আবারও তার পাশের মানুষটাকে দেখে নিলো। আর তার পাশের মানুষটা অত্যন্ত বিরক্তি নিয়ে ফিরে তাকাল তার দিকে। মানুষের অভিব্যক্তি এমন একটা ব্যাপার যেটা বোঝার জন্যে আলো আর আঁধারির প্রয়োজন হয় না। স্থান-কাল আর পাত্রের সংজ্ঞা পরিবর্তন হলেও এই জিনিস খুব ভালোভাবেই ধরা যায়, বিশেষ করে ঘটে যদি খানিকটা বুদ্ধি আর কাজের ক্ষেত্রে যদি খানিকটা বিদ্যা থাকে আরকি। আর বারো ভূঁইয়াদের ভেতরে সবচেয়ে সাহসী এবং দক্ষ যোদ্ধা মাসুম খাঁ কাবুলির দুটোই বেশ ভালো অনুপাতে আছে। কাজেই তার পাশের মানুষটি যে তার গলার স্বর শুনে চূড়ান্ত বিরক্ত হয়েছে সেটা বুঝতে তার খুব বেশি বেগ পেতে হলো না।

সে কথা বলে উঠতেই ধোবল বিরক্তি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে মুখের সামনে একটা আঙুল তুলে চুপ থাকতে নির্দেশ করল।

মাসুম খাঁ কাবুলি একটা হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করে খুব সাবধানে নিজের শরীরটাকে খানিকটা পিছিয়ে নিলো গাছের ডালের ওপরে, তারপর আরাম করে হেলান দিলো গাছের মোটা কাণ্ডের গায়ে। হিসেবে ঘুমে জড়িয়ে আসার কথা তার কিন্তু উত্তেজনায় বরং বুকের ভেতরটা ধুপ ধুপ করছে। মাসুমের মনে পড়ে গেল তার ছোটোবেলার কথা।

ইয়েমেনি বংশদ্ভুত পরিবারে জন্ম তার। পূর্বপুরুষেরা ইয়েমেনের পাহাড়ি মরু অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল। সেখান থেকে ধর্মপ্রচারের জন্যে তারা প্রথমে পূর্ব আফগানিস্তানের কাবুল প্রদেশে যায় এবং সেখান থেকে পরবর্তীতে বাঙাল মুলুকে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। সেখান থেকেই নামের সাথে *কাবুলি* উপাধিটা যোগ হয়েছে তাদের পরিবারে। তার পূর্বপুরুষদের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত

কঠিন। একদিকে হাজার হাজার মাইলের ভ্রমণ আবার তার ওপরে নতুন অঞ্চল এবং নতুন বসতি শধুমাত্র তাদের ওপরেই প্রভাব সৃষ্টি করেনি, প্রভাব সৃষ্টি করেছিল তাদের বংশধরদের ওপরেও। বর্তমান সময়ে হলে আমরা হয়তো একে বলতাম *জেনেটিক মোডিফিকেশন*। যাই হোক, মাসুমের পর দাদারা প্রথম ইয়েমেন থেকে আফগানের পাহাড়ি এলাকায় বসতি স্থাপন করার পর তাদের পরিবারের একটা অংশ সেই পাহাড়ি গোত্রের সাথে মিশে যায়। মাসুমের পরদাদা নিজেদের বন্ধুত্ব বিস্তারের জন্যে সেই পাহাড়ি গোত্রের সর্দারের মেয়ের সাথে নিজের ছেলে অর্থাৎ মাসুমের দাদার বিয়ে দিয়েছিল। সেখানেই নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে সংসার শুরু করলেও নিজের বাবার নির্দেশে একটা সময় পরে সে আবারও পরিবারের একটা অংশ নিয়ে পথ চলতে শুরু করে এবং বঙ্গভূমিতে এসে পৌঁছায়। সরাসরি ঠিক করা না হলেও বঙ্গভূমিতেই আসার নিয়ত ছিল তাদের। দীর্ঘযাত্রায় পথিমধ্যেই নিজের সন্তান জন্ম দেয় মাসুমের দাদি অর্থাৎ পথ চলার ভেতরেই জন্ম হয় মাসুমের বাবার। তাদের পথ চলতে চলতে আরও একটা মজার বিষয় ঘটে। পথ চলতে চলতেই তাদের সাথে মিশে যায় আরও দুটো যাযাবর গোত্র। নিজেদেরকে মুসলিম ধর্মে ধমান্তরিত করে তারা হয়ে ওঠে একই পরিবারের অংশ। আর ঠিক একারণেই বলতে গেলে একদিকে মাসুমের রক্তের ভেতরে রয়েছে ইয়েমেনি এবং আফগান পাঠানদের বীজ এবং অন্যদিক থেকে বাঙালি এবং যাযাবর গোত্রের ধারা। যে-কারণেই বলতে গেলে একদিকে সে ধর্মপ্রাণ, অন্যদিকে ভয়ঙ্কর এবং বেপরোয়া যোদ্ধা, সেই সাথে অত্যন্ত ছন্নছাড়া ধরনের একজন মানুষ।

মাসুমের দাদা বাঙাল মুল্লুকের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে এবং সেই সাথে যে উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এসেছে অর্থাৎ ধর্মপ্রচার শুরু করে। মাসুম কাবুলির পরিবার বাঙাল মুল্লুকে এসে স্থায়ীভাবে আসন গেড়ে বসতে খুব বেশি অসুবিধা হয়নি কারণ বাঙাল মুল্লুকে সেই সময়ে ইয়েমেন থেকে আসা সম্প্রদায়ের বেশ প্রভাব, প্রতিপত্তি তো ছিলই সেই সাথে মাসুমের দাদা বেশ ভালো রকমের সম্পদ সাথে করে নিয়েই এসেছিল। আর তারা ছিল পাহাড়ি গোত্রের কঠিন পরিশ্রমী মানুষ এবং সেই সাথে সৎ। একদিকে পরিশ্রমের ফলে ধীরে ধীরে তাদের পরিবার উন্নতি করতে শুরু করে, অন্যদিকে সততা এবং ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে অত্র এলাকায় তাদের নামডাক ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। মাসুমের দাদার পর তার বাবা পারিবারিক ব্যাবসাকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে তো যায়ই সেই সাথে সে জড়িয়ে পড়ে রাজনীতিতে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের তাদের পরিবার দারুণ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে মাসুমের জন্মের আগেই। তাদের পরিবার যখন উন্নতির চরম শিখরে বিচরণ করছে এমন সময়ে তিন ভাই-বোনের পর জন্ম হয় মাসুমের।

পরিবারের ছোটো সন্তান হিসেবে একদিকে বাবা-মায়ের প্রিয় তো ছিলই, সেই সাথে একেবারে ছোটোবেলা থেকেই নিজের চঞ্চলতা দিয়ে সবার মন জয় করে নিতে থাকে সে। কিন্তু মাসুমের পরিবার ছিল প্রচণ্ড রকমের ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা রক্ষণশীল, তীব্র মূল্যবোধ সম্পন্ন এবং বেশ নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলা পরিবার। প্রথম দুটো ব্যাপার নিয়ে সমস্যা না হলেও তৃতীয়টা নিয়ে মাসুমের নিজের পরিবারের সাথে মানিয়ে নিতে বেশ সমস্যা হতে শুরু করে সে কৈশোরের কোঠা পার হওয়া মাত্রই। কারণ অল্প বয়সেই শারীরিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে সে এবং এর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে তার দুরন্তপনা। নামাজ-কলমা ঠিকমতো করলেও পড়ালেখা তাকে দিয়ে খুব বেশি হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে সারাদিন সে মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াত আর নানা দুরন্তপনা করে বেড়াত। ছেলে যুবক হওয়া মাত্রই তাকে নিয়ে বেশ চিন্তায় পড়ে যায় তার বাবা। এমন সময় কেউ একজন তাকে পরামর্শ দেয় ছেলে যদি আক্ষরিক অর্থেই পারিবারিক গণ্ডির ভেতরে থাকতে না চায় এবং দুরন্তপনাতেই তার যদি মন থাকে তবে তাকে সেই ব্যবস্থাই করে দেওয়া হোক। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সেই সময়ে দুরন্ত ছেলেদেরকে পারিবারিক বাঁধনে বাঁধার জন্যে বাবা-মায়েরা যে অস্ত্র ব্যবহার করত সেটা ছিল তাদেরকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়া। কিন্তু মাসুমের বাবা তাকে বেশ ভালোভাবেই চিনতে পেরেছিল। সে জানত এই ছেলেকে বিয়ে দিলে উলটো আরও ঝামেলা বাড়বে। তারচেয়ে যে পরামর্শ দিয়েছিল তার কথা শুনে ছেলেকে সে মোঘল সেনাবাহিনীতে ভর্তি করিয়ে দেয় এবং তার দূরদর্শিতা শতভাগ ঠিক ছিল।

মোঘল সেনাবাহিনীতে মাসুম আক্ষরিক অর্থেই তার নিজের জীবনের অর্থ খুঁজে পায়। তৎকালীন সময় মোঘল সেনাবাহিনী ছিল উপমহাদেশ কাম বিশ্বের সেরা সেনাবাহিনীগুলোর একটি। মোঘল সেনাবাহিনীতে একেবারে ছোটোবেলা থেকে সৈনিক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হতো যুবকদের এবং ধাপে ধাপে তাদেরকে শূন্য থেকে শিখরে পৌঁছে দেওয়া হতো। সৈনিক নিয়োগ দেওয়া হতো একেবারে ভারতবর্ষের সমস্ত এলাকা থেকে শুধুমাত্র বুদ্ধিমত্তা এবং শারীরিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে। না ছিল কোনো জাত-ভেদের কাহিনি, না ছিল কোনো রেষারেষি। একটাই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ধাপে ধাপে তৈরি করা হতো তাদেরকে।

নিজের সৈনিক জীবনের একেবারে শুরু থেকে মাসুম নিজে সেরাদের সেরা হিসেবে প্রমাণ করে নিজের সেনাবাহিনীর জীবনের দশ বছরে সে সর্বনিম্ন পদ থেকে সর্বোচ্চ অবস্থানে চলে গেছিল। বলা হতো পুরো ভারতে তার মতো দক্ষ যোদ্ধা খুব কমই আছে। মাসুম নিজেও সর্বদা ভাবত সে একদিন মোঘল বাহিনীর প্রধান সেনাদের একজন হবে। কিন্তু বিধি তার জন্যে ভেবে রেখেছিল একেবারেই ভিন্ন

কিছু। একেবারে ছোটোবেলা থেকেই মাসুম বড়ো হয়ে উঠেছিল তীব্র ধর্মীয় অনুশাসন এবং মূল্যবোধের ভেতরে। যে-কারণে যতই দুরন্তপনা করুক কিন্তু তার ভেতরে ধর্মীয় অনুভূতি ছিল প্রকট। যে কারণে বাদশা আকবর যখন দ্বীন-ই-ইলাহি ধর্মের প্রবর্তন করল ব্যাপারটা সে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। একরকম বলতে গেলে বিদ্রোহ করেই সে সেনাবাহিনী থেকে ইস্তফা দিয়ে ফিরে আসে নিজের বাড়িতে।

তার এই ফিরে আসার ব্যাপারটা মোঘল বাহিনী কোনোদিনই ভালোভাবে নেয়নি। কিন্তু সে বাড়ি ফিরে আসাতে খুব খুশি হয়েছিল তার বাবা। কারণ তার পরিবারে তখন তাকে প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে তার বাবার। একদিকে মোঘলদের সাম্রাজ্যে সম্রাট আকবরের দ্বীন-ই-ইলাহি প্রচারের ফলে মোঘল সাম্রাজ্যে যেমন উত্থান-পতন চলছিল ঠিক তেমনি বাঙাল মুল্লুকেও সেই সময়ে ঘটে চলেছিল নানা পরিবর্তন। মাসুমের পরিবার শুধুমাত্র ধর্মীয় দিক থেকে তাদের এলাকাতে শক্তিশালী ছিল না, বরং তারা রাজনৈতিক দিক থেকেও প্রভাবশালী ছিল। মাসুমের দাদা আর তার বাবার হাত ধরেই এই ধারাটা পরিবারে চলে আসছিল। যেই সময়ের কথা বলা হচ্ছে সেই সময়ে এমনিতেই বাংলাকে বলা হতো বিদ্রোহের মুল্লুক। কারণ বাঙাল প্রদেশে একদিকে যেমন ছিল সম্পদের পাহাড় অন্যদিকে ছিল বিদ্রোহী রাজা আর শাসকদের আস্তানা। একদিকে এমনিতে বাঙাল মুল্লুক ছিল বিদ্রোহী রাজাদের আস্তানা তার ওপরে দক্ষ নেতা এবং সাহসী বীর ঈশা খাঁর উত্থানের মাধ্যমে বারো ভূঁইয়ারা একত্রিত হতে শুরু করাতে বাঙাল মুল্লুক তখন স্বাধীনচেতাদের আস্তানা হয়ে উঠছিল। তার ওপরে সম্রাট আকবর দ্বীনই-ইলাহি প্রবর্তন করাতে ধর্মীয় অনুভূতি প্রবলভাবে বারো ভূঁইয়া এবং স্থানীয়দের মনে ব্যাপারটা এতটাই দাগ কাটে যে তারা প্রকাশ্যে নিজেদের স্বাধীন এবং মোঘল বিরোধী বলে ঘোষণা করতে শুরু করে। এমন সময় ঈশা খাঁ থেকে শুরু করে গাজীরা সবাই খুব করে চাইছিল মাসুমের পরিবারকেও নিজেদের সাথে সামিল করতে। কিন্তু মাসুমের বড়ো দুই ভাই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হলেও তাদের কেউই সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত তো ছিলই না, সেই সাথে তারা রাজনীতির বিষয়েও ছিল একেবারে কাঁচা। অন্যদিকে মাসুমের বাবার বয়স হয়েছিল। কাজেই সে নিজে থেকে কিছু করবে এমনটাও সম্ভব ছিল না। ঠিক এমনই এক সময় মোঘলদের সাথে বিরোধিতা করে বাড়ি ফিরে আসে মাসুম। তার বাবার পরামর্শেই সে ঈশা খাঁর সাথে যোগদান করার জন্যে উদ্যত হয়। একে তো ছোটোবেলা থেকেই উদ্ধত এবং তার ওপরে দীর্ঘদিন মোঘল বাহিনীতে কাজ করার সুবাদে মাসুমের ভেতরে একটা লুক্কায়িত অহংকার ছিল এবং সে মনে মনে ভাবত তার সামনে কেউই টিকতে তো পারবেই না বরং তার সমকক্ষও কেউ হতে পারবে না। কিন্তু তার এই ধারণা ভেঙে যায় ঈশা খাঁর সাথে মোলাকাত হবার পর। মল্লারের যুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ

করতে গিয়ে সে অনুধাবন করতে পারে ঈশা খাঁ নামের এই মানুষটা তার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী যোদ্ধা তো বটেই, সেই সাথে তার প্রজ্ঞা রাজনৈতিক দূরদর্শীতা মিলিয়ে এমন এক মানুষের সন্ধান পায় সে ঈশা খাঁর ভেতরে যাকে তার মতো উদ্ধত যুবকও নির্দ্বিধায় নেতা হিসেবে মেনে নেয়। মল্লারের যুদ্ধেই ঈশা খাঁর সাথে দারুণ সুসম্পক গড়ে ওঠে। কিন্তু গোলযোগটা বাঁধে মল্লারের যুদ্ধ শেষ করে বাড়ি ফিরে আসার পর।

মোঘলরা যে তার এভাবে বাঙাল মুল্লুকে ফিরে আসাটা পছন্দ করেনি সেটা সে পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারেনি। মল্লারের যুদ্ধ থেকে বাড়ি ফিরে যাবার আগেই মাসুম জানতে পারে মোঘল সুবাদার শাহবাজ খাঁর থেকে সমন এসেছে– তাকে দিল্লির সম্রাটের নির্দেশে মোঘল বাহিনীর কাছে ফিরে গিয়ে কারণ দর্শাতে হবে: কেন সে সেনাবাহিনী ছেড়ে পালিয়েছিল? তা না হলে তাকে রাজদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা করে ফরমান জারি করা হবে।

ঘটনাটা ঘটার সাথে সাথে নিজের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে মাসুম প্রথমে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল কিন্তু সে উলটাপালটা কিছু করার আগেই ঈশা খাঁ তাকে নিজের দরবারে ডেকে নেয়। ঈশা খাঁ বাদে দুনিয়ার আর কেউ যদি তাকে ডাকত সেই সময়ে জীবনেও সে সেই ডাকে সাড়া দিত না। কারণ মাসুমের বক্তব্য হলো: তাকে এই সমন জারি করার মাধ্যমে অপমান করা হয়েছে এবং এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে তাকে, প্রয়োজনে যদি শাহবাজ খাঁর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয় সে সেটাও করতে রাজি আছে। কিন্তু মানুষটা ঈশা খাঁ, একমাত্র তার ডাকেই নিজেকে শান্ত রেখে পালমপুরে ঈশা খাঁর গোপন কাচারি বাড়ির দিকে রওনা দেয় সে।

সেখানে যাবার পর অত্যন্ত তাজ্জব হয়ে সে দেখতে পায় সেখানে শুধু সে নয়, বরং বারো ভূঁইয়াদের অনেকেই উপস্থিত। শ্রীপুর ও বিক্রমপুরের রায় পরিবারের ভূঁইয়ারা, ভাওয়াল এলাকার গাজী থেকে শুরু করে অনেকেই উপস্থিত সেখানে। সেখানে যাবার পর বিস্তারিত আলোচনার পর পুরো ব্যাপারটার গভীরতা অনুধাবন করতে পারে সে খুব ভালোভাবে। সেই আলোচনায় যে কয়েকটা বিষয় উঠে আসে, তার ভেতরে অন্যতম হলো মোঘল শাসকেরা বাঙাল মুল্লুকে ইতিপূর্বে বারবার বারো ভূঁইয়াদের শক্তির কাছে পরাস্ত হয়ে আসছে এবং সেই কারণেই সম্রাট আকবর মানসিংহকে প্রেরণ করেছে বাঙাল মুল্লুকে। কিন্তু মানসিংহ বাংলায় এলেও সে এখন পর্যন্ত তেমন কিছুই করেনি বলতে গেলে। এটা নিয়ে বারো ভূঁইয়ারা চিন্তিত হচ্ছিল এবং বোঝার চেষ্টা করছিল আসলে সে করছেটা কী? তার চুপ করে থাকবার কারণটাই বা কী? মল্লারের যুদ্ধটা ছিল প্রথম একটা ধাক্কা। এরপর ধীরে ধীরে ওরা নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার পাশাপাশি প্রভাব বৃদ্ধি করতে শুরু করে। প্রথমে

সমন পাঠানো হয়েছে মাসুমকে আত্মসমর্পণের জন্যে, এর ঠিক কাছাকাছি সময়ে আরও বেশ কিছু ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে বাঙাল মুল্লুকের আরও বেশ কিছু জায়গায়। আর ঠিক একারণেই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যেই আজকের এই সমাবেশ। আর সেই সমাবেশেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়: পুরো বাংলা জুড়ে গোপনভাবে বারো ভূঁইয়াসহ সমস্ত স্বাধীন রাজ্য শাসকদেরকে সাবধান করে দেওয়া হবে। সেই সাথে আরও একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেই সমাবেশে, যা মাসুমের মোটেই পছন্দ হয় না। সেটা হলো তাকে আপাতত দৃশ্যপট থেকে সরে পড়তে হবে। বিষয়টাকে সে ভীষণভাবে প্রতিহত করতে যাচ্ছিল কিন্তু ঈশা খাঁ তাকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার পর সে বুঝতে পারে এবং মন না মানলেও বাস্তবতার হিসেব করেই তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ঈশা খাঁর বন্ধুসম ফজল গাজীর ভাওয়াল এলাকা চৌরাতে। সেই থেকে সে এখানেই আছে নিজের সবচেয়ে কাছের দুই বন্ধু ধোবল আর বরখার সাথে। সেই সাথে এখানে আসার পর তার মতোই আরও বেশ কিছু দামাল ছেলেপেলের সাথে বন্ধুত্বও হয়ে গেছে তার। সবাই মিলে ঘুরে বেড়ায়, বনে শিকার করে, নদীতে হাওড়ে মাছ ধরে। দিনগুলো খুব বেশি উত্তেজনাপূর্ণ না হলেও খারাপ যাচ্ছে না। পার হয়ে গেছে প্রায় দুই সপ্তাহ। এমন সময় গত কয়েকদিন তারা গাজীদের যে বাহির মহলে থাকছে সেখানে স্থানীয় এক জেলে খবর নিয়ে আসে–মঙ্গল মোহনা নদী যেখানে পুবের হাওড়ের সাথে মিশেছে সেখানে কয়েকদিন যাবৎ নাকি অদ্ভুত এক প্রজাতির মাছ এসে ঘাই মারে রাতের শেষ প্রহর আর ভোরের মাঝামাঝি সময়ে। কথাটা শুনেই পাকা মাছ শিকারি, মাসুমের অন্যতম সহকারী ধোবলের মাথা গরম হয়ে ওঠে। এমনিতেই কয়েকদিন ধরে তারা কোনো কাজ না পেয়ে মাছি মারছে, তার ওপরে এমন সময়ে বিশেষ ধরনের মাছের খবর শুনে তার মতো মৎস্য-শিকারির মাথা তো গরম হবেই। প্রশ্ন হলো জেলেরা তো নিজেরাই মাছ মারতে পারে খুব ভালোভাবেই, তাহলে তারা নিজেরাই কেন ধরছে না বড়ো আকারের মাছগুলোকে?

এর পেছনে বেশ কয়েকটা কারণ আছে। প্রথমত, মাছগুলো কী ধরনের মাছ এটা তাদের জানা নেই, তার ওপরে তারা এত বড়ো মাছ ধরতে অভ্যস্ত নয়। সেই সাথে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো–যে-এলাকাতে মাছগুলো দেখা গেছে, সেই এলাকাতে নদীর কুখ্যাত ঘড়িয়ালের আনাগোনা আছে। ঘড়িয়াল হলো এক ধরনের মেছো কুমির, এটাকে *ঘট কুমির* নামেও ডাকে অনেকে। এরা মূলত মাছ খায় বলেই এদেরকে মেছো কুমির বলে, তবে মাছ খায় বলেই এরা নিরীহ নয়। মুখটা অস্বাভাবিক লম্বা এবং বেশ হিংস্র প্রজাতি বলে এদের কুখ্যাতি আছে। একারণেই জেলেরা সাহায্য চাইতে এসেছে ওদের কাছে। আর সেখান থেকেই আজ রাতের অভিযান তাদের।

ধোবলের ধমক খেয়ে চুপ হয়ে মাথা সরিয়ে আধো অন্ধকারের ভেতরে বাকিদের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করতে লাগল। সবাইকে পরিষ্কার দেখা না গেলেও মাসুম মোটামুটি জানে, কে কোথায় আছে। ওরা অবস্থান করছে যে জায়গাটায় মাছেদের আগমন ঘটে বলে কথা ছড়িয়েছে, সেই জায়গাটার একেবারে কাছাকাছি একটা গাছের ডালের ওপরে। এখানে আছে সে আর ধোবল। ধোবলের কাছে আছে বিরাট আকারের একটা মাছ ধরার কোঁচ, সেটা গোড়ায় লম্বা দড়ি বাঁধা আর দড়ির এক মাথা আটকানো আছে গাছের ডালে। মাসুমের কোমরে আছে একটা বড়ো ড্যাগার, আর তার হাতে আছে একটা বড়ো চুক্কি, এটা মাছ মারার জন্যে ব্যবহৃত না হলেও নিজে সে এটা ভালো চালাতে পারে বিধায় এটা নিয়ে এসেছে সে। সে এটা আনার পেছনে আরেকটা বড়ো কারণ আছে। ওদের থেকে আরও খানিকটা দূরে আরেকটা গাছের ডালে আছে খণ্ডা নামে মাসুমের দলের আরেক যুবক। আর তাদের থেকে আরও বেশ খানিকটা তফাতে পানিতে দুটো ঝোপের আড়ালে জাল এবং কোঁচ নিয়ে প্রস্তুত আছে দুটো নৌকায় দুজন করে চারজন জেলে।

মাসুম দূর থেকে পরিষ্কার দেখতে না পেলেও এটা অনুভব করতে পারছে সবাই মনে হয় বিরক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মাসুম একবার দিগন্তের দিকে তাকাল। এখনও রাতের আঁধার পুরোপুরি বিদ্যমান, কিন্তু ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই। সে ধোবলকে আবারও কিছু বলার জন্যে ফিরে তাকাল। ওর পাগলামিকে যথেষ্ট সায় দেওয়া হয়েছে। আর না। 'ধোবল–'

মাসুম মুখের কথা শেষ করতে পারল না। ধোবল ধমকে উঠে নিচের পানির দিকে ইশারা করল। মাসুম চট করে ফিরে তাকাল সেদিকে। আধো অন্ধকারের ভেতরে ঘোলা পানিতে প্রথমে সে কিছুই দেখতে পেল না। কিন্তু ভালোভাবে তাকাতেই দেখতে পেল পানিতে ভুরভুরি উঠতে শুরু করেছে। সারা জীবন পানিতে বেড়ে ওঠা মাসুমের এটা বুঝতে সমস্যা হলো না যে ভুরভুরিগুলোর আকৃতি এবং ঘনত্ব দেখেই বোঝা যায় বেশ কিছু মাছ এসেছে এবং সেগুলোর আকৃতি যে মোটেই সাধারণ নয়–এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। আরেকটু মনোযোগের সাথে সামনের দিকে তাকাতেই সে আরও চমকে উঠল। জংলা পানির ভেতরে ওরা যেদিকে তাকিয়ে আছে তার থেকে খানিকটা দূরে আরেক জায়গায় ভুরভুরি দেখতে পেল সে। কিন্তু সেটা সমস্যা নয়, সমস্যা হলো ভুরভুরিগুলোর আকৃতি দেখে মাথা নষ্ট হবার জোগাড় হলো তার। বড়ো আকারের পাতিলের সমান এক একটা ভুরভুরি উঠছে পানি থেকে। 'ধোবল, ওদিকে ' ফিসফিস করে সেদিকে ইশারা করতে গিয়ে দেখল ধোবল ইতিমধ্যেই সেদিকে তাকিয়ে আছে। উত্তেজনা আর খুশির চোটে তার দাঁতগুলো সব বেরিয়ে পড়েছে।

'কী মাছ এইগুলা এত বড়ো ভুরভুরি

মাসুম দেখল ধোবলের শরীরটা ডালের সরু পরিসরের ওপরেই টান টান হয়ে উঠেছে এবং তার ডান হাতটা ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে পেছনের দিকে। শরীরটা টান টান হয়ে উঠছে। দক্ষ হাতের কবজি স্থির হয়ে গেছে একটা বিশেষ ভঙ্গিতে। মাসুম খুব ভালো করেই জানে এরপর কী ঘটবে, কারণ এই জীবনে এই দৃশ্য সে বহুবার দেখেছে। আর দুই এক মুহূর্ত পর সে হাতটাকে পেছনে নিতে নিতে স্থির হয়ে যাবে তারপর থেমে যাবে মুহূর্তের জন্যে। মুখে ফুটে উঠবে হালকা একটা হাসি এরপর সে কোচটাকে ছুড়ে মারবে শিকারকে উদ্দেশ্য করে। অন্ধকারের ভেতরেই আনমনে একবার মাথা নাড়ল মাসুম, ধোবল কোনোদিনই শুধরাবে না, প্রত্যেকবার শিকারের আগে এমনটা করে সে।

কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল প্রতিবার যেভাবে ব্যাপারটা ঘটে সেভাবে ঘটতে ঘটতেও ধোবলের মুখের হাসি পর্যন্ত এসে থেমে গেল বিষয়টা। তারপর হঠাৎই তার হাসি গায়েব হয়ে গেল মুখ থেকে। মাসুম তাকিয়ে ছিল ধোবলের দিকে, তার মুখের হাসি গায়েব হয়ে যেতেই সে ফিরে তাকাল পানির দিকে এবং সাথে সাথে সে নিজেও অবাক হয়ে গেল। পানিতে বেশ ভালো রকমের আলোড়ন চলছে এবং বিরাট মাছটা হঠাৎ বেশ জোরে ঘাই মারতেই ওটার মাথাসহ শরীরের ওপরের অংশ চোখে পড়ল এবং মাসুম অবাক হয়ে দেখল মাছটার আকৃতি এবং গায়ের রঙ পরিচিত কোনো মাছের মতোই নয়।

'সর্বনাশ এইটা তো গারুদ মাছ,' ধোবলের হাত এখনও ওপরে ওঠানো এবং সে কোচটাকে ধরে আছে। মাসুম এখনও পানির দিকেই তাকিয়ে আছে মাছটার নাম শুনতেই তার মাথার ভেতরে ঝিলিক দিয়ে উঠল, গারুদ মাছের সে স্রেফ নামই শুনছে, কখনও দেখার সৌভাগ্য হয়নি। গারুদ মাছ গজার মাছেরই এক ধরনের প্রজাতি কিন্তু আকারে অনেক বড়ো এবং কথিত আছে এই মাছ নাকি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নদী-খাল-বিলে এটাকে আর দেখা যায় না। আর এই বিলুপ্ত প্রজাতির মাছটাকেই কি না ওরা আবিষ্কার করে ফেলেছে এই হাওড়ের জঙলার কিনারায় এসে! কিন্তু মাছটাকে দেখার সাথে সাথে যে ভাবনাটা মাসুমের মাথায় খেলে গেল সেটা খুব সুবিধার না। নিশ্চিত এইবার ধোবল কোনো একটা পাগলামি করবে এবং তার দিকে নজর ফিরিয়েই সে দেখতে পেল ধোবলের মুখে হাসি ফিরে এসেছে এবং সে কোচটাকে ধীরে ধীরে নামিয়ে আনছে। মাসুম তার দিকে ফিরে তাকাতেই সে একটা হাসি দিয়ে বলে উঠল, 'এই মাছ তো মারা যাবে না..'

'ধোবল, পাগলামি করিস না–'

মাসুম কথা শেষ করার আগেই ধোবল কোচটাকে গাছের গায়ে গেঁথে ফেলল, সেই সাথে জোরে শিস বাজিয়ে উঠল সে। এই শিস বাজানোর অর্থ হলো, দুইপাশে যারা ওঁৎ পেতে আছে তারা পানিতে শব্দ করে দুইদিক দিকে জাল পেতে নৌকা

নিয়ে এগোতে থাকবে, যাতে দুইদিকে পানির ঝাপটা আর তাড়া খেয়ে মাছটা উলটোদিকে রওনা দেয় এবং এদিক থেকে ওরা শিকার করতে পারে। ধোবলের ইশারা পেয়ে নৌকা থেকে হল্লা করে উঠল মাঝিরা সেই সাথে ঝপাঝপ পানিতে দাঁড়ের শব্দের সাথে সাথে বৈঠা পড়তে শুরু করল। আর মাসুমের দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিয়ে ধোবল বলে উঠল, 'এইটারে ধরতে হবে,' বলেই সে মাছের ঝাপটানি লক্ষ্য করে খালি হাতে ঝাঁপ দিলো।

মুহূর্তের জন্যে ধোবলকে আটকানোর জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েও তাকে ধরতে পারল না মাসুম। তার আগেই ধোবল পাকা সাঁতারুর মতো লাফ দিলো মাছের সৃষ্ট আন্দোলনরত জায়গাটা লক্ষ্য করে। মুহূর্তের ভেতরে আধো অন্ধকার শান্ত জায়গাটাতে প্রায় নরক গুলজার সৃষ্টি হলো। দুইদিক ধেকে জেলেরা হল্লা করতে করতে জাল নিয়ে এগিয়ে আসছে। অন্যদিকে গাছের ওপর থেকে উৎসুক দৃষ্টিতে পানির দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। আর পানিতে চলছে হুটোপুটি। একহাতে চুক্কিটাকে ধরে ডালের ওপর থেকে উৎকণ্ঠার সাথে পানির দিকে তাকিয়ে আছে মাসুম। ধোবল লাফ দেওয়ার সাথে সাথে সেই যে হুটোপুটি শুরু হয়েছে সেটা থামার নাম নেই।

সে নিজে কী করবে সেটা পুরোপুরি ঠিক করার আগেই ভুস করে একটা মাথা ভেসে উঠল পানির ওপরে। তবে মাথা আর কোনোটাই স্থির নয়। কারণ মাথার মালিক দুই হাতে জাপটে ধরে আছে কিছু একটা। 'ধইরা ফেলছি   ধইরা ফেলছি   ' খুশিতে চিৎকার করতে করতে ধোবল বলে উঠল। বলতে গেলে দুই হাতে বিরাটাকায় মাছটাকে জাপটে ধরে রাখাতে পানিতে ভেসে থাকতে যেমন কষ্ট হচ্ছে, তেমনি সমস্যা হচ্ছে নিজেকে স্থির রাখতে, কিন্তু তার গলায় খুশির আভাস। জেলেদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে দ্রুত এগোতে বলল সে।

মাসুম স্বস্তির সাথে গাছের গায়ে হেলান দিতে যাবে তার আগেই ব্যাপারটা চোখে পড়ল ওর। ওরা যেখানে অবস্থান করছে সেখান থেকে একটু সামনেই পানিতে মাছটাকে জাপটে ধরে হুটোপাটি করছে ধোবল, তার বাঁদিকে দুটো নৌকায় করে এগিয়ে আসছে জেলেরা। কিন্তু ওদের থেকে ডান দিকে জংলা ঝোপের মতো জায়গায় ফোলা ফোলা কিছু একটা চোখে পড়ল ওর, সাথে সাথে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল ওর। 'ধোবল,' ও চিৎকার করে সাবধান করে দেবার আগেই পানির ওপরে ফোলা ফোলা জিনিসটা গায়েব হয়ে গেল কিছু বুদ্বুদ রেখে। মাসুম দেখল ওপর দিকে জেলেরাও দেখতে পেয়েছে কিছু একটা; থেমে গেল ওদের চিৎকার-চেঁচামেচি, সেই সাথে নৌকার গতিও কমে আসতে শুরু করেছে। মাসুম কিছু বলে ওঠার আগেই *ঝুপ* করে মাছসহ ধোবলের মাথাটা ডুবে গেল পানির

ভেতরে। গাছের ওপর থেকে বাকিরাও চিৎকার করে উঠল। ব্যাপারটা পরিষ্কার যে ঘড়িয়াল আক্রমণ করেছে ধোবলকে। ঝোপঝাড়ের মতো জায়গাটায় যে ফোলা ফোলা আকৃতি দেখা গেছিল সেটা ঘড়িয়াল ছাড়া আর কিছু নয়।

যেকোনো কুমির জাতীয় প্রাণি কখনও পানির উপরিভাগে আক্রমণ করো না বরং পানিতে ডুব দিয়ে টুপ করে নিচ থেকে টেনে পানিতে নামিয়ে ফেলে শিকারকে। আর হঠাৎ করে ধোবলের মাথাটা পানির নিচে নেমে যাওয়া প্রমাণ করে–নিশ্চিত তার পা কামড়ে ধরে পানিতে টেনে ধরেছে ঘড়িয়াল। মুহূর্তের জন্যে খানিকটা দিশেহারা বোধ করল মাসুম। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে বুঝতে পারল কী করতে হবে। পানির নিচে চোখা জিনিসটা কোনো কাজে দিবে না। তাই সে ধোবলের মতো ওটাকে গেঁথে ফেলল গাছের সাথে, তারপর কোমর থেকে ড্যাগারটা বের করে ওটাকে দাঁতে কামড়ে ধরে লাফ দিলো পানিতে। ঠিক যেখানে ধোবলের মাথাটা ডুবে গেছিল পানির নিচে তার যতটা কাছাকাছি সম্ভব সেখানে।

মুহূর্তের জন্যে হাওড়ের ঠান্ডা কালো পানি গিলে নিলো তাকে। পানির নিচে কিছুই দেখতে পাবার প্রশ্নই আসে না। দিনের আলোতেই ঘোলা পানিতে কিছু দেখা যায় না আর রাতের শেষ প্রহরের অন্ধকরের ভেতরে তো প্রশ্নই আসে না। কিন্তু ছোটোবেলা থেকে জলকাদার ভেতরেই মানুষ হওয়া দক্ষ সাঁতারু মাসুম জানে কী করতে হবে তাকে। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোটো ছোটো নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সে প্রথমে তরতর করে ডুব সাঁতার দিয়ে নেমে গেল বেশ অনেকটা। ছয়-সাত হাত পানির নিচে নামতেই শরীটাকে সোজা করে ফেলল ও। এতক্ষণ ছোটো ছোটো নিশ্বাস নিতে নিতে নামছিল সে। এবার নিশ্বাস বন্ধ করে শরীরটাকে স্থির করে অনুভব করার চেষ্টা করল–আলোড়ন আসছে কি না কোনোদিক থেকে। কিন্তু অন্ধকার পানির ভেতরে কিছুই বুঝতে পারল না। চোখ বন্ধ করে, শরীরটাকে আরও স্থির করে ফেলল মাসুম। এসব কিছুই মাসুমের জন্যে নতুন নয়, পরিস্থিতি বুঝতে হলে প্রয়োজন শুধু মন আর মস্তিষ্কের সংযোজন। পানির গভীরে শব্দ কিংবা কম্পন কয়েকগুণ বেশি বেড়ে যায়, দরকার শুধু অনুভব করা। কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকতেই তিনটে কম্পন টের পেল সে। দুটো আসছে ডান দিক থেকে আর সবচেয়ে ভারী কম্পনটা আসছে পেছন থেকে। চট করে ঘুরে ড্যাগারটাকে ডান হাতে নিয়ে শরীরটাকে একটা পাক খাইয়ে তিরের মতো লম্বা করে ফেলল সে, তারপর পা দুটোকে মাছের পাখনার মতো করে পানিতে শক্তিশালী দুটো ধাক্কা মারতেই অনেকটা সামনে এগিয়ে গেল মাসুম। সাথে সাথে টের পেল সামনে শক্তিশালী আলোড়ন পানিতে, আরেক দফা সামনে এগোতেই শক্তিশালী কিছু একটা ধাক্কা মারল মাসুমের চওড়া কাঁধে।

ধাক্কাটা এতটাই শক্তিশালী যে সাথে সাথে তার পরনের ফতুয়াটা ছিঁড়ে গভীর আঁচড় পড়ে গেল কাঁধের চামড়ায়। সাথে সাথে একপাশে সরে যাবার চেষ্টা করেও খুব একটা সফল হলো না মাসুম। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে এমন শক্তিশালী ধাক্কা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। কাঁধের তীব্র আঘাত উপেক্ষা করে দলাপাকানো শরীরটাকে সোজা করে ডান হাতে ধরা ছুরিটাকে আরও শক্ত করে চেপে ধরল সে, কিন্তু জানে খুব একটা লাভ হবে না। সামনে যাই ঘটুক না কেন সেখানে তিনটে প্রাণি আছে–ঘড়িয়াল, গারুদ মাছটা আর ধোবল। ছুরি চালাতে গেলে জোরদার সম্ভাবনা আছে মাছ কিংবা ঘড়িয়ালটাকে আঘাত না করে ধোবলকে আঘাত করে বসতে পারে। কারণ কাকে আঘাত করছে সেটা নিশ্চিত না হয়ে ছুরি চালানো যাবে না, আর ততক্ষণ ছুরিটা একটা ঝামেলা ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু একবার নিশ্চিত হয়ে গেলে ছুরিটাই হয়ে উঠবে সবচেয়ে মূল্যবান অস্ত্র, কাজেই ওটাকে ছাড়াও যাবে না।

শরীরটাকে সোজা করে আবারও সামনে ঠেলে দিলো সে। ডুব সাঁতারে দুর্দান্ত দক্ষ হলেও দম ফুরিয়ে আসতে শুরু করেছে ওর, আর যদি তাই হয়, তবে ধোবলের অবস্থা এতক্ষণে আরও খারাপ। দ্রুত কিছু না করলে সর্বনাশ। আর কিছু করতে হলে একটাই উপায়, আর তাই করল সে। শরীরটাকে সামনে ঠেলে দিতেই সামনে তীব্র ঘূর্ণনের ধাক্কা টের পেল, পরোয়া না করে পাকের ভেতরে ঢুকে যাবার চেষ্টা করল। সেই সাথে মুক্ত বাঁহাতে ধরার চেষ্টা করছে সামনে। যাই ধরা পড়বে সেটাই কাজে লাগবে। একটাই ঝুঁকি, ঘড়িয়ালটার মুখে হাত পড়ে গেলেই হয়েছে। বাঁহাত প্রথমে পিছলে কিছু একটা লাগল। খপ করে ধরার চেষ্টা করতেই ছুটে গেল ওটা, জিনিসটা কী–কিছুই বুঝতে পারল না। আবারও চেষ্টা করতেই পাতলা কিছু একটা হাতে লাগল। সাথ সাথে হাতটাকে সামনে এগিয়ে নিলো সে। মানুষের হাতের মতো কিছু একটা লাগতেই সমস্ত শক্তিতে চেপে ধরল ওটা। পিছলাতে গিয়েও হাতটা ধরে ফেলল ওকে। সাথে সাথে সমস্ত শক্তিতে টান দিয়ে ওপরের দিকে উঠতে শুরু করল মাসুম। নিচ থেকে টেনে নামিয়ে নিতে চাইছে হাতটা কিন্তু সর্বশক্তিতে ওটা চেপে ধরে ওপরের দিকে উঠতে উঠতে পানির ওপরে মাথা তুলল ও। হাতের মালিককে এখনও টেনে তুলতে পারেনি। মাথা তুলেই খাবি খাবার মতো দম নিলো কয়েক মুহূর্ত হাতটা এখনও ছাড়েনি। ফুসফুসে অক্সিজেন পৌঁছাতেই সমস্ত শক্তিতে টান দিয়ে তুলে ফেলল মানুষটাকে।

চারপাশ থেকে হইহল্লা ভেসে আসছে। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই ওর। মুহূর্তের জন্যে ধোবলের মাথাটাকে পানির ওপরে ভেসে উঠতে দেখল ও। চিৎকার করে কিছু একটা বলতে গিয়েও আবারও টুপ করে ডুবে গেল ও। পানির ওপরেই ধোবলের মাথার অন্যপাশে খাঁজ কাটা একটা লেজ পানির ওপরে তীব্র শক্তিতে

বাড়ি মেরেই লেজ আর মাথা দুটো মালিকই হারিয়ে গেল পানির নিচে। মাসুমের হাত থেকে ছুটে গেল ধোবলের হাত, মুহূর্তের জন্যে মাসুম বুক ভরে দম টেনে নিয়ে শরীরটা গুটিয়ে পা দুটো পানির ওপরে তুলে শরীরটাকে বাঁকিয়ে নিচের দিকে নিয়ে মাছের মতো বাউলি কেটে এগিয়ে গেল যেখানে লেজ আর মাথা দুটোকে হারিয়ে যেতে দেখেছে। মাছের লেজের মতো পানিতে বাড়ি মারতেই শরীরটা এগিয়ে গেল তীব্র আলোড়নের ভেতরে। অন্ধকার পানির গভীরে নড়তে থাকা দুটো শরীরের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় নিজের শক্তিশালী কাঁধ দিয়ে বাড়ি মারল মাসুম। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো আহত কাঁধে আগুন ধরে গেল, পরোয়া করল না ও। বাঁহাত থেকে ডান হাতে নিয়ে আসা ড্যাগারটার হাতলে শক্ত হলো নিজের আঙুল। বাঁহাতের নাগালে থাকা শরীরটাতে যেন আদর করে হাত বোলাচ্ছে এমনভাবে সেকেন্ডের ভগ্নাংশের জন্যে হাত বুলাতে খাঁজগুলো হাতে লাগতেই ডান হাতটা সাপের মতো ছোবল মারল এলোপাথাড়ি। ঘড়িয়ালের শক্তিশালী শরীরটা যেন মোচর খেয়ে উঠল, দুবার ছুরি চালাতেই শরীরটা ঘুরে গেল। মাসুম সতর্ক হয়ে উঠল, কিন্তু কাজ হলো না। আরেকবার ছুরি চালানোর আগেই ওটা ধরে থাকা শিকার ছেড়ে ওর দিকে ঘুরেই কামড় মারল ছুরি ধরা হাতে; মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্যে কামড়টা লাগল না ওর হাতে, কিন্তু নিজেকে সে সরাতেও পারল না। অন্ধকার পানির ভেতরও অনুভব করল ঘড়িয়ালটার মুখ আর ওর মুখ ফুটখানেক ব্যবধানে। ওটার মুখ হাঁ হয়ে গেল কামড় দেওয়ার জন্যে। কামড় এড়ানোর জন্যে একটাই উপায় আছে, আর তাই করল মাসুম; পিছিয়ে না গিয়ে বরং এগিয়ে গেল ওটার দিকে চট করে একহাতে জড়িয়ে ধরে অপর হাত আঘাত হানার জন্যে উদ্যত হলো কিন্তু ভয়ঙ্কর শক্তিশালী প্রাণিটার লেজের বাড়িতে বাঁকা হয়ে গেল ও। শরীরটা নেমে যেতে শুরু করল পানির গভীরে। কিন্তু ঘড়িয়ালটা এত সহজে শিকারকে ছেড়ে দেবার বান্দা নয়। সে ঠিকই বুঝতে পেরেছে শিকার কাবু হয়ে গেছে। মাসুম তীব্র আঘাত আর দমের অভাবে খাবি খেতে শুরু করেছে। কিন্তু এর ভেতরেও তীব্র বেগে ঘড়িয়ালটাকে এগিয়ে আসতে দেখল ওর দিকে। দুর্বল হাতে ছুরি তুলল কিন্তু ওটা তাকে আঘাত করার আগেই কিছু একটা আঘাত করল ওটাকে। আর একটা হাত টেনে ধরল ওকে। কিছু চিন্তা না করেই ওপরের দিকে রওনা দিলো সে। পানির ওপরে উঠে খাবি খেয়ে নিশ্বাস নিতে লাগল। ওর পাশেই ভেসে উঠল আরেকটা মাথা, ঘোলাটে চোখে দেখল ধোবলের মাথা, ধোবলের দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিতে যাবে তার আগেই ওদের থেকে খানিক তফাতে ভেসে উঠল ঘড়িয়ালটার মাথা।

অন্ধকারের ভেতরেও মাসুম পরিষ্কার দেখতে পেল ওটার কুতকুতে চোখে ভীষণ রাগ। ওরা ফিরে তাকাতেই ওটার লম্বাটে মাথাটা ডুবে গেল পানির নিচে।

ধোবলকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে পানিতে ডুব দিলো মাসুম। কুমির জাতীয় প্রাণিরা কীভাবে আক্রমণ করে জানা আছে ওর ভালোই। ওগুলো পানির নিচে ডুব দিয়ে শিকারকে নিচ থেকে কামড়ে ধরে ডুব দেয়। পানিতে বাউলি কেটে ডুব দিতেই ঘড়িয়ালটার লম্বা মাথা এসে বাড়ি মারল ওর পেটে। এক ধাক্কায় সব বাতাস বেরিয়ে গেল। মাসুমের মনে হলো ওর মেরুদণ্ডটা ভেঙে গেছে। ও এগিয়ে আসাতে কামড় না লেগে বাড়ি লেগেছে। শরীরটাকে বাঁকিয়ে ছুরি চালাল, লাগাতে তো পারলই না উলটো আরেকটু হলেই ওটার হাঁ করা মুখের ভেতরে ঢুকে যেত ওর হাতটা। ওটার এতটাই কাছে এগিয়ে গেছে, আবারও ওটাকে জড়িয়ে ধরে ফেলল, তবে এবার ডান হাতের ছুরিটা চালাল পাগলের মতো। কয়বার আঘাত করল নিজেও জানে না। ওটার শরীরের তীব্র মোচড়ের ধাক্কায় একপাশে সরে যেতেই ওপরের দিকে রওনা দিলো। সে পানির ওপরে ভেসে উঠতেই আরেকটু দূরেই ঘড়িয়ালটারও মাথা ভেসে উঠল।

চারপাশের পানি রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এত আঘাতেও ওটার স্থিরতা নেই, পানির ওপরে ভেসে উঠতেই মাসুম দেখল নিজের স্বভাবসুলভ শিকারের নিয়ম ভুলে আহত ঘড়িয়ালটা পানির ওপর দিয়েই হাঁ করে ধেয়ে আসছে, ওর দিকে। আর বাধা দেওয়ার শক্তি নেই। ওটার হাঁ করা মুখটা ধেয়ে আসছে কিছু একটা উড়ে এসে গেঁথে গেল ঘড়িয়ালটার দুই চোখের মাঝখানে। রক্তাক্ত ভেজা পানি থেকে চোখ তুলতেই মাসুম দেখতে পেল পানির ওপরের নৌকা থেকে একটা কোঁচ এসে বিঁধেছে ওটার গায়ে। কোঁচটা লাগার সাথে সাথে পানির ওপরে মোচড়াতে শুরু করল ঘড়িয়ালটা, আরেকটা বর্শা এসে বিঁধতেই স্থির হয়ে এলো ওটা।

মাসুমের মনে হলোঃ পানির ওপরে আর ভেসে থাকতে পারছে না। মাথার কাছে কিছু একটা এসে থামল। শক্তিশালী একটা হাত নৌকার ওপরে টেনে তুলে ফেলল ওকে। নৌকার পাটাতনে শুয়ে চোখ বন্ধ করে স্রেফ দম নিতে লাগল মাসুম। শরীরে কোনো শক্তি নেই, মাথার ভেতরে কোনো বোধ নেই। মনের ভেতরে স্রেফ বেঁচে থাকার আনন্দ। যখন ঘড়িয়ালটাকে আক্রমণ করতে গেল ও ভাবেনি, আজ বেঁচে পানির ওপরে উঠতে পারবে। সব ওই শালা ধোবলের দোষ। চট করে চোখ খুলে উঠে বসার চেষ্টা করল ও। কেউ একজন ধরে শুইয়ে দিলো ওকে।

'আরে আস্তে আস্তে, ওস্তাদ,' মাসুম চোখ খুলে দেখল ওর দলের আরেক সদস্য বরখা।

'ধোবল কই?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল মাসুম।

অন্য কেউ উত্তর দেওয়ার আগেই ওর পাশ থেকে ধোবল বলে উঠল। 'আমি ঠিক আছি,' মাসুম ফিরে তাকিয়ে দেখল আহত বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে ওর পাশেই

পাটাতনের ওপরে পড়ে আছে ধোবল। ও কিছু বলার আগেই আবারও ধোবল বলে উঠল, 'আফসোস একটাই,' সে উঠে বসল নৌকার ওপরে। কাটা-ছেঁড়া শরীর থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। 'শালার মাছটা ধরতে পারলাম না।'

মাসুম চট করে ধোবলের দিকে তাকাল। কড়া ভাষায় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ওদের আরেকদিকের জেলে নৌকা থেকে চিৎকার ভেসে এলো। ওরা পানিতে পেতে রাখা জালটা টেনে তুলছে, মাসুম দেখতে পেল ওটার জালের ভেতরে ছটফট করছে বিরাটাকায় মোটা অজগরের মতো গারুদ মাছটা। আশপাশের নৌকা থেকে সবাই হল্লা করে উঠল। মাসুম দেখতে পেল পানির ওপরে উলটো হয়ে ভেসে আছে মৃত ঘড়িয়ালটার দেহ। ওটাকে টেনে তোলা হবে আরেক নৌকায়।

মাছটাকে পাশের নৌকায় দেখে খুশিতে চিৎকার করতে লাগল ধোবল। মাসুম ওকে কড়া ভাষায় কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গিয়ে আনমনে মাথা নাড়তে লাগল। এ কোনোদিনই ঠিক হবে না। আজ জানের ওপর দিয়ে বেঁচে গেছে।

মাসুম ওপরের দিকে চোখ তুলে তাকাল। আকাশে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। সবগুলো নৌকায় ফিরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিতে যাবে তার আগেই দেখতে পেল। দূর থেকে একটা বিছা নৌকা এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

'এই সময় এইদিকে আসে কে?' মাসুমের পাশ থেকে বরখা বলে উঠল।

নৌকাটা আরেকটু এগিয়ে আসতেই ওরা দেখল ওটাতে বসে আছে গাজীদের প্রধান নায়েব। এই ভোরবেলা খোদ নায়েব চলে এসেছে হাওড়ে! তারমানে বিষয় গম্ভীর।

'নায়েব মোক্তার, আপনি এই সময়ে এইদিকে?' নৌকাটা আরেকটু এগিয়ে আসতেই মাসুম চিৎকার করে জানতে চাইল। ওদের একেকজনের বিধ্বস্ত চেহারা দেখে নায়েবের চোখ কপালে উঠে গেছে।

'আইব না, সারারাত গাজী সাহেব বইসা রইছে তোমগো অপেক্ষায়, আর তুমরা,' বলে সে তিন নৌকার সবাইকে দেখতে লাগল অবাক হয়ে।

'বিষয় কী?' মাসুম গম্ভীর মুখে জানতে চাইল। একহাতে আহত হাত চেপে ধরেছে। তীব্র ব্যথা সামলানোর চেষ্টা করছে।

'তোমাদের নামে সমন আসছে, জলদি চলো, এখনি,' বলে নায়েব নৌকা ঘোরানোর নির্দেশ দিলো। 'খাঁ সাহেবের রাজধানীতে শত্রুরা আক্রমণ করছে।'

সমন এসেছে শুনে খুশি হয়ে গেছিল মাসুম, কিন্তু খবরটা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল সে।

অধ্যায় চার
বর্তমান সময়
ফার্মগেট, ঢাকা

রাজুর নিয়ে আসা খবরটা স্তব্ধ করে দেবার মতোই বটে।

‘বাশার, এই বাশার,’ ঘুমের ভেতরে তীব্র ধাক্কা খেয়ে প্রায় চমকে উঠে বসল পুলিশের সিনিয়র এএসপি আহমেদ বাশার। আচমকা ঘুম ভেঙে যাওয়াতে বুকটা ধড়ফড় করছে ওর। ‘কী   ও, কী হয়েছে,’ হঠাৎ ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় বুকটা ধড়ফড় তো করছেই সেই সাথে রীতিমতো ঘামতে শুরু করেছে বাশার।

‘রাজু, তোর মাথা ঠিক আছে তো, এভাবে কেউ ঘুম থেকে ওঠায় নাকি?’ বাশার ডান হাতের উলটোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে খাটের পাশের ছোটো টেবিল থেকে পানির গ্লাস উঠিয়ে নিয়ে পানি পান করতে লাগল। একে তো গতকাল ভীষণ পরিশ্রান্ত একটা দিন গেছে, তার ওপরে আবার বিগত কয়েকদিন ব্যস্ততার কারণে ঠিকমতো বিশ্রাম নিতে পারেনি বাশার। সেই সাথে ঠান্ডার রাতে আবার নেমেছে বৃষ্টি কাজেই আজ রাতে বলতে গেলে মরার মতো ঘুমাচ্ছিল ও। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়াতে রীতিমতো অসুস্থ লাগছে ওর।

ওর উলটোদিকের আরেক খাটে ছোটো একটা হাফপ্যান্ট পরে বসে আছে আরেক সিনিয়র এএসপি রেজাউদ্দিন পাটোয়ারি ওরফে রাজু। রাজু শুধু ওর সহকর্মীই নয়। ওরা দুজনে খুব ভালো বন্ধুও। পুলিশ হিসেবে নিজেকে খুবই মধ্যম মানের মনে করলেও, বাশার সবসময়ই মনে করে রাজু খুবই বুদ্ধিমান এবং দক্ষ একজন পুলিশ। নিজের কাজকর্ম থেকে শুরু করে এমনকি ব্যক্তিগত জীবন পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই রাজুকে তার কাছে রীতিমতো একজন আইডল মনে হয়। কিন্তু সব মানুষের মতো রাজুরও কিছু সমস্যা আছে। আর তার মধ্যে অন্যতম হলো হুটহাট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অকারণে উত্তেজিত হয়ে যাওয়া। রাজুর এই দিকটা একেবারেই পছন্দ নয় বাশারের। কিন্তু কী আর করা, বন্ধু বলে কথা। রাজুকে খাটের বিপরীতে বসে উত্তেজতি ভঙ্গিতে পা নাড়তে দেখেই বাশার বুঝতে পেরেছে হয় কিছু একটা ঘটেছে, আর না হয় রাজু কিছু একটা ঘটিয়েছে। তা না হলে এই মাঝরাতে সে এতটা উত্তেজিত হয়ে ওকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে আসত না। মনে মনে বাশার

শঙ্কিত হয়ে উঠল কীভাবে রাজুকে সামলাবে সেটা ভেবে ঠিক করতে গিয়ে। আগে থেকেই তাকে সাবধান হতে হবে। 'দেখ, রাজু–' কিন্তু সে কথা শুরু করেও আগাতে পারল না। তাকে থামিয়ে দিয়ে রাজু বলে উঠল। 'দোস্ত, আগে বিড়ি দে,' বাশার ভেবেছিল রাজু তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তোড়বোড় করে কথা বলতে শুরু করবে। কিন্তু তা না করে হঠাৎ সিগারেট চাওয়াতে একটু অবাকই হলো বাশার। খাটের ওপরে উঠে বসে। পাশে টেবিলের ড্রয়ার থেকে বেনসনের প্যাকেট আর লাইটার বের করে নিজে একটা ধরিয়ে প্যাকেট আর লাইটার দুটোই রাজুর দিকে ছুড়ে দিলো বাশার। 'কী ব্যাপার বলত?' বলেই সে নিজেকে সামলে নিলো। ব্যাপার যদি সিরিয়াস হয়ও তাও রাজুকে বেশি লাই দেওয়া যাবে না। ব্যাটাকে লাই দিলেই খবর আছে। 'দোস্ত, দেখ আমি খুব ক্লান্ত–'

'আরে গুল্লি মার তোর ক্লান্তি,' সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলে উঠল রাজু। 'বাইশআঙ্গুইল্লা বজলু শহরে আসছে,' শেষ বাক্যটা প্রায় গালি দেওয়ার মতো দ্রুত এবং উত্তেজনার সাথে বলে উঠল রাজু।

মুহূর্তের জন্যে বাশারের মনে হলো সে কানে ভুল শুনেছে। পরমুহূর্তে বাক্যটার অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করে চট করে ফিরে তাকাল রাজুর দিকে। 'কী বললি?' সে আসলেই নিশ্চিত হতে চাইলে ঠিক শুনেছে কি না। প্রশ্ন করতে করতেই বাশার দেখল রাজুর সিগারেট ধরা হাতটা কাঁপছে। আর সেটা যে উত্তেজনায় কাঁপছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কম্পিত হস্তে সিগারেট টানতে টানতে সে বলে উঠল। 'যা শুনেছিস তাই বলেছি। বজলু শহরে আসছে আজ রাতে।'

বাশার চট করে বিছানার ওপরে উঠে বসল, ঘুম পালিয়েছে চোখ থেকে। 'কী বলিস! তুই জানলি কীভাবে?' বজলু হলো এই শহরের সবচেয়ে বড়ো গ্যাংস্টারদের একজন, সোজা কথা বলতে গেলে ক্যাডার। দুই মাস আগে সলিমপুরে বড়ো ধরনের গ্যাংওয়ার হয় ড্রাগ বিজনেস আর টেরিটরির দখল নিয়ে। প্রতিপক্ষ দলের সাথে সেই গ্যাঙওয়ারে প্রায় আধডজন খুনখারাবি হবার পর থেকে পুলিশ রেডঅ্যালার্ট জারি করে। বিগত দুই মাস থেকে রাজু আর বাশারের ওপরে দায়িত্ব পড়েছে এই পুরো গ্যাংওয়ারের হোতা বজলুকে খুঁজে বের করার জন্যে। স্থানীয় এলাকার কুখ্যাত ব্যবসায়ী এবং মাদকের প্রধান কারবারি বজলুর ডাক নাম বাইশআঙ্গুইল্লা বজলু। জন্মগতভাবে তার দুইহাতে একাধিক আঙুল থাকার কারণেই তাকে এই নামে ডাকা হয়। বিগত দুই মাস ধরে গোরুখোঁজা খুঁজে বজলুর টিকিরও সন্ধান বের করতে পারেনি বাশার আর রাজু। তবে একাধিক ইনফরমার আর রুট লেভেলের খবরদাতাদের থেকে এটুকু নিশ্চিত করতে পেরেছিল যে শহর ছেড়ে পালিয়েছে বজলু। এমনও খবর ছিল ওদের কাছে যে, গন্ডগোলের সুযোগে বজলু

একেবারে সোজা ভারতে পালিয়ে গেছে বর্ডার পার হয়ে। কারণ সলিমপুর থেকে ইন্ডিয়ার বর্ডার আসলে খুব বেশি দূরে নয়। ওরা যখন অনুসন্ধান প্রায় গুছিয়ে এনে রিপোর্ট করার দারপ্রান্তে ছিল যে বজলু আসলে ভারতে পালিয়েছে, এমন সময় কি না মাঝরাতে ওকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলছে বজলু শহরে ফিরে এসেছে!

'রাজু, তুই কি নিশ্চিত?' রাজুর উত্তেজনা বাশারের ভেতরেও স্থানান্তরিত হতে শুরু করেছে। সে নিজেও একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে জানতে চাইল।

'আমি শতভাগ নিশ্চিত, বন্ধু,' কথাটা বলেই উত্তেজনার চোটে সে আর বসে থাকতে পারল না, দাঁড়িয়ে গেল। 'দোস্ত, আমাদের কিছু একটা করতে হবে,' বলে সে টেবিলের ওপরে ছোটো একটা চাঁটি মারল। 'করতেই হবে।'

'শান্ত হ, রাজু, পাগলামি করিস না,' রাজুর পাগলামির ইতিহাস বাশারের বেশ ভালোই জানা আছে। আর ওর পাগলামিকে বেশি লাই দিলে কী ঘটবে সেটাও বেশ ভালোই জানা আছে ওর। 'আগে বল, তুই জানলি কীভাবে?'

'বাশার, বোকার মতো প্রশ্ন করিস না তো!' রাজুকে দেখে মনে হলো তাকে উৎসাহ না দিয়ে বরং প্রশ্ন করাতে সে বাশারের ওপরে বেশ বিরক্তই হয়েছে। 'কোত্থেকে আর জানব, কানা রউফুলে খবর দিছে।'

কানা রউফুল ওদের ইনফরমারদের একজন। আন্ডারওয়ার্ল্ডের প্রায় সব মহলেই তার বিশেষ যাতায়াত আছে বিধায় ইনফরমার হিসেবে তার বেশ মূল্যায়ন আছে। কিন্তু লোকটা ধুরন্ধরের ধুরন্ধর। তার ব্যাপারে প্রচলিত আছে মানুষে দুই নৌকায় পা দিয়ে ব্যালেন্স রাখতে পারে না, আর কানা রউফুল নাকি দুই-তিন-চার আসলে কয় নৌকায় পা দিয়ে আছে সে নিজেও সঠিক জানে না। তারচেয়ে বড়ো কথা লোকটা শুধু সব নৌকায় পা দিয়েই বসে নেই, সব নৌকা থেকে সে নাকি নিজের সুবিধামতো জিনিসও তুলে নিতে পারে! মানে নিজের সুবিধা আদায় করে নিতে পারে। আর এক চোখ ছোটো হওয়াতে তাকে কানা রউফুল বলে ডাকা হয়।

'রউফুলের কথা বিশ্বাস করার উপায় কী?' বাশার খানিকটা চিন্তিত ভঙ্গিতে সিগারেট টানতে টানতে বলে উঠল। 'এতদিন কোনো খোঁজ নেই, হঠাৎ সে কইথেকে আইসা বলে উঠল বজলু সলিমপুরে!' বাশার তাকিয়ে আছে রাজুর দিকে।

'বাশার, এত কথা বুঝি না। রউফুল আমারে পাকা খবর দিয়েছে বিশেষ একটা কাজে বজলু আজ রাতে সলিমপুরে আসবে এবং সে সকালের ভেতরেই আবার সরে পড়বে এখান থেকে। কাজেই তাকে পাকড়াও করতে চাইলে আজ রাতেই সুযোগ। আমি আজ রাতেই ওর খোঁজে যেতে চাই।'

রাজুর কথাগুলো এতক্ষণ ধরে মনের ভেতরে যাচাই করার চেষ্টা করছিল বাশার কিন্তু শেষ কথাটা শুনে সে চমকে তো উঠলই, সেই সাথে মনে মনে সে খানিকটা শঙ্কিতও হয়ে উঠল। 'রাজু, তুই আগে শান্ত হ। একদম পাগলামি করিস না,' বলেই বাশার হাত বাড়িয়ে বিছানার পাশের জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। 'দেখ, আমার তোর ওপরে পূর্ণ বিশ্বাস আছে কিন্তু রউফুলের কথার কোনো ঠিক নেই। তার ওপরে রাত এখন প্রায় মাঝরাতের দিকে যেতে শুরু করেছে এমন সময় এরকম স্রেফ একটা ইনফরমারের কথার ওপরে ভিত্তি করে এরকম একটা অভিযান চালাতে গেলে–'

'তোকে কে বলেছে আমি অথরিটির সাথে কথা বলে সব প্রসিজার মেনে অপারেশন চালাতে যাবো ' বাশারের কথা শুনে রাজু হেসে উঠল। 'শোন, বাশার, গত দুইটা মাস ধরে এই হারামজাদা যথেষ্ঠ জ্বালাইছে, এবার কেসে আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না। আজ রাতেই এর একটা এসপার আর না হয় ওসপার করেই ছাড়ব। সেটা যেভাবেই হোক।'

বাশার একটু ভ্রু কুঁচকে তাকাল তার দিকে। 'রাজু, তুই নিজেও জানিস না তুই কী বলছিস। স্রেফ একটা ইনফরমারের কথার ওপরে ভিত্তি করে তুই ভয়ঙ্কর এক গ্যাংস্টারের বিরুদ্ধে আনঅথরাইজড অপারেশন চালানোর কথা বলছিস, তোর মাথা ঠিক আছে তো? যদি কোনো গড়বড় হয়–'

'কিচ্ছু হবে না। শোন, আমি পাকা পরিকল্পনা করে ফেলেছি। দেখ,' বলে সে মোবাইল বের করে সেটাতে একটা ম্যাপ বের করে দেখাল। রাজু দেখল: ওটা সলিমপুরের ডকইয়ার্ড এলাকার একটা ম্যাপ। 'শোন, রউফুলের তথ্য মতে আজ রাতে বজলু আর তার সঙ্গীরা ট্রলারে করে এইখানে আসার কথা। ওদের ভেতরে নিশ্চিত কোনো একটা জরুরি মিটিং হবে বাজার এলাকায়। ওটা সেরেই ওরা আবার সকালের ভেতরে ফিরে যাবে। আমার পরিকল্পনা হলো–'

'রাজু, তুই জানিস আমি কোনো অবস্থাতেই আনঅথরাইজড অপারেশনে যাবো তো না-ই, তোকেও যেতে দিব না। তুই কি পাগল নাকি, এভাবে–শোন, বজলুর সাথে শত্রুতাটাকে তুই অনেক বেশি পারসোনাল করে ফেলছিস। এভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে গেলে প্রফেশনাল কাজকে–'

'বাশার, তুই যাই বলিস আজ রাতে আমি যাবোই,' রাজু কোমরে দুই হাত রেখে গোঁয়ারের মতো বলে উঠল। 'তুই আমার সাথে যাবি কি না বল,' বলেই সে বেশি জোরে বলে ফেলেছে কথাগুলো বুঝতে পেরে নিজের গলা নামিয়ে নিলো। 'আচ্ছা শোন, আমরা একটু ট্রাই তো করতে পারি।'

বাশার আনমনেই মাথা নাড়ল। রাজুকে কোনোভাবেই থামাতে পারবে না এটা সে বেশ ভালোই বুঝতে পারছে। 'ঠিক আছি, আমি যাবো তোর সাথে; কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

'তোর যেকোনো শর্ত–'

'আগে শোন,' বলে বাশার আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে উঠল। 'শোন, রউফুলের কথার ওপরে আমার কোনো ভরসা নেই আমরা ওখানে যাবো। গিয়ে যদি এটা নিশ্চিত করতে পারি বজলু আছে, সাথে সাথে আমরা ফোর্সে খবর দিব,' রাজু হাত নেড়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগে বাশার বলে উঠল, 'রাজু, এটা সিরিয়াস বিষয়, তুই পাগলামি না করে আমার কথা শোন। আমি তোকে অভিযান চালাতে মানাও করছি না, আবার যাতে পুরো ব্যাপারটাতে অতিরিক্ত ঘাপলা না হয় সেটাও বুঝতে বলছি। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে; চল, চল। তৈরি হয়ে নেই।'

পরবর্তী বিশ মিনিটের ভেতরে দুজনেই তৈরি হয়ে কালো রেইনকোট পরে পুলিশ ফাঁড়ির বাইরে বেরিয়ে এলো। দুজনেই সিভিল ড্রেসে এসেছে, সাথে ব্যাজ থাকলেও দুজনের কেউই এমনকি রেজিস্টার্ড ফায়ারআর্মসও নেয়নি। এটাও রাজুরই বুদ্ধি।

বাইরে বেরিয়ে এসে জিপ চালু করে টানা দশ মিনিটের মতো গাড়ি চালিয়ে চলে এলো ডক-ইয়ার্ড এলাকায়। বাজারের কাছাকাছি আসতেই বাশারের হাত চেপে ধরল রাজু। 'এইখানেই রাখ। বাকিটা পথ আমরা হেঁটে যাবো।'

'তোর ইনফরমার কই?' জিপটাকে সাইড করতে করতে বাশার প্রশ্ন করল।

'ওই যে,' টিপ টিপ বৃষ্টির ভেতরে বাজারের একপাশের কোনায় একটা ঘোলা লাইটের আলোতে এতটা ছাপড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আছে কম্বলের মতো কিছু একটা মুড়ি দিয়ে এক লোক। দূর থেকে ঠিক কে, সেটা পরিষ্কার বোঝা না গেলেও মোটামুটি এটা বোঝা যাচ্ছে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। 'জলদি চল।'

ওরা জিপ থেকে নেমে অনুভব করল বৃষ্টির বেগ বেশ বেড়েছে, এখন আর এটাকে টিপ টিপ বৃষ্টির পর্যায়ে ফেলা যাবে না কোনোভাবেই। তবে মুষলধারে বৃষ্টি বলারও উপায় নেই। রেইনকোটের হুডটা ভালোভাবে বসিয়ে খানিকটা এগোতেই দেখতে পেল ছোটোখাটো রউফুল চাদর মুড়ি দিয়ে ঝুপড়ির নিচে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছে। 'রফু,' অনুচ্চ স্বরে ডেকে উঠল। রাজুর ডাক শুনে রউফুল ওরফে রফু এমনভাবে ফিরে তাকাল যেন মনে হলো কোনো কুকুরকে শিস দিয়ে ডাকলে যেভাবে চট করে মাথা ফেরায় অনেকটা যেন সেভাবে।

'খবর কী বল,' রাজু রউফুলের কাছাকাছি গিয়ে একবার চট করে চারপাশে দেখে নিলো।

'আরে ওস্তাদেরা, আপনেরা দেরি করলাইন কেরে?' রউফুলও আশপাশে সতর্ক নজর বোলাচ্ছে।

'রফু, কথা কম বকুল, বজলু আসছে?' রাজুর গলায় অস্থিরতা। বাশার দেখল আনমনেই সে একবার কোমরে রাখা পিস্তলে হাত বুলিয়ে নিলো।

'শশশ,' রউফুল, আপনাদের ওদেরকে চুপ থাকতে বলেই চট করে ঝুপড়ি থেকে নেমে গেল। 'আমার লগে আইয়ুন।'

রাজু একবার বাশারের দিকে ফিরে দেখল। বাশার কিছু বলতে গিয়েও স্রেফ একবার কাঁধ ঝাঁকাল। দুজনেই রউফুলের পিছু নিয়ে সরু একটা গলির মতো জায়গায় চলে এলো। চারপাশে বাজারের ছোটো ছোটো দোকানঘর।

'ওস্তাদ, মাফ কইরা দেন,' রউফুলের গলায় অস্থিরতা।

'মানে কী?' রাজু প্রায় ধমকে উঠতে গিয়েও গলা নামিয়ে নিলো। একহাতে রউফুলের চাদর চেপে ধরে হালকা-পাতলা রউফুলকে একটানে নিজের কাছে নিয়ে এলো। 'রাজু, শান্ত হ,' বাশার সতর্ক করে দিলো রাজুকে।

রাজু বাশারের দিকে ফিরেও দেখল না। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কানা রউফুলের চোখের দিকে। 'মানে কী বলত, রফু। তুই কি এই মাঝরাতে আমাদেরকে ডেকে নিয়ে এসে এখন উলটাপালটা কথা বলছিস। এর মানে কী? বজলু আসছে কি আসে নাই? ঠিক কইরা কথা বলবি,' বলেই সে কোমর থেকে পিস্তল বের করে রউফুলের কপালের ওপরে চেপে ধরল। 'হয় আজ রাতে বজলুরে ধরব, আর না হয় তোরে মারব। মারতে আমার আইজরাতে হবেই।'

'ওস্তাদ, এট্টু আগে ওইহানে একটা টলার ভইরা কয়েকজন আইছে, হের ভিতরে বজলু আছে কি না কইবার পারি না।'

'ওরা গেছে কোনোদিকে?' রাজু প্রশ্ন করার আগেই বাশার জানতে চাইল।

'হেরা ওই দোতলায় গুদামের ভিতরে গেছে।'

'রউফুল, তুই কি নিশ্চিত ওরা ওইদিকেই গেছে?' আবারও বাশার জানতে চাইল। আনমনেই ডক-ইয়ার্ডটা একবার দেখে নিয়ে রাস্তার অন্যপাশে গুদামটা দেখে নিলো বাশার। রউফুলের কথায় যুক্তি আছে। যদি বজলু বা তার সঙ্গীরা এসেই থাকে তবে ওদিকেই যাবার কথা হিসেবে।

'ওস্তাদ, আমি নিশ্চিত কইতে পারি না হেগো ভিতরে বজলু আছে কি না, তয় হেরা ওইদিকেই গেছে আর যারা ওইদিকে গেছে কেউই বাইর হয় নাই।'

'রাজু, ওরে ছাড়, জলদি চল, যদি বজলু এসেই থাকে চেক করতে হবে,' বাশার নাড়া দিলো রাজুকে। রাজু এখনও রউফুলের দিকেই তাকিয়ে আছে। চট করে সে পিস্তলটা নামিয়ে নিলো। 'রফু, তুই এইখানেই থাক। আমরা আসতেছি। চল।'

'কি মনে হয়, রউফুলের কথা ঠিক আছে?' সন্তর্পণে গুদামের দিকে এগোতে এগোতে পিস্তলটাকে একবার চেক করে নিচ্ছে রাজু। সেই ফাঁকেই সে জানতে চাইল।

'যুক্তি তো বলে ঠিকই আছে। কারণ,' এইটুকু বলে বাশার একবার ডকের দিকে দেখাল। 'এখানে বেশিরভাগই মাছ ধরার ট্রলার অথবা নৌকা অথবা শ্যালো নৌকা। এই ট্রলারটা এখানকার না, এইটা নিশ্চিত, আর যদি ট্রলারে করে কেউ এসেই থাকে তবে এটাও ধরে নেওয়া যায় যে, গোপন মিটিংয়ের ইচ্ছে থাকলে গুদামগুলোর দিকে যেতেই পারে। আরেকটা কথা,' বলে বাশার থেমে গিয়ে এবার নিজের পিস্তল বের করে আনল। বৃষ্টির গতি আরও বাড়তে শুরু করেছে। 'রউফুল যে গুদামগুলোর দিকে দেখিয়েছে ওগুলোর মালিকানা কিংবা দখল কিন্তু বজলুরই।'

'ঠিক আছে, জলদি চল। বজলু যদি আইসা থাকে,' নিজের পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে, মাথা থেকে রেইনকোটের হুডটা সরিয়ে দিলো রাজু।

'এক মিনিট। তোর কথা মনে আছে তো? যদি আমরা একবার নিশ্চিত হতে পারি যে বজলু এখানে এসেছে তবে সাথে সাথে আমরা অথরিটিকে খবর দিব, মনে আছে?'

'মনে আছে, এখন চল,' রাজু এগিয়ে যেতেই তাকে অনুসরণ করে বাশার।

দুজনে মিলে সরু গলিটা থেকে মূল রাস্তায় বেরিয়ে এসে সেটা সাবধানে পার হয়ে ঢুকে পড়ল গুদাম এলাকায়। সামনে বেশ অনেকটা ফাঁকা জায়গা আর সেটা পার হলেই বেশ কয়েকটা গুদামঘর। 'কোনো মানুষের তো ছায়াও দেখি না,' বিড়বিড় করে বলে উঠল রাজু।

'মানুষ বাদ দে, কোথাও তো একটু আলোও দেখি না,' বাশার মনোযোগের সাথে সামনে জরিপ করার চেষ্টা করছে। 'ওই যে,' রাজু চট করে বলে উঠল। 'ওইদিকে আলো দেখা যায়। সম্ভবত গুদামের ভেতরে আরও জ্বলছে।'

'খুব সাবধানে, পাহারাদার থাকতে পারে,' দুজনেই যতটা সম্ভব সাবধানে দৌড়াতে দৌড়াতে ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে এলো। একটা বাঁকের অন্যপাশে আলো দেখা যাচ্ছে। 'তুই আগা, আমি তোকে কভার করছি,' রাজুকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলে উঠল বাশার। সামান্য মাথা নেড়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল রাজু, তাকে কভার করে সাবধানে অনুসরণ করে দুজনেই চলে এলো আলো জ্বলতে থাকা গুদামের একটা জানালার দুইপাশে। দুজনেই খুব সাবধানে পজিশন নিলো জানালার দুপাশে। ভেতর থেকে হালকা কথার শব্দ ভেসে আসছে। বাশারকে উদ্দেশ্য করে একবার মাথা নেড়ে খুব সাবধানে ভেতরের দিকে উঁকি দিলো রাজু। মাথাটাকে সামান্য ঘুরিয়ে ভেতরে দেখে নিতেই তার মুখে সামান্য হাসি ফুটে উঠল। আনমনেই সে বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'বজলু।'

'তুই নিশ্চিত?' প্রায় ফিস ফিস করে জানতে চাইল বাশার। রাজু কিছু বলার আগেই ওদের সামনে থেকে কেউ একজন আচমকাই ধমকে উঠল। 'এই তোরা কেডা রে?'

রাজু আর বাশার দুজনেই চট করে সামনে ফিরে তাকাল। ছাতা হাতে দুজন দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারের ভেতরে। একজনের হাতে একটা সিগারেট। রাজু আর বাশার সাথে সাথে যেন জমে গেল, লোকটা আরেক পা এগিয়ে এলো ওদের দিকে। 'কেডা রে তোরা?' লোকদুজনও যে ওদেরকে দেকে চমকে উঠেছে কোনো সন্দেহ নেই। সবার আগে বাশারই নড়ে উঠল, নিজের পিস্তলটাকে উঠিয়ে আনছে। সামনের দুজনের একজন পিস্তল তুলল। বাশার আর লোকটা দুজনেই গুলি করল ঠিক একই সাথে, একই সময়ে। দুটো গুলির শব্দ ঠিক একইসাথে ফুটে ওঠাতে মনে হলো যেন একটাই গুলি হলো, কিন্তু শব্দটা হলো ডিনামাইট বিস্ফোরণের মতো। নিস্তব্ধ রাতের নীরবতা খান খান হয়ে গেল গুলির শব্দে। বাশার দেখল ওর গুলি মিলি মাইক্রো সেকেন্ড আগে লাগাতে লোকটা পড়ে গেল। লোকটার গুলি ওদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। লোকটার সাথী অস্ত্র বের করে আনছে, 'বাশার, সাবধান,' বলেই রাজু ওর দিকে লাফ দিয়ে দুজনেই গড়িয়ে পড়ে গেল। শোওয়া অবস্থাতেই রাজু গুলি করল অপর লোকটাকে।

'সর্বনাশ, ওরা টের পেয়ে গেছে। বজলু পালাবে, জলদি খবর দিতে হবে ফোর্সে,' বাশার আপনাতেই বলে উঠল।

'সময় নেই,' রাজুর কথা শেষ হবার আগেই ধুপধাপ গুলির শব্দ হলো, ওদের আশপাশে বৃষ্টির ভেতরে কাদা ছিটালো গুলি। বাশার উঁকি দিয়ে দেখল গুদামের ভেতরে হই-হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে। 'দোস্ত, ওরা পালাবে,' বাশার কোনোমতে বলে উঠল।

'আমি সেটা হতে দিচ্ছি না,' বলেই রাজু গুদামের দরজার দিকে গুলি করল ওটা দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকা একজন গুলির শব্দের চেয়ে জোরে চিৎকার করে পড়ে গেল। 'শোন, একটা বুদ্ধি এসেছে,' রাজু উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে উঠল। কিন্তু দাঁড়ানোর সাথে সাথে গুলি হতেই আবারও বসে পড়ল। বাশার গুলি করে কভার দিলো ওকে।

'শোন, ওরা টের পেয়ে গেছে ঠিক আছে কিন্তু ওরাও ফাঁদে পড়ে গেছে। এই গুদাম থেকে বের হবার দুটো রাস্তা। এক কাজ করবো। আমি এগোবো, তুই আমাকে কভার দিবি। আমি গুদামের দরজাটা বাইরে থেকে আটকে দিয়ে অপরপাশের রাস্তায় চলে যাবো। তুই এদিক থেকে দরজাটা কভার করবি, আর আমি ওদিক থেকে। কেউ বেরোলেই আমরা গুলি করবো। আর আমি এর ভেতরে ফোর্সে খবর দিয়ে দিবো। আজ কোনোমতেই পালাতে দিবো না শালাদের।'

'রাজু, শোন, অনেক বেশি ঝুঁকি

'কভার কর,' বাশারের কথা শোনার আগেই রাজু ওকে গুলি চালানোর নির্দেশ দিলো। বাশার গুদামের দরজা লক্ষ্য করে গুলি করল কয়েক রাউন্ড। এই ফাঁকে

রাজু দৌড়াতে শুরু করল। 'এক-দুই-তিন,' মনে মনে গুনতে গুনতে আধো অন্ধকারের ভেতরে আরও দুই রাউন্ড গুলি করেই বসে পড়ল বাশার। বসেই আবারও গুনতে শুরু করল। 'এক, দুই, তিন ' দশ পর্যন্ত গোনা হতেই আবারও উঠে দাঁড়াল সে, আশা করছে রাজু এতক্ষণে পৌঁছে গেছে। কিন্তু ও উঠে দাঁড়ানোর সাথে সাথেই গুলি এসে লাগল। ওর গায়ে না লাগলেও ঠিক পাশেই দেওয়ালে লাগল। বাশার দেখল গুদামের জানালা দিয়ে কেউ একজন গুলি করছে। নিশ্চিত রাজুর গায়ে গুলি লাগবে। আড়ালের তোয়াক্কা না করে বাশার গুলি চালিয়ে গেল। রাউন্ড শেষ হতেই বসে পড়তে যাবে আবারও গুলি হলো, দেওয়ালের একটা ইটের চলটা এসে ডান চোখের ওপরে আঘাত করতেই তীব্র চিৎকার করে বসে পড়ল ও মাটিতে। চোখে হাত দিয়ে চেপে ধরলেও পরিষ্কার বুঝতে পারছে আহত জায়গাটা থেকে রক্ত বেরিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছে চোখ। ব্যথার চোটে মনে হলো পাগল হয়ে যাবে।

কিন্তু ব্যথার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ গুলি ভরা। ওপাশ থেকে গুলির শব্দ থেমে গেল কিন্তু ধপাধপ কারও এগিয়ে আসার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বাশার চোখ ছেড়ে দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই অন্ধের মতো পকেট থেকে ক্লিপ বের করে পিস্তলে ভরার চেষ্টা করতে লাগল। বৃষ্টি আর রক্তে পিচ্ছিল হাত থেকে বারবার পিছলে যাচ্ছে ক্লিপটা। ওদিকে এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ, বাশার নিজের অজান্তেই গুলি ভরতে ভরতে পেছাতে শুরু করছে, পেছনের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে ওর। গুলি ভরা হতেই বৃষ্টি আর রক্তে ভেজা চোখ খুলে সোজা পিস্তল তুলল সামনের দিকে। আড়ালের অন্যপাশ থেকে এগিয়ে আসতে থাকা ছায়ামূর্তিটা দেখা মাত্রই গুলি করল ও। একবার দুবার তিনবার।

মূর্তিটা থেমে গেছে, বাশার পিস্তল তাক করেই সোজা হলো একহাতে চোখের ওপর থেকে পানি আর রক্ত ঝাপটা দিয়ে সরাতেই মুখ হাঁ হয়ে গেল ওর। ঠিক ওর মতোই ততধিক অবাক দৃষ্টিতে হাঁ করা মুখে অবিশ্বাসের সাথে ওর দিকে তাকিয়ে আছে রাজু। তার নীল রেইনকোটের বুকটা ভেসে যাচ্ছে রক্তে। বাশারের তিনটে গুলিই তার বুক বিদীর্ণ করে গেছে। কাঁপতে কাঁপতে নিজের পিস্তল ফেলে রাজুকে ধরে ফেলল বাশার। বুক চিরে বেরিয়ে এলো বীভৎস চিৎকার

মোবাইলের ভাইব্রেশনের শব্দে ডায়েরির পাতা থেকে চোখ তুলে মোবাইলের দিকে তাকাল বাশার। সেই সাথে ডায়েরির পাতার বীভৎস অতীত থেকে ফিরে এলো বর্তমানে। মোবাইল স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলা রিফাতের কল। চোখের পাপড়ি ফেলতেই একফোঁটা পানি টুপ করে গড়িয়ে পড়ল মোবাইলের স্ক্রিনের ওপরে। ডায়েরির পাতা বন্ধ করে কলটা রিসিভ করল ও। 'হ্যালো।'

'কী ব্যাপার, এখনও ঘুমাওনি?' ওপাশ থেকে আর্কিয়োলজিস্ট রিফাত মজুমদারের গলা ভেসে এলো। রিফাতের প্রশ্নের জবাবে বাশারের নিস্তব্ধতার জবাবে রিফাত উদ্বিগ্ন সুরে জানতে চাইল। 'কী ব্যাপার, কোনো সমস্যা?'

বাশার তখনও চুপ। ওপাশ থেকে রিফাতই আবার কথা বলে উঠল। 'তুমি আবার পুরনো ডায়েরি পড়ছিলে?' এবার সে খানিকটা ঝাঁঝাল গলায় বলে উঠল। 'বাশার, তোমাকে না বলেছি পুরনো অতীত রোমন্থন করার কোনো প্রয়োজন নেই,' বলে সে একটু থামল। এবার আবারও শান্ত গলায় বলে উঠল। 'বাশার, অতীতে যা হয়েছে তো হয়েছেই। রাজুর মৃত্যুতে তোমার কি আদৌ প্রকৃত কোনো দোষ ছিল–এটা নিয়ে আমরা বহুবার আলোচনা করেছি। এমনকি ডিপার্টমেন্টও তোমাকে ক্লিন স্লেট দিয়েছে অবশেষে। তুমি সম্প্রতি দুর্দান্ত একটা কেস সলভ করেছ। তোমার প্রমোশন হয়েছে, নতুন ফোর্সে জয়েন করছ। সবকিছুই কি আগের চেয়ে বেটার হয়নি, বলো?'

ফোনের এপাশে বাশার বড়ো করে একবার নিশ্বাস নিলো। 'সবকিছুর পরও বন্ধু তো আমার আর ফিরে আসেনি, আর তাকে আমি নিজ হাতে খুন করেছিলাম।'

'বাশার,' ওপাশে আবারও রিফাতের গলা চড়ে গেল। 'শোনো, এবার কিন্তু সত্যি সত্যি আমি তোমাকে কাউন্সিলিংয়ের জন্যে পাঠাবো। যদি আমার কথা না শোনো, তবে আমি তোমার ডিপার্টমেন্টের বস আমজাদ আনোয়ারকে জানাবো।'

বাশার হেসে উঠল। 'হা-হা, এত কষ্ট করতে হবে না। আমার কথা বাদ দাও, তোমার কী অবস্থা? টুইন কালী মন্দিরের রেনোভেশন কেমন চলছে?'

'দারুণ,' ওপাশে রিফাতের গলায় খুশির আমেজ। 'আমি দারুণ একটা টিম পেয়েছি। পুরো টিম খুব ভালো কাজ দেখাচ্ছে। তবে এখানে অনেক ব্যাপার আছে। বিশেষ করে ঠগীদের অরিজিনের কিছু ক্লু নিয়ে খুব অদ্ভুত আর মিস্টিরিয়াস ব্যাপার আছে . আচ্ছা আমি এগুলো পরে বিস্তারিত বলব তোমাকে। আগে বলো তোমার প্রস্তুতি কেমন, কাল নতুন ফোর্সে জয়েন করছ। তাও আবার স্পেশাল উইংয়ে। কেমন লাগছে?'

'হা-হা। এ এমন কিছু না। আমি ঠিক আছি,' বাশার ডায়েরিটা টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিলো। 'কাল সকাল সকাল চলে যাবো। দেখি কী কেস অপেক্ষা করছে।'

'বেস্ট অব লাক ডিয়ার, তুমি অনেক ভালো করবে, আমার বিলিভ। এখন ঘুমিয়ে যাও, গেস্ট হাউজের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা সব ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। তুমিও ঘুমিয়ে যাও,' রিফাতের কল কেটে দিয়ে মনে মনে বাশার বলে উঠল। *হ্যাঁ, কালকের দিনটা বড়োই বটে।*

কিন্তু কোনো ধারণাই নেই কালকের দিনটা ঠিক কতটা বড়ো হতে যাচ্ছে তার জন্যে।

দীর্ঘ এবং কঠিন একটা দিন অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

অধ্যায় পাঁচ

সময়: ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দ

ভাওয়াল ও মহেশ্বরদী পরগনার মধ্যবর্তী এলাকা

ব্রহ্মপুত্র ও শীতলক্ষ্যার মোহনা

অপেক্ষার প্রহরটা রীতিমতো দীর্ঘ মনে হচ্ছে।

'তুই নাকি পানিতে একেবারে পাগলের মতো লাফ দিছিলি?' ছোটো একটা চামড়ার বটুয়া থেকে হাতের আঙুলের ডগায় গুঁড়ো তামাক তুলে নিতে নিতে বলে উঠল ধোবল। 'কথা কি সত্যি নাকি চাপা মারতাছে সবাই?' আস্তে করে তামাকের একটা বল বানিয়ে সেটাকে জিভের নিচে ঠেলে দিতে দিতে বলে উঠল সে। এমন ভাব করছে যেন প্রশ্নটা করে মাসুমকে ভীষণভাবে পরখ করার চেষ্টা চালাচ্ছে সে।

সময়টা আসন্ন জোয়ারের সময় তাই তাদের নৌকার নিচে পানিতে দুলুনির পরিমাণ মারাত্মক বেশি। দুলুনির চোটে সবাই এমনভাবে নড়ছে যেন হাতির পিঠে সওয়ার হয়ে আছে। ভীষণ দুলুনির চোটে নড়তে থাকা নৌকার পাটাতনে নিজের শরীরের ভারসাম্য ঠিক করে বিশেষভাবে প্রক্রিয়াজাত করা শুকনো বক পাতা দিয়ে মোড়ানো ছইয়ের ওপরে হেলান দিলো মাসুম। এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল সে ধোবলের দিকে। ধোবলের মুখের এক পাশে অন্তত কয়েকশো আঁচড়ের দাগের মতো দাগ, চোখ মুখ এমনভাবে ফুলে আছে যেন ভয়ঙ্কর মারামারি করে এসেছে। ক্ষতগুলো অবশ্য মারামারিরই তবে সেটা মানুষের সাথে না, ঘড়িয়ালের সাথে। ধোবলের ক্ষতগুলো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু মাসুমের ক্ষত বাইরে থেকে দেখা না গেলেও তার অবস্থাও বেশি সুবিধার না।

ধোবলকে তামাক নিতে দেখে তার হাত থেকে চামড়ার বটুয়াটা ছিনিয়ে নিলো মাসুম। তারপর নিজেও খানিকটা তামাক মুখে পুরে তার দিকে ফিরে বলে উঠল। 'তোকে কে কইল?'

মহা আনন্দের সাথে তামাক চিবুতে চিবুতে ধোবল আড়ষ্ট মুখে বলে উঠল, 'ওই আরকি সবাই বলাবলি করতেছিল, আমি পানির তলে যাইতেই তুই নাকি পাগলের মতো ঝাঁপ দিছোস পানিতে,' বলে সে পিক করে থুতু ফেলল পানিতে। 'আমি অবশ্য পুরাটা বিশ্বাস করি নাই,' তার চোখে মুখে একটা দুষ্টামির হাসি ফুটে উঠতে শুরু করেছে।

'আহারে, তোরে বাঁচানোর লাইগা আমার ঠেকছে?' বলে বটুয়াটা ধোবলের দিকে ছুড়ে দিতে দিতে মাসুমও মৃদু হেসে উঠল। 'আমি তো লাফ দিছিলাম গারুদ মাছটা যাতে হারায়া না যায়। মাছটা গুরুত্বপূর্ণ, তুই কেডা?' কথাটা বলে আধো অন্ধকারের ভেতরে তাকায়া দেখল ধোবলের মুখটা অন্ধকারের ভেতরে আরও একটু অন্ধকার হয়ে গেছে। কৃত্রিম একটা রাগের ভাব ছড়িয়ে পড়েছে তার মুখ জুড়ে। 'শালা, নিজে তামাক আনোস না, খালি আমারটা খাস। আর বড়ো বড়ো কথা কস। তোর কোনো দরকার ছিল ওমনে ঝাঁপায়া পড়ার?' রাগের সাথে বটুয়াটা কোমরে রাখতে রাখতে সে বলে উঠল। 'আমি তো গেছিলাম, তুইও গেছিলি আরেকটু হইলে, গাধা কোথাকার?'

'আইচ্ছা আমি গাধা!' এবার মাসুম খানিকটা এগিয়ে গেল ধোবলের দিকে। 'আমি গাধা হইলে তুই কি, তুই তো একটা গোঁয়ারের একশেষ,' বলে রাগের সাথে মুখ থেকে তামাক পানিতে ফেলে দিলো মাসুম। 'পচা তামাক আনছস আবার বড়ো বড়ো কথা। আমি গাধা হইলে তুই একটা ছাগল। একরোখা একটা ছাগল।'

'অ্যাই, তোরা জামাই বউয়ের মতন ঝগড়া বন্ধ করবি?' নৌকার ছইয়ের ভেতর থেকে একটা গলা শাসনের সুরে ধমকে উঠল। 'এমনেই আছি আমরা ঝামেলার মধ্যে তার ওপরে তোরা কুত্তা-বিলাইয়ের মতন ঝগড়া করতাছোস।'

'খাড়া,' মাসুম ওদের তৃতীয় সঙ্গী এবং বন্ধু বরখার দিকে ফিরে অস্বাভাবিক রাগের সাথে একটা আঙুল তুলল। 'দেখ, আমগো কথার ভিতরে কথা কবি না, আমরা সিদ্ধান্তে আইত পারতাছি না কেডা গাধা আর ছাগল; আর তুই এর মধ্যে কুত্তা-বিলাই টাইন্না আনলি ক্যান?'

'ঠিকই আছে, চেহারা যা হইছে একেকজনের, কুত্তা-বিলাই-ছাগল এইগুলাই কইতে অইব? শালারা পাগলের দল মাঝরাইতে গেছিল পানির তলে মরতে। তগো মরাই দরকার আছিল।'

'আর তুমি তো যাওই নাই আমগো লগে। শালা, খেতা মুড়ি দিয়া ঘুমাইতাছিলা। কাপুরুষ কোনোহানকার,' এবার ধোবল রাগের সাথে বলে উঠল। সমর্থনের আশায় সে ফিরে তাকাল মাসুমের দিকে। মাসুমও তার দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল। 'একদম ঠিক, তুমি শালা আমগোরে কথা কও কোনো সাহসে, ভীতু, ঠিক?' শেষ শব্দটা উচ্চারণ করল সে ধোবলের দিকে তাকিয়ে। তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ধোবলও মাথা নাড়ল। 'এক্করে ঠিক। তুই শালা একটা ভীতুর ডিম।'

'খুব বাহাদুর তোমরা, শেষে যখন ঘড়িয়ালটা তোমার,' মাসুমকে নির্দেশ করে সে বলে উঠল। 'কল্লাটা চিবাইতে আসতাছিল আমি কোঁচ না মারলে তো গেছিলা,'

বলে সে ঝামটা দিয়ে আরও জোরের সাথে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই ভারী একটা গলা নৌকার ছইয়ের অন্যপাশ থেকে ধমকে উঠল।

'এই কী শুরু করছ তোমরা? এইসব পারিবারিক ঝগড়া বাদ দিয় চাইরপাশে খেয়াল রাখো,' ভারী গলার ধমকে চুপ হয়ে গেল তিনজনই। যদিও তিনজনেরই মুখে চাপা হাসি। 'আর পারলে শব্দ কম করো। চাইরপাশে শত্রু বিদ্যমান, এর ভিতরে এমন চিল্লাপাল্লা বাদ দিয়া নজরে রাখ কোনো আলো চোহে পড়ে কি না। খাঁ সাহেবের তো কোনো নিশানাই দেখি না।'

'আমরা ঠিক জায়গায় আছি তো?' খুনসুটি আর চাপা হাসি সামলে মাসুম নিজের গলার স্বর যতটা সম্ভব ভারী করে বলে উঠল।

'এইখানে আসো,' ছইয়ের ওপাশ থেকে ভারী গলার ধমক শুনে একটু ঘাবড়েই গেল মাসুম। সে ধোবল আর বরখার দিকে ফিরে চোখে ইশারা করল, দুজনেই কাঁধ ঝাঁকিয়ে এমন ভাব করল, *এইবার তুমি সামলাও*।

'কী অইল, আইতে কইলাম না?' মাসুম নড়ছে না দেখে ছইয়ের ওপাশে থাকা মানুষটা চোখের সামনে ছোটো সলতের বাতিটা তুলে বলে উঠল, 'আরে বিয়াক্কেল, ধমকাইতে ডাকতাছি না। আইতে কইতাছি কামে।'

'আরে আমি তো আসতে আছিলাম,' বলে ধোবল আর বরখার দিকে কপট বাহাদুরির ভঙ্গিতে হাত নেড়ে সে দুলুনি সামলে ছইয়ের অন্যপাশে যাবার জন্যে রওনা দিলো, আর নিজেদের দিকে চোখাচোখি করতে করতে নিঃশব্দ হাসিতে ফেটে পড়ল ধোবল আর বরখা।

মাসুম ছইয়ের নিচ দিয়ে অন্যপাশে আসতেই দেখতে পেল, হাতে ছোটো আলোর নিশানাটা নিয়ে সামনের অন্ধকারের ভেতরে মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছে গাজীদের লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান বলরাম। বিশালদেহী বলরামের পায়ে ধুতি গায়ে বুক খোলা ফতুয়া, গলা মুখে গামছা প্যাঁচানো। নিজের বলশালী এক হাতে সলতের বাতি ধরে অন্যটা মুখের কাছে নিয়ে রেখেছে সে। মাসুম কাছাকাছি গেলেও সে ফিরে তাকাল না, বরং আরও মনোযোগের সাথে সামনে দেখতে দেখতে নিজের খালি হাতটা তুলে ইশারা করল। 'আমার এলাকা আর নদীপথ আমি হাতের তালুর চেয়ে ভালো চিনি। কিন্তু পরিচিত পানি ছাইড়া আসছি আমার বিশ্বাস আরও বিশ মাইল পিছনে,' সে সামনে দেখতে দেখতেই কথাগুলো বলে চলেছে। 'যদি আমার হিসাব ঠিক থাইকা থাকে, তবে আমরা এখন আছি ব্রহ্মপুত্র আর শীতলক্ষ্যার মাঝামাঝি জায়গাতে এইখানে পশ্চিম থেইকা,' বলে সে হাতের ইশারায় দেখাল একদিকে। মাসুম অনুমান করল ওটা পশ্চিম দিকই হবে, তবে অন্ধকারের ভেতরে ঠিক ঠাওর করতে পারল না। 'খাঁ সাহেবগোর

আসার কথা। কারণ তাগো এলাকা ওইদিকেই। আর এই সামনে আগায় যাইতে থাকলে মোহনা পার হইয়া কিশোরগঞ্জের আর জঙ্গলমহালের দিকে যাবার কথা।'

'বুঝলেন কীভাবে, জায়গামতো আছি, নিশানা কী?' বলে অন্ধকারের ভেতরে দেখে নিয়ে সে আকাশের দিকে তাকাল একবার। এসব এলাকায় নদীপথে চলার উপায় আছে তিনটে; প্রথমত, হয় চেনাজানা এলাকা হতে হবে। অন্তত দলে এমন একজন থাকতে হবে যে এলাকার চৌহদ্দি চিনে। তা না হলে আকাশের তারা, আর না হলে পাড়ের নিশানা। কিন্তু মাসুম এই অন্ধকারের ভেতরে কোনোটাই ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছে না। এমনকি আকাশও মেঘে ঢেকে আছে, তারার কোনো লক্ষণ নেই। মনে মনে সে খানিকটা শঙ্কিতই বোধ করল। ওরা ঠিক জায়গায় আছে তো? আজকের এই সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওদের জন্যে। শুধু ওদের জন্যে না, বাঙাল মুল্লুক এবং বারো ভূঁইয়া সমাজ সবার জন্যেই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। এর পেছনে বেশ কিছু কারণ আছে। পরিস্থিতি তো আগে থেকে টান টান হয়েই ছিল। এরপরে ওইদিন ওরা মাছ ধরে ফেরার সময়ে খবর পায় ওদের জন্যে ঈশা খাঁর রাজধানী থেকে সমন এসেছে খাঁ সাহের ওদের সাথে দেখা করতে চায়। সমনটা পেয়ে মাসুম খুশি হয়ে উঠেছিল কারণ ও মনে মনে ভেবেছিলঃ অবশেষে এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছে কিন্তু ওরা আশা করছিল হয় ওদেরকে যেতে হবে তার সাথে দেখা করতে অথবা খাঁ সাহেব নিজে আসবে ভাওয়ালে; কিন্তু দুটোর কোনোটাই ঠিক হবার আগে খবর আসে খাঁ সাহেব ওদেরকে দেখা করতে বলেছে ভিন্ন এক জায়গায়। সে নিজেও ভাওয়ালে আসবে না, আবার ওদেরকেও ডেকে পাঠানো হয়নি। বরং তারা মাঝামাঝি এলাকায় দেখা করবে। ঈশা খাঁর পাঠানো বার্তায় এটাও লেখা ছিল মাসুম যেন সাথে করে অবশ্যই ওর বন্ধু এবং সহযোদ্ধা ধোবল আর বরখাকে নিয়ে আসে। সেই সাথে আরও উল্লেখ করা ছিল ওদের এই বিশেষ জায়গায় দেখা করার পেছনে নাকি আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। ওরা যেন দেরি না করে, পারলে সময়ের আগেই পৌঁছায় এবং ওদের যাত্রা যেন অবশ্যই বেশ সঙ্গোপণে সম্পন্ন হয়।

ঈশা খাঁর পাঠানো বার্তাটা মাসুম বারবার করে পড়েছে। বার্তার ভেতরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা তো ছিল সেই সাথে এটাও তাকে বেশ অবাক করেছে যে খাঁ সাহেব এমনকিছু কথা বলেছে যেগুলো সাধারণ সে বলে না এবং সেই কথাগুলো শুধু একবার না বারবার করে বলা হয়েছে। এসব বিষয়ে এত বেশি জোর দেওয়ার কারণ কি ঠিক ভেবে বের করতে পারেনি মাসুম।

সে একজন যোদ্ধা, একেবারে জন্মগত ভাবেই সে যোদ্ধা। মাসুম মনে করে তার রক্তের ভেতরেই যুদ্ধের বীজ নিয়ে জন্ম নিয়েছে, যুদ্ধ করতে করতেই একদিন মারা যাবে সে। আর যদি সেটা সে করতে পারে, তবে তার জন্যে এটাই হবে সর্বোত্তম জীবন। আর যদি খাঁ সাহেবের জন্যে সে মরতে পারে, নিজের মাতৃভূমির

জন্যে মরতে পারে, বন্ধুত্বের জন্যে মরতে পারে তবে এরচেয়ে বড়ো পাওয়া তার জন্যে আর কিছু হতে পারে না। তবে একজন যোদ্ধা হিসেবে মাসুম জানে–যুদ্ধের সাথে রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সে নিজে রাজনীতি খুব বেশি বোঝে না, খুব বেশি বোঝার চেষ্টাও কখনও সেভাবে করেনি। কিন্তু সে এটা বোঝে যে যুদ্ধের সাথে রাজনীতির একে-অপরের সাথে জড়িয়ে থাকে। একদিকে পুরো বাঙাল মুল্লুক উত্তপ্ত হয়ে ওঠা, তার ওপরে আবার ওর নিজের নির্বাসন, এখন আবার কত্রাবো আক্রমণের খবর–সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটাকে সে ঠিক একটা নির্দিষ্ট চিত্রে দাঁড় করাতে পারছে না। আর তাই একটা পর্যায়ে সে ভাবনা ছেড়ে দিয়ে বরং নিজের কাজে মনোযোগ দেয়। নিজের পরিবার থেকে সে দূরে আছে বেশ কিছুদিন, আর নিজের সম্বল হিসেবে প্রিয় ড্যাগার, তরবারি আর নিজের বন্ধু আর নিজের দলটাকে বাদে আর কোনোকিছুরই প্রয়োজন নেই তার। যেহেতু বন্ধুদেরকে সাথে নিয়েই সে যাবে, কাজেই নিজের দলটাকে ওর মাতৃভূমিতে ফিরে যাবার নির্দেশনা দিয়ে সে নিজের পরিবারের জন্যে একটা বার্তা লিখে ওদেরকে বিদেয় দিয়ে ধোবল আর বরখাকে নিয়ে বলরামের সাথে নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা দিয়ে এসে পৌঁছেছে এই মোহনাতে। সে নিজে বাঙাল ভূমির দক্ষিণের এলাকা খুব ভালোভাবে চেনে। তার পরিবারের একটা অংশ উত্তরে হবার কারণে আর ছোটোবেলা থেকে ঘুরে বেড়ানোর কারণে ওসব এলাকাও বেশ ভালোভাবে চেনা। আর পানিরই মানুষই সে, কাজেই হাতে একটা বৈঠা থাকলে উত্তাল পানি বা ভয়ঙ্কর জলজ জীব বা পানির ডাকাত কাউকেই ভয় করে না সে। কিন্তু এই এলাকা তার সেভাবে চেনা নেই। এই কারণেই বলতে গেলে প্রায় পুরোপুরি নির্ভর করছে বলরামের উদ্দেশ্য। মাসুম নিজে খানিকটা উত্তপ্ত মস্তিষ্কের মানুষ, সেই সাথে সে প্রাণচঞ্চল, ওর বন্ধু ধোবল ওর চেয়ে আরেক কাঠি সরেস, কিন্তু বরখা সেই তুলনায় ঠান্ডা। কিন্তু বলরাম লোকটা যেন ভোরের শিশিরে ভেজা ঠান্ডা পাথরের টুকরোর মতো। তাই তাকে বেশি একটা পছন্দ করে না মাসুম, কিন্তু লোকটার ভেতরে এক ধরনের নেতাসুলভ ব্যাপার আছে যেটা বেশ আস্থা যোগায়। লোকটা গাজীদের সাম্রাজ্যের শক্তিশালী খুঁটিগুলোর একটি। আর তার কাজের দক্ষতার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। তার প্রতি মাসুমের এক ধরনের ভক্তিও আছে।

'ওই যে ওইদিকে দেহো,' মাসুমের করা প্রশ্ন কীভাবে সে এই জায়গাটা নির্দিষ্ট করেছে সেটার জবাবে সে নিজের একটা হাত তুলে অন্ধকারের ভেতরে একদিকে নির্দেশ করল। মাসুম তার দেখান নির্দেশনায় চোখ কুঁচকে তাকাল। নিজের দৃষ্টিকে যতটা সম্ভব গভীর করেও সে কিছু দেখতে পেল না পরিষ্কার। 'কই· ' কিছু দেখতে পাচ্ছে না বলতে গিয়েও আবছাভাবে পানির ওপরে ঢিপির মতো উঠে থাকা কিছু একটার হালকা ছায়া দেখতে পেল যেন। 'হুম।'

'যেইটা দেখলা ওইটা হইল কামন্তির ঢিপি, কইতে পার নদীর মধ্যে উইঠা থাকা একটা দ্বীপের মতন। কওয়া হয় ওইখানেই মোহনা শুরু হইছে। ওইটা হইল একটা নিশানা,' বলে সে আরেক দিকে দেখাল। ওইটার বিপরীতে আর যেইদিক থেইকা আসছি সেইটা হইল দক্ষিণ পশ্চিমের নদী, আর এই দিকে আরও মাইল দশেক গেলে আরেকটা গঞ্জ পড়ব। কাজেই হিসাব অনুযায়ী খাঁ সাহেবের লোকেরা ঠিক যেইখানে আমগো আসতে কইছে আমরা সেইখানেই আছি। ভুল হওনের সম্ভাবনা যে একেবারেই নাই তা না কিন্তু

'যদি ' মাসুম আগ্রহের সাথে ওদের অবস্থানগত বিষয়ে আরও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই ওদের থেকে গজ বিশেক দূরে থাকা দ্বিতীয় নৌকাটা থেকে কেউ একজন মৃদু একটা চিৎকার করে কিছু একটা বলে উঠল। জবাবে বলতে গেলে প্রায় সাথে সাথে ঘুরে গেল বলরাম, সে শিস বাজিয়ে উঠল। তার জবাবে উলটোদিক থেকে আবোরো শিসের শব্দ ভেসে এলো।

ব·রাম, নৌকার মাঝিকে কিছু নির্দেশনা দিয়ে পাটাতন থেকে নিজের তেল চকচকে বাঁশের লাঠিটা উঠিয়ে নিলো। 'দক্ষিণপুব দিক থেইকা একটা আলোর নিশানা দেখা দিছে।'

'এইটা কি খাঁ সাহেবের–'

মাসুমকে কথা শেষ করতে দিলো না বলরাম। 'শত্রু, না মিত্র, না অন্য কেউ তা এখনি বোঝার কোনো উপায় নাই। যে কেউই হইতে পারে, কাজেই সবাই প্রস্তুত, তার বাক্যের শেষ শব্দটা উচ্চারণ করেই সে বেশ জোরে আবারও শিস দিয়ে উঠল। মাসুম নিজে একবার ধোবল আর বরখার দিকে দেখে নিয়ে ওদেরকে প্রস্তুত হবার ইশারা করল। নিজে আনমনেই কোমরে হাত বুলিয়ে দেখে নিলো ড্যাগারটা ঠিক জায়গামতো আছে কি না। নৌকার ছইয়ের ভিতরেই তার তরবারিটা আছে। তবে এই নৌকার যুদ্ধে সেটার চেয়ে লাঠি অনেক বেশি কাজের, কাজেই সে-ও পাটাতনে রাখা বাঁশের লাঠিগুলো থেকে একটা উঠিয়ে নিলো। সে আর বলরাম নৌকার ঠিক সামনেই, বলরামের হাতে একটা বাতি। সেটা পাটের মোটা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা। ওদের ঠিক পেছনে ছইয়ের ওপরে নৌকার হাল ধরে বসে আছে মাঝি। আর ছইয়ের অন্যপাশে প্রস্তুত আছে ধোবল আর বরখা। ওদের সাথে আরও বেশ বড়ো আরেকটা নৌকা। ওটায় প্রস্তুত আছে রীতিমতো একটা ছোটোখাটো লাঠিয়াল বাহিনী। ওদের নৌকাটা দ্বিতীয় নৌকাটাকে খানিকটা সামনে এগিয়ে গিয়ে স্থির হয়ে রইল। উত্তাল পানিতে যতটা সম্ভব স্থির থাকা যায় আরকি। আর ওদের সাথে থাকা নৌকাটা আরও বেশ খানিকটা পেছনে গিয়ে হারিয়ে গেল অন্ধকারের ভেতরে।

পানির যুদ্ধে অভিজ্ঞ যোদ্ধা মাসুম খুব ভালো করেই জানে কী হচ্ছে আসলে এখানে। ওরা এই নৌকাটা থেকে সামনে ইশারা করবে। আর পেছনে লাঠিয়াল ভরতি যুদ্ধ নৌকাটা অন্ধকারের ভেতরে শুধু সৈন্য না, সাথে আরও দুটো ছিপ নৌকা নিয়ে প্রস্তুত থাকবে। ওরা এই নৌকা থেকে আসন্ন নৌকায় আলোর ইশারা করবে। যদি বন্ধু হয় তবে কীভাবে সেটার জবাব দিতে হবে ওরা জানাবে, প্রতি উত্তরে ওরাও নির্দিষ্ট পন্থায় ইশারা করবে। আর যদি অচেনা কেউ হয় কিংবা শত্রু হয় তবে ওরা সেই নিদিষ্ট ইশারা জানবে না। সেক্ষেত্রে ওদেরকে যেকোনো পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

মাসুম মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছে বলরামের দিকে। লোকটা একহাতে শক্ত করে ধরে আছে লাঠি, অন্য হাতে পাটের মোটা কাপড় দিয়ে ঢাকা বাতিটা। মনোযোগের সাথে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। মাসুম একবার সামনে দেখে নিয়ে পেছনে চোখ বুলাল নৌকার মাঝি থেকে শুরু করে প্রতিটা লোক টান টান হয়ে আছে। মাসুম জানে দ্বিতীয় নৌকারও একই অবস্থা। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল বলরামের চোখে মুখে যেন কোনো বিকার নেই। সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। মাসুম মনে মনে লোকটার স্থিরতার প্রশংসা না করে পারল না। বলরাম জানে আজকের এই মোলাকাতের গুরুত্ব কতটুকু এবং সেই সাথে এ-ও জানে পুরো বিষয়টার দায়িত্বই তার ওপরে নিহিত, তবুও সে একেবারেই স্থির এবং শান্ত আছে। মাসুম নিজের কোমরের পেছনে রাখা ড্যাগারের হাতলটা শক্ত করে চেপে ধরে সামনে ফিরে তাকাল। আগুয়ান নৌকাটা এখন অনেকটাই দৃশ্যমান। আর পানির বুকে বিচরণরত মানুষ হিসেবে জানে যেহেতু ওরা নৌকাটাকে দেখতে পাচ্ছে এর মানে ওই নৌকা থেকেও তারা এখন দৃশ্যমান। আগামী কয়েক মুহূর্তের ভেতরেই সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। বলরাম আচমকাই নিজের লাঠিটা একবার তুলে ধরল মাথার ওপরে। এটা সবার জন্যে একটা সতর্কবার্তা। এবার সে লাঠির ডগা দিয়ে টান দিয়ে বাতির ওপর থেকে কাপড়টা ফেলে দিলো। পরিষ্কার নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে ওপাশে। এবার দেখার বিষয় ওরা কী করে। কয়েক মহূর্তের ভেতরে ওপাশেও সরু একটা আলোর রেখা দৃশ্যমান হলো। বলরাম সাথে সাথে লাঠির ডগাটা নৌকার পাটাতনের ওপরে চেপে ধরে শরীরটাকে স্থির করে বাতিটাকে নাড়তে শুরু করল বিশেষ ভঙ্গিতে। তার নাড়ানো শেষ হতেই সে উৎসুক নয়নে তাকিয়ে রইল সামনের দিকে। আগামী কয়েক মুহূর্তের ভেতরেই নির্ধারিত হয়ে যাবে অপরপক্ষ কি শত্রু না বন্ধু। ওপাশেও আলোটা নড়তে শুরু করল।

'ঠিক আছে,' চূড়ান্ত স্বস্তির সাথে শব্দগুলো উচ্চারণ করে বলরাম হাতের লাঠিটাকে পাটাতনের ওপরে ফেলে অলোটাকে মুখের সামনে তুলে ধরল। 'ওটা খাঁ সাহেবেরই নৌকা।'

স্বস্তির নিশ্বাস বয়ে গেল মাসুমের শরীরেও। ইশারায় পেছনে নির্দেশ করল সে। সবাই যার যার অস্ত্র নামিয়ে নিলো, ছইয়ের ওপরে বসে থাকা মাঝি অনুচ্চ স্বরে শিস বাজাতেই পেছনের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া নৌকাটা ওদের পাশে এসে স্থির হয়ে গেল। ধোবল আর বরখা ছই পার হয়ে মাসুমের পাশে এসে দাঁড়াল। 'খাঁ সাহেব কি আসছেন?'

'আবশ্যই আসছেন,' মাসুম দৃঢ় গলায় কথাটা বলার চেষ্টা করলেও তার গলায় সামান্য দ্বিধা। অপর দিক থেকে এগিয়ে আসা নৌকাটা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে স্থির হয়ে গেল ওদের সামনে। 'হেই' বলে অনুচ্চ স্বরে চিৎকার করে সম্ভাষণ জানাল বলরাম। অপর পাশ থেকেও কেউ একজন একই সম্ভাষণ জানাল তাকে। মাসুম উৎসুক নয়নে তাকিয়ে আছে সামনের নৌকার দিকে। কিন্তু তার না তাকালেও চলত। কারণ নৌকার একেবারে সর্বাগ্রে আলো হাতে দাঁড়িয়ে থাকা দীর্ঘদেহী সুঠাম মানুষটাই ঈশা খাঁ। যদিও তার শরীরে পরে থাকা ধূসর আলখাল্লা আর কালো পাগড়ির প্রান্ত দিয়ে মুখ আড়াল করা কিন্তু এই অবয়ব চিনতে না পারার কোনো কারণই নেই মাসুমের। নৌকাটা পাশে এসে ভিড়তেই এক গাল হাসি নিয়ে নৌকার প্রান্তে দাঁড়িয়ে নিজের একটা হাত বাড়িয়ে দিলো সে ঈশা খাঁর দিকে। তার হাতটা ধরে ছোটো কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে ওদের নৌকায় চলে এলো ঈশা খাঁ এবং তার সাথের দুই সঙ্গী। মাসুম সালাম জানিয়ে তার পা ছুঁতে গেলেও ঈশা খাঁ তাকে সেটা করতে দিলো না। বরং শক্ত হাতে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরল তাকে। মাসুমও তাকে তীব্র আবেগের সাথে জড়িয়ে ধরে রইল কিছুক্ষণের জন্যে। দুইজন শক্তিশালী এবং দৃঢ়চেতা মানুষ পরস্পরের প্রতি তীব্র ভাইসুলভ আবেগে আক্রান্ত হয়ে রইল কিছুক্ষণের জন্যে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মাসুমের চোখের দিকে তাকিয়ে তার দুই কাঁধ শক্ত করে ধরল ঈশা খাঁ। 'তুমি ভালো আছ, মাসুম?' বলেই ওর মুখের একপাশে হাত বুলাল সে। 'মৎস্য শিকার বেশ ভালোই চলেছে মনে হচ্ছে,' বলে সে ধোবল আর বাকিদের দিকে এক পলক বুলিয়ে নিয়ে নিজের প্রধান সেনাপতির দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। ঈশা খাঁর বলা কথায় খানিকটা লজ্জা পেয়ে গেল মাসুম। 'না না, আমি ভালো আছি, এগুলো তো

'চলো, ছইয়ের ভেতরে বসে কথা হবে, অনেক জরুরি কথা বলার আছে তোমারে।' মাসুম একবার চারপাশে দেখে নিয়ে সবাইকে ভেতরে যাবার জন্যে ইশারা করল। আপনাতেই সে ঈশা খাঁর দুই সঙ্গী সরফরাজ এবং লতিফ খাঁর দিকে ফিরে সম্বোধন সুচক মাথা নাড়ল।

'আমি বাইরেই আছি, চাইরপাশে নজর রাখতে অইবে,' বলে মাসুমের উদ্দেশ্যে একবার মাথা নাড়ল বলরাম।

পরবর্তী কিছুক্ষণের ভেতরেই নৌকার ছইয়ের ভেতরে আলোচনা জমে উঠল। 'খাঁ সাহেব, পরিস্থিতি কি আসলে? শুনলাম শত্রুরা নাকি—'

ঈশা খাঁ আপনাতেই খানিকটা ফিক করে হেসে উঠতেই মাসুম বেশ অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে। সে ফিরে তাকিয়ে দেখল ধোবল আর বরখাও বেশ অবাক হয়েছে ওর প্রশ্নের জবাবে ঈশা খাঁর হাসি দেখে। কিন্তু ঈশা খাঁ তার দিকে তাকিয়ে নেই, সে বরং তাকিয়ে আছে তার দুই সঙ্গী লতিফ খাঁ আর সরফরাজের মুখের দিকে। 'কি বলছিলাম না, কাজ হইছে?' বলে সে ফিরে তাকাল মাসুমের দিকে। 'আসলে সোনারগাঁওয়ের পতন হয় নাই শত্রুরা কত্রাবো দখল করে নিছে। আর সোনারগাঁও থেইকা আমরা সরে আসছি।'

মাসুম ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে ঈশা খাঁর দিকে। 'আমি ঠিক বুঝলাম না, চাইরপাশে খবর ছড়াইছে সোনারগাঁও নাকি শত্রুরা দখল করছে। আপনি বললেন সোনারগাঁও না কত্রাবো; কিন্তু আমার প্রশ্ন হইলে,' ঈশা খাঁ মনোযোগের সাথে তাকিয়ে আছে মাসুমের দিকে। অপেক্ষা করছে ওর প্রশ্নের জন্যে।

'প্রথম কথা হইল, আপনি নিজেই বললেন আপনারা নিজে থেকেই সোনারগাঁও ছাইড়া পিছনে আসছেন। ঘটছে একটা, কথা ছড়াইছে ভিন্ন, এইটা কীভাবে হইল, আর যদি ওরা কত্রাবো দখল কইরাও থাকে সেইটাও কি বিপদের কথা না, তাইলে তো আপনাদের আরও শক্ত হাতে সোনারগাঁও প্রতিরোধ গইড়া তোলার দরকার আছিল।'

'এইজন্যেই আমি তোমারে পছন্দ করি,' ঈশা খাঁ একটা হাত তুলল মাসুমের দিকে। 'তুমি সঠিক জায়গায়টা সবসময় ধরতে পারো সহজে,' বলে সে পানপাত্র থেকে একটা সুপুরি তুলে মুখে পুরে দিলো। 'শতরঞ্জ খেলছো কখনও?' মাসুম কিছু না বলে চুপ করে তাকিয়ে রইল ঈশা খাঁর দিকে। সে বোঝার চেষ্টা করছে খাঁ সাহেব আসলে কী বলতে চাইছে। 'শতরঞ্জের বাজিতে কখনও কখনও শত্রুরে কাবু করতে হইলে খেলার ঘুঁটি যেমন আগে বাড়াইতে হয়, আবার কখনও কখনও পিছাইতেও হয়। কিন্তু পিছানোর মানে কিন্তু এই না যে ময়দান ছাইড়া দেওয়া হইছে। এইটা স্রেফ চালমাত্র,' বলে সে আনমনেই মাথা নাড়ল। 'শোনো, এইগুলা হইল চাল মাত্র। প্রথম কথা হইল, মোঘলরা গত কয়েক বছরে আমগোর লগে বারবার লাইগাও কিছুই করতে পারে নাই। এই কারণেই এইবার ওরা খুব শক্ত হইয়া লাগছে। মানসিংহের বাঙাল মুল্লুকে পাঠানো এইডাই প্রমাণ করে। তুমি কি জানো মানসিংহ বাঙাল মুল্লুকে আসার পর থেইকা এখন পর্যন্ত কী করছে?'

মাসুম আনমনেই মাথা নাড়ল, কারণ সে আসলে জানে না মানসিংহ বাঙাল মুল্লুকে আসার পর থেকে কী করেছে। 'আমার ধারণা তুমি জানো না সে কী করছে, ক্যান জানো না জানো? কারণ সে কিছুই করে নাই। মানসিংহের মতো এত বড়ো

মাপের একজন মোঘল সেনাপতি বাংলায় আসল, আসার পরে এতদিন ধইরা নিজের রাজধানী স্থানান্তর বাদে আর কিছুই করতাছে না, এইটা কি তোমাদের কাছে স্বাভাবিক মনে হয়?' বলে সে ওদের তিনজনের দিকে দেখে নিলো একবার। 'আবার সে আসার ঠিক পর দিয়াই মল্লারের যুদ্ধ লাগল আবার যুদ্ধের ঠিক পরেই তোমার সাথে ওগো যেমন গোল বাঁধলো, ঠিক তেমন গোল বাঁধতাছে সবখানে। তোমার কি মনে হয় না এইগুলা সব মোঘলগোর চালেরই অংশবিশেষ। মানসিংহ এখন কই আছে জানো? সে আছে এগারো সিন্ধুর কাছাকাছি। বলে সে নিজের একটা আঙুল রাখল পাটাতনের ওপরে।

'ধর এইখানে,' নিজের আঙুলটা দেখাল। 'তোমার এলাকাটা এইখানে, এরপরে বিক্রমাদিত্য, এরপরে সোনারগাঁও বলে সে আঙুল দিয়ে একটা বৃত্ত রচনা করতে শুরু করল। 'চাইরপাশে একের-পর-এক ঘটনা ঘটতাছে। আর সে ঠিক কেন্দ্রে বইসা আছে। কেন জানো? সে আসলে নিজের জাল বিছাইতাছে। আর ধীরে ধীরে খুব সাবধানে নিজের জালটারে গুটায়া আনতাছে। সে জানে আমার লোকেরা একের-পর-এক ঝামেলার সম্মুখীন হইলে আমার শক্তি কমতে থাকব। এরই অংশ হিসেবে সে কত্রাবো আক্রমণ চালাইছিল। তার ইচ্ছা ছিল স্রেফ ভয় দেখানো। কিন্তু আমরা এমনভাবে পিছে হটছি ওরা কত্রাবো দখলও কইরা ফালাইছে, আবার সোনারগাঁও থেইকা ইচ্ছা কইরা পিছানি হইছে যাতে ওইটাও ওরা দখল করতে পারে। কিন্তু আসলে ওইগুলা ওরা চাইলেই দখল এমনেও করতে পারত। বরং এখন যেমনে দখল করতাছে তাতে ওরা বেশিদিন এইগুলার একটাও ধইরা রাখতে পারবো না। এইটা আমগো চাল।'

'কত্রাবো কি শাহবাজ খাঁ–' মাসুম প্রশ্ন শেষ করার অগেই ঈশা খাঁ বলে উঠল, 'নাহ, দুর্জন সিং দখল করছে।'

মাসুম চট করে চোখ তুলে তাকাল তার দিকে। 'মোঘল সেনাপতি দুর্জন সিং? মানসিংহের মেয়ের জামাই?'

ঈশা খাঁকে এই প্রথমবারের মতো খানিকটা চিন্তিত মনে হলো মাসুমের কাছে।

'তাইলে শাহবাজ খাঁ কই?' প্রশ্নটা যেন আপনাতেই বেরিয়ে গেল মাসুমের মুখ দিয়ে।

'শাহবাজ খাঁ কই–তারচেয়েও বড়ো একটা সমস্যা দেখা দিছে,' ঈশা খাঁ আরেকবার সুপুরি তুলে মুখে পুরে দিলো। 'তুমি কি জানো জঙ্গলমহালের পতন হইছে?'

মাসুম আবারও খুব অবাক হয়ে ফিরে তাকাল ঈশা খাঁর দিকে। 'জঙ্গলমহাল, সুবাদার আসলাম শেঠের জঙ্গলমহাল?' মাসুম জানে সুবাদার আসলাম শেঠ নিজে সরাসরি বারো ভূঁইয়াদের একজন না হইলেও সে বাঙাল মুলুকে বারো ভূঁইয়াদের

শক্ত খুঁটিগুলোর একটি এবং জঙ্গলমহাল সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গগুলোর একটি। কিন্তু তবুও সে বেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ঈশা খাঁর দিকে। নিজের রাজধানীর পতনে যে মানুষটা মোটেও বিচলিত নয়, সেই মানুষটাই কি না স্রেফ একটা দুর্গের পতনে এতটা বিচলিত বোধ করছে, কারণ কী? কিন্তু সে জবাব দেবার আগে ঈশা খাঁ কথা বলে উঠল।

'তুমি হয়তো ভাবছ, নিজের রাজধানীর পতনে আমি বিচলিত নই, তবে জঙ্গলমহালের পতনে এতটা অস্থির হয়া উঠতাছি কেন? তুমি সুবাদার আসলামরে কতটা চিনতা?' ঈশা খাঁ গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাসুমের দিকে।

'তার সাথে একাধিকবার মোলাকাত হইছে কিন্তু অতোটা গভীরভাবে চেনার সুযোগ হয় নাই,' মাসুমের মনে পড়ল শেষবার যখন সুবাদার আসলামের সাথে ওর দেখা হয়েছিল বিভিন্ন দেশে যুদ্ধের কৌশল নিয়ে লম্বা আলোচনা হয়েছিল দুজনার মাঝে। সে আগে থেকেই জানত মানুষটার গভীর জ্ঞানের কথা কিন্তু সেদিন টের পেয়েছিল: বহুদেশ ঘোরা মানুষটার অভিজ্ঞতা আর জ্ঞানের ঝুলি আসলে লোকমুখে যতটা প্রচলিত বাস্তবে তারচেয়েও অনেক বেশি।

'আমার দেখা সবচেয়ে চতুর, শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান মানুষ ছিল সুবাদার আসলাম শেঠ। বহু দেশ-বিদেশ ঘুরলেও এই দেশ এই মাটির প্রতি তার ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। তোমাকে একটা কথা বলি, মোঘলরা যেভাবে পুরো বঙ্গদেশ, বিশেষ করে বারো ভূঁইয়াদের পিছনে লাগছে, তাতে একটা বিষয় পরিষ্কার যে ওরা এর শেষ না দেইখা ছাড়বে না। আর একটা যুদ্ধ যে আসন্ন সেইটা ফিরানোর কোনো উপায় নাই। একদিকে ওরা ওগো সব জাল গুটায়া আনতাছে, অন্যদিকে, আমরা নানা কৌশল করতেছি জালটারে ছিদ্র কইরা বাইর হবার। কিন্তু একটা সময় গিয়া যুদ্ধে নামতেই হবে। আর সেইটা যখন হবে, অগোরে প্রতিহত করার মতন শক্তি কিন্তু আমগো নাই। এইখানেই দেখা দেয় জঙ্গলমহালের ভূমিকা,' এই পর্যন্ত বলে ঈশা খাঁ খানিকটা বিরতি নিলো, একজনকে পানি দিতে বলে আবারও শুরু করল সে।

'জীবনের বহু বছর সুবাদার আসলাম পারস্যতে কাটায়া ফিরা আসে গেল বছর। তার স্ত্রীও কিন্তু পারস্যের। আসার পর তার সাথে আমার দেখা করার কথা ছিল, নানা ঝামেলায় সেইটা হয়ে ওঠে নাই। আর এর ঠিক পরেই লাগল মল্লারের যুদ্ধ। কিছুদিন আগে সে আমার সাথে গোপনে দেখা করতে আসছিল, সে আমাকে জানাইছিল তার কাছে এমনকিছু একটা আছে যা মোঘলগোর লগে আমগো পুরা যুদ্ধের গতি পালটাইয়া দিতে পারে। কিন্তু সেইটার প্রস্তুতির জন্যে তার আরও কিছু সময় লাগব এইরকমও বলছিল সে। কিন্তু সে বাড়ি ফিরা যাবার কিছুদিন পরেই তার জঙ্গলমাহলে আচমকা আক্রমণ হয় এবং আক্রমণ করে মোঘলগোর সবচেয়ে হিংস্র

সেনাপতি বাহরাম খাঁ। ওরা পুরা এলাকা অবরোধ কইরা আক্রমণ চালায়। কিন্তু জঙ্গলমহালের ব্যাপারে তো তুমি জানই। ওরা নিজেগোর অবস্থান ধইরা রাখে। একটা পর্যায়ে আর পারে নাই। জনমুখে অনেক কথাই প্রচলিত অইছে কিন্তু একটা মাধ্যম এরকম বলে যে শেষ দিকে নাকি আসলাম শেঠ নিজের লোকগোরে নিয়া নিজেই দুর্গের পতন ঘটাইছে।'

'কিন্তু সে ওরকম করবে ক্যান?' মাসুম বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করছে।

'সেইটা আমরা কেউই সঠিকভাবে জানি না। কিন্তু ধারণা করতে পারি,' ঈশা খাঁ চিন্তিত ভঙ্গিতে নিজের দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলে উঠল। 'তার কাছে যাই ছিল সেইটা যাতে শত্রুর হাতে না পড়ে সেইজন্যে সম্ভবত নিজের লোকদেরকে পালানোর সুযোগ করে দেওয়ার জন্যেই সে কাজটা করেছে। এইটা স্রেফ আমরা ধারণা করতে পারি, আর জনশ্রুতিও তাই বলে।'

'তারমানে আপনি বলতাছেন, আসলাম শেঠের কাছে যাই ছিল না কেন, সেইটা শত্রুর হাতে পড়ে নাই এখনও,' মাসুম বলে উঠল।

'এইখানে আমার একটা কথা আছে,' অনেকক্ষণ পর মাসুমের পাশ থেকে বরখা বলে উঠল। 'আমার জানামতে ওই এলাকাতে রসুল খাঁর রাজ্য সবচেয়ে কাছে। সে ক্যান তাগোরে সাহায্য করল না?'

'কারণ অনেকগুলা আছে,' ঈশা খাঁ একটা আঙুল তুলল। 'এরমধ্যে অন্যতম দুইটা কারণ হইল, মোঘলরা এমনভাবে জঙ্গলমহাল ঘিরা ধরছিল যে যেদিকে রসুল খাঁর রাজ্য সেদিকে যাবার কোনো উপায় ছিল না ওগো। তার ওপরে ওই এলাকার অবস্থানগত বিষয়টাও মাথায় রাখতে অইব। নদী আর খাল-বিল বিধৌত ওই এলাকা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর জঙ্গুলে এলাকা। ওইখান থেইকা আবার মেঘালয়, আসামের সংযোগ আছে। ওইখানে একদিকে মোঘল বাহিনী, হাওড়ের ডাকাইত থেকে শুরু কইরা সব রকমের বিপজ্জনক লোকজনের আনাগোনা।'

'আপনে ডরাইতেছেন আসলাম শেঠের জঙ্গলমহাল থেইকা যদি কেউ পলাইয়াও থাকে সে বেশিদিন টিকতে পারবো না।'

'তারচেয়েও বড়ো কথা, আসলাম শেঠের ওইখানে যা আছিল সেইটা ভুল লোকের হাতে পড়লে ভয়াবহ বিপদ, পরিস্থিতি এমনিতেই এরপরে কী অইবে আমরা কেউই জানি না।'

মাসুম বড়ো করে একবার নিশ্বাস নিলো। 'আমার জন্যে আপনার নির্দেশনা কী?'

'আমি চাই তুমি ধোবল আর বরখারে নিয়া মহেশ্বরদী পরগনা পার হয়া ব্রহ্মপুত্র আর শীতলক্ষ্যা দিয়া নৌপথে জঙ্গলমহালের কাছাকাছি চইলা যাও। আমি প্রথমে ভাবছিলাম ফজল গাজীর চৌরা থেইকা বড়ো বাহিনীসহ তোমগোরে পাঠাবো। কিন্তু

ওইখানে এখন বড়ো বাহিনী গেলেই সমস্যা হবে। তারচেয়ে তোমরা তিনজন যাও, একটা ভ্রু উঁচু হলো তার। 'মাসুম, তুমি আমার ছোটো ভাইয়ের মতো, বলতে দ্বিধা নাই তুমি বাঙাল মুল্লুকের সেরা যোদ্ধাদের একজন। বিশেষ করে তুমি সেইসব গুটিকয় যোদ্ধাদের একজন যারা মোঘলদের কাছ থেকেই যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে যোদ্ধা হইছে। সেই সাথে বাংলার মাটির জল-কাদা সবচেয়ে ভালো বোঝে এবং চেনে। মিঠা পানির যুদ্ধে তোমার সমকক্ষও কেউ নাই। কাজেই একদিকে তুমিই সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবা মোঘলগোর পরবর্তী পদক্ষেপ, সেই সাথে তুমিই সবচেয়ে ভালো ধরতে পারবা ওইখানে আসলে কী হইতাছে। আর কী করতে হবে,' বলে ঈশা খাঁ দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছাড়ল। 'শুধু একটা অনুরোধ, পাগলামি কইর না, কোনো কিছু নিয়াই অস্থির হয়ো না।

ঈশা খাঁর প্রশ্নের সরাসরি কোনো জবাব না দিয়ে মাসুম ভিন্ন কথা বলে উঠল। 'ওদিকের পানি আমি খুব ভালো বুঝি এই ব্যাপারে কোনো দ্বিধা নাই। কিন্তু ওইখানে আসলে হচ্ছেটা কী আমাকে বুঝতে হবে। আপনার কাছ থেইকা যা শুনলাম সেইটা অপ্রতুল, সেই সাথে–'

'তোমার রসদ লাগব, তথ্য থেকে শুরু করে অস্ত্র এমনকি লোকবলও,' ঈশা খাঁ আপনাতেই মাথা নাড়ল। 'আমি জানি, আমি এই কারণেই গাজীকে বলেছিলাম দুটো নৌকায় করে তোমাদের পাঠাইতে, তোমরা এখান থেকে দুটো নৌকার একটা নিয়া যাবা, পালের যেটা সেইটা নিয়া যাবে। তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। এরপরে এইখান থেইকা শীতলক্ষ্যা দিয়া ব্রহ্মপুত্র দিয়া চইলা যাব সোজা রসুল খাঁর এলাকায়। ওইখানে যাবার পর আমার বিশ্বাস তুমি সব বুঝতে পারবা কীভাবে কই যাইতে হবে, কী করতে হবে, রসুল খাঁ নিজে আমারে বার্তা পাঠায়া সব বলে নাই। কারণ বার্তা অন্য লোকের হাতে পইরা যাবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আমার বিশ্বাস তুমি গেলে সে সব বিস্তারিত তো বলবেই সেই সাথে তোমার যা যা লাগে সব দিয়া সে তোমারে সাহায্য করবে।'

'বুঝতে পারছি,' আনমনেই মাথা নেড়ে মাসুম একবার ধোবল আর বরখার দিকে দেখে নিলো। ঈশা খাঁর সামনে দুজনেই খুব স্বাভাবিক মুখে ভদ্র ছেলের মতো বসে থাকলেও মাসুম জানে ওরা দুজনেও ওর মতোই ভেতরে ভেতরে উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। কারণ ঠিক ওর মতোই ওরাও অভিযানের গন্ধ পেয়েছে।

'ঠিক আছে, আমরা এইখান থেইকাই রওনা দিব, আর বলরাম?'

'ওরে বলো গাজীদের এলাকা চৌরায় ফিরা যাইতে। গাজীদের জন্যে আমার কিছু বিশেষ বার্তা আছে।'

'আপনি এইখান থেইকা কই যাবেন?' মাসুম জানে এই পরিস্থিতিতে এই প্রশ্ন করাটা ওর আসলে উচিত হচ্ছে না, কিন্তু প্রশ্নটা না করেও সে থাকতে পারল না।

ঈশা খাঁ সরাসরি কোনো উত্তর না দিয়ে দাড়িতে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে মৃদু হেসে উঠল। 'আমার এখন অনেক কাজ, আর দিল্লি থেকে বন্ধু আসছে, তার জন্যে তো আয়োজন করতে হবে,' বলে সে বাকিদেরকে ছইয়ের বাইরে যাবার নির্দেশ দিলো। 'মাসুম তোমার সাথে আমার আলাপ আছে। বসো।'

ওদের আলাপচারিতা শেষ হবার পর ছইয়ের ভেতরে কুঁজো হয়ে উঠে বাইরের দিকে রওনা দিলো ওরা। ছইয়ের বাইরে এসে ঈশা খাঁ বলে উঠল, 'মাসুম, আমি বলরামের সাথে কথা বলব অন্য নৌকায় গিয়ে। তোমার কাছ থেকে এইখানেই বিদায় নিব। সরফরাজ আর লতিফ খাঁ তোমারে কিছু জিনিস বিস্তারিত বুঝায়া দিবে,' বলে সে মাসুমের চোখে চোখ রেখে তার কাঁধে হাত রাখল। মুহূর্তের জন্যে কাঁধটাকে শক্তহাতে ঝাঁকি দিয়ে সে জড়িয়ে ধরল মাসুমকে।

'মাসুম, তুমি তো বুঝতেই পারতাছ, তোমার এবং তোমাদের এই অভিযানের ওপরে অনেক কিছুই নির্ভর করতাছে। কাজেই তুমি তোমার সেরাটা দিয়া চেষ্টা করবা আমি জানি, কিন্তু আমি এইটাও জানি পরিস্থিতি খুব বেশি সুবিধার না। কাজেই–' সে বাক্যটা শেষ না করে মাসুমের হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে পা রাখল অন্য নৌকায় মাসুম চোখ ফিরিয়ে একবার ধোবল আর বরখাকে দেখে নিয়ে ফিরে তাকাল অন্ধকার পানির দিকে।

ধীরে ধীরে মুখে ফুটে উঠল এক টুকরো ঠান্ডা হাসি। বহুদিন পর এমন একটা কাজ এসেছে যার জন্যে সে জীবন বিলিয়ে দিতেও প্রস্তুত, কিন্তু সেটা সঠিকভাবে সঠিক পথে বিলিয়ে দিতে পারবে তো?

অধ্যায় ছয়

বর্তমান সময়

পিবিআই অফিস, ধানমন্ডি, ঢাকা

দায়িত্বের জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মতো মানুষ বাশার।

আর তাই যখন ধানমন্ডি পিবিআইয়ের অফিসের সামনে গিয়ে সিএনজি থেকে নামল তখন ওর হাতের ঘড়ির কাঁটা সকাল আটটার কোঠা ছোঁয়নি। মনে মনে সে একবার ভাবল, বেশি জলদি চলে এলো কী? কিন্তু গতকাল শেষবার যখন তাকে কল করা হয়েছিল তখন বলা হয়েছিল সকাল সকাল যেতে, যতটা সম্ভব দ্রুত পিবিআইয়ের স্পেশাল ব্রাঞ্চের সেকশনে রিপোর্ট করার জন্যে।

ভবনটার ভেতরের দিকে যেতে যেতে বাশারের মনে হতে লাগল বহু বছর আগে একবার সে এখানে এসেছিল কী একটা কাজে, এরপরে আর এদিকে আসার সুযোগ হয়নি ওর। এতবছর পর এভাবে এই অফিসে স্পেশাল ব্রাঞ্চে যোগ দেবার জন্যে ফিরে আসবে সে কখনও ভাবেনি, কথাটা ভাবতে ভাবতেই তার মুখে একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল। গতকাল রাতে সে শুয়ে পড়ার পরেও খুব একটা ভালো ঘুম হয়নি, রাতের একটা সময়ের পর আর ঘুম না আসাতে জলদি উঠে কিছুক্ষণ গেস্টহাউজের জিমে গিয়ে এক্সারসাইজ করেছে তারপর রেডি হয়ে বেরিয়ে গেছে জলদি জলদি। আর্লি বের হবার পেছনে কারণ ছিল দুটো। প্রথমত, তাকে জলদিই যেতে বলা হয়েছে, তার ওপরে সে যেকোনো ভাবেই হোক ঢাকার জ্যাম অ্যাভয়েড করতে চাইছিল। সিএনজি থেকে নেমে ভবনের ভেতরের দিকে যেতে যেতে সে বহু আগে দেখে যাওয়া ভবনের নকশাটা মনে করার চেষ্টা করল। কিন্তু নিজের পুরনো স্মৃতির সাথে খুব বেশি মেলাতে পারল না। ভেতরে ঢুকে রিসিপশনে নিজের পরিচয় দেওয়ার পর কিছু ফর্মালিটি সারল সে। কিছু পেপার ওয়ার্ক করে, কিছু ডকুমেন্ট ওর সই রেখে সোজা চলে যেতে বলল ছয় তলায় স্পেশাল ব্রাঞ্চে। লিফটে করে ছয়তলায় এসে, সে একটা ভারী দরজার সামনে চলে এলো। সেটার সামনে স্বচ্ছ কাচের ওপরে লেখা স্পেশাল ব্রাঞ্চ। কিন্তু যে-সেকশনের নাম তার চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছিল, সেটার নাম-নিশানাও দেখতে পেল না কোথাও। একবার নক করে দরজাটা মেলে ধরল সে।

ভেতরে তেমন কেউই নেই, দরজাটা মেলে ধরে সে ভেতরে ঢুকে দেখল ছোটো হলরুমের মতো একটা অফিস, সেটার বিভিন্ন দিকে কয়েকটা ডেস্ক বসানো। তিনটে ডেস্কের ভেতরে দুটোতেই কেউ নেই। তৃতীয় ডেস্কে বসে আছে লম্বা চুলের একটা ছেলে। একমনে সে কাজ করছে কম্পিউটারে। ওকে দেখে সে এক গাল হেসে উঠল। 'হাই, আপনি নিশ্চয়ই, ইন্সপেক্টর আহমেদ বাশার?' ছেলেটার কথাবার্তা সরকারি অফিসের কোনো কর্মকর্তার মতো নয় বরং চৌকস কোনো কর্পোরেট অফিসারের মতে। তার পোশাক-আশাক আর চালচলনও অনেকটা সেরকম।

'জি, আমিই আহমেদ বাশার,' ছেলেটার হাত মৃদু ঝাঁকির সাথে নাড়িয়ে দিয়ে সে জবাব দিলো। 'আমি–'

'ওহ, ইয়েস স্যার। আপনার জন্যে স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেস্ক অফিসার এবং স্পেশাল উইংয়ের প্রধান হাবিব আনোয়ার পাশা স্যারের পারসোনাল অ্যাসিসট্যান্ট মৌসুমি আক্তার অপেক্ষা করছেন। এই দিকে গিয়ে ডানে মোড় নিলেই উনার ডেস্ক পেয়ে যাবেন, থ্যাঙ্ক ইউ।'

বাশার কিছু বলার আগেই, এমনকি থ্যাঙ্কস জানানোর আগেই সে চলে গেল। একবার আনমনেই কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাশার ছেলেটার দেখান করিডোর ধরে সামনে এগিয়েই একপাশে কাঠের প্যানেলিং দিয়ে আড়াল করা সুন্দর একটা অফিস দেখতে পেল। ওটার ওপাশে বিরাট একটা টেবিলের ওপাশে বসা সাদা সালোয়ার কামিজ পরা একজন মহিলা বসে ফাইল সাজাচ্ছিল ডেস্কের ওপরে। বাশার এগিয়ে যেতেই উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে অভিবাদন জানাল ওকে। 'হ্যালো, আমি মৌসুমি, আপনি নিশ্চয়ই ইন্সপেক্টর বাশার?'

'জি, ম্যাম, আমিই আহমেদ বাশার,' বাশারও মৃদু হেসে অভিবাদন জানাল। 'আপনার সাথেই বোধহয় আমার ফোনে কথা হয়েছিল একাধিকবার, তাই না?'

'জি, আপনি বসুন না,' মহিলা নিজেও চেয়ারে বসে বাশারকে বসতে ইশারা করল। 'আপনার জন্যে চা-কফি বা অন্যকিছু বলব? এখন তো বেশ সকাল। আপনি কি ব্রেকফাস্ট করার সুযোগ পেয়েছেন?'

'জি, ম্যাম। আমি ফুল ব্রেকফাস্ট করেই এসেছি, আপনাকে থ্যাঙ্কস,' বাশারের কাছে মহিলাকে প্রথম দেখাতেই বেশ ভালো লেগে গেছে আন্তরিক ব্যবহারের কারণে। বেশ একটা বড়ো বোনসুলভ ভাব আছে তার ভেতরে। কিন্তু বেশ কয়েকটা বিষয়ে সে বেশ অস্বস্তিও বোধ করছে। এর ভেতরে অন্যতম একটা হলো নিজের দীর্ঘদিনের সরকারি চাকরির অভিজ্ঞতায় ও ঠিক যেরকম আচরণ কিংবা আতিথেয়তায় এবং ডেকোরামে অভ্যস্ত, এখানকার কাজ-কর্ম পরিবেশে ঠিক সেরকম লাগছে না ওর কাছে।

মহিলা এক মুহূর্তের জন্যে ভাবল, 'আচ্ছা, এক কাজ করব, আপনি পাশা স্যারের রুমে গেলে তখন একসাথে দুজনকেই কফি দিব। সেটাই বেটার হবে,' বলে মহিলা টেবিলের ওপরে ফাইলগুলোকে একপাশে সরিয়ে একটা অ্যাপলের ট্যাব ওপেন করল। 'আপনি যেহেতু আমাদের সাথে কাজ করতে এসেছেন তাই আপনাকে প্রাথমিক ব্রিফিংটা আমাকেই করতে হবে। আপনাকে একটা কথা বলি, প্রথমত, আপনি হয়তো ইতিমধ্যেই টের পেয়েছেন যে আর দশটা সরকারি অফিসের ডেকোরাম আমাদের এখানে নেই। আমরা এমনকি পিবিআইয়ের ভেতরেও অনেকটা ছোটো দ্বীপের মতো বলতে পারেন। আমাদের এই স্পেশাল উইংয়ে আমরা বলতে গেলে অনেকটাই আমাদের মতো চলি। আমাদের কাজের কারণেও এই স্বাধীনতাটুকু আমরা পেয়ে থাকি। আরেকটা কথা, আমাকে ম্যাম-ম্যাডাম ডাকার প্রয়োজন নেই। যেহেতু আমি বয়সে আপনার থেকে বড়ো আপু বলে ডাকতে পারেন। আপনাকে যিনি চিঠি পাঠিয়েছিলেন অপারেশন ব্ল্যাক বুদ্ধার কমান্ডার তানভীর মালিক, ও, সেই সাথে এখানকার আরেক অফিসার শারহান শারিয়ার, ওরাও আপনার বয়সী হবে, ওরা সবাই আমাকে মৌসুমি আপা বলেই ডাকে। কাজেই আপনিও তাই ডাকতে পারেন।'

'সেক্ষেত্রে আমার একটা শর্ত আছে,' বাশার মৃদু হেসে বলে উঠল। 'আমাকেও আপনি বলে ডাকার দরকার নেই। তুমি বলেই ডাকতে পারেন, মৌসুমি আপা।'

মৌসুমি এক মুহূর্তের জন্যে বাশারের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর বলতে গেলে জোরেই হেসে উঠল। 'হা-হা, ঠিক আছে, বাশার। আমি বুঝতে পারছি এখানকার কাজ নিয়ে তুমি প্রায় অন্ধকারে আছ, তোমার কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো। আমি একবারে গুছিয়ে তোমার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব। বাই দ্য ওয়ে, সবকিছু জানার জন্যে বিস্তারিত একটা ইমেইল তোমাকে করা হবে, সেই রিপোর্টের হার্ড কপিও আমি তোমাকে দিয়ে দিব, কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে আছি। কাজেই এমনও হতে পারে এখান থেকে সরাসরি তোমাকে কাজে নামতে হতে পারে। কাজেই আপাতত ফাংশন করার মতো তথ্য চাইলে আমি মৌখিকভাবে তোমাকে জানাতে পারি।'

'অবশ্যই, অনেক ধন্যবাদ আপু, আমি বুঝতে পেরেছি। কিছু বিষয়ে আমার জানাটা খুব জরুরি, প্রথমেই যেটা আমি জানতে চাই এই স্পেশাল উইংয়ের ব্যাপারে আমি বলতে গেলে কিছুই জানি না, এই বিষয়ে খানিকটা জানতে চাচ্ছিলাম, এর পাশাপাশি আলফা এম নামে যে স্পেশাল টিমের কথা বলা হয়েছে সেটা নিয়েও আমি জানতে চাই, আর এইক্ষেত্রে আমার ভূমিকাটা কী হবে বা আমার দায়িত্ব কেমন হবে–সেই বিষয়গুলো জানাটাও জরুরি। আরেকটা বিষয় হলো, আমি কি আদৌ এই কাজের জন্যে উপযুক্ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত কি না সেটাও

জানতে হবে। মানে সোজা কথায় বলতে গেলে আমার সেই যোগ্যতা আছে কি না? তারচেয়েও বড়ো কথা হলো আমাকেই কেন সিলেক্ট করা হলো এই কাজের জন্যে?'

মৌসুমি হেসে উঠল বাশারের একগাদা প্রশ্ন শুনে। 'শোনো, তোমার শেষ প্রশ্নটা দিয়ে তোমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া শুরু করছি। প্রথম কথা হলো, তুমি এই কাজের জন্যে যদি যোগ্য না হতে তোমাকে ডেকে পাঠানো হতো না। তবে এর সাথে দুটো কারণ আছে। একটা আমি এখন বলব কিন্তু অপরটা পাশা স্যার ব্রিফিংয়ের সময়ে তোমাকে বলবেন। কারণ হলো সাম্প্রতিককালে তোমার সমাধান করা টুইন কালীর কেসটা নিয়ে আমাদের এই স্পেশাল উইংয়ের প্রধান পাশা স্যারকে তোমার বস, এসপি আমজাদ আনোয়ার তোমার নাম সাজেস্ট করেছিলেন। পুরো কেস ফাইল পড়ে পাশা স্যার বেশ মুগ্ধ, তোমাকে ডেকে আনার এটা একটা কারণ। বাই দ্য ওয়ে আমজাদ আনোয়ার স্যার কিন্তু আমারদের এই স্পেশাল উইংয়ের অ্যাডভাইজারদের একজন। উনার কথাকে এখানে খুবই মূল্যায়ন করা হয়।'

মৌসুমি একটু থেমে একটা কল রিসিভ করে কিছুক্ষণ কথা বলে আবার বাশারের দিকে ফিরে তাকাল। 'সরি, এবার আসি আমাদের এই স্পেশাল উইংয়ের বিষয়ে। প্রথমত, এই স্পেশাল উইং আমাদের প্রধান হাবিব আনোয়ার পাশা স্যারের বেইন চাইল্ড। উনি বেশ কয়েক বছর আগে গাজীপুরে একটা স্পেশাল অপারেশন চালানোর পর সরকারের কাছে বিশেষ অনুরোধ করে সরাসরি পুলিশের কাজ থেকে সরে দাঁড়ানো গবেষণার জন্যে। প্রায় এক বছর নিজে রিসার্চ করার পর উনি সিদ্ধান্তে আসেন বিশেষ ধরনের ক্রাইম অ্যানালাইসিস এবং এর সমাধান করার জন্যে উনি একটা স্পেশাল উইং খুলবেন। এই স্পেশাল উইং আপাতত পিবিআইয়ের অধীনে কাজ করবে, ভবিষ্যতে আমাদের নিজের পুরো ইনফ্রাস্ট্রাকচার দাঁড়িয়ে গেলে এটাকে সরাসরি আলাদা একটা ডিপার্টমেন্ট হিসেবে ঘোষণা করা হবে।'

'আমার একটা প্রশ্ন আছে?' বাশার ছোটো বাচ্চাদের মতো হাত তুলে প্রশ্ন করতেই মৌসুমি মাথা নেড়ে কথা চালিয়ে যেতে বলল। 'আমি ময়মনসিংহে দেখেছি ওখানে একটা স্পেশাল ল্যাব বানানো হচ্ছে ফরেনসিক থেকে শুরু করে নানা ধরনের ক্রাইম রিলেটেড ইস্যু সলভ করার জন্যে। আমি শুনেছি সিলেটেও নাকি এরকম একটা ল্যাবের কাজ চলছে। এটাও কি এই স্পেশাল উইংয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট?'

'শুধু সিলেট না, দেশের বড়ো বড়ো প্রায় সব বিভাগীয় শহরেই এই ল্যাব বসানো হবে ফরেনসিক থেকে শুরু করে সবধরনের ক্রাইম অ্যানালাইসিস করার

জন্যে। হ্যাঁ, বলতে পারো এটা এই উইংয়ের সাথে কানেকটেড কারণ ডক্টর মণিকা নামে একজন স্পেশালিস্ট আমাদের পাটোয়ারি স্যারের অধীনে কাজ করছে এই ল্যাবগুলো নিয়ে। তুমি তো টমিকে চেন, টমিও এই টিমেরই অংশ। এই ল্যাবগুলো বানানো হচ্ছে বিশেষ ধরনের কাজের জন্যে। এগুলোতে প্রায় সব আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার লোকেদের অ্যাক্সেস থাকবে, তবে কাজ শেষ হবার পর। ততদিনে যদি স্পেশাল উইং চালু হয়ে যায় তবে, ল্যাবগুলো স্পেশাল উইংয়ের অধীনেই পরিচালিত হবে।'

'বুঝতে পেরেছি, আর প্রজেক্ট আলফা এম?' বাশার জানতে চাইল।

'প্রজেক্ট আলফা এমের গল্পটা বলতে হলে আগে আরও দুজন মানুষের কথা বলতে হবে। পাশা স্যার যখন স্পেশাল উইংয়ের পরিকল্পনা নিয়ে ছুটি থেকে ফিরে পিবিআইতে জয়েন করলেন অনেকটা বলতে গেলে স্পেশাল উইংয়ের কথা মাথায় রেখে একজন ডেস্ক অ্যানালিস্ট তানভীর এবং একজন ফিল্ড এজেন্ট শারিয়ারকে ইউরোপে পাঠান ট্রেনিংয়ের জন্যে। ওরা যখন প্রায় ট্রেনিংয়ের শেষ দিকে তখন সিলেটে একটা ঘটনা ঘটে এবং পাশা স্যার স্কটল্যান্ড থেকে তানভীরকে ডেকে সেই মিশনে পাঠান। তানভীর সিলেটে গিয়ে বেশ বড়ো একটা ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে। ওটাই ছিল অপারেশন ব্ল্যাক বুদ্ধা। ওইখান থেকে আমরা জানতে পারি আমাদের দেশে দুটো অত্যন্ত শক্তিশালী আন্তর্জাতিক ক্রাইম অর্গানাইজেশন রেলিক এবং নেক্রপলিস অ্যাক্টিভ আছে এবং ওইখানে তানভীর নেক্রপলিসের সাউথ এশিয়া জোনের অন্যতম প্রধানকে গ্রেপ্তারও করতে সক্ষম হয়, তানভীর এখনও সিলেটে আছে ওই কাজেই। এরপরে চট্টগামে অ্যাক্সিডেন্টে মারা পড়ে এক ব্যক্তি এবং সেই ব্যক্তির মৃত্যুকে ঘিরে বেশ কিছু রহস্যময় ঘটনা ঘটতে থাকলে সেখানে পাঠানো হয় আমাদের আরেক ফিল্ড এজেন্ট শারিয়ারকে। সেখানে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পার হয়ে সে আরও বড়ো এক রহস্যে উদঘাটন করতে সমর্থ হয়। সেখানেও মিস্টার ইউ নামে ইন্টারপোলের লিস্টেড আরেক কুখ্যাত অপরাধী ধরা পড়ে।'

'এখানেও কি সেই আগেরগুলোই নাকি নতুন কোনো সংগঠনই?' বাশার প্রশ্ন করল।

'আগেরগুলোই,' মৌসুমি ত্বরিত জবাব শুনে বাশার খানিকটা নড়ে-চড়ে বসল।

'তাহলে তো বলতে হবে বেশ বড়ো আকারের একটা ষড়যন্ত্র চলছে। কিন্তু অবাক বিষয় হলো এরকম বড়ো বড়ো সংগঠন এবং তাদের এত বড়ো মাপের অপারেটররা আমাদের দেশে অপারেট করছে অথচ আমরা এতদিন ধরে জানিই না! ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত হয়ে গেল না?'

'শুধু অদ্ভুতই না সেই সাথে দুঃখজনকও বটে,' প্রথমবারের মতো মৌসুমির ভ্রু কুঁচকে উঠতে দেখল বাশার। 'কিন্তু তারচেয়ে বড়ো কথা ওরা বাংলাদেশে শুধু

অপারেটই করছে না, আমরা ধারণা করছি তারা অনেক বড়ো কিছু একটার পেছনে লেগেছে। সেটা আসলে যে কি এখনও আমরা জানি না। কিন্তু কিছু একটা অবশ্যই আছে। আমাদের অ্যানালিস্টদের মতে সেটা এমনকি আমাদের কল্পনার চেয়েও বড়ো কিছু হতে পারে, কারণ এখন পর্যন্ত আমরা যা টের পেয়েছি এবং বুঝতে পেরেছি এটা আমাদের অ্যানালিস্টদের মতে এমনকি এর উপরিভাগও নয়। এখানে অনেক বড়ো কিছু আছে,' বলে মৌসুমি বড়ো করে নিশ্বাস নিলো। 'যা ঘটছে এই ঘটনাটাকে আমরা দুইভাবে দেখছি। একদিকে এই ঘটনা প্রমাণ করে আমাদের স্পোশাল উইংয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে। এখন পর্যন্ত আমরা যেসব কেসের দায়িত্ব নিয়েছি সেগুলোর সবাই শতভাগ সফলতার সাথে উদঘাটনই করিনি আমরা, বরং সামনে ঘটতে পারে এমনকিছুরও ইঙ্গিত বের করতে পেরেছি। আবার সেই সাথে বড়ো বড়ো অন্তত দুটো রাঘববোয়ালকেও ধরতে সক্ষম হয়েছে আমাদের এজেন্টরা। কিন্তু এখনে এমন অনেক কিছু আছে যা আমরা ধরতে পারছি না। স্পেশাল উইংয়ের ভেতরে এই স্পেশাল কেসটাকে নাম দেওয়া হয়ে প্রজেক্ট আলফা এম। এর মূল দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তানভীর মালিকের ওপরে। সেই তোমাকে চিঠি পাঠিয়েছিল।'

'বুঝতে পেরেছি, তবে এখানে আমার ভূমিকা কোনো জায়গায়, মানে

বাশার চিন্তিত ভঙ্গিতে নিজের হাতের আঙুলে পরে থাকা আংটিটা মোচড়াতে মোচড়াতে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সে বাক্য শেষ করার অগেই ইন্টারকম বেজে উঠল। মৌসুমি ফোন তুলে কথা বলে ওর দিকে ফিরে একটা হাসি দিলো। 'ভালো টাইমে ভালো প্রশ্ন করেছ, ওপরওয়ালার ডাক এসেছে,' বলে সে জোরে হেসে উঠল। 'ওই ওপরওয়ালা নয়,' বলে সে ওপরের দিকে নির্দেশ করল। 'ইনি আমাদের ওপরওয়ালা, মানে পাশা স্যার। চল, তোমার সব প্রশ্নের উত্তর থেকে শুরু করে তোমার দায়িত্বের ব্রিফিংসহ সবই ওখানে গিয়ে হবে,' বলে মৌসুমি আই প্যাড আর ফাইলগুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাশার পিছু নিলো তার। দেখা যাক ভবিতব্য কী রেখেছে ওর জন্যে।

অধ্যায় সাত

সময়: ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দ

কিশোরগঞ্জ, জঙ্গলমহালের কাছাকাছি

রসুল খাঁর এলাকা

যে ধরনের ভবিতব্যে মাসুম বিশ্বাস রাখে তার সাথে এর কোনো মিল নেই।

মাসুম নিজে ঠিক যে-ধরনের জীবন-যাপন থেকে শুরু করে অতিথিপরায়ণতা আর কাজে অভ্যস্ত, তার ঠিক কোনোকিছুই মিলছে না যেখানে এসেছে সেই এলাকা এবং এর লোকজনের সাথে। দস্তরখানের ওপরে খাবারের আয়োজনের দিকে তাকিয়ে একবার অস্বস্তির সাথে সে খাবারগুলো দেখল, এরপরে চোখ তুলে তাকিয়ে সে ধোবল আর বরখার দিকে দেখে নিলো একবার। বরখার চেহারার অবস্থাও অনেকটা ওর মতোই, কিন্তু ধোবলের খুশি দেখার মতো। তার দুই ঠোঁটের কিনারা চওড়া হাসিতে এই কান থেকে অপর কান স্পর্শ করেছে। মাসুম ফিরে তাকাতেই তার হাসি আরও চওড়া হলো। আনমনেই একবার আফসোসের সাথে মাথা নাড়ল মাসুম।

আবারও তার দৃষ্টি ফিরে এলো সামনে বিছানো দস্তরখানের ওপরে। কী আয়োজন করেনি তাদের আয়োজক ঠিক বুঝতে পারছে না ও। কিসমিস আর পেস্তা দিয়ে রান্না করা চিকন চালের সুগন্ধি পোলাও, মুরগির কোরমা, খাসি আর মহিষের দুই ধরনের ঝাল মাংস। কোরমা আবার শুধু মুরগিরই নয়, খাসির মাংসের কোরমাও আছে, দুই ধরনের কাবাব, ঘি দিয়ে ভাজা বেগুন, কয়েক ধরনের সবজি, সুগন্ধি লেবু দিয়ে বানানো শরবত, কেওড়া জল, অন্তত ছয় সাত ধরনের ফল আর আট-দশ রকমের মিষ্টি আর দই। খাবার খাবে, নাকি এই পরিমাণ খাবার দেখে খুশি হবে, নাকি আফসোস করবে–ঠিক বুঝতে পারছে না মাসুম আর বরখা। খুব বেশি সময় আসলে খাবারের দিকে তাকিয়ে থাকাটা ঠিক শোভন নয়। খাবার থেকে চোখ তুলে চারপাশে দেখেতে লাগল মাসুম।

মাসুম নিজে পাগল প্রকৃতির মানুষ। জীবনের বেশিরভাগই তার কেটেছে হাটে-মাঠে-ঘাটে, সেনাবাহিনীর ব্যারাকে অথবা যুদ্ধের ময়দানে, আর না হয় পানির ওপরে। ফলে পারিবারিক বিষয় থেকে শুরু করে আতিথেয়তা ইত্যাদি সে

আসলে খুব ভালো বুঝতে পারে না। তবে সে নিজেও খুবই বনেদি পরিবারের ছেলে। বাঙাল মুল্লুকের আতিথেয়তা সে নিজ চোখে দেখে এসেছে ছোটোবেলা থেকে। কিন্তু এমনকি তাদের পরিবারের অতিথি সেবার একটা মাত্রা থাকে, এরা যেন সেইসব মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। সুবাদার রসুল খাঁর নাম সে আগে শুনলেও এদের রাজ্যের ব্যাপারে আসলে খুব বেশি ধারণা ছিল না ওর নিজের। এসব এলাকাতে বহুবার এলেও সরাসরি কখনও রসুল খাঁর অতিথি হবার সুযোগ হয়নি ওর। সেদিন রাতে ঈশা খাঁ বিদেয় নেওয়ার পর বলরামের সাথে কথা বলে বলরামকে কিছু জিনিস বুঝিয়ে দিয়ে ওরা বড়ো পালের নৌকাটা নিয়ে রওনা দেয় রসুল খাঁর এলাকার দিকে। প্রায় সারারাত এবং পরের অর্ধদিবস নৌকা চালিয়ে ওরা রসুল খাঁর এলাকার কাছাকাছি আসতেই রসুল খাঁর পাঠানো তিনটে জালি নৌকা এগিয়ে এসে ওদেরকে নিয়ে যায়। আসার পর রসুল খাঁর জমিদারি এবং তার অন্দরমহল থেকে শুরু করে বৈঠকখানার সাজসজ্জা দেখে বেশ অবাক হয়েছে মাসুম। এমনকি ভূঁইয়াদের একজন হয়ে ওরা নিজেরা এতটা ধনী নয়। ওরা সবাই আসার পরেই এতটাই ক্লান্ত ছিল যে স্রেফ পরিচ্ছন্ন হয়ে বাহির বাড়ির কাচারি, মানে যেখানে ওদের থাকার আয়োজন করা হয়েছে সেখানে প্রথমেই একচোট ঘুম দিয়ে নেয়। বিশ্রাম নিয়ে ওঠার ঠিক পর দিয়েই ওদের আয়োজক একবার এসে দেখা করে যায় ওদের সাথে। এরপর বৈঠকখানাতেই ওদের খাবার আয়োজন করা হয়। এবার ওরা প্রস্তুত হবার আগেই সমানে আসতে শুরু করে খাবার। একের-পর-এক আসতেই থাকে। ওরা অবশ্য বসে অপেক্ষা করছে ওদের অতিথির জন্যে। সে না এলে ওরা খাওয়া শুরু করতে চাইছে না। কিন্তু তাদের মূল আয়োজক, মানে রসুল খাঁর দেখা নেই এখনও। ওদেরকে সাহায্য করার জন্যে দরজার ঠিক পাশেই দুইজন খানসামা দাঁড়িয়ে আছে। মাসুম চারপাশে একবার দেখে নিয়ে নিজের একটা হাত ওঠাল দুই খানসামার একজনকে ডাকার জন্যে। কিন্তু তাকে ডাক দেওয়ার আগেই তাদের মূল আয়োজক রসুল খাঁ প্রবেশ করল দরজা দিয়ে। তার সাথে আরও দুজন ছোটোখাটো ফর্সা মতন দেখতে, রসুল খাঁ ভেতরে ঢুকেই হায় হায় করে উঠল, 'কী সর্বনাশের কথা! আপনারা এখনও খাইতে শুরু করেন নাই?' বলে সে রক্তচক্ষু করে দুই চাকরের দিকে তাকাল। 'আমি কি নির্দেশ দিয়েছিলাম, তোরা বুঝিস নাই?' বলেই সে চট করে ফিরে তাকাল মাসুমদের দিকে। 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত ওরা আপনাদেরকে অপেক্ষা করায়া রাখছে। আমি আরও দুঃখিত আমার আসতে দেরি হইল। আপনারা খাইতে শুরু করেন, শুরু করেন। এই খাবার পরিবেশন কর এখনি,' ছোটোখাটো মানুষটা বৈঠকখানার ভেতরে ঢুকে ওদেরকে খেতে না দেখে উত্তেজনার চোটে যেন লাফাতে শুরু করল।

মাসুম একটা হাত তুলে তাকে শান্ত হতে বলল, 'আপনি অস্থির হবেন না দয়া করে,' মাসুম আবারও খানিকটা অস্বস্তির সাথে একবার বরখার দিকে তাকাল। বরখাও ওর দিকে খানিকটা অস্বস্তির সাথে তাকিয়ে আছে। কিন্তু ধোবলের এসব দিকে কোনো বিকার নেই। সে মহা সমারোহের সাথে উপভোগ করছে পুরো আয়োজন। 'ওদের কোনো দোষ নাই। আমরাই বলছিলাম আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো। আপনিও বসে যান আমাদের সাথে। আমরা ক্ষুধার্ত কিন্তু শুধু খাওয়াটাই মূল বিষয় নয়, আমাদের আসলে অনেক কিছুই আলোচনা করার রয়েছে,' মাসুম একটু অস্বস্তি বোধ করছে। ওরা মূলত এসেছে একটা কাজে, সেই কাজের জন্যে এই লোকটার সাহায্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মানুষটাকে দেখে মনেই হচ্ছে না ওরা কোনো যুদ্ধাবস্থার ভেতরে আছে। কাজ নিয়ে কোনো কথাই নেই, বরং সে ওদেরকে আদর আপ্যায়ন করতে বেশি ব্যস্ত। অস্বস্তির আরও কারণ হলো, ওদের আগমন নিয়ে এখানে এত বেশি হল্লা করা হচ্ছে আর ঢাকঢোল পেটানো হচ্ছে ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগছে না মাসুমের। ওরা এখানে এসেছে খুবই গোপনে কাজ সারার জন্যে আর সেখানে এমন হই-হল্লা আয়োজন ভালো লাগছে না ওর কাছে। কিন্তু একটা মানুষ যদি এত অয়োজন আর উৎসাহের সাথে কিছু একটা করে তাকে বাধা দেওয়া যায় না কোনোভাবেই।

'আমার দুই ছেলের সাথে পরিচিত হোন,' রসুল খাঁ ওদের সাথে দস্তরখানে বসতে বসতে বলে উঠল। 'ও আমার বড়ো ছেলে বাসিম,' মাসুম তাকিয়ে দেখল বাসিমের বয়স ওদের মতোই হবে। লম্বা-পাতলা, মুখে পাতলা দাড়িওয়ালা পাগড়ি পরা ছেলেটার সাথে তার বাপের প্রায় বলতে গেলে কোনো মিলই নেই। এমনকি তার হাবভাবও একেবারে শান্ত। বাসিমের নাম বলতেই সে মাসুমের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে মাথা নাড়ল। ছেলেটাকে ভালোই লাগল ওর কাছে। বাপের মতো বেশি কথা বলে না। 'আর ও হলো আমার ছোটো ছেলে আবদুল্লাহ,' রসুল খাঁর দ্বিতীয় ছেলের বয়েস বেশ কম, একেবারেই কৈশোরের গণ্ডি পার হয়নি এখনও সে। দেখতে একেবারে ভাইয়ের বিপরীত আর বাপের প্রতিচ্ছবি।

ওদেরকে খাবার পরিবেশন করতে করতে রসুল খাঁ সবিস্তারে এই এলাকা আর তাদের বাড়ির ইতিহাস বলতে শুরু করেছিল। কিন্তু তাকে থামিয়ে দিলো তার বড়ো ছেলেই। 'বাবা, প্রথমত উনাদেরকে শান্তিমতো খেতে দিন। আর তাছাড়া আমি যদি ভুল না ভেবে থাকি তবে উনারা এই মুহূর্তে আমাদের পারিবারিক ইতিহাস জানার চাইতে জঙ্গলমহালে কী হয়েছে সেই বিষয়ে জানতে বেশি আগ্রহী হবেন,' বাসিম শেষ কথাটুকু বলে আরেকবার মাসুমের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। মনে মনে ভীষণ কৃতজ্ঞ বোধ করল মাসুম। সে নিজে কিছুতেই উচ্ছ্বসিত মানুষটাকে থামিয়ে দিয়ে কাজের কথা শুরু করতে পারছিল না। বাসিম সেই

কাজটা করে দেওয়াতে খানিকটা হলেও শান্তি পেল ও। তবে সেই সাথে এটাও বুঝতে পারল বাসিম শুধুমাত্র তার বাপের বড়ো ছেলেই নয়, পরিবারের হর্তাকর্তাদের একজন হবে অবশ্যই। কারণ তা না হলে এভাবে বাপের কথার মাঝে তাকে থামিয়ে দিয়ে সে চাইলেই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে পারত না।

'জি, খাঁ সাহেব, শুধু জঙ্গলমহালই নয়, আমি পুরো এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়েই জানতে চাই,' সুযোগ পেয়েই মাসুম বলে উঠল। 'জঙ্গলমহালে আসলে হয়েছিল কী, আর এভাবে সুবাদার আসলাম শেঠের মতো লোক বহিরাগত মোঘলদের কাছে পরাজিত হয়ে গেল, ব্যাপারটা ঠিক মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। আমি তাকে যতটুক চিনতাম অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ মানুষ ছিলো।'

মাসুমের কথা শেষ হতেই রসুল খাঁ একবার বৈঠকখানায় উপস্থিত দুই খানসামার দিকে ফিরে কিছু একটা বলে উঠল, দুজনেই বলতে গেলে প্রায় নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। যাবার সময় রসুল খাঁর ছোটো ছেলেকেও নিয়ে গেল আর বৈঠকখানার দরজাটাও বন্ধ করে দিয়ে গেল।

'আসলে জানেন তো সাবধানে কথা বলতে হয়,' মাসুম রসুল খাঁর গলার স্বর শুনে খানিকটা অবাক হয়ে গেল। এতক্ষণ মানুষটা যেভাবে কথা বলছিল তার গলার স্বর পুরো পালটে গেছে। 'সত্যি কথা হইল পরিস্থিতি খুব বেশি সুবিধার না। প্রথমত, যেহেতু খাঁ-সাহেবের নির্দেশনায় আপনারা এইখানে আসছেন, কাজেই সার্বিক মুল্লুকের পরিস্থিতি তো জানেনেই। এখন ঘটনা হইছে এই এলাকায় সবচেয়ে বড়ো দুই শক্তি আমরা আর সুবাদার আসলাম শেঠের পরিবার। আমগো দুই পরিবারের ভিতরে সম্পর্কও সবসময় খুবই ভালো। মল্লারের যুদ্ধের পরে সুবাদার আসলাম শেঠ একদিন আমার সাথে দেখা করতে আসে। সেই তখন আমারে কিছু বিষয়ে অবগত করে। এর মধ্যে একটা অইল মোঘল সেনাপতি মানসিংহ এই এলাকায় আসতাছে। তার মানে অনেক বড়ো কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। সে আমারে এইটাও বলে সে এই এলাকার ওপরে তার নজর থাকবই, তাই আমগোর সবার সতর্ক থাকা উচিত। আমি প্রথমে তার কথা বেশি গুরুত্ব দেই নাই। আমি আসলে ভাবতে পারি নাই তারা এত দ্রুত কিছু কইরা বসবে। সুবাদার আসলাম শেঠের লগে আলোচনার কয়েকদিন পরেই শুনি জঙ্গলমহালে আক্রমণ হইছে এবং এর নেতৃত্ব দিতাছে বাঙাল মুল্লুকে অবস্থানকারী সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আর হিংস্র মোঘল সেনাপতি বাহরাম খাঁ। যুদ্ধের ময়দানে বাহরাম খাঁর অনেক বদনাম আছে।'

মাসুম মনে-মনে দাঁতে দাঁত পিষলো, বাহরাম আর সে একই বাহিনীর অন্তর্গত ছিল, বাহরামের সাথে তার ভালোই পরিচয় আছে। তাকেও বাহরাম খুব ভালোভাবেই চিনে। 'এইখানে আমার একটা কথা আছে,' খেতে খেতে হঠাৎ মাসুম জানতে চাইল। 'এই এলাকাতে মোঘলগোর আনাগোনা তো আগে থেইকাই ছিল।

কারল জঙ্গলমহাল আর আপনাগো এলাকা দুইটাই ভূঁইয়াগো শক্তিশালী খুঁটি। কিন্তু মোঘলরা পুরোদস্তুর বাহিনী নিয়া আক্রমণ কইরা ফালাইলো আর আপনারা কেউই কিছু টের পাইলেন না, বিষয়টা কেমন জানি হয়া গেল না?' যদিও প্রশ্নটা করতে খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছিল মাসুম, কিন্তু অবশেষে আর থাকতে না পেরে বলেই ফেলল।

রসুল খাঁ জবাব দেবার আগে তার ছেলে বাসিম কথা বলে উঠল, 'আপনার কথার সাথে আমি পুরেপুরি সহমত পোষণ করি, এইখানে আমাদেরও ব্যর্থতা আছে। শুধু আমরা না এমনকি সুবাদার আসলাম শেঠেরও ব্যর্থতা আছে। তাদের জাসুস বাহিনী আমাদের চেয়েও শক্ত, কিন্তু তারাও আগে থেইকা কিছু ঠাওর করতে পারে নাই। আরেকটা কথা বলি, আপনারা জানেন কি না, মানসিংহ কিন্তু এখন এইখান থেইকা বেশি দূরে নাই, সে এগারো সিন্ধুতে অবস্থান করতাছে এখন সে।'

বাসিমের শেষ কথাটা শুনে তার দিকে চোখ তুলে তাকাল মাসুম। আনমনেই মাথা নাড়ল সে। 'একদিকে জঙ্গলমহাল আর অন্যদিকে এগারো সিন্ধু, মাঝখানে খালি আপনারা। আপানাদেরও তো সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা উচিত,' কথাটা মাসুমের মুখ দিয়ে আপনাতেই বেরিয়ে গেল।

'আমরা আছি, যতটুকু সম্ভব, আপনার সাথেও এই বিষয় নিয়া আলোচনা আছে,' বাসিম কথাটা বলে তার বাপের দিকে তাকাল সম্ভবত পূর্বের আলোচনায় ফেরার জন্যে। 'তারপর বলেন, আব্বা হুজুর।'

'যাই হোক, আক্রমণের খবর যখন শুনলাম এমনকি মোঘলরা আক্রমণ করছে শুইনাই আমরা খুব বেশি বিচলিত বোধ করি নাই। কারণ আমরা জানতাম একদিকে জঙ্গলমহাল অত্যন্ত শক্তিশালী ঘাঁটি, তার ওপরে আসলাম শেঠ বহু যুদ্ধের দক্ষ সেনাপতি। তার ওপরে আমরা যেকোনো সময় ছিপ আর কোষায় কইরা তাগোরে সাহাইয্য পাঠাইতে পারবো।'

'কিন্তু আদতে সেইটা হয় নাই,' মাসুমের পাশ থেকে বরখা বলে উঠল। 'কারণ কী?' অনেকক্ষণ পরে কথা বলল সে। বরখার প্রশ্ন শুনে ধোবল একবার চোখ তুলে তাকাল কিন্তু খুব বেশি সময় মনোযোগ ধরে রাখতে পারল না, আবার সে খাবারে মনোনিবেশ করল।

রসুল খাঁ তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে কথার তুবড়ি ছোটাতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই তার ছেলে বাসিম কথা বলে উঠল। 'এইখানে মোঘলদের চালাকি আছে, আমাদের গাফিলতিও আছে আর সুবাদার চাচার কিছু বোকামি আছে,' শেষ কথাটা বলে সে সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। 'দুঃখিত আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি উনাকে অত্যন্ত ভালোবাসতাম, এমনকি আমি মধ্যপ্রাচ্যে পড়ালেখা করতে গিয়েছিলাম তার যোগাযোগের মাধ্যম ধরেই। কাজেই তাকে

ছোটো করার বা হেয় করার প্রশ্নই আসে না। আমি একটু একটু করে বলতাছি। প্রথম মোঘলদের চালাকিটা হলো ওরা মল্লারের যুদ্ধের সময়ে যখন বুঝতে পারে আমাদের সাথে আসলে সেইভাবে পাইরা উঠবে না, তখন থেকেই নিজেগো আখের গুছায়ে চারপাশে নিজেগো শক্তি ছড়ায়া দিতে শুরু করে। মোদ্দাকথা হইল, ওরা নিজেগো শক্তি বৃদ্ধি করতে শুরু করেছিল এটা আমরা তো বটেই এমনকি খাঁ-সাহেবরাও পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারে নাই। এরপরে যখন দক্ষিণে মানে আপনাদের ওদিকে ওরা ঝামেলা করা শুরু করল, বিশেষ করে শাহবাজ খাঁর বাহিনী তখনও আমরা আসলে বুঝতে পারিনাই ওরা এত দ্রুত একই সময়ে উত্তরেও হামলা চালাবে। এইখানেই আমাগো গাফিলতি, কিন্তু আমার কথা হইল সুবাদার চাচাই আমগো মাঝে সবার আগে এই বিষয়ে ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন কিন্তু তিনি নিজের জঙ্গলমহালের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সেভাবে বৃদ্ধি করার খুব বেশ তাগিদ অনুভব করেন নাই। এইখানেই উনার বোকামি ছিল।'

'এই বিষয়ে আপনারা নিশ্চিত?' এবার মাসুম জানতে চাইল তার খাওয়া প্রায় শেষ দিকে। 'এমনও তো হইতে পারে হয়তো মোঘলরা অনেক বেশি শক্তি নিয়ে আঘাত করেছিল তাদের ওপরে। কারণ আমি এর আগে জঙ্গলমহালে একবার গেছিলাম। যদিও সেইটা অনেক আগে, কিন্তু পরিষ্কার মনে আছে জঙ্গলমহাল অত্যন্ত সুরক্ষিত একটা কেল্লা।'

'আসলে ওইখানে যে কী হইছিল কোনোটাই সঠিকভাবে জানা যায় নাই,' এবার রসুল খাঁ বলে উঠল।

'কারণ কী? আমি তো জানি আক্রমণের প্রায় সাথে সাথে জঙ্গলমহাল থেইকা বৃদ্ধ, শিশু আর মহিলাদের একটা দলকে আপনাদের এখানে সরিয়ে ফেলা হয়। তাহলে ওরা আসতে পারল কিন্তু আপনারা যাইতে পারলেন না,' মাসুম মনে মনে আবারও অস্বস্তি বোধ করল। কে জানে তার কথাগুলো জেরার মতো শোনাচ্ছে কি না। কিন্তু তাকে পরিস্থিতি বুঝতে হবে।

'ওরা নিতান্তই বৃদ্ধ-শিশু আর ভেতর বাড়ির লোকজন। ওরা তেমন কিছুই বলতে পারে নাই। যাকগে,' রসুল খাঁ বলে চলল। 'জঙ্গলমহালের পতন কীভাবে হইছে সেইটা জানা এখন জরুরি না। জরুরি যেইটা সেইটা হইল আক্রমণ শোনার পরে প্রথম লোকজন যখন চইলা আসল। আমরা প্রায় সাথে সাথেই দ্রুততম সময়ে আমগো লাঠিয়াল আর আর ছিপ নৌকার একটা বাহিনী পাঠাইছিলাম কিন্তু ওরা কিছুই করতে পারে নাই এর আগেই মোঘল সেনাপতি বাহরাম খাঁর বাহিনী পুরা এলাকার স্থল আর জলপথ দুইটারই দখল নিয়া নেয় এমনকি আমগো বাহিনীর লগে ওগোর কিছু খণ্ডযুদ্ধও হইছে। আমগো বাহিনী কিছুই করতে না পাইরা ফিরা আসছে। বাকিটা তো আপনারা জানেনেই।'

'আরেকটা বিষয়,' মাসুম নিজের হাত মুছতে মুছতে বলে উঠল, 'শোনা গেছে জঙ্গলমহালের পতনের ঠিক আগেই নাকি সুবাদারের স্ত্রী আর তার বিশ্বস্ত কয়েকজন লোক ভিতরের জঙ্গল আর জংলার দিকে সইরা পড়ছে, কথাটা কতখানি সত্যি?'

'এইটা আমি ভালো বলতে পারবো,' বাসিম আবারও কথা বলে উঠল। 'আপনারা তো সেই উদ্দেশ্যেই আসছেন তাই না?' মাসুম মাথা নেড়ে সায় জানাল। 'সুবাদার আসলাম শেঠ অত্যন্ত অভিজ্ঞ আর বিচিত্র কাজকারবারের লোক ছিলেন। কথিত আছে উনার অনেক রহস্যময় ব্যাপারও নাকি ছিল। আপনারা কি জানেন উনার স্ত্রী পারস্যের বিশেষ গোত্রের মহিলা ছিলেন?'

মাসুম আর বরখা মাথা নেড়ে সায় জানাল। 'ওইরকমই তো শুনছি,' দুজনেই অনেকক্ষণ পর ধোবলের গলা শুনে বেশ অবাক হয়ে ফিরে তাকাল সেদিকে। খাওয়া শেষ করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে সে এখন ওদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

'হ্যাঁ, আপনারা ঠিকই শুনেছেন। আমরা ধারণা করতেছি সুবাদার আসলাম শেঠ যখন বুঝতে পারে জঙ্গলমহাল পতনের দ্বারপ্রান্তে, অর্থাৎ কেল্লার পতন স্রেফ সময়ের ব্যাপার তখন সে নিজে থেকেই নিজের বাহিনী নিয়ে সামনে সরে আসে সরাসরি যুদ্ধে। এই কাজটা সে করে সম্ভবত,' শেষ শব্দটার গুরুত্ব বোঝানোর জন্যে দুবার উচ্চারণ করল সে। 'তার স্ত্রী এবং তার সাথের লোকদেরকে পালানোর ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যে।'

'এইখানে আমার একটা কথা বলার আছে,' মাসুম কথাটা শুরু করলেও তাকে থামিয়ে দিলো রসুল খাঁ।

'একটু আপনাগো, মিষ্টি পান আর তামুক পরিবেশন করতে বলি,' রসুল খাঁ ঠিক আগের মতোই তার অতিথি সৎকারের সুরে বলে উঠল। মাসুম একবার মানা করতে চাচ্ছিল কিন্তু তারও তামাকের তেষ্টা পেয়েছে, তাই আর মানা করল না। রসুল খাঁ দরজা খুলে তালি বাজিয়ে খানসামাদেরকে ডাকতেই কিছুক্ষণের ভেতরে ওদেরকে মিষ্টি পান আর সিলিম সাজিয়ে তামাক পরিবেশন করা হলো।

সাজানো বাটা থেকে পান তুলে নিয়ে মুখে পুরে গড়গড়ার নলটা টেনে নিয়ে তাতে দুটো টান দিলো মাসুম। এরকম চিন্তিত পরিস্থিতিতেও ওর মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। জীবনে যেই অবস্থায় যেই পরিস্থিতিতেই থাকুক না কেন, ছোটো ছোটো জিনিসগুলো উপভোগ করার কোনো বিকল্প হয় না। এইটাই তো জীবন।

'জি, রসুল খাঁ সাহেব, আমার একটা কথা জানবার আছে। আমি এখন পর্যন্ত যা বুঝতে পারছি তাতে আমার তিনটা প্রশ্ন আছে। প্রথমত, আপনাদের বক্তব্য অনুযায়ী জঙ্গলমহালকে বাহরাম খাঁর লোকেরা এমনভাবে ঘিরা ফেলছিল তাতে

ওগো পালাবার কোনো পথ ছিল না। যেইখানে আপনাদের শক্তিশালী বাহিনীই ঢুকতে পারে নাই, সেইখানে কয়েকজন নারী আর তার সাথের লোকজন জঙ্গলমহাল থকে পালালো কীভাবে?'

'এর উত্তর আমি দিতে পারবো,' বাসিম নিজেও পান চিবুতে চিবুতে বলে উঠল। 'আমি আরবদেশ থেকে পড়ালেখা করে ফিরে আইসা গত কয়েক বছর ধইরা এই এলাকা আর রাজনীতি বোঝার চেষ্টা করতেছি। আর তাতে একটা তথ্য আমার কাছে আছে, জঙ্গলমহালের অনেক রহস্য অছে। আর অবশ্যই জঙ্গলমহালের গোপন পথ ছিল যেদিক দিয়ে তারা সম্ভব সুবাদার আসলাম তার স্ত্রী এবং ওদেরকে পলাইতে সাহায্য করছে। কাজেই তারা পলাইতে পারছে এটা শুধুমাত্র গুজব না যুক্তিনির্ভর অনুমানও বটে। আপনার দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা?' বাসিম সরাসরি তাকিয়ে আছে মাসুমের দিকে।

মাসুম আনমনেই মাথা নাড়ল। এই ছেলেটাকে তার ভালো লাগতে শুরু করেছে। এর বুদ্ধিমত্তা দারুণ। 'আমার দ্বিতীয় কথা হইল, তারা যদি পলাইয়া থাকে, তবে মোঘলদের চষে বেড়ানোর পরও পুরা এলাকাতে তারা টিকা আছে ক্যামনে বিগত কয়েকদিন? এইটা কি প্রায় অসম্ভব না?'

'আমি বলব?' রসুল খাঁর দিকে তাকিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করতেই বাসিমকে মাথা নেড়ে সায় জানাল রসুল খাঁ। 'আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে এই এলাকার ভৌগোলিক কিছু বিষয় আপনাগো বুঝতে হবে এবং এখানকার পরিস্থিতি আর রাজনীতিরও খানিকটা অংশও।'

'আমি জানতে আগ্রহী,' মাসুম বেশ দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলে উঠতেই, তাকে সায় জানাল তামাক টানতে থাকা বরখা আর ধোবল।

'আমরা যদি ওইখানে গিয়ে কিছু করতে চাই তাইলে আমাদের সব বুঝতে হবে।'

'অবশ্যই, আমি বুঝতে পারছি। এই কারণেই আপনাদেরকে এত বিস্তারিত বলা সবকিছু এবং আরও কারণ আছে সেগুলোও বলবো এবং,' বলে সে আবারও দরজার কাছে গিয়ে দরজাটা ভালোভাবে আটকে দিলো ভেতর থেকে। 'প্রথমেই এই এলাকার ব্যাপারে খানিকটা বলে নেই। আমি শুনেছি আপনি এই এলাকাতে আগেও এসেছেন,' এই কথাটা সে মাসুমের উদ্দেশ্যে বলে উঠল।

'হুম, শুধু আমি না, ধোবলেরাও,' বলে সে তামাক চিবুতে থাকা ধোবলের দিকে দেখাল। 'এই এলাকার সাথে পারিবারিক সম্পর্ক আছে। কাজেই আমরা দুজনেই এই এলাকার ব্যাপারে মোটামুটি ধারণা রাখি। একেবারেই ধানি এলাকা এইটা। পুরো এলাকাটা দুইভাগে বিভক্ত, উজান আর ভাটি। আপনাদের এইদিক

থেকে একেবারে এগারো সিন্ধু পর্যন্ত উজান আর জঙ্গলমহালের প্রায় পুরো এলাকাটাই ভাটি এলাকা। চারপাশে নদী, খাল, বিল আর হাওড়ে ছাওয়া পুরো এলাকা।'

'পানির নানা ধারায় তো ছাওয়া আছেই তারচেয়ে বড়ো কথা হলো পানির ধারা সাথে সাথে জঙ্গলেও ছাওয়া আছে পুরা এলাকা,' রসুল খাঁ কথা বলে উঠল। 'এক কাম করি, আমার বাহিনীর প্রধান শেরুরে আসতে বলি।'

'আর ওরে আমগো কাপড়ের মানচিত্রগুলাও আনতে বইলো,' বাসিম বলে উঠল। তার বাপ বিদেয় নিতেই সে বলে যেতে লাগল। 'হ্যাঁ, কী জানি বলতেছিলাম?'

'আমি বলতেছিলাম আমি এই এলাকা সম্পর্কে সার্বিক ধারণা রাখি তবে সত্যি কথা হলো সার্বিক ধারণা রাখা এক জিনিস আর একেবারে নির্দিষ্টভাবে এলাকার সম্পর্কে জানা ভিন্ন কথা। এইটা বুঝতে পারছি যেহেতু ভাটিতে অবস্থিত জঙ্গলমহাল এলাকার পুরাটা জুইড়াই নানা ধরনের ছোটো-বড়ো পানির ধারা আর জঙ্গলে ছাওয়া পুরো এলাকা।

'সেই সাথে ছোটো বড়ো ফসলি হাওড়ও আছে। আর এইসব হাওড়গুলারে আমরা বলি বিধায়ী, বিধায়ীর নানা জায়গায় ছোটো বড়ো নানা ধরনের দ্বীপও থাকে। দ্বীপ বলতে এখন যেহেতু বর্ষাকালের সায়াহ্নে কাজেই বেশিরভাগ হাওড়গুলা ডুবে গেছে পানিতে আর ছোটো ছোটো গ্রামগুলো হয়ে গেছে দ্বীপের মতন। এইসব দ্বীপগুলোর ভিতরে কিছু দ্বীপে মানুষের বসবাস আছে আবার কিছু দ্বীপ একেবারেই খালি।'

রসুল খাঁর সাথে বিশালদেহী পালোয়ানের মতো এক লোককে নিয়ে প্রবেশ করল বৈঠকখানার ভেতরে।

'ও হইল শেরু, আমার স্থল বাহিনীর প্রধান,' বলে সে শেরু নামের লোকটার চওড়া কাঁধে একটা চাপড় মারল। 'শেরু হইল অত্র এলাকার সবচেয়ে বড়ো পালোয়ন এবং সেরা তলোয়ার আর লাঠির ওস্তাদ।'

'সালাম হুজুর,' লোকটার বিশাল আকৃতি আর ভয়ঙ্কর চেহারার তুলনায় তার গলার স্বর অনেকটাই পাতলা। শুনতে অস্বাভাবিক লাগে।

'যা আনতে বলছি আনছ?' বাসিম জানতে চাইল

'জি, হুজুর,' বলে সে গোল করে পাকানো কাপড় খুলে ওদের সামনে মেলে ধরে বাসিমের হাতে একটা ছোটো কাঠির মতো ধরিয়ে দিলো। ওরা সবাই বিছানো কাপড়ের মানচিত্রটাকে ঘিরে দাঁড়াল।

'মনোযোগ দিয়ে দেখেন, এইখানে বলতে গেলে প্রায় পুরা এলাকারই মানচিত্র আছে। একেবারে ছোটো নদী-নালাগুলান না থাকলেও বড়ো বড়ো পানির ধারা

আর মূল জঙ্গলের বলতে গেলে প্রায় সবই আছে,’ বলে সে হাতে ধরা কাঠিটা দিয়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দেশ করল। ‘এইটা হইল আমগো আবাসস্থল। মানে আমরা এখন এইখানে আছি। এইখান থেকে–’ সে কাঠিটাকে সরিয়ে নিতে নিতে দেখাতে লাগল। ‘–এইদিকে মাইল পনেরো আগাইলে জঙ্গলমহাল,’ বলে সে কাঠিটা গোল করে একটা এলাকা নির্দেশ করল। ‘এইটা পুরাটাই জঙ্গলমহাল। এখন পুরাটা মোঘলবাহিনীর হাতে, এই এলাকার দখলে আছে বাহরাম খাঁ,’ বাসিম নামটা উচ্চারণ করতেই আনমনেই মাসুম নিজের দাড়িতে একবার হাত বুলাল। চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল, ‘বাহরাম খাঁ,’ তার কথা কেউ শুনতে পেল না। বাসিম বলে চলেছে।

‘আর এই এলাকার পুরাটাই বলতে গেল এখন মোঘল নজরদারিতে আছে,’ বলে সে জঙ্গলমহালের দিকে নির্দেশ করল। ‘এইটা হইল জঙ্গলমহালের সামনের ভাগ। এই এলাকা দিয়া মোঘলগোর নজর এড়ায়া একটা মাছিও ঢুকতে পারব না। এইটা হইল অন্যপাশ এদিকেও একই অবস্থা এদিকটা মোঘলগোর দখলে থাকলেও এদিক দিয়া কেউ সইরা পড়তে পারলে আমরা টের পাইতাম। তারমানে একটা দিকই বাকি থাকল যদি জঙ্গলমহাল থেইকা কেউ সইরা যাইতে পারে তবে অবশ্যই অবশ্যই এইদিকে গেছে। সে জঙ্গলমহালের পেছনের একটা নির্দিষ্ট দিকে নির্দেশ করল।

‘কী আছে ওইদিকে?’ মাসুম নিজের দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে জানতে চাইল।

‘প্রথমে বলতে হয় ছোটো-বড়ো বেশ কিছু খাল-বিল, সেগুলা গিয়া মিশছে বমার নদীতে, বমার নদীর একটা অংশ আবার গিয়া মিশছে ছোটো ছোটো দুইটা হাওড়ে। আর পুরা এলাকা আবার ছাওয়া জল-জঙ্গল নামে একটা ছড়ানো-ছিটানো জঙ্গলে। যদি জঙ্গলমহাল থেইকা কেউ সইরা গিয়ে থাকে এইদিকেও যেকোনোখানে থাকতে পারে,’ বলে সে কাঠিটা দিয়ে একটা বৃত্তের মতো এঁকে দেখাল।

মাসুম চিন্তিত ভঙ্গিতে নিজের দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে মানচিত্রে নজর বুলাচ্ছে। ‘তারমানে আমরা যদি অনুসন্ধান চালাইতে চাই তবে এইখান থেকে মোঘলগোর রাজত্ব পার হইয়া, জঙ্গলমহাল যেইটা মোঘলগোর দখলে সেইটা পার হইয়া ওই এলাকায় ঢুইকা তাগরে খুঁইজা বাইর কইরা তারপর আবার সব পার হয়া ফিরা আসতে হইব,’ প্রতিটা শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথে মাসুমের ভ্রু কুঁচকে উঠছে। ‘এইটা তো খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার চেয়েও কঠিন।’

মাসুমের কথা শুনে ধোবল আর বরখা দুজনেরই চোখ কপালে উঠে গেছে। কিন্তু বাসিম হেসে উঠল। ‘আপনে স্রেফ অর্ধেক বলছেন, জনাব। আপনে খড়ের

গাদায় সুচ খোঁজার কথা বলছেন। এই সুচ আদৌ গাদাতে আছে কি না–আমরা কেউই জানি না। এই সুচ আবার বহুলোকে খুঁজতাছে। আর এইটা শুধু খুঁইজা পাইলেই হবে না। এইটারে আবার নিয়া ফিরা আসতে হবে।'

মাসুমের ভ্রু আবারও কুঁচকে উঠল। 'একটা কথা বুঝলাম না, বহু লোকে খুঁজতেছে বলতে আপনে কি বুঝাইলেন, মোঘলরা?'

'আপনারে আমি আলোচনার শুরুতে বলছিলাম এই এলাকা সম্পর্কে ধারণা দিবো, এরপরে এই এলাকার রাজনীতি সম্পর্কে বলব। এইবার সময় আসছে রাজনীতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার। জঙ্গলমহালের যেই এলাকা আপনারা দেখলেন ওই এলাকার একটা বিশেষত্ব হইল ওইটা বমার নদীর মাধ্যমে ওপরে উত্তর, বাঁয়ে পশ্চিম আর ডাইনে পূর্বের সাথে একটা যোগাযোগ আছে। এইখানে আমগো একটা সুবিধা হইল আমগো এলাকা পুরাটাই আমগো দখলে, কারণ এইটা কারও সাথে সংযুক্ত না। এই কারণে আমগো এইদিকে যেমন পুরাটাই নিজেগো নিয়ন্ত্রণে, সাথে আবার অসুবিধা হইল আমগো আয়ও, কম প্রভাবও কম জঙ্গলমহালের তুলনায়। মোঘলরা ওইদিকে আগে আক্রমণ চালানির এইটাও একটা কারণ। একেবারে মেঘালয় থেইকা শুরু কইরা আসাম এমনকি ত্রিপুরার অনেক ব্যবসায়ী এই বাংলা হয়া বৃহত্তর হিন্দুস্থানের দিকে যাবার পথের সাথে সংযুক্ত ওই এলাকা দিয়া। এই কারণে সুবিধা-অসুবিধা দুইটাই আছে। জঙ্গলমহাল দখল করলেও মোঘলরা পুরা এলাকা নিশ্ছিদ্রভাবে আটকাইতে পারে নাই–এর কারণ হইল পুরা এলাকা অটাকায়া দিলে নিম্নবিত্ত থেইকা শুরু কইরা বহু মানুষের অনেক ক্ষতি হইবে। আবার আরেকটা অসুবিধা হইল লোকের সমাগমের কারণে যেই এলাকা দেখাইলাম সেই এলাকা ছোটো বড়ো ডাকাইত থেইকা শুরু কইরা বহু স্বাধীন রাজ রাজাদের বাহিনীর সমাগম ওই এলাকায়। আর ইতিমধ্যেই খবর ছড়াইয়া গেছে জঙ্গলমহালের পতনের পর ওই এলাকাতে সুবাদার আসলাম শেঠের স্ত্রী বহু সম্পদ নিয়া পলায়া গেছে। কাজেই এই সুচ এমন যার পিছনে এখন বহুত লোক লাগছে,' বলে বাসিম নিজের মুখটা বাঁকায়া একটা বিশেষ ভঙ্গি করল।

'খুব ভালো অবস্থা বুঝতে পারছি,' বাসিমকে ভেংচে দিয়ে ধোবল বলে উঠল।

'তাহলে এখন উপায় কী? আমার প্রশ্ন হইল ওই এলাকায় গিয়া উদ্ধার অভিযান তো পর, মোঘলগোর নজর এড়ায়া তো আমরা ঢুকতেই পারব না। এর আগেই শেষ। তাহলে উপায় কী এখন?' নিজের প্রশ্নের শুরুতে আর শেষে একই কথার পুনরাবৃত্তি করল মাসুম।

'উপায় একটা আছে,' এবার কথা বলে উঠল রসুল খাঁর বাহিনীর প্রধান শেরু। 'মানে আমরা ভাইবা বাইর করছি আরকি, কিন্তু মারাত্মক ঝুঁকি আছে এতে।'

তার কথা শুনে নিষ্ঠুর একটা হাসি ফুটে উঠল মাসুমের মুখে। নিজের দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে সে একবার ধোবল আর বরখার দিকে দেখে নিয়ে বাটা থেকে এটা পান তুলে মুখে পুরে সরাসরি বাসিম আর শেরুকে একবার দেখে নিয়ে রসুল খাঁর দিকে দৃষ্টি স্থির করল। 'আপনাগো কি মনে হয় আমরা এইখানে আসছি ক্যান? ঝুঁকি আছে বইলাই তো আমরা আসছি। আমরাও দেখব কতবড়ো ঝুঁকি আছে।'

অধ্যায় আট

বর্তমান সময়

পিবিআই অফিস, ধানমন্ডি

সাহস করেই কামরাটায় ঢুকে বাশারের নাকটা কুঁচকে উঠল।

পিবিআইয়ের স্পেশাল উইংয়ের প্রধানের কামরার ভেতরে প্রবেশ করতেই দুই ধরনের গন্ধ এসে নাকে বাড়ি মারল বাশারের। সাথে সাথে ভ্রু কুঁচকে উঠল ওর। কারণ দুটো গন্ধই বেশ অদ্ভুত এবং এর ভেতরে একটা গন্ধ সে ভালোভাবেই চিনতে পেরেছে। কড়া জর্দার গন্ধ, বিশেষভাবে বলতে গেলে হাকিমপুরি মিক্সার জর্দার গন্ধ। *আজব অবস্থা! এমন সফিসটিকেটেড অফিসে পান খায় কে?* কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করেই সে সামনে ফিরে তাকাল।

প্রথমেই চোখে পড়ল কামরার বিরাট জানালাটা। ঠিক কোনদিকে অবস্থিত সেটা ঠাওর করতে না পারলেও বাশার অনুমান করে নিলো জানালাটা দক্ষিণ দিকেই হবে। জানালার সামনে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মধ্যম উচ্চতার হ্যাংলা-পাতলা সুদর্শন একজন মানুষ। মাথায় ধূসর চুল, মুখে পালিশ করা কাঁচা-পাকা দাড়ি, পরনে ফরম্যাল ব্রাউন ট্রাউজারের ওপরে সাদা সিল্কের শার্ট আর তার ওপরে ভেস্ট। সাদা শার্টের সাথে কনট্রাস্ট ম্যাচিং করা ব্রাউন টাই। মানুষটা সামান্য বাঁকা হয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কারও সাথে কথা বলছিল, হাতে সিগারেটের চেয়ে সরু খয়েরি রংয়ের একটা সিগার, সেটা থেকে নীলচে ধোঁয়া উঠছে। বাশার এবার ধরতে পারল দ্বিতীয় গন্ধের উৎস তাহলে এই সিগার। এই গন্ধটা নির্দ্বিধায় জর্দার গন্ধের চেয়ে অনেক ভালো।

'স্যার, ইন্সপেক্টর আহমেদ বাশার,' মৌসুমি ডেস্কের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে উঠল। 'বাশার, হাবিব আনোয়ার পাশা স্যার।'

বাশার ডেস্কের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হাবিব আনোয়ার পাশা হেলান দেওয়া থেকে সোজা হয়ে স্মার্ট ভঙ্গিতে ডান হাতে ধরা সিগারটা বাঁহাতে চালান করে দিয়ে ডান হাতটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'ওয়েলকাম মাই বয়, আমি আমজাদের কাছে তোমার কথা অনেক শুনেছি।'

বাশার শুকনো শক্তিশালী হাতটা ধরতেই জোরে একটা ঝাঁকি দিলো হাবিব আনোয়ার পাশা। মানুষটার বয়স হবে ষাটের আশপাশে অনুমান করল বাশার কিন্তু সেই হিসেবে তার হাতের জোর বেশ অবাক করার মতোই। ও নিজেও মৃদু ঝাঁকি দিয়ে সামান্য হেসে বলে উঠল, 'থ্যাংক ইউ, স্যার, আসলে আমিও আপনার কথা এতবার শুনেছি,' সে নিজে যে হাবিব আনোয়ার পাশার একজন ফ্যান সেটা বলতে গিয়েও বেশ দ্বিধা বোধ করাতে কথাটা আর বলল না। 'স্যার, অনেক ধন্যবাদ যে আপনি স্পেশাল টিমের একজন হিসেবে আমার কথা ভেবেছেন স্যার। আমি সত্যি অনারড।'

হাবিব আনোয়ার পাশা নিজের রিভলভিং চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে সেটাতে বসতে বসতে সিগারে দুটো টান দিয়ে সেটা অ্যাশট্রের ওপরে রেখে দিলো। 'আসলে এইক্ষেত্রে আমার চেয়ে তোমার বস এসপি আমজাদ আনোয়ার আর আমার স্পেশাল এজেন্ট তানভীর মালিকের ভূমিকা বেশি। সিলেটে হাসপাতালে বসে তোমার ফাইল পড়ে ও-ই তোমাকে রিকমেন্ড করেছে। বিশেষ করে টুইন কালীর কেসটাতে তুমি বেশ ভালো কাজ দেখিয়েছ, বলতেই হবে। এরকম একটা কেস সলভ করা মুখের কথা না। তাও তোমার ক্যারিয়ারের যে পর্যায়ে তুমি ওই ধরনের ঝুঁকি নিয়েছ সেটা বেশ প্রশংসার দাবি রাখে,' বলে সে নিজের মুখটাকে বাশারের দিকে খানিকটা এগিয়ে বলে উঠল। 'শোনো, বাশার, যেটা প্রশংসা করার মতো বিষয় সেটার প্রশংসা করতে আমার কোনো দ্বিধা নেই, তবে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে উলটোটাও ঠিক,' মুহূর্তের জন্যে মানুষটার চোখের ভাষা যেন একেবারে বদলে গেল, সাথে সাথে বাশার অনুভব করতে পারল কেন মানুষটাকে বাংলাদেশের আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার ভেতরে লিজেন্ড বলে ভাবা হয়। মানুষটার হাসিখুশি প্রফুল্ল ব্যক্তিত্বের ভেতরে যে অত্যন্ত শক্তিশালী আর কঠোর একজন মানুষ আছে, সেটা বলতে কোনো দ্বিধা নেই।

'জি স্যার,' বাশার শুধু এটুকু বলল।

'মৌসুমি আমাদেরকে কফি দাও, তোমার ওই স্পেশাল কফি, বাশার নতুন এসেছে; ওর জন্যে স্পেশাল কফিই দরকার আজকে,' বলে সে টেবিলের অন্যপাশের দিকে তাকাল। 'পাটোয়ারি, তুমি কফি খাবে?' হাবিব আনোয়ার পাশা কথাটা যাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে, তাকে এই প্রথমবারের মতো খেয়াল করল বাশার। টেবিলের অন্যপাশের বিরাট কুশনের চেয়ারটাতে মানুষটা এমনভাবে বসে আছে তাকে খেয়ালই করেনি ও। দেখার পর ভালোভাবে খেয়াল করে খানিকটা অবাক হলো ও সেই সাথে স্বস্তিও পেল। অবাক হবার কারণ ঢিলা শার্ট আর পুরনো গোল টুপিপরা ছাগুলে দাড়িওয়ালা মানুষটাকে কোনো এক অদ্ভুত কারণে কেন জানি বেশ বেমানান লাগছে এখানে, আর স্বস্তির কারণ হলো মানুষটাকে জাবর কাটার

মতো মুখ নাড়তে দেখে রুমে প্রবেশকরা মাত্রই পাওয়া জর্দার গন্ধের রহস্যের সমাধান করতে পারল ও। এই মানুষটাই পান খাচ্ছে এবং জর্দার গন্ধটাও তার কাছ থেকেই আসছে।

'নাহ, তুমগো ওই কফি-টফি আমার পুষায় না, আমি আরেকটা পান খামু,' মানুষটা মুখ খোলামাত্রই তার চল ভাষায় শোনা কথাগুলো আরও অবাক হয়ে গেল বাশার। কিন্তু মানুষটার অন্য কোনোদিকে খেয়াল নেই, সে তার সামনে ডেস্কের ওপরে রাখা স্টিলের পানের কেস থেকে একটা খিলিপান বের করে আয়েশ করে সেটাকে মুখে পুরে দিয়ে সরাসরি ফিরে তাকাল বাশারের দিকে। বাশার তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি দিতে যাচ্ছিল লোকটার করা প্রশ্ন শুনে সে বেশ থতমত খেয়ে গেল।

'ওই পোলা তোমার হাতে মাইয়াগো আংটি ক্যান?' প্রশ্নটা এমনভাবে উচ্চারণ করল আর এমনভাবে সে সরাসরি তাকিয়ে আছে বাশারের দিকে, মুহূর্তের জন্যে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল সে। আমতা আমতা করে জবাব দিতে যাচ্ছিল কিন্তু সে মুখ খোলার আগেই আবারও মানুষটা বলে উঠল। 'আংটিটা তোমার মায়ের, তাই না?' এবার তার গলার স্বর যেন অনেকটাই বদলে গেছে। একেবারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে বাশারের দিকে। 'মৃত মায়ের স্মৃতি তাই না?'

বাশার আর যাই হোক এমন কিছু আন্দাজ করতে পারেনি। সে অবাক তো হলোই কেমন জানি বোকা বোকা অনুভব হতে লাগল ওর। ক্ষণিকের জন্যে সে কেন জানি দিশেহারা বোধ করল। 'ইয়ে জি, এক্সকিউজ মি,' বলে সে হাবিব আনোয়ার পাশার দিকে ফিরে তাকাল। 'স্যার–' কিন্তু সে কথা শেষ করার আগে হাবিব আনোয়ার পাশাই কথা বলে উঠল, সে একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলে উঠল। 'আমি এক্সট্রিমলি সরি, পাটোয়ারির সাথে তোমাকে পরিচয় করাতে ভুলে গেছি। ও হলো আলীম পাটোয়ারি, ডক্টর আলীম পাটোয়ারি। ও হলো আমাদের স্পেশাল উইংয়ের রিসোর্স ও রিসার্চ সেকশনের হেড। ওর দায়িত্বেই সবগুলো ফরেনসিক ল্যাব বানানো হচ্ছে তুমি হয়তো ডক্টর মনিকার নাম শুনেছ। ডক্টর মনিকা পাটোয়ারির আন্ডারেই কাজ করছে।'

হাবিব আনোয়ার পাশার শেষ কথাটা শুনে বাশার বেশ অবাক হলো। স্ট্যানফোর্ড গ্র্যাজুয়েট ডক্টর মনিকা এই লোকের অধীনে কাজ করে, ব্যাপারটাকে ঠিক মেলাতে পারল না ও। তবে লোকটা যেভাবে কথা বলেছে এবং যে প্রসঙ্গে কথাটা বলেছে তাতে বাশার এটা বুঝতে পেরেছে লোকটাকে দেখে তার ব্যাপারে আন্দাজ করে নিলে ভুল হবে। যেমন এই মুহর্তে পান মুখে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে সে চোখ বন্ধ করে আরাম করে পান চিবুচ্ছে। 'পাটোয়ারি, তুমি তো বাশারকে চেনোই।'

হাবিব আনোয়ার পাশা পাটোয়ারির সাথে কথা বলিয়ে দেওয়াতে বাশার কিছু বলবে কি না ঠিক সেটা ভেবে বের করার আগে পাটোয়ারিই হাত নেড়ে বলে উঠল। 'হাবিব, কাজের কথা শুরু করো।'

'ওহ, ইয়েস,' বলে সে ডেস্কের পেছন দিকে দেখাল। 'ওই যে কফি চলে এসেছে,' মৌসুমি একটা কাপ প্রথমে হাবিব আনোয়ার পাশার সামনে রাখল, তারপর বাশারকে একটা কাপ ধরিয়ে দিয়ে নিজেও তৃতীয় কাপটা নিয়ে বসে গেল একটা চেয়ার টেনে। এই ব্যাপারটা বাশারের কাছে বেশ ভালো লাগল। এতটা ক্যাজুয়াল কিন্তু এক্সেপ্টেড পরিবেশ সে এর আগে কোনো সরকারি অফিসে পায়নি।

'যাক ভালো করেছ, আমি বলতে চাচ্ছিলাম তোমার জন্যে কফি নিয়ে আসতে, এনে ভালো করছ কারণ এখন বেশিরভাগ কাজ তোমার আর পাটোয়ারিরই। আমি জাস্ট ইনপুট দিব। তুমি বাশারকে কতটা বলেছ?'

'স্যার, আমি আমাদের স্পেশাল উইংয়ের শুরু এবং তানভীর আর বাশারের অপারেশনের ব্যাপারে বলেছি। সেই সাথে প্রজেক্ট আলফা এমের ব্যাপারটাও ইনট্রোডিউস করেছি।'

'তার মানে বর্তমান পরিস্থিতি এবং কারেন্ট কেসের ব্যাপারটা–'

'না, স্যার। আমরা ওই পর্যন্ত আলোচনা করতে পারিনি, আমি কি আবার ওখান থেকে শুরু করবো?' বলে সে আনোয়ার পাশার অনুমতি প্রার্থনা করল। আনোয়ার পাশা কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে সিগারে আরও দুবার টান দিয়ে বলে উঠল, 'নাহ, তুমি কফি এনজয় করো, যখন বলার প্রয়োজন হবে আমি জানাবো তোমাকে। আপাতত আমিই ব্রিফ করছি বাশারকে,' বলে সে বাশারের দিকে ফিরে তাকাল। 'শোনো, বাশার, তুমি তো স্পেশাল উইংয়ের ব্যাপারটা শুনেছই, আসলে দীর্ঘদিন যাবৎই আমি স্বপ্ন দেখছিলাম স্পেশাল কেস নিয়ে কাজ করতে সক্ষম একেবারে স্বাধীন আর দক্ষ একটা স্পেশাল উইং গড়ে তোলার, যারা অনেকটা এলিট ফোর্সের মতো ইনভেস্টিগেটর হিসেবে কাজ করবে শুধুমাত্র স্পেশাল কেস নিয়ে। এই স্বপ্ন দেখছি আমি আজ বহু বছর ধরে। একটা সময় ছিল যখন আমার নিজেকে প্রমাণ করতে হতো। বেশ কয়েক বছর আগে গাজীপুরের একটা কেসে সেটা করতে পারার পর, আমি বিশেষ পারমিশন নিয়ে এই স্পেশাল উইংয়ের কাজ শুরু করি। এর অংশ হিসেবেই সারা দেশে স্পেশাল ফরেনসিক ল্যাবের কাজ চলছে। পাটোয়ারিকেও আমি আমার টিমে নিয়েছি। এই স্পেশাল উইংয়ের একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল এর জন্যে এজেন্ট খুঁজে বের করা। আর এর জন্যে আমি যখন শারিয়ার আর তানভীরকে বেছে নিলাম সবাই হেসেছিল কিন্তু ওরা নিজেদেরকে দারুণভাবে প্রমাণ করতে পেরেছে এবং এমন সব কেসের কাজ করেছে বলতে গেলে প্র্যাকটিক্যালি অসম্ভব ছিল। আমার একটাই প্রাথমিক ভিশন

ছিল স্পেশাল উইং স্পেশাল কাজে পারদর্শী সেটা প্রমাণ করা। সেটা প্রমাণ তো হয়েছেই–আমরা এমন ধরনের আর এমন সব কাজ পেয়েছি, যা বলতে গেলে আমাদের রিসোর্স এবং আয়ত্তের চেয়ে বড়ো হয়ে গেছে এবং পরিস্থিতি হয়ে গেছে অনেক ঘোলাটে।'

'হাবিব, তোমার বয়স হয়া যাচ্ছে, এইটা বুঝতে পারতাছ?' টেবিলের আরেকপাশ থেকে পাটোয়ারি ধীরে ধীরে মৃদু স্বরে কথাগুলো বলে উঠল। বাশার তাকিয়ে দেখল তার দুই চোখ এখনও বন্ধ, এখনও সে হেলান দিয়ে পান চিবুচ্ছে। 'নেতাগো মতো সমানে কথা বলতাছো, কাজের কথা বাদে।'

পাটোয়ারির কথা শুনে বাশারের মুখে প্রায় হাসি চলে এসেছিল কোনোমতে নিজেকে সামলে নিলো সে। মৌসুমির দিকে তাকিয়ে দেখল তারও একই অবস্থা। সে মনোযোগ দিয়ে কফি পান করার ভাব দেখাচ্ছে। কিন্তু বাশার অবাক হয়ে গেল হাবিব আনোয়ার পাশাকে দেখে। মানুষটা মোটেও বিব্রত বোধ করছে না, বরং মৃদু হেসে বলে উঠল, 'হুম, আমারও ইদানীং তাই মনে হয়; শুধু কথাই বেশি বলি না, মাঝে মাঝে ভাবিও বেশি। যাই হোক, আমি বর্তমান পরিস্থিতি আর কেসের ব্যাপারে বলি। তানভীর আর শারিয়ারের কেসের ব্যাপার তো তুমি জেনেছি, সেই সাথে রেলিক এবং নেক্রপলিসের ব্যাপারেও। একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো–এই অর্গানাইজেশনগুলো আমাদের এখানে এভাবে এতদিন ধরে অপারেট করছে এটা তো আমরা জানতামই না, সবচেয়ে বড়ো কথা, এদের বড়ো বড়ো সব এজেন্টদের অ্যাক্টিভিটি। আমরা ওদের ব্যাপারে কিছুই জানি না–অথচ ওরা আমাদের ব্যাপারে প্রায় সব জানে। আমাদের কাছে আমাদের শত্রুরা অদৃশ্য কিন্তু আমরা ওদের কাছে খোলা বইয়ের মতো।'

'আর অন্যটা, স্যার?' বাশার জানতে চাইল।

'দ্বিতীয় কথা হলো ওদের সার্বিক উপস্থিতি এবং অ্যাক্টিভিটি খুব বড়ো কিছুর আভাস দিচ্ছে?' বাশারের মনে হলো হাবিব আনোয়ার পাশা যেন চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে উঠল কথাটা।

'স্যার, আমি ঠিক বুঝলাম না,' বলে বাশার এক মুহূর্তের জন্যে মৌসুমিকে দেখে নিলো। সে-ও কফি শেষ করে মনোযোগের সাথে হাবিব আনোয়ার পাশার কথা শুনছে।

'বুঝিয়ে বলছি, প্রথমে সিলেটে ওদের পুরনো বুদ্ধ মূর্তি নিয়ে এত বড়ো একটা ঝামেলা, এরপরে ময়মনসিংহের ঘটনা,' হাবিব আনোয়ার পাশার এই কথা শুনে বাশার ভ্রু কুঁচকে তাকাল কিন্তু কোনো প্রশ্ন করল না। 'এরপরে চট্টগ্রামে একজন বিখ্যাত প্রফেসরের সাথে এদের সংযোগ খুব বড়ো কিছুই আভাস দেয়।'

'স্যার, ময়মনসিংহের ব্যাপার মানে?' বাশার জানতে চাইল।

'তুমি বলোনি ওকে?' আনোয়ার পাশা মৌসুমির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করতেই সে মাথা নেড়ে জানাল সে কিছু বলেনি। 'ময়মনসিংহে কালী মূর্তির ব্যাপারটাতেও রেলিক এবং নেক্রপলিসের সংযোগ আছে বলে ধারণা করছি আমরা। এখনও একদম সলিড প্রমাণ না পেলেও যাকে তুমি গ্রেপ্তার করেছ ময়মনসিংহে তার সাথে অবশ্যই এদের কারও সংযোগ থাকার সম্ভাবনা আছে। তোমাকে স্পেশাল উইংয়ে ডেকে পাঠানোর পেছনে এটাও একটা কারণ।'

আচ্ছা, এই তাহলে ঘটনা মনে মনে বলে উঠল বাশার। 'স্যার, আপনি বড়ো কিছু বলতে আসলে কী বুঝাচ্ছেন?' বাশার চেয়ারে নড়েচড়ে বসল। এতক্ষণে সে নিজেকে কেসের সাথে কানেক্ট করতে সক্ষম হচ্ছে।

'রেলিক এবং নেক্রপলিসের ব্যাপারে কি তুমি কিছু জানো?' আনোয়ার পাশা জানতে চাইতেই মাথা নেড়ে জবাব দিলো বাশার। 'না, স্যার, খুব আবছাভাবে জানি এরা অ্যান্টিক চোরাচালানি বা এরকম কোনো সংগঠন।'

'অ্যান্টিক আসলে ওদের একটা অংশমাত্র। রেলিক আর নেক্রপলিস হলো ইন্টারপোলের লিস্টেড সবচেয়ে কুখ্যাত অ্যান্টিক চোরাচালানি, বিক্রি এবং ম্যানুপুলেটিভ দুটো সংগঠন। অনেকে বলে এরা আসলে একই সংগঠনের দুটো রূপ। মানে সিস্টার অর্গানাইজেশন। আবার অনেকে বলে এরা আলাদা। আমরা এখন পর্যন্ত যা জেনেছি এবং টের পেয়েছি তাতে মনে হয়েছে এরা আসলে সিস্টার কনসার্নই। আসলে শুধু অ্যান্টিক বললে কম বলা হয়, পুরো পৃথিবীতে অ্যান্টিকের ব্যাবসা বিলিয়ন ডলারের ব্যাবসা। এর ভেতরে এরা একটা বড়ো চাঁই নিয়ে বসে আছে। এরা এতটাই শক্তিশালী যে এরা অ্যান্টিক নিয়ে এদিক-সেদিক করতে গিয়ে একটা দেশের সরকার নামিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।'

আনোয়ার পাশার শেষ কথাটা শুনে ভ্রু কুঁচকে উঠল বাশারের। 'তাই নাকি, স্যার? কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো চায়না, নেপাল, থাইল্যান্ড এমনকি ইন্ডিয়াও বুঝলাম; ওদের দেশের পুরনো স্থাপনা অ্যান্টিক ইতাদিতে এরা অনেক রিচ। বাংলাদেশে তো না অ্যান্টিকের তেমন কোনো কারবারই নেই,' বলে সে কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমি বেশি কিছু জানি না অবশ্য।'

'আমারও কনসার্ন এখানেই। আমাদের দেশে এরা এত অ্যাকটিভ কেন হলো এবং একটা ব্যাপার খেয়াল করো, এরা কিছুদিন যাবৎ অ্যাক্টিভ হবার পরেই একদিকে অমূল্য টুইন কালী, অন্যদিকে অমূল্য ব্ল্যাক বুদ্ধা আবিষ্কার করে বসে আছে। আর চট্টগ্রামে যা ঘটেছে তাতে মনে হচ্ছে ওখানে ওরা যেটার পেছনে লেগেছিল সেটার খোঁজ পেলে এগুলো স্রেফ রাস্তার পাশের সস্তা খেলনা মনে হবে।'

'মানে, স্যার?' বাশার দারুণ আগ্রহ বোধ করতে শুরু করেছে।

হাবিব আনোয়ার পাশা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সিগারটা হাতে নিয়ে নিলো। জানালার পাশে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে সিগারে দুটো টান দিয়ে সে অনেকটা যেন আনমনেই বলে উঠল কথাগুলো। 'আমরা এখনও সরাসরি কিছুই জানি না। কিন্তু চট্টগ্রামে শারিয়ার যে কেসটা সলভ করেছে সেটা থেকে এটা বেশ পরিষ্কার বোঝা গেছে প্রফেসর আবদেল এবং তার সাথের আরও বেশ কয়েকজন মিলে ইতিহাসের বেশ বড়ো কোনো একটা রহস্যের সমাধান করতে পেরেছিলেন কিংবা বলা যায় রহস্যটা সমাধান করার একেবারে দ্বারপ্রান্তে ছিলেন। কিন্তু কোনো একটা কারণে একটা পর্যায়ে অথরিটির সাথে তার বা তাদের কোনো একটা ঝামেলা হয় এবং হয় তারা রেলিক কিংবা নেক্রপলিসের সাথে যোগদান করেন কিংবা তারা তাদের পেছনে লাগে এবং তারা একবাক্যে বলতে গেলে লোকচক্ষুর অন্তরালে সরে পড়ে। প্রফেসর আবদেল পালিয়ে চট্টগ্রামে চলে যান, সেখানে তিনি একটা বাড়ির বেইজমেন্টে লুকিয়ে নিজের গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এরপর একটা পর্যায়ে বাইরে বেরিয়ে অ্যাক্সিডেন্টে মারা পড়েন এবং সেখান থেকে রেলিক আর নেক্রপলিসের সাথে আমাদের ধাওয়া-পালটা ধাওয়া চলতে চলতে এক পর্যায়ে শারিয়ার তার মৃত্যু রহস্য উদঘাটন করতে সমর্থ হয় এবং মিস্টার ইউ নামে নেক্রপলিসের বড়ো মাপের একজন হর্তকর্তা ধরা পড়ে এবং প্রফেসর আবদেলের কাছের একজনও ধরা পড়ে। তারচেয়ে বড়ো কথা শারিয়ার আর টিম মিলে রহস্য সমাধানের খুব কাছাকাছি গেলেও পুরো ব্যাপারটা ধরতে পারেনি।'

'বিষয়টা কী?' বাশার জানতে চাইল।

'স্যার, আমি বলব?' প্রশ্নটা করে আনোয়ার পাশার কাছে অনুমতি চাইতে সে মাথা নেড়ে সায় জানাতে মৌসুমি বলতে শুরু করল।

'ওরা চট্টগ্রামের পুরনো ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত এক অদ্ভুত রহস্যের খোঁজ পায় যেটা নিয়ে প্রফেসর আবদেল গবেষণা করছিলেন। ওরা প্রফেসর আবদেলের রেখে যাওয়া ক্লু ধরে ধরে বিষয়টার শেষ পর্যন্ত গিয়ে জানতে পারেঃ প্রফেসর আবদেল যে-ক্লুগুলো রেখে গেছিলেন সেগুলো পুরোটাই ছিল সাজানো। সম্ভবত ভুল লোকের হাতে যেন না পড়ে কিংবা সম্ভাব্য অনুসরণকারীদের বিপথে পরিচালিত করার জন্যেই এই আয়োজন করেছিলেন তিনি। কিন্তু মূল জিনিসের ক্লু তিনি রেখে গেছিলেন একটা মাইক্রোচিপের ভেতরে। সেটা আমাদের হাতে পড়েছে।'

'কিন্তু পুরো জিনিসটাই বিচিত্র ধাঁধা আর রহস্যের জাল আর কোডে সাজানো, আমরা এরকম একটা ব্যাপার আন্দাজ করছি এই ঘটনার সাথে মোঘলদের রেখে যাওয়া পুরনো কোনো বিষয়ের সংযোগ আছে। সম্ভবত মোঘল রাজপুত্র এবং সুবাদার শাহসুজা আরাকানে পালিয়ে যাবার সময়ে সে কিছু একটা রেখে গেছে বাংলার বুকে। যেটাই তারা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল।'

'সর্বনাশ!' আনমনেই কথাটা বেরিয়ে গেল। 'হারিয়ে যাওয়া মোঘল গুপ্তধন,' এই জন্যেই আনোয়ার পাশা বাকিগুলোর চেয়ে এটা অনেক বেশি মূল্যবান এই কথাটা বলেছিল। রেলিক এবং নেক্রপলিস কেন এত হন্যে হয়ে লেগেছে এর পেছনে সেটাও খানিকটা আন্দাজ করতে পারছে সে। কিন্তু এরপরের যে-কথাটা শুনলো সেটাতে খানিকটা চুপসে গেল সে।

'গুপ্তধন,' বলে আনমনেই একবার কাঁধ ঝাঁকাল আনোয়ার পাশা। 'কে জানে হতে পারে, নাও পারে। আমরা আসলে কিছুই বুঝতে পারছি না। শুধু এটা বুঝতে পারছি গুপ্তধন কিংবা অন্যকিছু, তবে যেটাই হোক সেটা অনেক বড়ো কিছু। আর সেটার এমন এক জায়গায় আমরা আটকে গেছি যার কিছুই বুঝতে পারছি না আমরা।'

'আর এইসব সমাধার করনের লাইগ্যা একটাই উপায় আছে, যেই কারণে তুমারে এইহানে ডাকা অইছে,' অনেকক্ষণ পরে আলীম পাটোয়ারি কথা বলে উঠল। 'যেইখানে যাই ঘটতাছে আর যাই করা অইতাছে তার পুরা জট খোলনের লাইগ্যা একটাই উপায় সেইটা হইল রাজদ্রোহীর রহস্য সমাধান করা। আর সেইটা আমগো পক্ষে কোনোভাবেই করা সম্ভব অইতাছে না,' বলে সে নাটকীয়ভাবে থামল। একদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে বাশারের দিকে। বাশারের মনে হলো মানুষটা আসলে মনোযোগ দিয়ে পরখ করছে ওর প্রতিক্রিয়া। 'যদি না আমরা একটা কাজ করতে পারি।'

'কী সেটা?' বাশার উত্তেজিত ভঙ্গিতে নিজের হাতের আঙুলে পরা আংটিটা ধরে মোচড়াতে মোচড়াতে জানতে চাইল।

'প্রফেসর আবদেলের একজর পার্টনার ছিল প্রফেসর ইফতেখার মাহমুদ। আমগোর হেরে খুইজ্জা বাইর করতে অইব,' আলীম পাটোয়ারি আবারও চেয়ারে হেলান দিতে দিতে বলে উঠল। 'সমস্যা অইল প্রফেসর আবদেলের মতন প্রফেসর ইফতেখার মাহমুদও তিন বছর আগে গায়েব হয়া গেছিল। যেকোনো উপায়েই হোক তারে খুইজ্জা বাইর করতে পারলেই একমাত্র রাজদ্রোহীর রহস্য সমাধান করা সম্ভব অইব।'

বাশার আনমনেই মাথা নাড়ল, এতক্ষণে পুরো বিষয়টাতে নিজের ভূমিকাটা ধীরে ধীরে ধরতে পারছে সে। তাকে একজন হারিয়ে যাওয়া মানুষকে খুঁজে বের করতে হবে।

অধ্যায় নয়

সময়: ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ

রসুল খাঁর জমিদার বাড়ির বৈঠকখানার বাইরে

'এইভাবে ওরা সব হারাইল কেমনে?' একটু থেমে সে আবারও বলতে লাগল।

'আচ্ছা, আমারে একটা বিষয় বুঝায়া বলেন তো,' পান চিবুতে চিবুতে আনমনেই কথাটা বেরিয়ে গেল মাসুমের মুখ দিয়ে। 'এইটা আপনাগো এলাকা, এইখানে আপনারাই হর্তা-কর্তা। এইখানে আপনাগো সবকিছু আছে, লোকলস্করও থেইকা শুরু কইরা বলতে গেলে সবকিছু। কিন্তু সুবাদার আসলাম শেঠের ওপরে যখন জঙ্গলমহালের আক্রমণ হইল তখন আপনারা কিছুই করতে পারেন নাই। এখন যখন আমরা ধারণা করতাছি জঙ্গলমহাল থেইকা একটা দল পলাইয়া উত্তর পশ্চিমের এলাকায় ছড়ায় পড়ছে এমন সময় আমরাই ক্যান?' বলে সে বাসিমের দিকে দেখে নিয়ে রসুল খাঁর দিকে তাকাল সরাসরি। 'আপনাগোর এলাকায় আপনারাই যদি কিছু করতে না পারেন আমরা বাইরে থেইকা আইসা কী করতে পারবো?'

মাসুম, ধোবল, বরখা ওরা সবাই মিলে বসে আছে বৈঠকখানার ছাদে। সময়টা বিকেল বেলা পার হয়ে সন্ধের দিকে রওনা দিয়েছে। খাওয়াদাওয়ার পর বিশদ আলোচনা সেরে ওরা বেশ কিছু পরিকল্পনা করে আর সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই রসুল খাঁর বাহিনীর প্রধান গেছে ওদের জন্যে বিশেষ কিছু ব্যাপারে আয়োজন করতে আর সেই ফাঁকে ওরা বৈঠকখানার দোচালায় বসে গড়গড়া টানছে আর চলছে আলোচনা।

'এইটার উত্তর আব্বাজানের চেয়ে মনে হয় আমি ভালো দিতে পারবো,' কথাটা বাসিম বলে উঠল। বাসিম যেভাবে নড়াচড়া করছে তাতে মাসুমের মনে হলো ওদেরকে তামাক টানতে দেখে তারও তামাকের নেশা পেয়েছে কিন্তু বাপের সামনে সে মনে হয় তামাক টানে না। যেই কারণে বারবার পাত্র থেকে সুপুরি তুলে মুখে পুরছে আর অস্বস্তির সাথে নড়াচড়া করছে। 'প্রথম কারণটা হইল এইটা আমগো এলাকা এইকারণে আমগো যেমন কিছু সুবিধা আছে তেমন কিছু অসুবিধাও

আছে। অসুবিধা অইল আমগোরে সবাই চিনে। বিশেষ কইরা আমগো এইখানে চাচাত মামাতো ভাই বেরাদার তো বটেই, এমনকি আমগো যত শক্তিশালী যোদ্ধা আছে সবাই পরিচিত।'

বাসিমের কথা শুনে তার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে মাসুম। এইটা অসুবিধা কীভাবে ব্যাপারটা এখনও ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না তার কাছে। তাকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে সম্ভবত বাসিম বুঝতে পারল মাসুম ওর কথা পুরোপুরি ধরতে পারেনি। 'আপনে হয়তো ভাবতাছেন এইটা অসুবিধা ক্যামনে? আমি বুঝায়া বলতাছি। এই মুহূর্তে যে পরিস্থিতি তাতে মোঘলগোর লগে সরাসরি দ্বন্দ্বে যাবার মতো অবস্থায় আমরা কেউই নাই–এইটা তো আপনে ভালোই জানেন। এইক্ষেত্রে জঙ্গলমহাল থেকে যারাই পলায়া উত্তরে সইরা পড়তে পারছে তাগোরে উদ্ধার কইরা আনার একটাই উপায়, ওইখানে লুকায়া যাইতে হবে এবং তাগোরে খুইজ্জা বাইর কইরা উদ্ধার কইরা নিয়া আসতে হবে। ব্যাপারটা খুবই কঠিন এবং দুর্ধর্ষ বিষয়। আমি বলব না যে এইটা করার মতন যোদ্ধা আমগো নাই, বা আমগো পক্ষে করা সম্ভব না কিন্তু আমরা স্থানীয়রা কেউ ওই এলাকাতে ঢুকতেই পারবো না। ক্যান পারবো না, বলতাছি–তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন আমরা কিংবা ঈশা খাঁ সাহেব ক্যান আপনেগো এইখানে পাঠাইছে।'

এই পর্যন্ত বলে সে একবার বাইরে উঁকি দিয়ে দেখে নিলো। মাসুম আসার সময়েও দেখেছে এখন আরও ভালোভাবে খেয়াল করে দেখল, পুরো কেল্লা এবং বসতবাড়ির চারপাশে প্রচুর সৈনিকের প্রহরা এবং সে এটাও অনুধাবন করতে পারছে–সৈনিক থেকে শুরু করে সাধারণ প্রহরীরাও অত্যন্ত সজাগ। এটাই স্বাভাবিক হবার কথা, কারণ চারপাশে একটা যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান, এর ভেতরে এমন প্রহরা এবং সতর্কতা থাকবে এইটাই হওয়া উচিত রসুল খাঁ কিংবা বাসিমের জায়গায় সে নিজে থাকলেও একই কাজ করত।

'যা বলতেছিলাম, মোঘলরা জঙ্গলমহাল দখল কইরা নিলেও তারা পুরো জল-জঙ্গলের এলাকা বন্ধ কইরা দেয় নাই। প্রথমে জঙ্গলমহাল দখলের পরে দুই দিন বন্ধ রাখছিল জঙ্গলমহাল দখলের মানে যুদ্ধের সময়েও সতর্কতার কারণে কিছুদিন বন্ধ ছিল, কিন্তু ওরা কেল্লাটা দখলের পর খুব সাধারণ মানবিক এবং কৌশলগত কারণে জল-জঙ্গলের পথগুলা খুলে দিছে।'

'কারণটা কী?' মাসুমের পাশে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসা ধোবল জানতে চাইল। মাসুম মনে মনে খানিকটা স্বস্তি বোধ করল। যদিও সে জানে সে নিজে যেমন বাঙাল মুল্লুকের মানুষ, নিজের পরিবার ধর্ম আর খাঁ সাহেবের জন্যে জীবন দিতে পারবে হাসতে হাসতে ঠিক তেমনি তার বন্ধু ধোবল আর বরখা কোনোরকম দ্বিধা ছাড়াই হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ করে নিবে ওর নির্দেশে কিংবা ওকে সাহায্য

করার জন্যে। কিন্তু একজন যোদ্ধা এবং নেতা হিসেবে সে এটাও জানে যুদ্ধে জিততে হলে কিংবা দলগত কাজে সাফল্য আনতে হলে দলের প্রতিটা সদস্যের শুধুমাত্র শারীরিক সম্পৃক্ততা নয় বরং ঘটনার সাথে তাদের মানসিক সংযুক্তিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। প্রথমে তো নিজেই পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না। এরপর নিজে যখন বুঝতে শুরু করেছে তখন সে খানিকটা চিন্তিত ছিল তার দুই বন্ধু আসলে পুরো ব্যাপারটার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারছে কি না–সেটা নিয়ে। বরখার ব্যাপরটা আলাদা, প্রচলিত ব্যবস্থার আর্থসামজিক অবস্থানের একেবারে নিচ স্তর থেকে উঠে আসা বরখা সবসময়ই খুব শান্ত এবং ঠান্ডা মাথার মানুষ। কিন্তু ধোবল অত্যন্ত শক্তিশালী আর দক্ষ যোদ্ধা হলেও তার মনোযোগ কম এবং অস্থিরতা বেশি, কিন্তু বাসিমের প্রশ্নে সেও যখন আগ্রহ বোধ করতে শুরু করেছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন নির্দ্বিধায়।

'কারণ হলো,' ধোবলের প্রশ্নের জবাবে বাসিম বলে উঠল। 'একদিকে এই এলাকা অনেক মানুষের আবাসস্থলও, তাদের অনেকেই নিজেদের জীবিকার জন্যে জল-জঙ্গলের ওপরে নির্ভর করে, কাঠকাটা থেকে শুরু করে মাছ ধরা, শিকার, এমনকি জ্বালানি সংগ্রহ থেইকা শুরু কইরা তাগো নিত্যনৈমিত্তিক প্রায় সবকিছুই জল-জঙ্গলের ওপরে নির্ভরশীল। কাজেই জল-জঙ্গলের পথ বন্ধ করে দিলে এইসব মানুষেরা না খেয়ে থাকবে। মোঘলরা নিষ্ঠুর হইতে পারে কিন্তু মানুষের রিজিক বন্ধ করার মতো নয়। দ্বিতীয়ত, আরেকটা বিষয় হইল, জল-জঙ্গলের ভৌগোলিক অবস্থান। আগেই বলছি সুদূর মেঘালয় থেকে শুরু করে দূর আসাম এমনকি ত্রিপুরার অনেক ব্যাবসায়িক জিনিস আদানপ্রদানের অন্যতম একটা যোগাযোগ পথ এই জায়গা, বিশেষ কইরা বমার নদীটা বেশ বড়ো কয়েকটা হাওড় আর অন্য নদীর সাথে সংযুক্ত। কাজেই এটা বন্ধ কইরা দিয়ে মোঘলরা সবাইরে খেপাইতে চাইব না–এটাও স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। তবে এখানেও ব্যাপার আছে। ওরা পথ খুইলা দিছে ঠিকই, কিন্তু ওগো নজরদারি ছাড়া একটা মাছও এই জলপথ বা স্থলপথ অতিক্রম করতে পারবো না। ওই জায়গাতে ঢোকার প্রতিটা পথ ওগো নজরদারিতে রাখা এবং ওরা প্রতিটা লোকরে পরীক্ষা কইরা অস্ত্র জমা রাইখা ঢুকতে দিতাছে ওইদিকে।'

টানা কথা বলে সে সামান্য থেকে মৃদু কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে আবারও বলতে লাগল। 'কাজেই ওইখানে ঢুকতে হইলে হয় ওগো হাতে পরীক্ষা হইয়া ঢুকতে অইব আর না হয় সরাসরি যুদ্ধ কইরা ঢুকতে হবো,' মাসুম একটা ব্যাপার জানতে চাইত কিন্তু তার আগে বাসিমই সেটার জবাব দিয়ে দিলো। 'আমরা ওগো লগে যুদ্ধ করতে পারবো না, তারমানে ওইখানে ঢুকতে অইলে লুকায়া ঢুকতে অইব। আর আমরা সেইটা পারবো না, কারণ মোঘল স্থানীয় ডাকাইত

থেইকা শুরু কইরা বিপুল পরিমাণ লোক নিয়োগ দিয়া রাখছে। এমনকি শোনা যাইতাছে জঙ্গলমহাল থেইকা যারাই পলাইছে তাগো ধরার জন্যেও বিপুল অর্থ ঘোষণা করা অইছে। কাজেই আমগো কারও পক্ষেই ওইখানে ঢোকা সম্ভব না। এই কারণেই খাঁ সাহেব আপনাগো পাঠাইছে। আপনারা এই এলাকার লোক না, কাজেই কেউ চিনব না। এই ধরনের পানিবাহিত জঙ্গল এলাকায় আপনাগো যাতায়াত ও যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে। সেই সাথে আপনারা নৌকা চালানিতে দক্ষ এবং আপনাগো কাজের দক্ষতা অনেক। খুব সহজেই ছদ্মবেশে আপনারা আরও ভিতরে ঢুইকা যাইতে পারবেন।'

'সে তো বুঝলাম কিন্তু ভিতরে ঢুকলে পরে? আর আমরা কীসের ছদ্মবেশে ঢুকব ভিতরে?' বরখা জানতে চাইল, গড়গড়ায় টান দিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে ধোঁয়া ছাড়ছে সে।

বরখার প্রশ্ন শুনে বাসিম হেসে উঠল। 'এইটাও আমরা ভাইবা রাখছি,' ছেলেটার কথা শুনে মনে মনে বেশ অনেকটাই কৃতজ্ঞ বোধ করল মাসুম। ছেলেটার বুদ্ধি আছে, তারচেয়ে বড়ো কথা সত্যি সত্যি ওদেরকে সাহায্য করার ইচ্ছা আছে। এই ছেলে একদিন সত্যি সত্যি বাপের রাজত্বের হাল তো ধরতে পারবেই, এ বাঙাল মুল্লুকের বড়ো নেতা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা অছে। 'বুদ্ধিটা অবশ্য আমার না। আমি প্রথমে ছদ্মবেশের কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু পরে আমগো বাহিনীর প্রধান শেরু আরও ভালো একটা বুদ্ধি দিছে। এতে আপনাগো দুইটা সমস্যারই সমাধান অইব,' সে এইটুক বলতেই তার বাপ রসুল খাঁ মাথা নেড়ে সায় জানাল। 'ঠিক।'

'বুদ্ধিটা অইল আপনাগো খালি একলা না, এইখানে নিয়মিত যাতায়ত করে এরকম একটা দলের লগে আপনেগো ভিড়ায়া দিব। শেরু বলছে এইখানে কাঠুরিয়াগো একটা দল আছে যারা নিয়মিত ওইখানে যাতায়াত করে এইরকম একটা দলের লগে আপনাগো ভিড়ায়া দিলে আপনেরা সহজেই অগো লগে মিলা কাঠুরিয়ার ছদ্মবেশে জল-জঙ্গলে ঢুইকা যাইতে পারবেন। এতে আরেকটা সুবিধা অইব। ওরা আপনাগো জল-জঙ্গলে ঢোকার পরে পথ দেখান থেইকা শুরু কইরা অন্যান্য কাজের সাহায্য করতে পারবো। এতে আপনাগো ওইখানে যাবার পরেও খুব বেশি চিন্তা করতে অইবে না।'

'বুদ্ধিটা ভালো নিঃসন্দেহে,' মাসুম খুশি হয়ে উঠল, ছেলেটা আসলেই সব ভেবে রেখেছে। 'আর একবার যদি তাগোরে উদ্ধার করতে পারি তাহলে?'

'সেই উপায়ও ভাইবা রাখা হইছে,' বলে বাসিম ওদেরকে দেখিয়ে দিলো সম্ভাব্য যে জায়গাগুলোতে তাদেরকে পাওয়া যেতে পারে এবং সেসব জায়গাগুলোতে একবার তাদেরকে পেলে কোনো কোনো পথে ওরা আবার রসুল খাঁর এলাকায় ফেরত আসতে পারবে। নিদেনপক্ষে ওদের পরিচিত কোনো মেছো পল্লী বা গ্রামেও

যদি পৌঁছাতে পেরে একবার ওদেরকে খবর পাঠাতে পারে তাহলেই হবে। পথগুলো বুঝে নিতে নিতে মাসুম বলে উঠল, 'বুঝতে পারছি। কিন্তু শেরু গেল কই, আর আমগো কিছু খবরের দরকার আছিল। ওইগুলাও জানা প্রয়োজন ছিল আবার সইন্ধ্যা নাইমা আসতাছে,' মাসুম একবার অন্ধকার আকাশের দিকে দেখে নিলো। সন্ধে বেশ গভীর হয়েই নেমে এসেছে।

'শেরু আপনাগো কাজেই গেছে,' রসুল খাঁ বলে উঠল। 'আইজ সকালে আপনেরা যখন এইখানে আইসা পৌঁছায়া বিশ্রাম নিতেছিলেন সেইসময়ে এলাকায় লোক লাগানো অইছিল খবরের জন্যে এবং সাম্প্রতিক সময়ের ভেতরে ওইদিকে যাইব এরকম একটা দল খুইজা বাইর করা অইছে, অবশ্যই খুব গোপনে। আপনারা খাবার সময়ে খবর আসে, ওইরকমই একটা দল নিজে থেইকাই আগ্রহ দেখাইছে আপনেগো ভিতরে নিয়া যাওয়ার জন্যে, অবশ্যই অর্থের বিনিময়ে।'

'অর্থ বা মুদ্রা কোনো সমস্যা না। আমার প্রশ্ন অন্য জায়গায়,' মাসুম চিন্তিত ভঙ্গিতে একবার বাসিম আর ধোবলের দিকে দেখে নিলো। 'আচ্ছা, এই লোকগুলারে আবার আমরা বিপদে ফালায়া দিব না তো? আরেকটা বিষয় হইল, এরা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য, এরা আবার আমাদের নিয়া ওপারে গিয়া মোঘলদের লগে টাকার বিনিময়ে সওদা করে দিব না তো?'

রসুল খাঁ হেসে উঠল। 'আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর অইল এরা কাজটা করতাছে টাকার বিনিময়ে, কাজেই ঝুঁকি এরা জানে। আর এরা ভয়ঙ্কর সাহসী লোক, এই সবরে এরা ডরায় না। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব অইল ওগোরও তো ফিরা আসতে হবে এইখানেই তাই না, ওরা বেঈমানি করলে যাইব কই?' বলে সে বাইরের লোক সমাগমের দিকে তাকাল। 'মনে অয়, শেরু চইলা আসছে। দেখি খবর কী?'

রসুল খাঁর সাম্রাজ্যের প্রধান ভিত্তিদের একজন শেরু তার সাথে ঠিক তার মতোই পোশাক পরিহিত আরও দুজন সৈনিককে নিয়ে বৈঠকখানার ওপরে উঠে আসল। 'সালাম, হুজুর,' কথাটা সে রসুল খাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেও বাকিদের দিকে ফিরেও সামান্য মাথা ঝাঁকাল।

'খবর বলো, শেরু? যা যা করতে পাঠানো অইছিল করতে পারছ? আর চাইরপাশে এলাকার খবর কী?'

'হুজুর, খবর আগের মতোই, মোঘল পাহারা আগের মতোই শক্ত দড়ির গিটের মতনই আছে। বরং আরও শক্ত অইছে,' বলে সে একবার মাসুমদের দিকে দেখে নিলো। 'আইজ সকালে কালীঘাটে একদল মেছুয়াগোরে ঢুকতে তো দেয় নাই সন্দেহ হওয়াতে আটকাইয়া রাখছে অনেক সময়, তারপর ফেরত পাঠাইছে।'

'কোনো কারণ ছিল ওগোরে আটকায়া রাখার?' মাসুম ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইল। 'কোনো সমস্যা করছিল ওরা?'

'না, হুজুর,' লোকটা বিশালাকায় এক ডাকাতের মতো দেখতে হলেও তার আচার-আচরণ অত্যন্ত মার্জিত এবং আদবকায়দাও খুব ভালো। যতবার মাসুমের দিকে ফিরে ততবারই সামান্য ঝুঁকে সম্মান জানিয়ে কথা বলে। 'কোনো কারণই আছিল না। কালীঘাট অইল যেইহান দিয়া আমগো এইখান থেইকা জল-জঙ্গলের পথে ঢোকা যায়।'

'আচ্ছা বুঝছি, তুমি কাজের অগ্রগতি বলো, এইগুলা হিসাব কইরা লাভ নাই, ঝামেলা ছিল, আছে, থাকবই। আর উনারা যেহেতু যাইবই, কাজেই এইসব চিন্তা কইরা কিংবা আলাপ কইরা লাভ নাই। তুমি যাগো সন্ধান করতে গেছিলা হেগোরে পাইছ কি না, সেইটা বলো?'

'না, হুজুর, বিলা আর হের সাথের কাউরেই পাইনাই। জঙ্গলমহালের যুদ্ধের পর থেইকা হেরা কই আছে কেউই জানে না। তবে অন্য একটা দল পাইছি, ওরা নিজ থেইকাই আসছে আগ্রহ নিয়া, এরাও কাঠুরিয়া। হেগোরে নিয়া আসছি যাতে হুজুরের লগে সরাসরি কথা বইলা সিদ্ধান্ত নিতে পারে।'

'ও কার কথা বলতাছে?' মাসুম বাসিমের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল।

'আমি বিস্তারিত বলতাছি,' কথাটা মাসুমকে বলে সে শেরুর দিকে ফিরে বলে উঠল, 'তুমি যাও ওগোরে এইখানে নিয়া আস,' বাসিমের কথা শেষ হতেই শেরু একবার মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল।

'মাসুম কাবুলি, আমি একটা পরিকল্পনা করছি তা তো আগেই বলছি, এখন বাকিটা বলি। আপনেগো জল-জঙ্গলের পথে ঢুকাইতে হইলে এই একটাই উপায় আছে,' বলে সে রসুল খাঁর দিকে একবার দেখে নিলো। রসুল খাঁ মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই সে আবারও মাসুমদের দিকে ফিরে কথা বলতে লাগল। 'আপনাদেরকে শেরু একদল কাঠুরিয়ার সাথে পরিচয় করায়া দিবে, ও যাগোরে খুঁজতেছিল তাগোরে না পাইলেও যাগোরে পাইছে এগোরে দিয়াও কাজ চলব আমার বিশ্বাস। আপনেরা হেগোর সাথে কথা বইলা, হেগোর কাছ থেইকা সব বুইঝা প্রস্তুতি নিয়া রাখবেন। ওরা যখন জল-জঙ্গলের পথে প্রবেশ করে, আপনেরা তিনজন ওগোর দলের লগে মিশা ভিতরে ঢুইকা যাবেন। ভিতরে ঢুকার পরে বাকিটা আপনেগো ওপরে নির্ভর করতাছে।'

'না, এইখানেও আমি খানিকটা সাহায্য করতে পারবো,' রসুল খাঁ মনোযোগের সাথে ওদের কথা শুনছিল। সে এতক্ষণ খুব বেশি কথা বলেনি। কিন্তু এইবার বলে উঠল। 'ভিতরে ঢোকার পরে কী করতে হবে সেই ব্যাপারেও খানিকটা সাহায্য করতে পারবো আমার বিশ্বাস। কিন্তু তার আগে ভিতরে ঢোকাডা বেশি জরুরি। ওই যে ওরা আসছে।'

মাসুম বৈঠকখানার ছাদের প্রান্তের দিকে তাকিয়ে দেখল: ওপরে ওঠার চালান বেয়ে শেরুর সাথে তিনজন উঠে আসছে। সবার প্রথমে ওর নজরে পড়ল শেরুর সমানই লম্বা কালো ধুতি আর খয়েরি ফতুয়া পরা শক্তিশালী এক যুবকের দিকে। তার সাথে একজন বয়স্ক আরেকজন তুলনামূলক কিশোর বয়সী ছেলে। ফতুয়া পরা লম্বা পাকানো দড়ির মতো শক্তিশালী যুবক এগিয়ে এসে প্রথমে রসুল খাঁকে সালাম জানাল, তারপর বাকিদের দিকে ঝুঁকে সম্মান জানাল। মাসুম মনোযোগের সাথে ছেলেটাকে দেখেই অনুমান করল এই ছেলেই এদের দলের অবিসংবাদিত নেতা। পরনে কালো ধুতি আর খয়েরি ফতুয়া ঠেলে বেরিয়ে আছে শক্তিশালী পেশিবহুল শরীর। গলায় একটা মোটা পাটের চাদরের মতো প্যাঁচানো, কপালে বাঁধা লাল নিশান আর সেটা ছাপিয়ে ওপরে উঠে আছে লাল তিলক। তার ঠোঁটের কিনারা থেকে বাঁ-কানের গোড়া পর্যন্ত একটা লম্বা কাটা দাগ, আরও একটা বিষয় অবাক করল। ছেলেটাকে দেখেই বোঝা যায় কঠিন পরিশ্রমী কোনো পেশার সাথে সংযুক্ত সে, কিন্তু সেই হিসেবে তার চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত শান্ত এবং অভিজাত, শিক্ষিত কিংবা অভিজাত মানুষের মতোই। 'হুজুর, সালাম জানাই,' মাসুমের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল সে।

ব্যাপারটা অনুভব করে মাসুম বেশ মজা পেল। সে যেমন বুঝতে পেরেছে এই ছেলেটাই এই দলের নেতা, ঠিক একইভাবে ছেলেটাও পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে এই দলের নেতা হলো মাসুম।

'এই, তুমি কে? তোমারে তো আগে কখনও দেখছি বইলা মনে পড়ে না, তোমরা করো কী?' রসুল খাঁ অনেকটা ধমকের সুরে বলে উঠল।

ছেলেটা রসুল খাঁর দিকে ফিরল কিন্তু সে মাথা ওঠাল না। মাথা নিচু করেই শান্তস্বরে বলে উঠল, 'হুজুর, আমরা নিচু জাতের মানুষ, আমগোরে চিনা কি আপনেগো শোভা পায়?' মাসুমের মনে হলো ছেলেটার কথা শুনে রসুল খাঁ বেশ খুশি হয়ে উঠল। বিষয়টা খানিক অবাক করার মতোই, ছেলেটাকে দেখে যেমন মনে হয় তার কথা বলার ভঙ্গি একেবারেই অন্যরকম। অত্যন্ত বিনয়ী এবং কেতা-সম্পন্ন।

মাসুম বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ছেলেটার সামনে চলে এলো। 'তুমি তোমার নাম বলো নাই,' সে ছেলেটার একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। উচ্চতা গড়ন এবং বয়সে ছেলেটা প্রায় ওর সমানই হবে। কিন্তু আদব দেখানোর জন্যে সে খানিকটা মাথা নিচু করে রেখেছে। 'হুজুর, আমার নাম, গেড়ুয়া, ও হইল আমার ছোটো ভাই, পটু, আর হেয় আমার চাচা। আমরা কাঠ কাটি হুজুর। ওস্তাদ শেরুর কাছে শুনলাম বিশেষ কাজে লাগতে অইব, অর্থকড়িও পাওয়া যাব তাই চইলা আসছি।'

'গেড়ুয়া, তুমি কি জানো, তোমগোরে ঠিক কী কামে এইখানে ডাকা অইছে?' কোনো অদ্ভুত কারণে দরিদ্র কিন্তু আচার-আচরণে কেতাসম্পন্ন অভিজাত ছেলেটাকে ওর ভালো লেগে গেছে প্রথম দর্শনেই; এর সাথে কোনো ধরনের ছলচাতুরি তো করবেই না বরং একে সব জানিয়ে তারপর এর সাথে কাজ করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাসুম। যদি এরা ওদেরকে সাহায্য করতে না চায়, প্রয়োজনে এদেরকে বাদ দিবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাসুম। 'এতে কী ধরনের ঝুঁকি আছে, সেইটা জানো?'

'জি, হুজুর, ওস্তাদ শেরু কিছুই লুকায় নাই বা জোর করে নাই। আমগোরে সব জানায়াই এইখানে আনছে। আপনেগোরে সাহাইয্য করতে পারলে আমরা খুশি হবো,' বলে সে মাথা নিচু করেই আড়চোখে নিজের চাচাকে একবার দেখে নিলো। তার চাচাও সায় জানাল তার কথাতে।

'ঠিক আছে,' বলে মাসুম ফিরে তাকাল বাসিমের দিকে। 'তাহলে আর দেরি না করে পুরো পরিকল্পনাটা আমি একবার বুইঝা নিতে চাই।'

মাসুম কথাটা বলামাত্রই বাসিম শেরুর দিকে তাকাল; শেরু তার এক সাগরেদের দিকে ইশারা করতেই সে আবারও মেঝেতে রাখা পাটির ওপরে আগের মানচিত্রটা বিছিয়ে দিলো। 'হুজুর, ভালো কইরা দেখেন। এই তুমরাও দেখ,' এই কথাটা সে গেড়ুয়া আর তার সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলে উঠল। ওরাও কাছে এসে বসে পড়ল। 'এইখান থেইকা কাল কাকভোরে এই জায়গায় যাবো আমরা। সেই সাথে ওগো বাকি দলের সাথে আপনারা কাঠুরিয়ার ছদ্মবেশে এইখান থেইকাই নৌকায় উঠবেন। ওরা আপনেগো নিয়া ওইখান থেইকা দূরে এই জায়গায় কালীঘাটে যাইব।'

'এইখানেই সবাইরে পরীক্ষা কইরা একটা একটা কইরা নৌকা ছাড়া অয়,' গেড়ুয়া বলে উঠল। 'এই জায়গা পার হওনই সবচায়া কঠিন। হুজুর, গোস্তাকি না নিলে আমি এট্টু কই,' গেড়ুয়া মাথা নিচু করেই অনুমতির জন্যে রসুল খাঁর দিকে দেখে নিলো। সে মাথা নেড়ে সায় জানাতে বলে উঠল। 'হুজুর, আপনেগো আমগো কাপড় পড়তে অইব, আমগো জিনিসপত্র নিয়া লগে থাকতে অইব কুনো অস্ত্রপাতি নেওয়া যাইব না, আর ভুলেও আপনেরা কথা কইয়েন না। বোঝা গেছে?'

অস্ত্র নেওয়া যাবে না শুনে মাসুম বরখা আর ধোবল তিনজনেই একসাথে আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বাসিম হাত নেড়ে বলে উঠল।

'ও নিয়া আপনারা চিন্তা কইরেন না। অস্ত্র নৌকার তলে অন্য উপায়ে দেওয়া হবে। একবার ওইপার যাইতে পারলে আর চিন্তা নাই। বাকি কথাগুলো ও ঠিকই বলছে। শেরু, তারপর বলো, যদি ওরা পার অইতে পারে তবে কী করবে?'

'হুজুর, ওরা আপনেগো নিয়া নৌকা ভিতরে আরও পনেরো মাইল যাইয়া এইখানে নামায় দিব। এইখানে,' বলে সে মানচিত্রের একটা নিদিষ্ট জায়গা দেখাল। 'এইখানেই অগো দায়িত্ব শেষ হইবে।'

'ওইখানে আমার লোক থাকব। বাকিটা ওর কাছ থেকে বুঝে নিতে পারবেন,' রসুল খাঁ বলে উঠল।

'ঠিক আছে, আলোচনা অনেক হইছে এইবার কাজে নামতে হবে,' মাসুম জোর গলায় বলে উঠল তবে আরও কয়েকটা জিজ্ঞাসা আছে আমার। বলে সে আরও কিছু জানতে চাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই বাইরে অনেক হই-হট্টগোল শোনা গেল।

'কি ব্যাপার, অইছে কী?' রসুল খাঁ উদ্বিগ্ন স্বরে বলে উঠল।

ওরা দেখল ওদের পাহারাদারদের একজন দৌড়ে আসছে এদিকে। লোকটা এগিয়ে এসে হাঁপাতে হাপাতে বলে উঠল, 'হুজুর, একটা ঝামেলা অইছে।'

অধ্যায় দশ

বর্তমান সময়

পিবিআই অফিস, ধানমন্ডি ঢাকা

‘প্রফেসর ইফতেখার মাহমুদ, পুরোদস্তুর একজন ঝামেলাবাজ লোক,’ বলে হাবিব অনোয়ার পাশা কামরার একপাশে থাকা স্ক্রিন প্রজেক্টরে একটা স্লাইড ওপেন করতেই তাতে একজন মানুষের ছবি ভেসে উঠল। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি, মাথায় পাতলা চুল, ঠিক টাক বলা যাবে না আবার ঠিক চুল আছে তেমনও বলা যাবে না। লম্বা ধারালো বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্যহীন একটা চেহারা, তবে একটা জিনিস বাদে। আর তা হলো লোকটার ধারালো চোখ দুটো। বাশার খেয়াল করে দেখল মানুষটার মুখে সামান্য হাসি আছে, কিন্তু সেটা তার চোখ স্পর্শ করেনি মোটেই। আসলে একজন মানুষকে প্রথম দৃষ্টিতে দেখে তার ব্যক্তিত্ব বা ইত্যাদি আন্দাজ করা না গেলেও ফার্স্ট ইমপ্রেশন বলে একটা কথা থাকে। প্রফেসর ইফতেখার মাহমুদের চেহারা দেখে প্রথম দর্শনেই বাশারের যেটা মনে হলো সেটা হলো: লোকটা অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং ঠান্ডা মাথার একজন মানুষ এবং সম্ভবত বেশ নিষ্ঠুর বা ভাবলেশহীন প্রকৃতিরও।

‘ইসপেক্টর আহমেদ বাশার,’ আবারও মৌসুমির গলা শুনে বাস্তবে ফিরে এলো বাশার। ‘তোমার বর্তমান মিশন আসলে এই মানুষটাকে খুঁজে বের করা।’

‘যদি সে বেঁচে থাকে,’ বাশার অনেকটা আনমনেই বলে উঠল।

‘তা তো বটেই, তবে সে যদি মারা গিয়ে থাকে তবে সেটার একেবারে কংক্রিট প্রমাণ বের করতে হবে একেবারে ডিএনএ টেস্ট করিয়ে শিয়োর হয়ে। সেটা না হওয়া পর্যন্ত তার খোঁজ চলতেই থাকবে। এক কথায় বলতে গেলে জীবিত বা মৃত যাই হোক না কেন, প্রফেসর ইফতেখার মাহমুদকে তোমার খুঁজে বের করতে হবে,’ কথাগুলো হাবিব আনোয়ার পাশা আবারও মৌসুমিকে ইশারা করতে যাবে ইন্টারকম বেজে উঠল। হাবিব অনোয়ার পাশা ফোন রিসিভ করে ওপাশে কিছু একটা শুনে বলে উঠল, ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

ফোন রেখে সে প্রথমে বাশারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ‘বাশার, তোমার এটা প্রথম কেস এবং যদি আমরা ভুল না করে থাকি তবে এই কেসে প্রায় সব

ক্ষেত্রেই নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ আসবে। কাজেই এসব বিষয়ে হেল্প করার জন্যে তোমার একজন অ্যাসিসট্যান্ট কাম জুনিয়র পার্টনারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছেলেটার নাম সোহেল ইসলাম, আগে ডিবিতে ছিল। বলতে গেলে অনেকটা তোমার মতোই ওকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ও গতকাল জয়েন করেছিল। এখন এসেছে, আমি এখানে আসতে বলেছি।'

হাবিব আনোয়ার পাশা কথা শেষ করতেই দরজায় নক হলো, ভেতরে আসার নির্দেশ দিতেই ফাইল হাতে ভেতরে প্রবেশ করল পরিপাটি পোশাক পরা হ্যাংলা-পাতলা সুদর্শন এক যুবক, ভেতরে ঢুকে সে নিজের পরিচয় দিয়ে সালাম দিলো।

'ভেতরে আস, সোহেল। বাশারের সাথে পরিচিত হও, ও এই কেসে তোমার সুপিরিয়র হিসেবে আছে, আর আমরা ব্রিফিং শুরু করতে যাচ্ছিলাম। বাশারের কাছাকাছি এসে ওকে সালাম দিতেই ওর পাশের চেয়ার দেখাল বাশার, ধন্যবাদ জানিয়ে ওর পাশের চেয়ারে বসে পড়ল সোহেল ইসলাম নামের সুদর্শন ছেলেটা। বাশার খেয়াল করে দেখল আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার লোক হিসেবে একটু বেশিই ফর্সা আর সুদর্শন ছেলেটা। চোখে আবার চশমা, ফলে তাকে দেখে কোনো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ইয়াং ফ্যাকাল্টি মনে হয়, ডিবির অফিসার না। তবে সুদর্শন হওয়া তো আর কোনো অপরাধ না। বাশার ব্রিফিংয়ে মন দিলো।

'প্রফেসর ইফতেখার মাহমুদ, বাড়ি যশোরে, পড়ালেখা প্রথমে আন্ডারগ্রাড জওহরলাল নেহেরু ইউনির্ভাসিটিতে, এরপরে মাস্টার্স কায়রো ইউনির্ভাসিটিতে, পিএইচডি লন্ডনের কিংস কলেজে ফুল স্কলারশিপে। পেশা ছিল ইউনির্ভাসিটির গেস্ট প্রফেসর, বলতে গেলে ফুল টাইম আর্কিয়োলজিস্ট, সেরাদের সেরা বলা হতো তাকে একসময়। গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল মধ্যপ্রাচ্য। এরপরে অনেকটা প্রফেসর আবদেলের মতোই হঠাৎ কোনো কারণে বিষয় পালটে ভারতবর্ষ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। যদিও নির্দিষ্ট কারণটা সেভাবে জানা যায়নি। কিন্তু ধারণা করা যায় যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা রহস্য আন্দাজ করছি সেই কারণেই তিনি সম্ভবত তার বিষয় পালটে ভিন্নখাতে চলে আসেন। বিগত চার পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশে থাকছিলেন। মাঝেমধ্যে জাহাঙ্গীরনগরে পড়াতেন, আর বাকি সময় ইনডিপেনডেন্ট গবেষণা করতেন। প্রফেসর আবদেলের সাথে তার প্রথম পরিচয় লন্ডনে, এরপরে একটা সময় পরে তারা একসাথে গবেষণা করতে শুরু করেন। এরপরে বলতে গেলে একই সময়ে একইসাথে তাদের বাংলাদেশের অথরিটির সাথে গন্ডগোল বাধে, প্রফেসর আবদেলের মতোই তারও আর্কিয়োলজির লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হয় এবং এরপরই আজ থেকে তিন বছর আগে প্রফেসর আবদেলের মতোই গায়েব হয়ে যান তিনি-ও,' টানা বলে মৌসুমি থামল। এই হলো প্রফেসর ইফতেখারের লেটেস্ট আপডেট। তার ব্যাপারে বিস্তারিত ফাইল ছবিসহ হার্ড এবং সফট কপি তোমাদের দুজনকেই দেওয়া হবে।

বাশার একটা হাত তুলল। 'তার পরিবার?'

'হ্যাঁ, তার পরিবারের ব্যাপারে জানাটা জরুরি। কারণ আমাদের বিলিভ ওটা একটা সম্ভাব্য স্টার্টিং এরিয়া হতে পারে,' শেষ কথাটা সে হাবিব আনোয়ার পাশার দিকে তাকিয়ে বলেছে।

'আমাদের অ্যানালাইসিস্টরা দুটো স্টার্টিং পয়েন্ট বের করে রেখেছিল তোমাদের জন্যে; অবশ্যই তোমাদের চয়েজ, যেহেতু তোমরা ইনভেস্টিগেটর।'

'প্রফেসর ইফতেখার মাহমুদ এতিম ছিলেন। তার কোনো রক্তের সম্পর্কের পূর্ববর্তী রিলেটিভ পওয়া যায়নি কখনোই। লোকমুখে মানে তাদের পুরনো কলিগ ইত্যাদির কাছ থেকে জানা গেছে তিনি এতিমখানায় বড়ো হয়েছেন, কিন্তু সেখানে তিনি বেশিদিন থাকেননি আর আগের দিনে পথে পথে জাদু দেখিয়ে বেড়াত এরকম একটা যাযাবর বেদে সম্প্রদায়ের সাথে বড়ো হয়েছেন। যেই বেদে সম্প্রদায় থেকে শুরু করে ইউনির্ভাসিটিতে প্রফেসর হওয়া পর্যন্ত লম্বা এবং বিচিত্র জীবন ছিল তার। সেসব তোমরা ফাইলে পাবে। সব বলতে গেলে দিন পার হয়ে যাবে। তবে এইসব বিষয়গুলো তার জরুরি কারণ তিনি একজন অ্যাকাডেমিশিয়ন হলেও তার বিভিন্ন দিকে দারুণ দক্ষতা ছিলেন, প্রায় অ্যাক্রোবেটদের মতোই ফিটনেস ছিল তার, সেই সাথে জাদু এবং হাতসাফাই দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিত পারতেন মানুষকে খুব সহজেই।

'সুজা কথা কইতে গেলে ভার্সিটির প্রফেসরগুলা যেমন আবাল কিসিমের হয় তিনি কিন্তু মোটেই সেইরকম মানুষ না,' কথাটা বলে আলীম পাটোয়ারি আবারও চেয়ারে হেলান দিয়ে ঝিমুতে লাগল।

'পাটোয়ারি স্যার একদম ঠিক বলেছেন। অত্যন্ত ধূর্ত আর বুদ্ধিমান বলে খ্যাতি এবং কুখ্যাতি দুটোই ছিল তার। তো যাই হোক, লন্ডনে পড়ালেখার সময়েই প্রফেসর ইলা হাসান মাহমুদ নামে লন্ডনপ্রবাসী আরেক আর্কিয়োলজিস্টের সাথে পরিচয় প্রেম এবং বিয়ে হয়, তাদের ঘরে পরবর্তীতে একটা মেয়েও হয়। প্রফেসর ইফতেখার সংসার জীবনে মোটেই সুখী ছিলেন না, উনি নাকি অত্যন্ত বাজে রকমের জীবন-যাপন করতেন। তাদের মেয়ের বয়স যখন দশ বছর তখন ভদ্রমহিলার সাথে তার ডিভোর্স হয়ে যায়। মহিল আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে মারা যান।'

'আর তাদের মেয়ে?' বাশার জানতে চাইল।

'পৃথা হাসান মাহমুদ,' বলে মৌসুমি স্লাইড বাটন চাপতেই বাশার দেখল ওর বয়সি একটা মেয়ের ছবি ফুঠে উঠল স্ক্রিনে। 'বাবা-মায়ের বাজে সম্পর্কের সবচেয়ে বাজে প্রভাব সম্ভব তার ওপরেই পড়েছিল। সে কখনও বাবার সাথে থাকত আবার কখনও কখনও মায়ের সাথে। বাবার সাথে তার সম্পর্ক নাকি সবসময়ই শীতল

ছিল। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে নাকি বাবার সাথে সম্পর্ক আরও খারাপ হতে থাকে। প্রফেসর গায়েব হয়ে যাবার অনেক আগে থেকেই দুজনার ভেতরে মুখ দেখাদেখি বন্ধ, এমনকি তার নামের মাহমুদ অংশটাও সে এফিডেভিট করে বাদ দেয় পরে। এখন তার নাম শুধু পৃথা হাসান।'

'সে কি বাংলাদেশে থাকে?' বাশারের পাশ থেকে সোহেল জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, পেশায় সে-ও আর্কিয়োলজিস্ট; যদিও সে প্র্যাকটিসিং আর্কিয়োলজিস্ট নয়, সে মূলত গবেষণা করে। ঢাকায় মোহাম্মদপুরে থাকে, ইউল্যাব ইউনির্ভাসিটিতে পড়ানোর পাশাপাশি ওখানেই বাংলাদেশের পুরনো বিভিন্ন স্থাপনা নিয়ে গবেষণা করে।'

'এমনকি কোনো সম্ভাবনা আছে মেয়ের সাথে প্রফেসরের যোগাযোগ আছে?' বাশার জানতে চাইল।

জবাবে মৌসুমি বলে উঠল, 'আগেই বলেছি এটা তোমাদের জন্যে একটা সম্ভাব্য স্টার্টিং পয়েন্ট হতে পারে, কিন্তু কানাগলি হবার সম্ভাবনাও একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না। কারণ এই মেয়ের সাথে প্রফেসরের যে খারাপ সম্পর্ক ছিল তাতে তাদের যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা খুব কম।'

'আরও একটা ব্যাপার আছে। প্রফেসর গায়েব হয়েছিল পুলিশ থেকে শুরু করে নেক্রপলিস বা রেলিকের মতো সংগঠনের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে। খুব স্বাভাবিকভাবেই ওদের নজর থাকার কথা এই মেয়ের ওপরে কারণ প্রফেসরের একমাত্র জীবিত আত্মীয় হিসেবে তার সাথে তার যোগোযোগের সম্ভাবনা সবার মাথাতেই কাজ করবে। কাজেই একদিকে এই মেয়ে একটা আকর্ষণীয় সোর্স হয়ে উঠতে পারে।'

'বুঝতে পেরেছি। বাশার ওর মোবাইলে কিছু নোট নিচ্ছে। 'আচ্ছা, আরকেটা সম্ভাব্য লিডের কথা বলেছিলেন অপনারা সেটা–'

'লিডটা কী বলছি,' বলে মৌসুমি একটা স্লাইড চাপল। 'মধ্যবয়স্ক এক লোকের ছবি ফুটে উঠল। গোলগাল চেহারা মাথায় এলোমেলো চুল, মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত। 'প্রফেসর ইফতেখার মাহমুদের অ্যাসিসট্যান্ট ছিল এই ছেলেটা। নাম চৌধুরী হাসান শেখ।'

'এ কেমন নাম!' সোহেল মৃদ হেসে বলে উঠল। 'তিনটাই উপাধি, মেইন নাম নয় কোনোটাই।' তার কথা শুনে হেসে উঠল সবাই।

'শোনো, সিরিয়াস হও, কারণ এরপর যা বলব তাতে এই কেসের গভীরতার ব্যাপার খানিকটা আঁচ করতে পরবে তোমরা। এখন হয়তো ভাবছ তিন বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ভার্সিটির এক প্রফেসরকে খুঁজে বের করতে হবে, এ আর এমন কী! কিন্তু এখন বুঝতে পারবে ঝামেলাটা কোনো জায়গায়। আজ থেকে তিন বছর আগে

যখন প্রফেসর আবদেল আর প্রফেসর ইফতেখার লোকচক্ষুর আড়ালে সরে পড়ে সেইসময়ে এই চৌধুরী তাদেরকে হেল্প করেছিল। দুই প্রফেসর পালাতে পারলেও এই চৌধুরী পালাতে পারেনি। পুলিশের কাছে ধরা পড়ার পর নানা কেসে তার পাঁচ বছরের জেল হয়।'

'তারমানে এই লোক জেলেই আছে? তাকেও জেরা করতে হবে বিষয়টার ব্যাপারে বিশদ জানতে হলে?' বাশার খুশি হয়ে উঠল। 'প্রফেসরের মেয়ের চেয়ে এই লোক বেটার লিড মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'হ্যাঁ, এটা আরেকটা স্টার্টিং পয়েন্ট হতে পারে। আসলে তার সাথে কথা বলার জন্যে স্পেশাল পারমিশনের জন্যে আবেদন করা হয়েছিল গতকালই সেটা আজ পেয়েছি আমরা। তাকে আনার জন্যে লোক পাঠানো হয়েছে। এদিক থেকে আমরা খানিকটা কাজ এগিয়ে রেখেছি বলতে পারো।'

'গ্রেট, তাহলে বলা যেতে পারে, একদিকে চৌধুরীকে জেরা করা, অন্যদিকে প্রফেসরের মেয়ের সাথে কথা বলা—এই দুটো জায়গা থেকে আমরা শুরু করতে পারি

'গ্রেট, মৌসুমি,' স্লাইড বন্ধ করে হাবিব আনোয়ার পাশার দিকে তাকাতেই সে বলে উঠল, 'এক কাজ করো, বিস্তারিত ফাইল তো পাবেই বাশার আর সোহেল তোমরা মৌসুমির সাথে কথা বলে বাকি সব ফাইনাল করে নিয়ো। তার আগে তোমরা পাটোয়ারির সাথে ওর ল্যাবে গিয়ে ওয়েপন থেকে শুরু করে সব টেকনো রিসোর্স আপডেট করে নাও,' বলে মাথা সোজা করে দুজনার দিকে তাকাল। 'আশা করি কেসটার গভীরতা তোমরা বুঝতে পারছ, কাজেই আই অ্যাম কাউন্টিং অন ইউ গাইজ। হোপ ইউ য়োন্ট ডিসস্যাটিসফাই মি। বেস্ট অব লাক।'

'লও, আমার লগে লও,' বলে পাটোয়ারি নিজের হাতে ধরা একটা পুরনো চামড়ার ব্যাগ বাশারের হাতে ধরিয়ে দিলো। দুজনেই তার পিছু পিছু রওনা দিতেই মৌসুমি বলে উঠল, 'পাটোয়ারি স্যারর সাথে কাজ শেষ হতেই সোজা আমার এখানে চলে আসবে দুজনেই।'

দুজনেই মাথা নেড়ে সায় জানাল।

'বস, আপনার সাথে তো সেভাবে কথাই হলো না,' বাশারের পাশে যেতে যেতে সোহেল বলে উঠল।

'সমস্যা নাই, শুধু কথা না আগামী কয়দিন কথা-খাওয়া ঘুম তো বটেই বাকিসবও একসাথেই করতে হবে মনে হচ্ছে,' বলে ও হেসে উঠল। ওর সাথে সাথে সোহেলও হেসে উঠল।

ওরা দুজনেই পিছু নিয়ে পাটোয়ারির সাথে একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দুজনেরই মুখ হাঁ হয়ে গেল। ভেতরে দারুণ আধুনিক একটা ল্যাব। দুজনের হাঁ

হওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে পাটোয়ারি মৃদ হেসে উঠল। বাশারের হাত থেকে নিজের ব্যাগটা নিতে নিতে বলে উঠল, 'কী মিয়ারা, কেমুন লাগল আমার ল্যাব? এইটা বাংলাদেশের সবচেয়ে সফিসটিকেটেড ফরেনসিক ল্যাব। এমন ল্যাব প্রত্যেকটা বিভাগীয় শহরে বানানি অইব। আহো আমার লগে।'

'বস, বুড়ার কথা আর কামে তো কোনো মিল পাই না,' সোহেলের কথা শুনে হেসে উঠল বাশার। 'আমিও না,' বাশার বলে উঠল।

পাটোয়ারি ওদেরকে নিয়ে চলে এলো ল্যাবের একপাশে। সেখানে ল্যাব কোট গায়ে কাজ করছিল একটা ছেলে, তাকে কিছু নির্দেশনা দিতে সে স্টিলের কেসের মতো দেখতে একটা কেস নিয়ে এলো।

'দুইজনেই হাতা গুটাও দেখি,' সে পিস্তলের মতো দেখতে একটা সিরিঞ্জ বের করে প্রথমে বাশারের হাতে অ্যান্টিসেপটিক ডলে সেটা থেকে কিছু একটা পুশ করল, তারপর সোহেলের। কাজটা সেরে মনিটরে দুজনের মুভমেন্ট দেখিয়ে বলে উঠল, 'এইটারে বলে স্মার্ট ব্লাড, একরকমের ট্র্যাকার কইতে পার। জিনিসগুলা তোমাগো রক্তের লগে মিশা গেছে। তোমরা কই যাবা, কই আছ সব আমরা এইখান থেইকা ট্র্যাক করতে পারবো আগামী বায়াত্তর ঘণ্টা পর্যন্ত। এরপরে অব্যশ্য ডিজেবল হইয়া বাইর হইয়া যাইব।' দুজনকে দুটো ব্যান্ড-এইড ধরিয়ে দিয়ে, আরেকটা ফাইল ওপেন করল সে। বাশার দেখল ওর প্রোফাইল রেকর্ড।

'ভাতিজা, তোমার রেকর্ড তো ভালোই, এমন একটা ভুল করছিলা ক্যামনে?' বলে সে বাশারের দিকে ফিরে তাকাল। বাশার বুঝতে পারল লোকটা ওর পুরো প্রোফাইল হিস্ট্রি জানে। একারণেই সে তখন ওর মায়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিল।

'দেখি, হাত দেখি,' বলে সে বাশারের ডান হাতটা টিপে দেখতে লাগল। 'এখন তো সার্ভিস ইস্যু নাইন এম এম ব্যবহার করো তাই না?' বাশার মাথা নেড়ে সায় জানাল। 'দেখি, হাতের পাঞ্জাটা দেখি,' বলে সে বাশারের হাতটা নিজের হাতে নিয়ে ওর হাতের তালুটা দেখল কীসের একটা যেন মাপ নিলো, তারপর ল্যাবের অন্য ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'এই, যাও। আমার আর্মস কেস নিয়া আসো,' বলে সে ডেস্কের নিচের একটা ড্রয়ার খুলে দুটো প্যাকেট বের করে একবার দেখে নিলো। 'এই দুইটা লও,' বলে প্যাকেট দুটো এগিয়ে দিলো বাশারের দিকে একটা বাশার হাতে নিয়ে আরেকটা সোহেলের দিকে এগিয়ে দিলো।

'কী এইগুলা?' অনেকটা পোশাকের মতো দেখতে প্যাকেটটা হাতে নিয়ে উলটেপালটে দেখতে লাগল।

'আরে পোলারা,' পাটোয়ারি মনিটর থেকে চোখ সরিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'ঈদের ডেরেস পাইছনি যে কেউ দেইখা ফালাইলে ঈদের খুশি যাব গা?

প্যাকেট খুইল্লা দুইজনেই গায়ে দেও দেহি মাপ ঠিক আছে কি না।' বাশার প্যাকেট খুলে দেখল ভেতরে সাদা খুবই পাতলা বলতে গেলে প্রায় হাফ সোয়েটারের মতো একটা ভেস্ট। 'বুলেট প্রুফ ভেস্ট? বাহ এত পাতলা?'

'হু, বুলেট পুরুফ ভেস্ট, লাইটওয়েট কার্বনের, বর্তমান দুনিয়ায় এফবিআই থেইকা শুরু কইরা সবাই এখন এইটাই পরে, গায়ে দেও দেখি,' দুজনেই নিজেদের শার্টের ওপরে ভেস্ট দুটো পরে দেখছে।

'ঠিকই তো আছে মনে হচ্ছে,' সোহেল বলে উঠল। 'কিন্তু আমার কথা হলো, একজন প্রফেসরকে খুঁজে বের করার কেসে বুলেট পুরুফ ভেস্ট পরার আদৌ প্রয়োজন আছে কি?'

তার কথাটা শুনে পাটোয়ারি সরাসরি ফিরে তাকাল তার দিকে, 'বয়, ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া হোয়াট ইউ আর গোয়িং ইনটু, কাজেই সব রহমের লাইগা প্রস্তুত থাকতে অইব। ওই লও তুমগো অস্ত্র চইলা আসছে। দুইজনেই আগের মালগুলা জমা দাও,' পাটোয়ারি কেস খুলতে খুলতে বাশার আর সোহেল দুজনেই নিজেদের আগের স্ট্যান্ডার্ড ইস্যু পিস্তল দুটো টেবিলের ওপরে রাখল হোলস্টারসহ।

'দারুণ,' হাতে একটা ল্যুগার নিয়ে দক্ষ হাতে সেটার ক্লিপ চেক করতে করতে, প্রথমে সোহেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই সুন্দরি পোলা, তুমি আগে আসো। দেখি হাত, আহ হা হাত তো পুরা মাইয়াগো মতো, অবশ্য শক্তি আছে খারাপ না। এইটা ধর দেখি,' সোহেল পিস্তলটা হাতে নিতেই সে মুখ কুঁচকে ফেলল। 'নাহ, এইটা অইব না এইটা লও দেখি,' বলে সে সরু দেখতে একটা পিস্তল তুলে নিলো স্টিলের কেইসটা থেকে। 'এইটা লও দেখি,' সোহেল পিস্তলটা হাতে নিতেই সে হেসে উঠল। 'পারফেক্ট, এইটা হইল স্প্রিংফিল্ড আর্মরি রোনেন টেন এমএম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এইটার ব্যবহার শুরু অইছিল, তোমারে যেইটা দিলাম একেবারে লেটেস্ট। তোমার হাইট, হাতের মাপ আর স্ট্রাকচারের লাইগা পারফেক্ট। বারো রাউন্ডের ক্লিপ, ল্যাবের ওই পোলার কাছ থেইকা হোলস্টার আর এক্সট্রা কিলিপ নিয়া নিবা। এইবার তুমি আসো দেখি,' বলে বাশারের দিকে ফিরে তাকাল। তোমারটা অবশ্য ঠিক করাই আছে, বলে সে কেস থেকে আর্মি ফ্যাটিগ কালারের একটা কমব্যাট পিস্তল তুলে নিলো। ষোলো রাউন্ডের ম্যাগাজিন, বলে অভ্যস্ত হাতে পিস্তলটা লোড আনলড করল। 'দারুণ, এক্কেরে লেটেস্ট মাল, হাতে লও দেখি,' পিস্তলটা বাশার হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। একেবারে চকচকে আধুনিক একটা জিনিস। এখনও ফ্যাক্টরি গ্রিজ লেগে আছে।

'পাক্কা মাল, একদম ঠিকাছে তুমার লগে। এইটারে কয় নাইটহক, মানে রাইতের বাজপাখি, ব্যাপক না নামডা? হা হা, নাইটহক ভিআইপিএজেন্ট টু

পিস্তল। মারাত্মক জিনিস,' বলে সে ঘুরে গেল। 'আইচ্ছা পিস্তল অইল। এইবার, এই দুইটা লও,' বলে দুজনের দিকে দুটো সুইচ নাইফ এগিয়ে দিলো। 'মাইক্রোটেক স্প্রিং ভি, দুনিয়ার সেটা ফাইটিং, থ্রোয়িং এবং কমব্যাট সুইচ নাইফ, জন উইক থেইকা শুরু কইরা ইথান হান্ট, জেমস বন্ড থেইকা জেসন বর্ন সবাই মাইক্রোটেকের ছুরি ইউজ করে,' বলে সে মনিটরে একবার চেক করে নিলো।

'ব্যাস, টেরেকার অইল, অস্ত্র অইল, ছুরি অইল। এইবার এইগুলা সই কইরা ওই পোলার কাছ থেইকা বাকি সব মাল নিয়া আমার চোখের মনে থেইকা বিদায় অও। বহুত টাইম নষ্ট করছি তুমগো লগে,' যেন প্রচণ্ড বিরক্ত সে এমন সুরে বলে উঠল। দুজনেই নিজেদের জিনিস বুঝে নিয়ে কাগজে সই করতেই পাটোয়ারি হঠাৎ নিজের স্বাভাবিক গলার চেয়ে একেবারে ভিন্ন গলায় বলে উঠল, 'তোমরা দুইজনেই মনোযোগ দিয়ে শোনো। তোমরা দুইজনে অভিজ্ঞ পুলিশ এবং অফিসার, কিন্তু একটা কথা মনে রাখবা এখন তোমরা ভিন্ন জগতে পা রাখছ। এই জগৎ আলাদা জগত, এইটা সাধারণ পুলিশ প্রসিজারের ভিতরে পড়ে না,' অত্যন্ত স্মার্ট ভঙ্গিতে নিজের কাঁধ নাড়িয়ে বলে চলেছে সে। 'তোমরা হয়তো কেসটা দেইখা ভাবতাছ, এইটা আর এমন কী? মনে রাইখো এর আগে আমার সেরা দুই এজেন্ট এইরকমই সাধারণ কেস ঘাঁটতে গিয়া দুনিয়ার ঝামেলার জিনিস পাইছে। আমার ধারণা তোমাদের এই কেস এমনকি ওগুলার চায়াও জটিল হইতে পারে। একদিকে ঘোড়েল প্রফেসর, অন্যদিকেই শক্তিশালী অথরিটি। তার ওপরে ভয়ঙ্কর অদৃশ্য শত্রু, কাজেই সাবধান। প্রতিটা পা ফেলবা সাবধানে। একটা ভুল করবা না, আর কাউরে বিশ্বাস করবা না, এমনকি নিজেরেও না। যা বললাম ঘটে বুদ্ধি থাকলে ঠিকই বুঝবা। গুডবাই অ্যান্ড গুড লাক, ওইটাই এখনও তোমাদের দরকার,' কথা শেষ করে ল্যাবের অন্য ছেলেটার দিকে ঘুরে গিয়ে সে বলে উঠল, 'এই পোলা, তুমারে না বলছিলাম, পুরান ঢাকা থেইকা বুইড়া মোক্তারের পান আনাইতে, সেইটার আপডেট কী?' বলেই সে আবারও ফিরে তাকাল ওদের দুজনার দিকে। 'ঘটনা কী? খাড়ায়া আছ ক্যান, সিন্নি লাগছেনি! বিদায় অও।'

দুজনেই ধমক খেয়ে ত্বরিতবেগে নিজেদের জিনিস বুঝে নিয়ে ল্যাব থেকে বেরিয়ে এলো। দুজনেই ওয়াশরুমে ঘুরে নিজেদের পরিধেয় খুলে, ভেস্ট পরে, তাতে হোলস্টার সেট করতে করতে সোহেল বলে উঠল, 'বস, বেশ একটা জেমস বন্ড জেমন বন্ড ভাব আসছে না। বন্ডের সিনেমাগুলাতে কিউ ব্রাঞ্চ থেকে সব রিসোর্স দেওয়া হয় ওইরকম।'

সোহেলের কথা শুনে হেসে উঠল বাশার। নিজের পোশাক ঠিকঠাক করে নিতে নিতে বলে উঠল, 'হুম, সবই ঠিক আছে এখন দরকার শুধু বন্ডের মতো একটা ভিলেন তাহলেই বুঝবেন ঠেলা কাকে বলে,' নিজের পোশাক ঠিক করে সোহেলের হোলস্টারটা ঠিক করতে তাকে হেল্প করতে করতে বাশার আরও কিছু

একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ওয়াশরুমে প্রবেশ করল রিসিপশনে থাকা পরিপাটি পোশাক পরা লম্বা চুলের ছেলেটা।

'বস, আপনারা এখানে, আপনাদেরকে পুরো অফিস খুঁজছে,' ছেলেটা একরকম হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল।

'কেন, কী হয়েছে?' বাশার জানতে চাইল। নিজের পোশাক পরা শেষ করে অস্ত্র ঠিক করে এখন অনেকটাই কনফিডেন্ট লাগছে নিজের কাছে।

'বস, একটা দুঃসংবাদ আছে, অমি জানি কিন্তু আমার বলার অনুমতি নেই, আপনারা জলদি চলুন মৌসুমি আপার অফিসে।

'ঘটনা কী, একটু আগে দেখলাম সব শান্ত হঠাৎ এমন কী হয়ে গেল?' বাশারের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সোহেল প্রশ্ন করল।

'খুব না জেমস বন্ড হবার শখ ছিল, খেলা শুরু হয়ে গেছে মনে হচ্ছে,' ওরা দুজনে মিলে মৌসুমির অফিসের সামনে এসে দেখল সে সেখানে নেই, হাবিব আনোয়ার পাশার কামরার দরজা খোলা। দুজনেই সেদিকে এগিয়ে দেখল হাবিব আনোয়ার পাশা ডেস্কের সামনে দাঁড়ানো, মৌসুমি তার ফোনে কথা বলছে, আবার পাটোয়ারিও দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

'ও তোমরা এসেছ,' ওদের দিকে সিগার তাক করে এমনভাবে কথাটা বলে উঠল অনোয়ার পাশা যেন ওরা তার বাসায় দাওয়াতে এসেছে।

'স্যার শুনলাম–'

'হুম, ব্যাড নিউজ আছে।' তার গলায় কোনো উত্তেজনা নেই।

'কী ব্যাপার, হঠাৎ–'

'চৌধুরী জেল থেকে পালিয়ে গেছে,' মৌসুমি ফোনটা রেখে চট করে বলে উঠল ওদের দিকে তাকিয়ে।

এক মুহূর্তে, জন্যে তার কথাটা ঠিক প্রসেস করতে পারল না বাশারের মস্তিষ্ক। চৌধুরী কে সেটাও ধরতে পারলো না সে, তার পরমুহূর্তে সাথে সাথে বুঝতে পারল ব্যাপারটা কী এবং কেন সেটা সিরিয়াস। 'চৌধুরী মানে প্রফেসর ইফতেখারের অ্যাসিসট্যান্ট, যে জেলে ছিল?'

'হ্যাঁ, সে বিগত কয়েক বছর ধরে জেলে ছিল সে। আজ যখন অনুমতি পাবার পর আমাদের লোক গেছিল তাকে স্পেশাল কাস্টডিতে নিয়ে আসার জন্যে, গিয়ে দেখে তাকে যে বিশেষ সেলে বন্দি করে রাখা হয়েছিল সে সেখানে নেই,' গম্ভীর এবং শান্ত সুরে বলে উঠল আনোয়ার পাশা। 'এর মানে বুঝতে পারছ কেসটা শুরু করার আগেই কেসের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং ভাইটাল স্টার্টিং এরিয়াটা আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল।'

অধ্যায় এগারো

সময়: ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ

রসুল খাঁর জমিদার বাড়ির বৈঠকখানা

মানুষটার পরনের পোশাকটাকে ঠিক শতচ্ছিন্ন বলা যাবে না, আবার সেগুলোকে পুরোপুরি পোশাকের পর্যায়ে ফেলাটাও ঠিক হবে না। মুখে কতদিনের অপরিচ্ছন্ন দাড়ি কে জানে, একই অবস্থা তার চুলেরও। পাটকাঠির মতো সরু শরীরটা দেখলে মনে হয় বেতগাছের গায়ে খোলস ছেড়েছে কোনো লম্বা সরু সাপ। মাসুম অনুমান করল দীর্ঘদিন গোসল না করার ফলে এই অবস্থা হয়েছে। মোঘল বাহিনীতে কাজ করার সময়ে মাসুম হিন্দুস্থানের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে। তখন সে দেখেছে জটাধারী সন্নাসীদের অনেকের এমন হয়। তবে লোকটার দিকে তাকিয়ে একটা ব্যাপার কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছে না মাসুম। লোকটার পুরো অবয়বের সাথে তার একটা জিনিসের কোনো মিল নেই, সেটা হলো তার অসম্ভব উজ্জ্বল আর প্রাণচঞ্চল চোখজোড়া। শরীর চেহারা এবং পরিধেয়র সাথে একেবারেই বেমানান চোখজোড়া একদিকে যেমন অসম্ভব উজ্জ্বল, একইসাথে সে-দুটো বিচিত্ররকমের প্রাণচঞ্চলও বটে। মুহূর্তের জন্যেও যেন চোখজোড়া স্থির হচ্ছে না। এদিক থেকে সেদিকে নড়েচড়ে তো বেড়াচ্ছেই, চোখের দৃষ্টির ভাবভঙ্গিও পরিবর্তন হচ্ছে যেন ক্ষণে ক্ষণে। মনে হয় চোখজোড়া যেন সামনে বসে থাকা মানুষটার নয়, বরং কোনো দুষ্টু বাচ্চার, যার মাথার ভেতরে ক্ষণে ক্ষণে নানা দুষ্টামির ভাবনা চিন্তা খেলে যাচ্ছে।

'হুজুর, আমি কইতাছি আপনাগো আমারে নিতেই অইবে   লোকটা আবারও কথা বলে উঠতেই মাসুম দেখল তার মুখের সামনের দিকে ওপরের সারিতে দুটো দাঁত নেই। যে-কারণে কথা বললে অনেক উচ্চারণ বিকৃত হয়ে যায়। বিশেষ করে 'ছ' বর্গীয় শব্দ যেগুলো উচ্চারণ করতে জিহ্বা আর তালুর সংযোগে বাতাস ওপরের সারির সামনের দিকে বাড়ি খায়, সেগুলো উচ্চারণ একেবারেই বিকৃত শোনায়। লোকটা কথা বলতে বলতে উত্তেজিত ভঙ্গিতে মাটি থেকে উঠে যাচ্ছিল কিন্তু শেরু তাকে নিজের হাতের লাঠি দেখিয়ে শক্ত ধমক দিলো। 'নুক্কুন,' শেরু ধমক দিয়ে উঠতেই মাসুম অনুমান করল এটাই লোকটার নাম সম্ভবত।

'বইসা কথা বল, তুই এই পর্যন্ত আসতে পারছস এইটা তোর কপাল, হুজুরগোরে সম্মান দিয় কথা কইবি না অইলে মাতা ফাডায়া ঘিলু বাইর কইরা ফালাব কই দিলাম,' মাসুম অবাক হয়ে দেখল হ্যাংলা-পাতলা পাগলাটে লোকটা কোথায় শেরুর মতো দানবের ধমক খেয়ে চুপ হয়ে গুটিয়ে যাবার কথা সেখানে লোকটা উলটো বাচ্চাওয়ালা মুরগির মতো ফুঁসে উঠল।

'এই মাতারির পোলা, চুপ কর,' তার গলার স্বর শরীরের তুলনায় অসম্ভব ভারী আর গম্ভীর, 'আমারে কথা কইতে দে,' বলেই সে একবার রসুল খাঁ আর বাসিমের দিকে দেখে নিয়ে মাসুমের দিকে ফিরে আবারও কথা বলে উঠল, 'হুজুর, আপনের দুই পায়ে পড়তাছি, আমারে আপনেগো লগে নিতেই অইব,' বলে লোকটা আরেকটু হলে মাসুমের পায়েই ধরে ফেলত যদি শেরু তাকে না আটকাত। মাসুম আড়চোখে একবার বাসিমকে দেখে নিয়ে গেড়ুয়ার দিকে তাকাল। বাসিম আর তার বাপ দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। ওদের থেকে খানিক তফাতে মাটিতে বসে আছে গেড়ুয়া। মাসুম তাদের দিকে তাকাতে দুজনেই মাথা নেড়ে মানা করল লোকটার ব্যাপারে, যাতে ও কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত না জানিয়ে ফেলে।

আজ সন্ধ্যায়, মাসুম, বরখা আর ধোবলেরা মিলে বাসিম রসুল খাঁ আর শেরুর উপস্থিতিতে ওদের ভোরের অভিযান নিয়ে গেড়ুয়া আর ওর চাচার সাথে পরিকল্পনার প্রায় শেষ দিকে, ঠিক কখন নিচ থেকে হই-হট্টগোল শুনে ওরা সবাই বেশ অবাক হয় এবং এক সিপাহি দৌড়ে এসে জানায় একটা সমস্যা হয়েছে, বাড়ির প্রধন ফটকে পাগল এক লোক এসে বাড়ির কর্তাদের সাথে দেখা করতে চাইছে। তাকে মানা করার পরও কোনো কথা শুনছে না বারবার অনুরোধ করছে দেখা করার জন্যে সেই সাথে পাগলামিও করছে। সাথে সাথে শেরু আফসোসের সাথে মাথা নেড়ে বলে উঠল এই পাগলের সাথে তার আগেও দেখা হয়েছে। সে তাকেও অনুরোধ করে বলেছে সে নাকি ওইপাড়ের সব জানে এবং চেনে সে মাসুমদের সাথে ওপাড়ে যেতে চায়। কারণ তার নাকি কী প্রয়োজন, কিন্তু লোকটাকে বেশি সুবিধার মনে না হওয়াতে সে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। এখন কীভাবে কীভাবে যেন বসতবাড়ি পর্যন্ত চলে এসেছে। শেরু তার লোক নিয়ে ফটকের কাছে যাবার পরও লোকটা কোনো কথা শোনেনি, সে মাসুমদের সাথে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে রয়েছে এখনও, তার এই অতি আগ্রহ দেখে বাসিম তাকে ডেকে পাঠায়। ভেতরে আসার পর থেকে বারবার অসংলগ্ন কথাবার্তা বলাতে ধমক দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে রাখা হয়েছে।

মাসুম একটা হাত তুলে শেরুকে থামিয়ে দিয়ে লোকটার দিকে সরাসরি তাকিয়ে কথা বলে উঠল, 'তোমার নাম নুক্কুন?' মাসুম যথাসম্ভব শান্তভাবে লোকটার সাথে কথা বলার চেষ্টা করছে।

'নুক্কুন। আমি এই এলাকারই মানুষ, আমার–'

'নুক্কুন শোনো, আমি যা জানতে চাইব আগে ঠিকঠাক তার উত্তর দিবা, পরে অন্য আলাপ করবো। আর আমি কিছু জিজ্ঞাসা না করলে সেইটা নিয়া কথা বলবা না, বুঝতে পারছ? আর আমার কথার উত্তর দিবা সোজাসুজি, অনেক কথা আমি শুনতে চাই না,' মাসুমের কথা, জবাবে সে কিছুই না বলে স্রেফ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। 'কি হইল, তোমারে যা জিগাইলাম বুঝছো?'

এইবার সে সামান্য মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলো মাসুম যা বলেছে সে তা বুঝতে পেরেছে। 'আমারে আগে বলো আমরা জল-জঙ্গলের দিকে যাইতেছি এইটা তুমি জানলা কই?' মাসুম প্রশ্নটা করতেই সে শেরুর দিকে তাকাল।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে মাসুম শেরুকে দেখে নিয়ে আধপাগলা নুক্কুনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আমি বুঝতে পারছি, শেরুর লোকেরা যখন ওইপাড়ে যাবার মতন লোক খুঁজতেছিল, তখন তুমি জানতে পারছ?' মাসুম একবার বাসিম আর গেড়ুয়ার দিকে দেখে নিলো সবাই মনোযোগ দিয়ে ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে। 'আচ্ছা, তুমি কি জানো আমরা কী কাজে ওইখানে যাইতেছি?' এই প্রশ্নটার উত্তর জানা খুব জরুরি।

নুক্কুন এবার চোখ তুলে তাকাল সরাসরি মাসুমের দিকে। 'আমি জানি, হুজুর। আপনেরা মোঘলগোর লগে মারামারি করতে যাইতাছেন, কারণ হেরা আসলাম শেঠরে মারছে।'

লোকটার জবাব শুনে মাসুম হেসে উঠল। 'আমরা মারামারি করতে যাইতেছি না,' লোকটা ওদের উদ্দেশ্য নিয়ে বিস্তারিত জানে না এটা অনেকটা স্বস্তির। 'যাই হোক–'

'হুজুর, আপনেরা মানুষ আনতে যাইতেছেন, সেইটার লাইগা লাগলে মারামারিও করবেন, আমি ঠিক কইছি না?' আধপাগলা নুক্কুনের কাছ থেকে এরকম জবাব একেবারেই আশা করেনি মাসুম। সে চট করে বরখার দিকে দেখে নিয়ে বাকিদের দিকে ফিরে তাকাল। সবাই খানিকটা চমকে উঠেছে লোকটার কথা শুনে।

'আচ্ছা নুক্কুন, তুমি তো জানো ওই এলাকা এখন নরকের সমান। তাইলে তুমি ক্যান ওইখানে যাইতে চাও?' মাসুম আসলেই লোকটার উদ্দেশ্য এবং বিধেয় দুটোই বোঝার চেষ্টা করছে। কারণ এরকম আন্দাজি একটা লোক যদি ওদের ব্যাপারে এতটা জানে তবে এলাকাতে ওদের খবর কতটা ছড়িয়েছে সেটা ওর জানা এবং বোঝা দরকার।

'হুজুর,' বলে সে নিজের দুই হাত তুলল। 'হুজুর, আমি এই এলাকারই মানুষ, বিশ্বাস না অইল সায়েবগোরে জিগাই দেখেন,' বলে সে শেরু, বাসিম রসুল খাঁ ওদের দিকে নির্দেশ করল। 'আমারে সবচাইতে পাগল কয়া ডাকে কিন্তু সত্যি কথা

অইল আমি আসলেই পাগল কিন্তু আমি পাগল অইলেও,’ মাসুম দেখল লোকটার চোখে অশ্রু গড়াতে শুরু করেছে। ‘আমি বুঝতাছি আপনেরা আমারে ক্যান এতকিছু জিগাইতাছেন। কারণ আপনেরা ভাবতাছেন আমারে দিয়া আপনেগো কোনো বিপদ অইব নাকি। হুজুর, আপনেগো কথা কেউই জানে না নিশ্চিত থাকতে পারেন। আমি জানছি কারণ আমি পাগল অইলেও কিছু জিনিস বুঝি। আমি আপনেগো লগে ওইপাড়ে যাইতে চাইতেছি কারণ আমার পরিবার। আমার বউ পোলাপান ওই পাড়ে আটকা পড়ছে। মোঘলগোর লগে যুদ্ধে ওরা বাইচা আছে না মইরা গেছে আমি জানি না। আমি পাগল, কিন্তু আমি আমার পরিবাররে বাঁচাইতে চাই হুজুর, আপনেরা না নিলে আমি যাইতে পারবো না। আমারে একটা সুযোগ দেন,’ বলে সে চট করে দাঁড়িয়ে গেল। ‘হুজুর, আমি পাগল অইতে পারি কিন্তু জল-জঙ্গল এলাকায় সব আমার চিনা, আমি ওই এলাকার এক একটা মাছ, পক্ষীও আমার চিনা। ওইপাড়ে আমারে যদি একবার নিয়া যান আমি আপনেগো সব সাহাইয্য করতে পারবো,’ বলেই সে আবারও মাটিতে একেবারে মাসুমের সামনে গড়িয়ে বসে পড়ল। ‘হুজুর, আমারে নিয়া যান, আমি কোনোভাবেই যাইতে পারতাছি না, আমারে সুযোগ দেন,’ বলে সে আবারও বলে উঠল। ‘হুজুর, আমারে সুযোগ দেন,’ বলে লোকটা রীতিমতো হাউমাউ করতে লাগল।

লোকটার অবস্থা দেখে মাসুমের মন আক্ষরিক অর্থেই নরম হয়ে উঠল, সে শেরুর দিকে তাকিয়ে ইশারা করল, ‘এক কাজ করো, ওরে নিয়া যাও, কিছু খাইতে দাও। আমি পরে ওর সাথে আবার কথা বলতাছি।’

শেরু তার সৈনিকদের ইশারা করল লোকটাকে নিয়ে যাবার জন্যে। মাসুম শুনতে পেল যাবার সময়ে লোকটা কারও নাম ধরে ডাকছে। লোকটা চলে যেতেই মাসুম ফিরে তাকাল শেরুর দিকে, ‘আমার একটা কথা জানবার আছে?’ তুমি যে আমাদের সাথে যাইবা খবর ছড়াইছ সেটা কত জনে জানে?’

‘হুজুর, আমি–’

শেরু কিছু বলতে শুরু করেছিল তার আগেই গেড়ুয়া মাথা নিচু করে কথা বলে উঠল, ‘হুজুর, গোস্তাকি মাফ নিবেন। আমি একটু কথা বলি। পাগল নুক্কুন আপনেগো ব্যাপারে জানে বইলা হয়তো আপনের মনে অইতাছে হয়তো অনেকেই আপনেগো ব্যাপারে জাইনা গেছে। কিন্তু আসলে বিষয়টা তা না। শেরু ওস্তাদে আমগো আগে যাগো লগে যাইতে চাইছিল, এই পাগল নুক্কুন হেগো এলাকায় ঘোরাঘুরি করে, মনে অয় তাগো কাছেই শুনছে। হুজুর, আপনে নিশ্চিত থাকেন বেশি লোকে জানে নাই। আর পাগল নুক্কুন পাগল অইতে পারে কিন্তু ক্ষতিকর না।’

‘এই লোকটা আসলে কে, আর তার পরিবারের বিষয়ে যা কইল সেইটা কি ঠিক?’

বাসিম আর রসুল খাঁ দুজনেই ফিরে তাকাল শেরুর দিকে। শেরু কাঁধ ঝাঁকাল, 'হুজুর, নুক্কুন একটা কথা ঠিকই কইছে ও এই এলাকারই লোক, ভবঘুরে পাগল টাইপ। টুকটাক কাজকাম করে, লোকের ফুটফরমাইশ কইরা দেয়, বিনিময়ে খায়-চলে আরকি। বাড়িঘর নাই। মাঝেমধ্যে গায়েব অইয়া যায়, আবার আইসা হাজির অয়। গেড়ুয়া ঠিকই বলছে, ও ক্ষতিকর না। তবে হুজুর, সত্যি কথা কইতে হের যে পরিবার আছে এইটা আমি এই প্রথম শুনলাম। হেয় কই থেকে আইছে কেউই জানে না।'

বাসিম কথা বলে উঠল হঠাৎ, 'এমন হইতে পারে ওর পরিবার হয়তো জল-জঙ্গলে থাকে কিন্তু ও পাগল বইলা ওকে পরিবার থেকে বিতারিত করা হইছে। কিন্তু যুদ্ধের কথা শুইনা ও হয়তো অস্থির হয়ে পড়ছে পরিবারের কাছে ফিরা যাবার জন্যে।'

'আমার কথা সেইটা না, তার পরিবার আছে কি নাই, এইটা পরের প্রশ্ন,' মাসুমের পাশ থেকে বরখা বলে উঠল। 'তাকে কি আমরা সাথে নিব না কি?'

শেরু কিছু না বলে গেড়ুয়ার দিকে তাকাল। সবাই বুঝতে পারছে জল-জঙ্গল এলাকায় প্রবেশ করার যে পরিকল্পনা ওদের, ওটাতে গেড়ুয়াই প্রধান। 'হুজুর, গোস্তাকি মাফ নিবেন। ওইখানে ঢুকতে এমনেই অনেক ঝুঁকি, আমগো খুবই সাবধানে হুজুরগোরে লুকায়া কাঠুরিয়া সাজায়া নিয়া ঢুকতে অইব। আমার মনে অয় এই পাগলরে ওইটাতে সামিল না করাই ভালো, কারণ সবশেষে সে পাগল, যদি একটা উলটাপালটা কিছু করে তাইলেই অইছে, সব শেষ। হুজুর, গোস্তাকি নিয়েন না, এইটাই আমার মতামত, বাকি আপনেগো মর্জি,' কথা শেষ করে মাথা নাড়ল সে।

মাসুম ফিরে তাকাল বাসিমের দিকে। 'আমি শেরুর লগে একমত, কারণ এই ঝুঁকি নিতে গেলে সবার জীবন তো খাতরায় পড়তে পারে তার ওপরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে যাইতাছেন আপনারা।'

মাসুম তাকিয়েছিল বাসিমের দিকে, তার কথা শেষ হতেই সে ফিরে তাকাল বরখা আর ধোবলের দিকে। বরখা সোজা মাথা নেড়ে মানা করল, ধোবল চুপচাপ। মাসুম আনমনে মাথা নাড়ল লোকটাকে দেখে ওর খারাপই লেগেছে কিন্তু বাসিম ঠিকই বলেছে। ওরা যাচ্ছে এমন এক কাজে, যেটা স্রেফ গুরুত্বপূর্ণই না পুরো বাঙাল মুল্লুকের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এর ওপরে, কাজেই একজন মানুষ আর তার পরিবারের জন্যে পুরো বিষয়টাকে সে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে না। মাসুম দ্বিধা করছে দেখে বাসিম বলে উঠল, 'জনাব, কিছু মনে না করলে একটা কথা বলি, এই পাগল লোকটা কি আদৌ ঠিক বলতাছে কি না তার পরিবারের বিষয়ে সেইটাও কিন্তু আমরা জানি না। কাজেই–'

'আচ্ছা ঠিক আছে, ওরে নেওয়া যাবে না,' বলে সে নিজে নিজেই মাথা নাড়ল। 'কিন্তু ওর সাথে তুমরা খারাপ ব্যবহার কইরো না, পারলে ওরে খাওয়া দাওয়া দিয়া এইখানেই রাখ,' কথাটা সে শেরুকে উদ্দেশ্য করে বলেছে। 'এখন করণীয় বলো?'

'হুজুর, আপনেরা এখন রাইতের খাওয়া সাইরা জলদি বাইর হইতে অইব। বেলা এখন বিকাল পার হয়া রাতের দিক, প্রথমে আপনেরা এইখান থেইকা, তেলীগাতির জঙ্গলে যাবেন, ওইখানেই গেড়ুয়াগোর বাকি সাথীরা আছে। সেইখানে গিয়া আপনেরা পোশাক পালটায়া ওগো লগে মিশা যাবেন। ওইখানে আপনেগো আরও কিছু প্রস্তুতি আছে। সেইগুলা সব সাইরা রাইতের শেষ প্রহরে অন্ধকার থাকতেই নাওয়ে চড়বেন বাকিগো লগে। এরপরে ওইখান থেইকা রওনা দিবেন কালীঘাটের উদ্দেশ্যে,' বলে সে একবার গেড়ুয়াকে দেখল।

'আজ্ঞে, হুজুর, যেইভাবে বলছেন সেইভাবেই সব অইব,' বলে সে চোখ তুলে তাকাল। 'দুয়েকটা অনুরোধ করতে পারি, আপনেগো ভালোর লাইগাই। গোস্তাকি না নিলে–'

মাসুম একটু বিরক্ত হলো ছেলেটার ওপরে। এই ছেলে অতিভক্তি দেখায়, মাঝে মাঝে যেটা বিরক্তিকর। 'বলো বলো, এত ভণিতার দরকার নাই।'

'হুজুর, প্রথম কথা, তেলীগাতি গেলে অপনেগো আমগো কাপড় পরতে অইবে, আমগো মতন তিলক লাগায়া সাজতে অইব, ধম্ম নিয়ে কিছু মনে নিয়েন না,' মাসুম ছেলেটার কথা শুনে আনমনে মাথা নাড়ল, যুক্তির কথা বলেছে সে। এটা বলাটা ওর জন্যেও গুরুত্বপূণ্, কারণ ধর্মের ব্যাপারটা খুবই স্পর্শকাতর। 'ঠিক আছে,' বলে উঠল ও।

'হুজুর, কোনো অস্ত্র নিয়েন না, আর কোনো কথা কইয়েন না,' ছেলেটার এবারের কথাটা শুনে খানিক বিরক্ত হলেও মাসুম বেশি কিছু বলল না। 'ঠিক আছে।'

'অস্ত্রের বিষয়ে আমার খানিকটা কথা আছে,' বাসিম বলে উঠল। 'তেলীগাতি পর্যন্ত আপনাগো লগে কয়েকজন লোক যাবে আপনেগো প্রস্তুতিতে সাহাইয্য করার লাইগা। আর যদিও ওরা বারবার বইলা দিছে যে অস্ত্র নেওয়া যাবে না, কিন্তু আমরা তিনটা তরবারি আর বর্শা নৌকার নিচে বাইন্ধা দিব, যাতে ওইপাড়ে যাবার পর আপনাগো কাজে লাগে।'

বাসিমের কথা শুনে গেড়ুয়া প্রবল আপত্তির সাথে মাথা নেড়ে মানা করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই শেরু ধমকে উঠল, 'তোর অনেক কথা শুনছি, এইটা নিতেই হবে,' সাথে সাথে গেড়ুয়া মাথা নিচু করে ফেলল। 'হুকুম হুজুর।'

তবে মাসুম তার দিকে তাকিয়ে অনুধাবন করতে পারল ছেলেটার একদমই ভালো লাগছে না এই অস্ত্র নেওয়ার ব্যাপারটা। মাসুম হয়তো শেরুকে মানা করে দিত কিন্তু বাসিম ঠিকই বলেছে অস্ত্রগুলো ওপারে ওদের অনেক কাজে দিবে, কাজেই এটা সে মানা করতে পারে না। 'ঠিক আছে, সবাই প্রস্তুত হওয়া শুরু করো অনেক সময় নষ্ট হইছে এইবার কাজে নামাটা বেশি জরুরি।'

তাও যতই জলদি বলুক সব গুছিয়ে রাতের খাওয়া আর কাজ সেরে ওদের বের হতে হতে আরও প্রায় এক ঘণ্টার ওপরে লেগে গেল। অবশেষে শেরু তার সাথে চারজন সৈনিক, মাসুম, ধোবল, বরখা আর গেডুয়ারা তিনজন রসুল খাঁ আর বাসিমের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে তেলীগাতির উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করল।

পুরো দুই ঘণ্টা লাগল ওদের হেঁটে জায়গামতো পৌঁছাতে। প্রথমে রসুল খাঁদের এলাকা থেকে বের হয়ে ওরা একরকম বলতে গেলে অন্ধকারের ভেতরেই আট-দশজন মানুষ নিঃশব্দে হেঁটে পুরো জনবসতি এলাকা পার হয়ে আসে, যাতে সেভাবে কারও চোখে না পড়ে। তারপর বেশ কয়েকটা ফসলের মাঠ পার হবার পর শুরু হয় জঙ্গুলে এলাকা। মাসুম, ধোবল আর বরখারা অনেকটা অন্ধের মতোই পুরো জঙ্গুলে এলাকায় ঠোকর খেতে খেতে হাঁটতে থাকে। তাও জঙ্গুলে এলাকা পার হবার পর শুরু হয় পানিবাহিত এলাকা। সাঁকো লাগানো কিছু খালবিল পার হয় বলতে গেলে বেশ ঝামেলা করেই। কারণ আকাশে কোনো চাঁদ নেই, রাত গহীন কালো। তাও ভালো বৃষ্টি আসেনি, কাকে যেন একবার বলতে শুনেছিল আগামীকাল তুমুল বৃষ্টি হতে পারে। যাই হোক অবশেষে সব পথ পাড়ি দিয়ে ওরা পৌঁছায় একটা জঙ্গলমতো এলাকায়। সেখানে প্রবেশ করতেই মাসুম বুঝতে পারে সামনে পানি আছে। পানি আছে মনে হয় বড়ো কোনো জলধারা আছে, আর সেটা নদী হবার সম্ভাবনাই বেশি। এই ব্যাপারটা মাসুমকে সবসময় অবাক করে, সারাজীবন জলের ওপরে থাকতে থাকতে বড়ো কোনো জলধারার কাছাকাছি আসতেই সে যেন পানির গন্ধ টের পায়।

'সামনে নদী, তাই না?' বলতে গেলে পথচলায় বেশ খানিকটা ক্লান্ত মাসুম অনেকক্ষণ পর কথা বলে উঠল। এই ক্লান্তিটা আসলে পথ চলার ক্লান্তি নয় বরং অচেনা পথ চলার ক্লান্তি। চেনা পথে চলার চেয়ে অচেনা পথ চলার ক্লান্তি সবসময়ই বেশি, কিন্তু জীবনের প্রয়োজনে চলতে হয়।

'জি, হুজুর, সামনেই কালসা নদীর একটা শাখা,' গেডুয়া তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলে উঠল। 'জানি না হুজুরে কেমনে টের পাইলেন, তয় অনুমান ঠিক আছে,' বলে সে যেন মৃদু হেসে উঠল বলে মনে হলো মাসুমের কাছে। জঙ্গলের ভেতরে আরেকটু এগোতেই গেডুয়া মৃদু স্বরে শিস বাজাল। প্রতিউত্তরে অনতিদূর থেকে শিসের শব্দ ভেসে এলো। 'হুজুর, প্রায় চইলা আসছি। আরেকটু সামনে গেলেই ঘাট। আমগো লোকেরা ওইখানেই আছে।'

‘তারা এইখান থেইকা নাওয়ে চড়ছে?’ শেরুর গলা শুনে মাসুমের কাছে মনে হলো এই এলাকা সে-ও খুব ভালোভাবে চেনে না। ‘ভাদুরিয়ারা তো অন্যখান থেইকা নৌকায় উঠে জানতাম।’

‘হুজুর,’ গেড়ুয়া ঘুরে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বলে উঠল। মাসুম অন্ধকারের ভেতরেও তার চোখের চকচকে ভাব আর সাদা দাঁত দেখতে পেল স্রেফ। ‘আপনেরা বড়ো বড়ো মানুষ, আপনেগো হিসাব আলদাই হয়, ভাদুরিয়া হেরাও অনেক বড়ো। আমরা হইলাম নিচুর নিচু জাত। বড়ো মাপের মানুষগো থেইকা আমগো সবসময় দূরে দূরে থাকতে অয়,’ বলে সে আবারও হেসে উঠল। মাসুম ঠিক বুঝতে পারল না এতে হাসির কী আছে। সে আড়চোখে একবার শেরুর দিকে, দেখল। যদিও অন্ধকারের কারণে পরিষ্কার দেখতে পেল না কিন্তু এটা পরিষ্কার বুঝতে পারল ছেলেটার কথা শেরুরও খুব ভালো লাগেনি। তবে ব্যাপারটা মাসুমের জন্যে একেবারে অননুমেয় নয়। মোঘলদের তো বটেই, এমনকি নিজের এলাকাতেও সে বহু ধরনের বহু জাতের মানুষের সাথে কাজ করেছে এবং এই কারণে সে ভালোই জানে বৃহত্তর এই ভূমিতে জাতের সমস্যা কতটা প্রকট। এই কারণেই সে নিজের ধর্মকে ভালোবাসে। এইখানে জাতের কোনো বিষয় নেই। তবে সমাজে শ্রেণিবিভাগ তো অবশ্যই আছে। সেই সাথে শ্রেণিবৈষম্যও সমান পরিমাণেই আছে। আর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সে এটাও জানে সমাজের নিচু শ্রেণীর নিষ্পেষিত মানুষেরা সুযোগ পেলে মৌখিকভাবে হোক কিংবা অন্য উপায়ে, এরা কোনো অবস্থাতেই সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষদের ওপরে প্রতিশোধ নিতে কোনো ছাড় দেয় না। কখনও সেটা মৌখিক, আবার কখনও সেটা বাহ্যিক। শেরু আর গেড়ুয়ার ভেতরে ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটল মাত্র।

ওরা আরেকটু এগোতেই সামনে আলো দেখতে পেল। মাসুম ভালোভাবে তাকিয়ে দেখল নদীর পাড়ে কাঠ-কয়লা দিয়ে একটা ধুনির মতো জ্বলছে আর সেটাকে ঘিরে বসে আছে ছয়-সাতজন মানুষ। ওরা এগিয়ে যেতেই গেড়ুয়ার মতোই ছিপছিপে লম্বা আরেক যুবক এগিয়ে এলো। তার পোশাক কথাবার্তাও অনেকটা গেড়ুয়ার মতোই। গেড়ুয়া ওদের সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে নৌকা প্রস্তুত করতে বলল।

গোল করে পাকানো একটা বান্ডিলের মতো কিছু একটা মাসুমের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে উঠল, ‘হুজুর, আপনেগো কাপড়। খুব বেশি সুবিধার না, তবে পরিষ্কার আছে। কষ্ট অইলেও পরতে পারবেন,’ মাসুম কিছু না বলে কাপড়ের বান্ডিলটা নিয়ে শেরুর দিকে ফিরে বলে উঠল, ‘তুমি গিয়ে নৌকার প্রস্তুতিটা ভালোভাবে দেখ আর অস্ত্রও যা আনছ সেইগুলা অইখানে ঠিক কইরা দিয়া আস।

মাসুম কাপড়ের বান্ডিলটা নিয়ে ধোবল আর বরখাকে একপাশে ডেকে নিলো।

'দ্রুত কাপড় পালটায়া ঠিকঠাক হয়া ল,' বলে সে নিজেও কাপড় পালটাতে লাগল। গেড়ুয়া ভুল বলেনি, কাপড় খুবই মলিন কিন্তু পরিষ্কার। তবে কাপড়ে কীসের যেন একটা তেলতেলে গন্ধ। গন্ধটা কীসের ঠিক বুঝেও বুঝতে পারল না ও।

'এহ হে, গন্ধ কীসের?' ঠিক ওর মনের কথাটাই বলে উঠল ধোবল।

'শোন, গন্ধের আলাপ বাদ দে, এইগুলা রাখ,' বলে ধোবল আর বরখার দিকে দুটো ছুরি এগিয়ে দিলো মাসুম। 'এইগুলার কথা অগোরে বলার দরকার নাই। বুঝছোস?' তিনজনেই কাপড় পালটে এসে দেখল গেড়ুয়া তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। শেরুর দিকে ইশারা করতেই সে বলে উঠল, 'হুজুর, তিনটা তরবারি, দুইটা বর্শা, তিনটা ছুরি আর দুইটা কুড়াল নৌকার পাটাতনের নিচে রাখা আছে। মাঝি ওইটার উপরেই বইসা হালে থাকব। আশা করি সমস্যা অইব না।'

মাসুম তাকে ধন্যবাদ এবং বিদায় জানিয়ে গেড়ুয়ার সঙ্গে এসে নৌকায় উঠল। পানিতে জোয়ার নামতে শুরু করেছে। নৌকা চলতে শুরু করতেই মাসুম খেয়াল করে দেখল যদিও রাত, তাও পূর্ব দিগন্তে হালকা একটা লালিমা ছড়িয়ে পড়তে শরু করেছে। এর ভেতরেই নৌকা ভাসাল গেড়ুয়ারা। প্রত্যেকর হাতেই একটা করে কুঠার আর কয়েকজনের হাতে লাঠিসোটা।

'এইগুলা যে?' নৌকা চলতে শুরু করতেই মাসুম জানতে চাইল গেড়ুয়ার কাছে।

ওর প্রশ্ন শুনে গেড়ুয়া হেসে উঠল, 'হুজুরে যে কী কইলাইন, আমরা কাঠুরিয়া আমগো কাছে কুড়াল থাকব না তো কাগো কাছে থাকব? লাডি আর বর্শা থাকলেও সমস্যা নাই। জিগাইলে বলব জঙ্গলের প্রাণী তাড়ানির লাইহা, হুজুর, শক্ত অইয়া বসেন, পানির স্রোত বাড়ব, নৌকা মূল নদীতে পড়তাছে।'

তার কথা প্রমাণ করেই একটু পরেই দুলুনি শুরু হয়ে গেল। এর ভেতরেই একদল কাঠুরিয়াদের মাঝে জবুথুবু হয়ে বসে রইল মাসুম। সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথে দিনের আলো ফুটে উঠতে শুরু করল ধীরে ধীরে। কয় ঘণ্টা গেল কে জানে হঠাৎ নৌকার সামনের অংশ থেকে মাঝি চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'কালীঘাট।'

'হুজুর, কালীঘাট চইলা আসছি, খুব সাবধান,' মাসুমের কানের কাছে অনেকটা যেন ফিস ফিস করে বলে উঠল গেড়ুয়া।

একবার ক্ষণিকের জন্যে চোখ তুলে মাসুম দেখতে পেল আধ মাইল সামনে নৌকার লাইন আর তার ঠিক ওপারেই মোঘলদের বাহিনী সজ্জিত ঘাট দেখা যাচ্ছে। আনমনেই সে একবার দোয়া-দরুদ পড়ে নিলো।

অধ্যায় বারো
বর্তমান সময়
রাইফেল স্কয়ার, ঢাকা

দোয়া-দরুদ যতই পড়ুক, ঢাকার বিখ্যাত জ্যাম থেকে কারও রেহাই নেই। রাইফেল স্কয়ারের জ্যামে বসে জিপের ভেতরে আটকানো অফিস ফাইলটাতে চোখ বুলাচ্ছিল বাশার। কিন্তু তার মন যতটা না ফাইলে তার চেয়ে অনেক বেশি জ্যাম কখন ছুটবে সেদিকে। আর মোহাম্মদপুরে কী হতে যাচ্ছে সেদিকে। সোহেল ছেলেটা আপনাতেই একবার জিপের হর্ন বাজিয়ে দিতে বাশার তার দিকে ফিরে তাকাল।

'সোহেল, অস্থির হয়ে কোনো ফায়দা আছে?' বলে সে ফাইলে নজর ফিরিয়ে আনল। যদিও সে নিজেই ছেলেটার চেয়ে অনেক বেশি অস্থির হয়ে আছে ভেতরে ভেতরে কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ পেতে দিচ্ছে না।

তবে বাশার নিজেও জানে পরিস্থিতি বেশি একটা সুবিধার না। কারণ একটু আগে পিবিআই অফিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চে পাটোয়ারির ব্রিফিং শেষ হবার সাথে সাথে ওরা স্রেফ প্রস্তুতি নেওয়া শেষ করতেই জানতে পারে প্রফেসর ইফতেখার মাহমুদের সেক্রেটারি চৌধুরী হাসান শেখ নাকি জেল থেকে গায়েব হয়ে গেছে। ব্যাপারটা একদিকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং অন্যদিকে অ্যালার্মিংও বটে। ওরা বিষয়টা জানতে পারার পর হাবিব আনোয়ার পাশার অফিসে গিয়ে জানতে পারে পিবিআই স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকজন যখন জেলে যায়, ওখানে গিয়ে জানতে পারে—আগের দিন নাকি বিশেষ ব্রাঞ্চের পরিচয়ে দুজন লোক এসে চৌধুরীকে নিয়ে গেছে। তাদের কাগজপত্র থেকে শুরু করে সবকিছুই ওকে ছিল। পরবর্তীতে খুব ভালো করে চেক করে পওয়া যায় সব নকল কাগজ ছিল, কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। চৌধুরীকে নিয়ে সরে পড়েছে তারা। এই ঘটনা বেশ কয়েকটা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একদিকে এই ঘটনা প্রমাণ করে প্রফেসর আবদেলের কেস সামনে আসার পর এই মুহূর্তে প্রফেসর আবদেল এবং প্রফেসর ইফতেখারের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটা মানুষ এবং তথ্য গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে ঠিক যেভাবে ওরা ইফতেখার মাহমুদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো খতিয়ে দেখছে এবং তাকে খুঁজে বের করার জন্যে উঠে

পড়ে লেগেছে। ঠিক একইভাবে এই ঘটনায় আরও একটা বা একাধিক মহল সেই চেষ্টাই করছে। তবে তারচেয়ে অ্যালার্মিং বিষয় হলো যদি প্রফেসরের সেক্রেটারিকে এভাবে সরিয়ে ফেলা হয়ে থাকে তবে ওদের জন্যে এখন একমাত্র বাকি রাস্তা থাকে প্রফেসর ইফতেখারের মেয়ে পৃথা হাসান। কাজেই তার সাথে দেখা করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, প্রফেসরের হদিস বের করতে সেই এখন ওদের একমাত্র পথ। আর দ্বিতীয়ত, যে বা যারাই চৌধুরীকে গায়েব করে থাকুক না কেন, তারা যদি চৌধুরীকে সুরক্ষিত জায়গার ভেতর থেকে উদ্ধার করতে পারে, তবে অবশ্যই তারা পৃথা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে। ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে কি না, কে জানে। তাই হাবিব আনোয়ার পাশা সাথে সাথে ওদেরকে বের হয়ে মোহাম্মদপুরে যেতে বলে, সেই সাথে বাশার তাকে অনুরোধ করে যেহেতু মেয়েটা মোহাম্মদপুর থানা থেকে খুব বেশি দূরে থাকে না, তবে যদি সম্ভব হয় অন্তত একটা পুলিশের ভ্যান মেয়েটার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে হলেও পাহারায় রাখতে।

'বস, কী মনে হয়, আমরা পৌঁছে কী মেয়েটার দেখা পাবো?'

'হুম?' বাশার ফাইল থেকে চোখ তুলে সোহেলের দিকে ফিরে তাকাল। 'দেখা যাক, আগে থেকে অস্থির হয়ে লাভ কী?' বলে সে বাইরে দেখল। রাইফেল স্কয়ারের সামনে জ্যাম একটু একটু করে ছাড়তে শুরু করেছে। 'গাড়ি আগে বাড়ান, সোহেল,' বলে সে একবার ঘড়ি দেখে নিলো, খুব বেশি সময় পার হয়নি ওরা অফিস থেকে বের হবার চার নম্বর থেকে ভেতর দিয়ে জিপ নিয়ে এগোতেই রাইফেল স্কয়ারের জ্যামে এসে পড়েছে। এটা ছেড়ে দিলে আরও অন্তত দুটো পয়েন্টে জ্যাম বা সিগন্যাল পড়বে হিসেব করে নিলো মনে মনে বাশার। ওর হিসেবে আরও অন্তত ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিটের মতো লাগবে ওদের পৃথা হাসানের ঠিকানায় পৌঁছাতে। এত সময়ের ভেতরে যদি কিছু না হয়ে থাকে, তবে এই ত্রিশ-চল্লিশ মিনিটে খুব বেশি পার্থক্য হবার কথা নয়। তবে কপাল খারাপ হলে অনেক কিছুই হতে পারে। সেকেন্ডের ব্যবধানে জীবন পালটে যেতে পারে কপাল বেশি খারাপ হলে, কথাটা মনে হতেই মুখের কোণে দুঃখের একটা হাসি ফুটে উঠল বাশারের। অন্তত ওর নিজের অভিজ্ঞতা সেরকমই বলে।

'কী ব্যাপার, বস, হাসলেন যে? ভুল কিছু জিজ্ঞেস করলাম নাকি?' বাশার সোহেলের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নিজের ভাবনায় হারিয়ে গেছিল।

'অহহ সরি, আমি আপনার কথায় হাসিনি,' বাশার বলে উঠল। 'অন্য একটা কারণে হাসছিলাম।'

'বস, কিছু মনে না করলে একটা কথা বলি, আমরা তো এখন একই টিমে। আপনি আমাকে তুমি করে বললে ভালো হয়, বস; তুই করেও বলতে পারেন, সমস্যা নাই,' বলে সে বাশারের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

বাশার কিছু না বলে মাথা নাড়ল সম্মতির ভঙ্গিতে।

'বস, বলছিলাম, হঠাৎ যেভাবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠল মেয়েটাকে কি আমরা পাবো, নাকি ইতিমধ্যেই–' বাশারের মনে হলো ইচ্ছে করেই ছেলেটা কথা শেষ করল না।

আনমনে মাথা নাড়ল বাশার। 'ভুল প্রশ্ন, সোহেল। মেয়েটাকে পাবো কিংবা পাবো না সেটা তো পরে। তাকে যদি পাই সে কি আদৌ আমাদের কোনো কাজে লাগবে কি না, সেটা হলো সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন। কেসটা শুরু হবার আগেই কেমন জানি ঘেঁটে গেল। ভাবছিলাম চৌধুরীকে দিয়ে প্রফেসর ইফতেখারের খোঁজ শুরু করব। কারণ চৌধুরী তার সাথে কাজ করেছে এবং কেস ফাইলে লেখা প্রফেসর ইফতেখার এবং আবদেল পালানোর সময়ে প্রফেসর ইফতেখারের কারণেই নাকি চৌধুরী ধরা পড়েছিল। কাজেই ইফতেখারের প্রতি তার একটা রাগ আছে, কাজেই সে হয়তো সাহায্য করতেই পারবে। সে ভালো একটা হেল্প হতে পারত কিন্তু সেটা তো হলো না।'

'তারচেয়ে বড়ো কথা যারাই আমাদের শত্রু পক্ষ হোক না কেন, চৌধুরীকে হাতে পেয়ে তারা তো অমাদের থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল,' সেহেলের কথায় খুশি হয়ে উঠল বাশার। ছেলেটার অ্যানালাইসিস করার ক্ষমতা খারাপ না।

'হুম, সেটাও একটা সমস্যা। এমনিতেই আমরা অন্ধকারে আছি। এখানে আরও একটা ব্যাপার আছে,' বাশার ফাইলটা রেখে হাতের আংটিটা মোচড়াতে শুরু করেছে। 'প্রফেসর ইফতেখারের মেয়ে আদৌ কিছু জানে কি না–সেটাও একটা প্রশ্ন, হেল্প তো পরে।'

'বস, সে যদি হেল্প করতে রাজি হয় অন্তত প্রফেসরের ব্যাপারে কথা তো বলা যাবে, কারণ ফাইল দেখে যা বুঝেছি প্রফেসর লোকটার ব্যাপরে আসলে খুব কমই লেখা আছে। খুবই চতুর ধরনের লোক মনে হয়েছে তাকে আমার কাছে। কিন্তু এই মেয়েকেও যদি ধরে নিয়ে যায় বা গায়েব করে দিয়ে থাকে, কিংবা সে যদি হেল্প করতে রাজি না হয়, তখন কী করবেন?'

বাশার হেসে উঠল, 'এত দূর এখনও ভাবিনি। তবে ব্যবস্থা একটা না একটা হয়েই যাবে, আর সেটা হবে এখান থেকে,' বলে সে ড্যাশবোর্ডের ওপরে রাখা ফাইলটা দেখাল। 'অভিজ্ঞতা বলে এসব ফাইল অনেক কিছুই মিরাকল করার ক্ষমতা রাখে, ওই শালা আবার জ্যাম।'

'কী আর করা, বস,' বলে সোহেল জিপ ব্রেক করে বাশারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বস, কিছু মনে না করলে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?' বাশার মাথা নাড়তেই সে বলে উঠল, 'আপনি এই ব্রাঞ্চে কীভাবে এলেন?'

বাশার সানগ্লাসের আড়াল থেকে তার দিকে তাকাল, 'সে অনেক লম্বা কাহিনি। আমার আলাপ বাদ দাও, ডার্ক নাইটের জোকারের ভাষায় বলতে গেলে

আমি হলাম অনেকটা পাগলা কুত্তার গাড়ির পেছনে দৌড়ানোর মতো, দৌড়াতেই আছি দৌড়াতেই আছি, গাড়ির নাগাল পেয়ে গেলে কী যে করব নিজেই জানি না, হা-হা-হা,' বলে জোরে জোরে হেসে উঠল বাশার।

'আপনি ফানি, বস,' সিগন্যাল ছাড়তেই সে আবারও গাড়ি আগে বাড়াল।

'তোমার কথা বলো, তুমি কীভাবে এখানে এলে?'

'বস, আমার হিসাবটা উলটা, আপনি অনেক মহৎ মানুষ একেবারে সরাসরি সত্যি কথা বলেছেন নিজের ব্যাপারে। আমি অবশ্য অতো ভালো না। আমি হলাম ক্যারিয়ারিস্ট,' বলে সে ঠোঁট কুঁচকালো। 'আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই ঠিক করেছি সরকারি চাকরি করবো। এই দেশে যত যাই বলেন ভাই, সরকারি চাকরির উপরে কোনো হিসাব নাই।'

বাশার হেসে উঠল দেখে সোহেলও হাসল। 'যাই বলেন, কথা কিন্তু সত্যি আমি অনার্স শেষ করে আর মাস্টার্স-ফাস্টার্স এইসবের ধার দিয়াও যাই নাই। সোজা কোচিং কইরা একটার পর একটা পরীক্ষা দিয়া গেছি। ডিবিতে চাকরি হইতেই ঢুইকা গেছি। আর এই স্পেশাল ব্রাঞ্চের ব্যাপারটাও অনেকটা এরকমই, আমি জানি এ-ধরনের ব্রাঞ্চগুলোতে চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি, কিন্তু সুযোগও অনেক। আর স্কিল বাড়ানো মানেই উপরে ওঠার সুযোগ। এই কারণেই এইখানে আসা।'

'যাক তোমার অন্তত তো স্পেসিফিক মোটিভেশন তো আছে, আমি যে কী করতেছি আর কই আছি নিজেই ঠিকঠাক জানি না। আমরা মনে হয় কাছাকাছি চইলা আসছি।'

মোহাম্মদপুর থানা রোডের সামনে আসতেই সোহেল গাড়ি ডানে ঘুরিয়ে মেইন রোড থেকে সাইড রোডে ঢুকে গেল, আর বাশার মোবাইল বের করল নির্দিষ্ট ঠিকানাটা দেখার জন্যে। মোবাইলের জিপিএসটা ওপেন করে অফিস থেকে দেওয়া ঠিকানাটা ম্যাপে বসিয়ে জিপিএসে ট্র্যাক চেক করে নির্দেশনা দিতে লাগল সোহেলকে। আরও দশ মিনিট পর ওরা একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের সামনে এসে থামল। 'এটাই মনে হয়।'

দুজনেই জিপ থেকে বেরিয়ে এসে বাশার একবার আশপাশে দেখে নিলো। 'দেখছ, পুলিশের ভ্যান আসার কথা ছিল, কোনো খবরই নাই। অবশ্য আমি আশাও করি নাই। তবে সোহেল থানায় ইনফর্ম করো ব্যাকআপের জন্যে,' বলে সে বাড়ির গেটের দিকে এগিয়ে মোবাইলে পৃথা হাসানের ছবি দেখিয়ে দারোয়ানের কাছ থেকে কনফার্ম করে দুজনে মিলে লিফটের দিকে এগোল।

'বাহ, এইসব অ্যাপার্টমেন্টে বিল্ডিংগুলো সেই বানিয়েছে তাই না?' সোহেল মন্তব্য করার মতো করে বলে উঠল। দুজনে লিফটে উঠতেই বাশার বলে উঠল একেবারে টপ ফ্লোর।'

লিফটে ওপরে উঠতে শুরু করতেই বাশার বলে উঠল, 'অস্ত্র চেক করে প্রস্তুত রাখো, বের করার দরকার নেই।' লিফট থামতেই দুজনে সাবধানে বাইরে বেরিয়ে এলো। এই ফ্লোরটাতে চারটা অ্যাপার্টমেন্ট হবার কথা কিন্তু শুধুমাত্র একটা অ্যাপার্টমেন্টের দরজা দেখতে পেল ওরা। বাকিগুলো খালি স্পেস। এগুলোতে এখনও মনে হয় ফ্ল্যাট বিক্রি হয়নি।

'এইটাই, তাই না?' সোহেল প্রশ্ন করতেই নম্বর মিলিয়ে বাশার কনফার্ম করল। সোহেলকে এগোতে ইশারা করে সে আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে তাকে কভার করল সোহেল কলিংবেল চাপলো। একবার, দুবার, তিনবার চতুর্থবারও কোনো রেসপন্স না পেয়ে কাঁধ ঝাঁকাল সোহেল। বাশার আলগোছে নিজের পিস্তলটা বের করে আনল।

'বস, এক কাজ করেন, কল দেন একটা, নম্বর আছে না?'

বাশার কথা না বলে পিস্তলটাকে সামলে মোবাইল বের করে ডায়াল করল। ওপাশে রিং হচ্ছে কিন্তু কেউ উঠাচ্ছে না।

'বস, ভেতরে রিং বাজতেছে,' বলে সে দরজায় হাত দিতেই সেটা হাঁ হয়ে খুলে গেল। বাশার চট করে পিস্তল বের করে আনল, সোহেলও নিজের পিস্তল বের করে এনেছে।

'আমি কভার করছি,' বলে উঠতেই সোহেল ভেতরে ঢুকে পড়ল প্রথমে। তার পেছনে বাশার অ্যাপার্টমেন্টটা খুব বেশি বড়ো না, তবে বেশ সুন্দর করে সাজানো গোছানো। রুমগুলো দেখে নিয়ে কিচেন ও ওয়াশরুম চেক করে নিলো ওরা। কেউই নেই ভেতরে। মোবাইলটা লিভিং রুমের টি-টেবিলের ওপরে রাখা। অ্যাপার্টমেন্টে কেউই নেই, এমনকি কোনো ধরনের জবরদস্তির চিহ্নও নেই।

'বস, কেউই তো নাই,' পিস্তল সামলে সোহেল মন্তব্য করার মতো বলে উঠল।

'কিন্তু কোনো জবরদস্তির চিহ্নও তো নাই,' বাশার বলেই আবারও চারপাশে নজর বুলিয়ে টেবিল থেকে মোবাইলটা তুলে নিলো, সেটাতে একবার পলক বুলিয়ে নিয়ে সোহেলের দিকে তাকিয়ে চূড়ান্ত হতাশ গলায় বলে উঠল, 'সোহেল, মনে হয় আমরা দেরি করে ফেলেছি। দুজনের মনে একই ভাবনা।

মেয়েটাকে কি কেউ অপহরণ করে নিলো!

অধ্যায় তেরো

সময়: ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ

কালীঘাট, জল-জঙ্গল এলাকায় প্রবেশের পথ

'হুজুর, ডর লাগতাছেনি?' মাসুমের ঠিক পেছন থেকে কানের কাছে ফিসফিস করে বলে উঠল একটা কণ্ঠ। পলকের জন্যে ফিরে তাকিয়ে দেখল গেড়ুয়া মৃদু হাসিমুখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কালরাতের বেলায় তাকে যেমন দেখাচ্ছিল তার থেকে এখন বেশ ব্যতিক্রম লাগছে। কপালের তিলক, মাথার বন্ধনী আর চোখের চারপাশে লাগানো কালো কাজলের মতো বস্তুগুলো তাকে কেমন যেন ভিন্ন করে তুলেছে। তবে এই ভিন্নতার মূল কারণ তার পোশাক নয় বরং তার চেহারার অভিব্যক্তি। আর এই ভিন্ন অভিব্যক্তির কারণ তার হাতে ধরা ছোটো নলের মতো একটা জিনিস। ওটা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। গন্ধটা মাসুমের কাছে অপরিচিত নয়, আবার পুরোপুরি পরিচিতও নয়। এটা একধরনের সিদ্ধি, কিন্তু গন্ধটা সিদ্ধির মতো হলেও পরিচিতি কোনো সিদ্ধির মতো নয়। মাসুম জানে এসব অঞ্চলের কাঠুরিয়া বা এ-ধরনের বুনো পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট লোকজন নানা ধরনের উদ্ভট নেশা করে। কিন্তু এরকম একটা পরিস্থিতিতে গেড়ুয়ার মতো একটা ছেলে সিদ্ধি টানছে ব্যাপারটা ঠিক ভালো লাগল না ওর কাছে।

'হুজুর, একটা টান দিবেন নাকি?' দেবী মাতার বিশেষ আশীর্বাদের জিনিস,' মাসুম কিছু বলছে না দেখে সে আবারও বলে উঠল। সম্ভবত মাসুমের বিরক্তি সে টের পায়নি। 'একবার টান দিলে দেখবেন–'

'গেড়ুয়া, এইরকম একটা সময়ে তোমার এখন সিদ্ধি টানা লাগতেছে!' মাসুম ফিরে তাকিয়ে দেখল শুধু গেড়ুয়াই নয় বরং ওদের সাথে আরও অনেকের হাতেই একইরকম ধোঁয়া ভরা নল, সেগুলো শুধু একজনে টানছে না। একজনের টানা হতেই আবার সেগুলো একের থেকে অপরের সাথে হাতবদল হচ্ছে। 'আমি তোমার কাছ থেকে এইটা আশা করি নাই।'

মাসুম ভেবেছিল ওর কথার জবাবে ছেলেটা আত্মসমর্পণমূলক কিছু বলবে কিন্তু সেটা না বলে সে বরং মৃদু হেসে উঠল। যদিও যখন সে কথা বলল বেশ বিনয়ী শোনাল। 'গোস্তাকি নিয়েন না, হুজুর। পানিতে নৌকা ভাসানির আগে দেবীর খুশির

জন্যে আমরা অনেক আয়োজন করি, সবশেষে সিদ্ধি টানি কিন্তু আইজ আপনেগো সম্মানে কিছু করা অয় নাই। তাই খালি সিদ্ধি টানতেছি। কিছু মনে নিয়েন না,' বলে সে মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে মাথা নেড়ে বিচিত্র ভাষায় কিছু একটা বলে উঠল। মাসুম এই ভাষা কখনও শোনেনি। ছেলেটার কথার জবাবে নৌকার ওপরে মৃদু গুঞ্জন বয়ে গেল। 'কাররা' 'কাররা' বলে মৃদু একটা রব উঠে শান্ত হয়ে গেল নৌকার ওপরটা। মাসুম দেখল সবাই যার যার নল নামিয়ে নিলো মুখের সামনে থেকে। আনমনেই সে একবার বরখা আর ধোবলের দিকে দেখে নিলো।

'হুজুর, আমরা প্রায় চইলা আসছি, সাবধান, আপনেরা কিন্তু কথা কইয়েন না।'

মাসুম আবারও বিরক্ত হলো ছেলেটার ওপরে, সে নিজেও কি আসলে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। 'গেড়ুয়া, আমি বাচ্চা পোলাপান না, আমরা কেউই না, তুমি বরং নিজের লোকগোরে সাবধান করো,' মাসুমের কথা শেষ হতেই সে তার উদ্দেশ্যে একবার হাত নেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু কুঁজো হয়ে চলে গেল নৌকার সামনের দিকে। মাসুম মাথা তুলে দেখল সারি সারি নৌকা এগিয়ে চলেছে ঘাটের দিকে। এই ঘাটে সে বহুবছর আগে একবার এসেছিল কাজেই এখানকার বিষয়াদি সম্পর্কে সে খুব ভালোই অবগত আছে। কিন্তু কালীঘাট বলতে যে ঘাটের কথা তার মনে পড়ে এই ঘাট তার থেকে অনেক ব্যতিক্রম। সেই ছোটো ঘাট কালের বিবর্তনে বিরাট আকারের ব্যাবসায়িক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে ওটাকে ব্যাবসায়িক কেন্দ্রের চেয়ে সামরিক কিংবা নৌ ঘাঁটি বলে মনে হচ্ছে বেশি। সেদিকে তাকিয়ে মাসুম দেখল সারি সারি ছোটোবড়ো নৌকাঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর মোঘল সেনারা প্রতিটা নৌকা পরীক্ষা করে তবে ঘাটের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করার জন্যে অনুমতি দিচ্ছে। ঘাটের বড়ো নৌকা চলাচলের জায়গাটাকে শক্ত লোহার জাল দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। তার পরিবর্তে সরু একটা জায়গা দিয়ে ধীর গতিতে এক এক করে নৌকাগুলো প্রবেশ করছে। অন্যদিকে বজরা কিংবা বড়ো জালিয়া নৌকাগুলোর প্রবেশ পথ আলাদা। সেগুলো গিয়ে একটা খোপঘরের মতো জায়গায় প্রবেশ করানো হচ্ছে। মাসুম অনুমান করল: সেখানে বড়ো নৌকাগুলোকে বেশি নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে। চারপাশের প্রহরা দেখে সে আরেকবার অনুধাবন করতে পারল বাসিমেরা কেন ওদেরকে এত কষ্ট করে এভাবে পাঠানোর আয়োজন করেছে। সত্যি কথা হলো, এছাড়া এখান দিয়ে প্রবেশের আর কোনো উপায় নেই। মাসুম ভেতরে খানিকটা উদ্বিগ্নতা বোধ করছেই তবে সেই সাথে আরেকটা সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলল। যে কাজে যাচ্ছে সেটা উদ্ধার করতে পারলে এখান দিয়ে নয় বরং বাসিমের কথামতো ওদেরকে অন্য পথে ফিরে আসতে হবে।

'হেই,' জোরে একটা চিৎকার ভেসে এলো সামনে থেকে। মাসুম দেখল সামনের আর ঠিক দুটো নৌকার পরেই ওদের নৌকা ঘাটের পরীক্ষার জায়গায় প্রবেশ করবে। আনমনেই একবার ধোবল আর বরখার দিকে দেখে নিয়ে সে মাথায় প্যাঁচানো কাপড়টা দিয়ে মুখ মাথা আর ঘাড় আরও ভালোভাবে ঢেকে এমনভাবে বসল যেন মনে হয় ঠান্ডার ভেতরে গুটিসুঁটি মেরে একেবারে সেঁধিয়ে গেছে নৌকার ভেতরে।

'হেই,' বলে ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা এক মোঘল সৈনিক ওদের নৌকাটাকে সামনে নিয়ে যাবার জন্যে ইশারা করল। মাসুম দেখল সামনের নৌকাটা পার হয়ে যেতেই ওদের নৌকাটা ঘাটের সাথে গিয়ে লাগল। আনমনেই ওর নজর চলে গেল ঘাটে অন্তত আট-দশজন সুসজ্জিত সৈনিক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিকদের দলটার ওপরে। প্রত্যেকর পরনে পুরোদস্তুর সামরিক পোশাক, প্রত্যেকের এক হাতে বর্শা, অন্য হাতে মোঘলদের প্রতীকচিহ্ন আঁকা গোল ঢাল আর কোমরে ঝোলানো বাঁকা তরবারি। প্রত্যেককেই দেখে মনে হচ্ছে যেন একেবারে যুদ্ধের ময়দানে প্রস্তুত হয়ে আছে যুদ্ধের জন্যে। সৈনিকদের সবার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সেনার দিকে চোখ পড়তেই তার পোশাকের ধরনটা দেখে মাসুম বুঝতে পারল এই লোকটাই ওদের দলের প্রধান। ওদের নৌকাটাকে এগিয়ে যেতে দেখেই সামনের এক সৈনিক ওদেরকে ডাক দিয়ে ওদের পরিচয় জানতে চাইল সে, কোথা থেকে আসছে, আর কোথায় যাচ্ছে সেটাও জানতে চাইল। মাসুম শুনতে পেল গেড়ুয়া উঠে দাঁড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেল মোঘল সৈনিকদের সাথে কথা বলার জন্যে। গেড়ুয়া ওদের সাথে কথা বলছে হঠাৎ মাসুমের খানকিটা আবেগপ্রবণ অনুভূতি হলো। ওর মনে পড়ে গেল পুরনো দিনগুলোর কথা, একসময় সে নিজেও ওদের একজন ছিল, এরকম কত জায়গায় কত যুদ্ধে কত টহলে সে নিজে এরকম দলের নেতৃত্ব দিয়েছে, শত্রু আছে কি না পরখ করে দেখার জন্যে। আর আজ সে নিজেই কি না চোরের মতো ওদের নজরদারি থেকে বাঁচার জন্যে পালিয়ে এখানে একজন কর্মজীবী মানুষের ছদ্মবেশে বসে আছে। ব্যাপারটা ভাবতেই ওর মস্তিষ্ক ওকে বুঝিয়ে দিলো কাজটা সে করছে নিজের মানুষ, নিজের নেতা আর নিজের মাতৃভূমির জন্যে, কিন্তু মস্তিষ্ক যত ব্যাখ্যাই দিক না কেন, মন তো মানতে চায় না।

'এই সর একদিকে,' মুহূর্তের জন্যে ধমক খেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল মাসুম। ক্ষণিকের জন্যে সে নিজের ভাবনার জগতে হারিয়ে গেছিল, এই সময়ে ওদের নৌকা পরীক্ষার জন্যে মোঘল সৈনিকেরা নৌকায় উঠে এসেছে ব্যাপারটা সে খেয়ালই করেনি। মোঘল সৈনিকেরা নৌকায় উঠে পুরো নৌকা পরীক্ষার জন্যে

ওদেরকে নেমে দাঁড়াতে বলছে, ওরা একে একে নৌকা থেকে নেমে ঘাটের পাটাতনের ওপরে দাঁড়াল। মোঘলদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আর সতর্কতা দেখে ও বেশ অবাকই হলো। মোঘল সেনাপতি বাহরাম খাঁর নেতৃত্বে যদি এটা ঘটে থাকে তবে বলতেই হবে অয়োজনে আর দায়িত্বে কোনো ত্রুটি রাখছে না ওরা। মনে মনে আরও একবার মাথা নাড়া দিয়ে উঠল মনের ভেতরে, এদেরকে ছাড়িয়ে যা করতে যাচ্ছে সেটা করাটা অনেক কঠিন একটা ব্যাপার হতে যাচ্ছে।

মোঘল সৈনিকেরা নৌকার ওপরে উঠে খুঁজে খুঁজে একপাশে নৌকার গলুইয়ের নিচে স্তূপ করে রাখা কুঠার লাঠি আর ছুরিগুলো দেখে ব্যাখা চাইল, গেড়ুয়া ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছে: ওরা যেহেতু কাঠুরিয়া কাজেই কুঠার এগুলো তো থাকবেই, তবুও ওকে আবারও জানতে চাইল লাঠি আর ছুরিগুলো রাখার কারণ কি, গেড়ুয়া ব্যাখ্যা করছে এমন সময় একাধিক সৈনিক এসে ওদেরকে পরীক্ষা করতে লাগল।

যদিও মোঘলরা এখন শত্রু তবু ওদের কাজের প্রশংসাই করল মনে মনে মাসুম। লোকগুলা কোনো সম্ভাবনা বাতিল করে দিচ্ছে না। আর মনে মনে এটাও স্বীকার করতে বাধ্য হলো গেড়ুয়ার কথামতো যদি একেবারে হুবহু ওদের মতো পোশাক পরিচ্ছদ আর ছদ্মবেশ ধারণ না করত তবে পার হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।

নৌকার লোকটা সব পরীক্ষা করে ঠিক আছে জানাতেই ডাঙার এরাও জানাল সব ঠিক আছে। গেড়ুয়াকে ডেকে ওরা কোথায় যাচ্ছে ওদিকে ফিরবে কি না জিজ্ঞেস করতে যাবে হঠাৎ চারপাশে সবাই সতর্ক হয়ে উঠল।

সৈনিকদের কেউ একজন চিৎকার করে জানাল সেনাপ্রধান আসছে। মাসুমরা নৌকায় ওঠার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল তার আগেই ওদেরকে নৌকায় উঠতে বাধা দিয়ে ঘাটের একপাশে সারি করে দাঁড় করিয়ে দিলো। মাসুম আনমনেই ধোবল আর বরখার দিকে তাকাল। ওরাও খানিটকটা চমকে গেছে, মাসুম দেখল গেড়ুয়ারও ভ্রু কুঁচকে উঠেছে।

'এই সবাই সাবধান, সেনাপতি আসতাছে, কোনো উলটাপালটা কিছু করলে শাস্তি হবে,' বলে একজন সৈনিক ধমকে উঠল। লোকটা না বললেও চলত, একদল সৈনিকের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সৈনিকদের দলটা ঘাটের কাছে এসে দুই সারিতে দাড়িয়ে মাঝখানে জায়গা করে দিলো। সেখান দিয়ে নিজের সঙ্গীদেরকে নিয়ে মাসুমদের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল সেনাপতি।

সেনাপাতিকে দেখেই বুকের ভেতরে ধরাস করে ওর হৃৎপিন্ডটা একটা লাফ দিলো। সেনাপতি বাহরাম খাঁ, ওরা একসময় একইসাথে একই বাহিনীতে কাজ

করত। লোকটা ওকে খুব ভালোভাবেই চেনে মাসুমকে। কথাটা বাকিদের বলতেই এমনকি গেড়ুয়ারাও চমকে উঠল। অন্যদিকে বাহরাম খাঁ বীরদর্পে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

***

চাইলে নাকি সবই পাওয়া সম্ভব, কথাটা সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না আর। সারা জীবন একের-পর-এক সব হারিয়ে যাওয়া মানুষকে এই কথা বললে অবশ্য বিশ্বাস করতে পারার কথাও না। তবে সারা জীবন ধরে হারালেও আজকের রাত আর দিনটা তার জন্যে একেবারে খারাপ না। সন্ধ্যার দিকে একবার ব্যর্থ হলেও সকাল হবার আগেই যা করতে চাচ্ছিল সে সেটা করার একটা সুযোগ পেয়ে গেছে। যদিও সে জানে এই সুযোগ কাজে লাগানোর মতন অবস্থায় সে এখনও আসতে পারেনি। এই সুযোগ কাজে লাগাতে হলে তার আরও ভাগ্যের সহায়তা লাগবে, সেই সাথে লাগবে কিছু মানুষের সাহায্য। আর তার মতো একটা লোকে সেই সাহায্য এত সহজে পাবে না এটা সে খুব ভালো করেই জানে। কাজেই তাকে নিজের পরিশ্রম আর ঝুঁকি নিয়ে কাজটা আদায় করে নিতে হবে, সেটা করতে হলে তাকে তাদের ভরসা অর্জন করতে হবে। আর সেটা করা যে সহজ হবে না, এটাও সে খুব ভালো করেই বুঝতে পারছে, আর মনে মনে প্রার্থনা করছে যেন আজ রাতের প্রথম প্রহরে ভাগ্য তাকে যেভাবে সহায়তা করেছে এইভাবে যেন এই ভাগ্য বজায় থাকে। অবশ্যই উপায় সে বের করবেই, করতে তাকে হবেই কারণ এটা তার পরিবারের বিষয় আর পরিবারের জন্যে সে সবই করতে পারে, আগেও করেছে, প্রয়োজনে আবারও করবে।

'আহয়,' বলে কেউ একজন চিৎকর করে উঠতেই নৌকা ঘাটে লাগল, সে দেখতে পেল ওদের নৌকার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে। এমন সময় ঘাটে অনেক লোকের আগমনের শব্দ আর হই-হট্টগোল শুনতে পেয়ে খানিকটা চমকে উঠল। *হচ্ছেটা কি ওইখানে, কোনো ঝামেলা না তো?*

***

ঝামেলা তো নাই, উলটা সবকিছু অনেক বেশি শান্ত হয়ে গেছে সেনাপতি বাহরাম খাঁর আগমনে। সাধারণ লোকজন তো বটেই এমনকি মোঘল সৈনিকেরও তটস্থ হয়ে গেছে সেনাপতি বাহরাম খাঁর সামনে। আর সেই তটস্থ ভাবের জোরেই সবাই একরকম বলতে গেলে স্থির হয়ে গেছে যার যার জায়গাতে। মাসুম খুব সাবধানে যতটা সম্ভব কম নড়াচড়া করে মাথার পাগড়িটাকে আরেকটু কপালের ওপরে

নামিয়ে আনল। সেই সাথে গলায় প্যাঁচানো পাগড়ির অংশটা খুব কৌশল করে পেঁচিয়ে দিলো মুখের ওপরে যতটা সম্ভব। বেশি প্যাঁচালে অবশ্য আরও বেশি চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা তাই খুব বেশি প্যাঁচালো না সে। তবে আরেকটা কাজ করল, ধোবল ওর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। ইচ্ছে করেই খুব সতর্কতার সাথে সে খানিকটা সরে এলো ধোবলের একপাশে, যাতে ওর চেহারাটা সরাসরি দেখা না যায়। মাসুম সরে আসছে, মোঘল পাহারাদার ধমকে উঠল, 'এই নড়িস না।' মাসুম জায়গায় স্থির হয়ে গেল।

বাহরাম খাঁ ততক্ষণে চলে এসেছে ঘাটের একেবারে কাছাকাছি। এসেই সে প্রহরারত সৈনিকদের প্রধানের কাছে জানতে চাইল ওদের কাজ কেমন চলছে? সৈনিক প্রধান সতর্কতার সাথে বয়ান করতে লাগল সকাল থেকে কী কী ঘটেছে এবং এখন কাদেরকে নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। মাসুম মনোযোগ দিয়ে বাহরাম খাঁকে দেখছে। বাহরাম খাঁ বয়সে তার থেকে বেশ বড়ো হলেও তারা একই দলে কাজ করত একসময় একসাথে এবং সেইসূত্রে মাসুমের সাথে তার বেশ খারাপ সম্পর্ক ছিল। কারণ বাহরাম খাঁ সবসময় বাঙালিদেরকে দুর্বল আর অসহায় মনে করত, শারীরিকভাবে কম শক্তিশালীও। তাই সে মনে করত মাসুমের মতো চরিত্ররা মোঘল সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে তুলছে। কিন্তু নিজে কাজের ক্ষেত্রে সবসময় বয়সে কম মাসুমের কাছে সবদিক থেকে পিছিয়ে থাকত, তাই তাদের ভেতরে একটা দুর্যোগের ঘনঘটা লেগেই থাকত সবসময়। মাসুম দেখল বিগত সময়ে বাহরাম খাঁ শরীরিকভাবে আগের চেয়ে ভারী হয়েছে দূর থেকে হলেও তার মুখে দুয়েকটা পাকা দাড়িও চোখে পড়ল মাসুমের। কিন্তু নির্দ্বিধায় তার শারীরিক ভাষা থেকে শুরু করে সবকিছুই আগের চেয়ে আরও উদ্ধত আর অহংকারী হয়েছে। মাসুম মনোযোগ দিয়ে বাহরাম খাঁকে দেখছিল হঠাৎ বাহরাম খাঁ একেবারে সরাসরি ওর দিকে ফিরে তাকাল, মুহূর্তের জন্যে মাসুম এতটাই চমকে উঠল আরেকটু হলে নড়ে উঠেছিল সে, কিন্তু বহুকষ্টে নিজেকে স্থির রাখল। আরও অবাক হয়ে দেখল বাহরাম খাঁ শুধু এদিকে তাকিয়েই নেই, সে নিজের একটা হাত তুলে এদিকেই ইশারা করছে। মাসুমের কলজেটা মুহূর্তের জন্যে একটা লাফ দিলো। পলকের জন্যে ওর হাত চলে গেল নিজের কোমরে লুকিয়ে রাখা ড্যাগারটাতে, কিন্তু স্বস্তির সাথে অনুভব করল ওরা আসলে ওদের দিকে তাকিয়ে নেই। ঘাটের পিছনে একটা বড়ো নৌকা আসছে মাল ভরতি করে। বাহরাম খাঁ তার সৈনিকদের নির্দেশ দিয়েছে ওটাকে ঘাটের এপাশে ভেড়ানোর জন্য। ওদেরকে আটকে রাখা সৈনিকেরা তাড়া দিলো ওদেরকে নৌকায় ওঠার জন্যে। স্বস্তির সাথে দ্রুত নৌকায় উঠতেই দাড় পড়ল পানিতে। কালীঘাটের মূল অংশ পার হয়ে এলো ওরা দ্রুততম সময়ে।

বাজার এলাকা পার হতেই মাথা থেকে পেঁচিয়ে রাখা কাপড়টা সরিয়ে বুক ভরে দম নিলো মাসুম।

'উফফ জানে বাঁচছি, আরেকটু অইলে,' মাসুম পেছন ফিরে দেখল ধোবল কথা বলছে। ও হেসে বলে উঠল, 'যখন বাহরাম খাঁ আমগো দিকে ইশারা করল মুহূর্তের লাইগা মনে অইছিল আইজ গেছি।'

'জি, হুজুর। ক্ষণিকের লাইগা আমিও ডরাই গেছিলাম,' ভারী গলা শুনে সেদিকে ফিরে তাকিয়ে মাসুম দেখল মাঝির পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে গেডুয়া। 'হুজুর, কিছু মনে কইরেন না, আপনেরে একটা কথা জিগাই?'

মাসুম তার দিকে তাকিয়ে দেখল গেডুয়া তার লোকদেরকে ইশারা করতেই তারা বলতে গেলে ওদেরকে ঘিরে গোল হয়ে বসেছে। 'আপনেরা আজকে অনেক সাহস দেখাইছেন,' কথাটা বলতেই তার লোকেরা তালি দিয়ে উঠল মাসুম বরখা আর ধোবল খানিকটা অবাক হলেও যে মুহূর্তে বুঝতে পারল আসলে ওদেরকে সম্মান জানিয়ে তালি দিয়েছে সবাই খুশি হয়ে উঠল ওরা।

তালি দিয়ে একটা বাঁশের ধোঁয়া ভরতি নল এগিয়ে দিলো ওদের দিকে। 'হুজুর, আজকে আপনেগো সম্মানে,' মুহূর্তের জন্যে মাসুম ভাবল ফিরিয়ে দিবে, কিন্তু কী মনে করে নলটা হাতে নিয়ে ওটাতে দুটা টান দিলো সে, তারপর ওটা বাড়িয়ে দিলো বরখার দিকে। কালীঘাট পার হয়ে এসে পুরো নৌকার পরিবেশ বদলে গেছে। সবার ভেতরে একটা খুশি খুশি ভাব।

'তোমারে এবং তুমগো সবাইরে ধন্যবাদ,' মাসুম কথাটা আন্তরিকভাবেই বলে উঠল। 'তুমি কিছু একটা জানতে চাইতেছিলা?'

'হুজুর,' গেডুয়া মাসুমের দিকে তাকিয়ে তার সুরমা লাগানো কালো চোখের মণিজোড়া স্থির করে বলে উঠল। 'ওইখানে দেখলাম আপনে মোঘল সেনাপতির দিকে কঠিন নজরে তাকায়া ছিলেন, আপনেগো কি পুরানা শত্রুতা আছে?'

মাসুম আনমনে মাথা নাড়ল। ছেলেটাকে সে যা ভেবেছিল সে তারচেয়ে বেশি চালাক। 'মোঘল বাহিনীতে আমরা একই দলে ছিলাম সেই সময় থেইকাই আমগো ভিতরে–' বাক্যটা শেষ না করে সে মাথা নাড়ল। 'আচ্ছা, এখন আমরা কোনো জায়গায় যাব?' মাসুম শেষ অংশটুকে গেডুয়াকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করেছে।

কিন্তু সেই কথার কোনো জবাব না দিয়ে গেডুয়া খুশি খুশি ভাবে তালি দিয়ে বলে উঠল, 'হুজুর, আপনে মোঘল বাহিনীতে ছিলেন? আমি জানতাম আপনে যোদ্ধা, মোঘল বাহিনীতে ছিলেন জানতাম না,' বলে সে নিজের লোকদের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'হুজুর, মোঘল বাহিনীর যোদ্ধা আছিল।' নৌকার প্রায় সবাই মিলে 'কাররা' 'কাররা' বলে উঠল। মাসুম ঠিক বুঝতে পারল না এটা কি সম্মানসুচক করল কি না ওরা।

'হুজুর, আপনেরা মহান,' বলে সে সামান্য মাথা নেড়ে ধোবল আর বরখাকে দেখিয়ে বলে উঠল, 'আর আপনের বন্ধুরা হেরাও কী যোদ্ধা?'

'হুম,' আলোচনাটা কোনোদিকে যাচ্ছে মাসুম ঠিক বুঝতে পারছে না। 'আচ্ছা আমরা এখন কোনোদিকে যাব তুমি ঠিক কইরা কওনাই সেইটা।'

গেড়ুয়া ঢুলু ঢুলু চোখে ওর দিকে তাকিয়ে কী জানি বলছিল বিড়বিড় করে, মাসুম আবারও একই প্রশ্ন করল। হঠাৎ সে একেবারে স্বাভাবিকভাবে কথা বলে উঠল। 'দুঃখিত হুজুর, দেবীর মন্ত্র পড়তেছিলাম। কাজে যাওনের আগে আমরা সবসময় পড়ি। বলে সে যোগ করল, হুজুর, আমরা কালীঘাট থেইকা কয়েক মাইল সইরা আসছি। আর আধ মাইলের মতো আগাইলে জল-জঙ্গলের শুরু, সেইখানে জঙ্গল আর জলপথের শুরুর মুহে অপনেগো নামায়া দেওয়ার নির্দেশ আছে। ওইখানেই রসুল খাঁর লোক থাহার কথা। সেই আপনেগো সব দিব। আমগো উপরে নির্দেশ আছে হের লগে আপনেগো দেখা করায়া বিদায় নেওয়ার, খাড়ান মাঝিরে বলি,' বলে সে মাসুমের পাশ থেকে উঠে যাচ্ছিল, মাসুম বরখার দিকে ফিরে কিছু একটা বলতে যাবে, হঠাৎ সেই পুরনো তেলের গন্ধটা আবারও প্রকট হয়ে লাগল ওর নাকে। কীসের গন্ধ চিনতে না পেরে পুরনো অস্বস্তিটা আবারও ফিরে এলো ওর ভেতরে। নাক কুঁচকে গন্ধটা নিতে গিয়ে আবারও বরখাকে কিছু একটা বলবে, হঠাৎ নৌকার পাটাতনে শক্ত কিছু দিয়ে কেউ একজন আঘাত করল, একবার, দুবার, তিনবার।

ব্যাপার কী? বেশ অবাক হয়ে সেদিকে ফিরে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেল না মাসুম। সে গেড়ুয়ার দিকে তাকিয়ে তাকেও সেখানে দেখতে পেল না। ঠিক একটু আগেও সেখানে ছিল লোকটা।

চট করে ওর মাথার ভেতরে একটা সতর্কবার্তা বেজে উঠল, 'বরখা,' নামটা উচ্চারণ করেই সে ওর দিকে ফেরার সাথে সাথে দেখল বিচিত্র কায়দায় বরখা আর ধোবল দুজনের গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা ফাঁস, শুধু ফাঁস পরানোই হয়নি, যে ফাঁস পরিয়ে সে ওদের বুকের ওপরে একটা পা তুলে দিয়ে ফাঁসটা দিয়ে সামনে টানছে আর ওদের ঘাড়ের পেছনে আটকে দেওয়া হয়েছে একটা কুঠারের ফলা। দুটোর বিপরীতমুখী টানে দুজনেরই প্রায় জিভ বেরিয়ে আসার দশা। ক্ষণিকের জন্যে মাসুমের মাথা কাজ না করেলো না। কিন্তু পরমুহূর্তে একজন যোদ্ধা হিসেবে সে বুঝতে পারল কী ঘটতে চলেছে! নিজের হাতটাকে ড্যাগারের দিকে এগোবে শক্তিশালী একটা হাত চট করে ওর হাতটা ধরে ফেলল, সেটাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার আগেই খুব আলতো করে যেন ওর গলায় পরিয়ে দিলো কিছু একটা। মাথা ঝাঁকিয়ে সেটা সরাতে যাবে, তার আগেই ওর হাতে টান পড়ল সেইসঙ্গে শক্ত কিছু একটা ঠেলা দিলো মেরুদণ্ডের ওপরে, আর কানের কাছে সেই পুরনো গলা

ফিসফিস করে বলে উঠল, 'হুজুর, আপনেরে আমার ভালো লাইগা গেছে কিন্তু লইড়েন না, লড়লেই আপনের পিঠের হাড্ডিটা দুই টুকরা কইরা দিব,' মাসুম আড়চোখে দেখল গেড়ুয়ার চাচা পরিচয়ধারী লোকটা ওর ঠিক মেরুদণ্ডের সংযোগ স্থলে কুঠারটা ঠেকিয়ে রেখেছে, আর ওর গলায় ফাঁস পরিয়ে দিয়েছে আরেকজন।

'হুজুর, আপনেগো লাইগা আমার মনে অনেক সম্মান,' যেন খুব দুঃখ পাচ্ছে এমন সুরে বলে উঠল গেড়ুয়া। 'কিন্তু কী করব বলেন, আমরা হইলাম জাতে পাঙ্গু, দেবীর লাইগা ভেট না দিলে চলবে ক্যামনে। আর দেবী মাতার পিপাসা বুজানোর লাইগা যোদ্ধা রক্তের চেয়ে মজার আর কিছু হইতে পারে, বলেন,' সে কথা শেষ করতেই নৌকায় উপস্থিত তার সব সঙ্গীরা 'কাররা' 'কাররা' করে রব তুলল। এই অসহায় অবস্থায়ও মাসুম গলার ফাঁসের টানে ব্যথার চোটে চোখে পানি নিয়ে ধোবল আর বরখার দিকে তাকিয়ে দেখল ওদেরও একই অবস্থা।

মানুষ উত্তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত চুলায় পড়ে, ওরা পড়ে গেছে একেবারে গলন্ত লাভার ভেতরে।

অধ্যায় চৌদ্দ

বর্তমান সময়

মোহাম্মদপুর, ঢাকা

পৃথা হাসানের অ্যাপার্টমেন্ট

'বস, এত সাড়ে সর্বনাশ হয়ে গেল মনে হচ্ছে,' বলে আফসোসের সাথে পিস্তল নামিয়ে কোমর থেকে ওয়াকিটকিটা তুলে নিয়ে তাতে রিপোর্ট করতে যাচ্ছিল সোহেল, হঠাৎ বাশার একেবারে রুক্ষভাবে ধমকে উঠল তাকে।

'চুপ, চুপ,' বাশার এখনও এক হাতে নিজের পিস্তল ধরে আছে কিন্তু সেই সাথে সে মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা শোনারও চেষ্টা করছে।

'কী ব্যাপার, বস?' সোহেল কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল বাশার আবারও তাকে থামিয়ে দিলো। ওরা এই মুহূর্তে অবস্থান করছে প্রফেসর ইফতেখারের মেয়ে পৃথা হাসানের শূন্য অ্যাপার্টমেন্টের লিভিং রুমে। প্রফেসর ইফতেখারের অ্যাসিসট্যান্ট চৌধুরী জেল থেকে ফেরার হয়ে যাবার পর জরুরি ভিত্তিতে প্রফেসর ইফতেখারের মেয়ে পৃথার সাথে দেখা করতে এসে দেখে সে-ও নেই তার অ্যাপার্টমেন্টে। খালি অ্যাপার্টমন্টে পড়ে আছে, এমনকি তার মোবাইলও রয়েছে, কিন্তু অ্যপার্টমেন্টে কেউই নেই। তখন সোহেল রিপোর্ট করতে যেতেই তাকে থামিয়ে দিয়েছে বাশার।

'সোহেল, মনোযোগ দিয়ে শোনো,' বাশার তাকে বলতেই সোহেল কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গিয়ে আবার বলে উঠল, 'কই তেমন কিছু তো

এক মিনিট কারও কথা বলার হালকা আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এটা কি অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে–'

'উহু,' বাশার অ্যাপার্টমেন্টের খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে ইশারা করল। 'শব্দ বাইরে থেকে আসছে,' বলে সে আবারও পিস্তলটাকে হাতে ধরে দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলে উঠল, 'এবার তুমি আমাকে কভার করো।'

দুজনেই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো। বাশার সামনে আর পেছনে সোহেল। বাইরে বের হতেই কথার শব্দ আরও পরিষ্কার শোনা গেল এবং অদ্ভুত ব্যাপার হলো শব্দটা আসছে ওপর থেকে, বাশার ছাদের দিকে ইশারা করল।

যেহেতু এটা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের টপ ফ্লোর কাজেই ওরা ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল দুটো সিঁড়ি পার হলেই ছাদের দরজা দেখা যাচ্ছে এবং সেখান থেকে কারও খুব উঁচু গলায় কথা বলার শব্দ ভেসে আসছে। হয় আগে কেউ কথা বলছিল না, অথবা ওরা প্রথমে ঢোকার সময়ে উত্তেজনার চোটে কথা শুনতে পায়নি।

ওরা সিঁড়ি বিয়ে যত ওপরে উঠতে লাগল কথার শব্দ তত পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়তে লাগল। 'বিষয় কী বস, মনে হচ্ছে–'

'কেউ ঝগড়া করছে,' সোহেলের অসমাপ্ত বাক্য বাশার পূরণ করে দিলো। হাতে পিস্তল থাকলেও সেটাকে সামান্য নামিয়ে ধরে রেখেছে এখন বাশার। ওরা সিঁড়ি দিয়ে ওঠে সিঁড়িঘরে পা রাখতেই পরিষ্কার শুনতে পেল একজন নারী এবং পুরুষ তুমুল ঝগড়া করছে। সোহেলের দিকে তাকিয়ে আনমনেই একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাশার সিঁড়ি ঘরের দরজা পার হয়ে পা রাখল ছাদে।

আর সব অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের মতোই সুন্দর একটা ছাদ। চারপাশে দেওয়ালে স্টিলের রেলিং দেওয়া, কালারফুল টাইলস লাগানো ফ্লোর, একপাশে কমিউনিটি হল আর ছোটো একটা কামরা, দেখে মনে হয় একজনের থাকার জায়গা, আর অন্য পাশটা খালি। বাশার তাকিয়ে দেখল কমিউনিটি হলের লাগোয়া কামরাটার সামনে আধবুড়ো গোছের এক লোক দাঁড়িয়ে আছে, বাশার অনুমান করল লোকটা দারোয়ান বা কেয়ারটেকার গোছের কিছু একটা হবে। আর ঠিক তার সামনে কোমরে হাত রেখে ওদের দিকে পেছন ফিরে গলা উঁচিয়ে চিৎকার করে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে এক মহিলা।

হঠাৎ করেই ওদের দুজনকে দেখে আধ বুড়ো গোছের লোকটা থেমে গেল, কামরাটার পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে কেউ একজন কিছু দেখছিল এবং সম্ভবত দুজনের ঝগড়ায় অংশগ্রহণও করছিল কিন্তু ওদরকে দেখেই চট করে সরে গেল ছায়াটা। বাশার অনুমান করল কেয়ারটেকারের বউ হতে পারে। কামরাটার সামনে নানা ধরনের জিনিসপত্র ছড়িয়ে আছে। তার ভেতরে বাগান করার গাছ লাগানোর জিনিসপত্র থেকে শুরু করে বিরাট আকারের একটা অ্যাশট্রেও দেখতে পেল সে।

বুড়ো লোকটা থেমে গেলেও মহিলা তখনও চিৎকার করে কথা বলছিল, তাকে থেমে যেতে দেখেও সে থামেনি, হাত নেড়ে নেড়ে সিঁড়ি পরিষ্কার বিষয়ে কিছু একটা বলছিল সে, বুড়োকে থেমে যেতে দেখে সে আওয়াজ কমালেও চেঁচামেচি করতে করতেই ফিরে তাকাল পেছন দিকে এবং হঠাৎ জলজ্যান্ত দুজন মানুষ দেখে চমকে উঠল খানিকটা।

মহিলা চমকে উঠলেও বাশার আর সোহেল দুজনেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, মহিলা পৃথা হাসানই, প্রফেসর ইফতেখারের মেয়ে। 'এক্সকিউজ মি, আপনি পৃথা হাসান?' বাশার দুই কদম এগিয়ে গেল মহিলার দিকে। পিস্তলটা শরীরের পেছনে রেখেছে ও।

'জি, আমিই পৃথা,' মহিলা এতটাই তেজের সাথে আগের ঝগড়ার সুরেই বলে উঠল যে বাশার প্রায় চমকে উঠল। 'আপনারা কারা? এভাবে কারও বাসায় ঢুকে পড়ে কেউ?' মহিলা সন্দেহের চোখে দুজনকে দেখছ। তার পেছন থেকে আধ বুড়ো লোকটাও তাকিয়ে আছে কৌতূহলী দৃষ্টিতে।

'সরি, আমি আহমেদ বাশার, ইন্সপেক্টর আহমেদ বাশার, এই মুহূর্তে পিবিআই স্পেশাল ব্রাঞ্চে কাজ করছি। একটা বিশেষ কেসের কাজে এসেছি,' বলে সে নিজের আইডি বের করে দেখাল। তারপর সোহেলের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'ও আমার অ্যাসিসট্যান্ট সোহেল, একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার সাথে দেখা করার জন্যে আসতে হয়েছে।'

মহিলা আইডি কার্ডটা বেশ ভালোভাবে পরখ করে দেখে নিলো। তারপর ওটা ওর দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বড়ো করে একবার দম নিলো। সে এখনও তার আগের ঝগড়ার মুড থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। বাশার আর সোহেলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'ঠিক আছে, আপনারা আমার সাথে আসুন,' বলে সে পেছন ফিরে বুড়ো কেয়ারটেকারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'তুমি ভেব না মাফ পেয়ে গেছ, তোমাকে আমি পরে ধরব, কাজে ফাঁকিবাজি করার মজা হাড়ে হাড়ে বুঝাব তোমাকে,' কথাগুলো বলে একটা আঙুল তুলে তাকে শাসাতে শাসাতে বাশারদের এগোতে বলে সে অগে আগে হাঁটতে লাগল আর বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'ফাজিলের ফাজিল, কেয়ারটেকার! আমার অ্যাপার্টমেন্ট, আমার সোসাইটি, আমার কাছ থেকে বেতন পাও, আবার প্রতিটা কাজের জন্য তোমাকে আলাদা টাকা দিতে হবে, সেই কাজও আবার ঠিকঠাক করবে না। ফাইজলামির একটা সীমা থাকা উচিত,' বলতে বলতে সে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। বাশার ফিরে তাকাল একবার সোহেলের দিকে। সোহেল কাঁধ ঝাঁকিয়ে এমন একটা ভাব করল–তোমার সামলাতে হবে, আমি পারবো না, বস।

'আপনারা বসুন,' অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে ঢুকে, ওদেরকে লিভিং রুমে বসতে বলে মহিলা ভেতরে চলে গেল।

'বস, মাল তো কড়া,' বলে সে মুচকি হাসি দিলো। 'সামলাবে ক্যামনে?'

'চেহারার কথা বললা, নাকি মেজাজের?' বাশারও দুষ্টামির সুরে বলে উঠল।

'মানে দুটোরই কথা বললাম, কোনোটাই কম না,' বলে সে আরেকটা হাসি দিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মহিলা ভেতরে প্রবেশ করল, খুব অল্প সময়ের ভেতরেই সে পোশাক পালটে একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে লিভিং রুমে প্রবেশ করল।

'ব্যাপার কী বলুন তো? হঠাৎ আপনারা কি বিষয়ে এখানে এলেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না,' মহিলা ওদের সামনে একটা সিঙ্গেল সোফায় পা তুলে বসে ওদেরকে বেশ কড়া সুরেই জানতে চাইল।

'সরি, এভাবে হুট করে কোনোরকম জানান না দিয়ে চলে আসার জন্যে, মহিলা যে-সুরেই কথা বলুক না কেন বাশার একেবারে শান্ত রয়েছে। তার গলার সুরে শতভাগ প্রফেশনালিজম। 'দেখুন, মিস পৃথা, খুব সিরিয়াস একটা ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে এবং এই বিষয়টার সাথে আপনার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।'

'নিশ্চয়ই বিষয়টা বাবাকে নিয়ে কিছু একটা,' পৃথা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে উঠল।

'আপনি কীভাবে বুঝলেন?' বাশার কিছু বলার আগেই সোহেল বেশ অবাক সুরে বলে উঠল।

মহিলা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সরাসরি বাশারের চোখের দিকে। 'দেখুন ইন্সপেক্টর,' তার গলা বরফের চেয়েও শীতল, অনেকটা যেন ওদেরকে দেখিয়েই ঘড়ি দেখল সে। 'প্রথমত, আমার সময় আসলে খুবই কম, আমার ক্লাশ আছে, আমি একজন প্রফেশনাল মানুষ কাজেই ঘরে বসে থাকলে আমার চলবে না। দ্বিতীয়ত, আমার বাবার বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই,' বলে সে সোহেলের দিকে তাকাল। 'আপনারা আমার বাবার বিষয়ে আলোচনা করতে এসেছেন, সেটা বোঝা খুব কষ্টকর না। কারণ আমি স্টুপিড না,' তার চোখ সরু হয়ে এসেছে। 'আজ থেকে তিন বছর আগে যখন বাবা গায়েব হয়ে যায়, তখন পুলিশ থেকে শুরু করে বাকি সবাইকে নিয়ে আমাকেই সবচেয়ে বেশি ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। বারবার মানা করার-বোঝানোর পরও সবাই আমাকেই জ্বালাতন করেছে সবচেয়ে বেশি। তারপর একটা সময় সব ঠান্ডা হয়েছে, ভেবেছিলাম এই যন্ত্রণা আমার লাইফ থেকে বিদেয় হয়েছে, কিন্তু কয়দিন আগে যখন আবদেল আঙ্কেলের মৃত্যু সংবাদ দেখলাম পেপারে তখনই অনুধাবন করেছিলাম আবার শুরু হবে এই যন্ত্রণা এবং তাই হয়েছে,' বলে সে হাত তুলে দেখাল। 'আপনারা দুজন এসে হাজির হয়েছেন।'

'দেখুন মিস,' বাশার মনে করার চেষ্টা করল, ফাইলে দেখেছিল মহিলা সিঙ্গেল এখনও। 'পৃথা, আপনি–'

'ইন্সপেক্টর আপনার পাশে যে দেওয়ালটা আছে ওদিকে একটু তাকান,' বলে সে পাশের দেওয়ালের দিকে দেখাল। 'কী দেখছেন ওখানে, আমাকে একটু বলুন তো?'

বাশার আর সোহেল দুজনেই দেওয়ালের দিকে তাকাল। পুরো দেওয়াল জুড়েই নানা ধরনের ছবি, সবই পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত ছবি। পৃথার ছোটোবেলা থেকে শুরু করে গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত নানা ধরনের ছবির বাহার।

'ছবি, তাই না?' মহিলার গলাই এমন নাকি ইচ্ছে করেই এতটা ঝাঁঝাল সুরে কথা বলছে বাশার ঠিক বুঝতে পারল না। 'বলেন তো এই ছবিগুলোতে একটা জিনিস মিসিং, কী সেটা?'

বাশার মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। পৃথার ছোটোবেলার ছবি, বন্ধুদের সাথে ছবি, একা ছবি, মায়ের সাথে ছবি, চট করেই সে ধরতে পারল এবং বলতে যাবে তার আগেই সোহেল বলে উঠল, 'এখানে আপনার বাবার সাথে কোনো ছবি নেই।'

মহিলা টিটকিরির ভঙ্গিতে তালি দিয়ে উঠল, 'সাবাশ, পুলিশ হলেও দেখি বুদ্ধি আছে,' মৃদু হাসি দিয়েই সে চোখের দৃষ্টি শক্ত করে ফেলল। 'ঠিক ধরেছেন, এখানে আমার বাবার কোনো ছবি নেই। কারণ শুধু ছবির দেওয়াল নয় তাকে বহু বহু আগে আমি এবং আমার মা আমাদের জীবন থেকে পুরোপুরি শিফট ডিলিট করে দিয়েছি, দুঃখের বিষয় হলো আমাদের সাথে থাকতে লোকটা কোনোদিন আমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। এখন দূরে সরে গিয়ে আরও বড়ো অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি আমার নাম থেকে এই লোকটার টাইটেল বাদ দিয়েছি, আফসোস জীবন থেকে নিজের বাপ এবং তার পরিচয়কে পুরোপুরি বাদ দেবার কোনো উপায় নেই।'

'দেখুন মিস, আপনাদের পারিবারিক–'

'দেখুন ইন্সপেক্টর, আমি আমার বাবার কোনো বিষয়ে এমনকি শুনতে পর্যন্ত আগ্রহী নই। সে কী করেছিল, সে কত মহান ছিল, সে কত বড়ো মাল ছিল, আমার জানার কোনোই আগ্রহ নেই,' মহিলার গলা চড়েই যাচ্ছে। 'আমি অনেক সময় নষ্ট করেছি জীবনে। সরি, আপনাদের সাথে আমি অকারণেই গরম হচ্ছি। কিন্তু সত্যি কথা হলো এসব নিয়ে আমি, আর একটা সেকেন্ডও ব্যয় করতে আগ্রহী নই। আপনারা দয়া করে আসুন প্লিজ।'

বাশার চট করে উঠে দাঁড়াল, 'ঠিক আছে আমরা আপনাকে বিরক্ত করব না। কিন্তু একটা বিষয় অন্তত আপনার জানা উচিত, সেটা কি আমি বলতে পারি?' বাশার তাকিয়ে আছে মহিলার দিকে। সোহেল আপনাতেই একবার দেখে নিলো তাকে। বাশার এখনও নিজের মেজাজ ঠান্ডা রেখেছে কীভাবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সে।

মহিলা উঠে দাঁড়িয়েছিল বাশারের সাথে সাথে কিন্তু বাশারের শান্ত গলা শুনে সে খানিকটা স্থির হলো, 'ঠিক আছে ইন্সপেক্টর, বলুন।'

'দেখুন আমি বুঝতে পারছি আপনার বাবার সাথে আপনার সম্পর্ক ভালো ছিল না–'

বাশার এটুকু বলতেই মহিলা আবারও চেঁচিয়ে উঠল রীতিমতো, 'ভালো ছিল না! শুধু ভালো ছিল না বলছেন আপনি, এতক্ষণ কী শুনলেন তবে?'

'ওকে ওকে, চিৎকার করার প্রয়োজন নেই,' বাশার এক হাত তুলে তাকে শান্ত হতে বলল। 'আমি বুঝতে পেরেছি তার কারণে আপনাদেরকে অনেক সাফারার হতে হয়েছে। কিন্তু সত্য কথা হলো বেলা শেষে তিনি আপনার বাবা–'

'হ্যাঁ, সেটাই তো আমার জীবনের সেরা আফসোস,' মহিলা বিড়বিড় করে বলে উঠল। 'সরি, আমি অকারণেই আপনাদের সাথে গরম হচ্ছি, হয়তো অনেক বেশি নেগেটিভিটিও দেখাচ্ছি। বলুন–'

'উনি যাই ছিলেন যেমনই ছিলেন, উনি আপনার বাবা, এটা আপনার অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। সম্প্রতি অনেক কিছু ঘটে গেছে। কী ঘটেছে তার কিছুই আপনাকে আমি বলব না, শুধু এটুকু বলব আপনার বাবাকে একদল লোক হন্যে হয়ে খুঁজছে।'

'সত্যি কথা বলছেন না কেন, অফিসার?' মহিলা ভ্রু নাচিয়ে বলে উঠল। 'আপনারাও তাকে খুঁজছেন এবং সেই ব্যাপারে আমার হেল্প লাগবে। কিন্তু দুঃখিত, হেল্প তো দূরে থাক আমি একটা সুতো দিয়েও আপনাদের হেল্প করতে পারবো না আর পারলেও করতাম না।'

'দেখুন–'

'এই বিষয়ে আর কোনো কথাই হবে না। জাস্ট ফুল স্টপ হিয়ার–'

'ঠিক আছে,' মহিলা যতটাই রুড, বাশার ততই মরিয়া। 'অন্তত এটা বোঝার চেষ্টা করুন–শুধু পুলিশ না, আরও অনেকেই আপনার বাবাকে খুঁজছে এবং তাদের জন্যে আপনিই এখন তার কাছ পর্যন্ত পৌঁছানোর একমাত্র মাধ্যম। কাজেই আপনার সিকিউরিটি–'

বাশার ভেবেছিল মহিলা খেপে উঠবে কিন্তু সে হেসে উঠল। 'শুনুন, এরকম যদি কেউ ভেবে থাকে আমাকে থ্রেট দিয়ে বা আমার ক্ষতি করার কথা ভেবে বাবার খবর বের করতে চাইবে বা তার কাছ পর্যন্ত পৌঁছাতে চাইবে, তাহলে বলে রাখি–বাবার কাছে আমার চেয়ে তার কাজ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যদি এরকম করে, কিছুই হবে না। আর রইল সিকিউরিটির কথা। নিজের নিরাপত্তা রক্ষা করার ক্ষমতা আমার আছে। আর যদি না থাকে তবে মরে গেলেও আমার কোনো আপত্তি নেই। বুঝেছেন? কাজেই প্লিজ আপনারা আসুন, আমি আপনাদের কোনো সাহায্য করতে পারছি না,' বলে মহিলা এমনভাবে একটা হাসি দিলো বাশারের মনে হলো একে আর কিছু বলার চেয়ে মরে যাওয়াই বেটার। দুজনেই মুখ গোমড়া করে বেরিয়ে এলো অ্যাপার্টমেন্ট থেকে।

'বস, বেটি তো পাত্তাই দিলো না,' গাড়িতে উঠতে উঠতে সোহেল বলে উঠল।

'হুম,' গাড়িতে উঠে বাশার একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। 'এমনটা হবে আমার আগে থেকেই ধারণা ছিল, তবে এতটা খারাপ অবস্থা হবে ভাবিনি। অন্তত ভেবেছিলাম মহিলার সাথে কথা বলতে পারবো,' বলে সে আফসোসের সাথে মাথা নাড়ল। 'যাক গে দায়িত্ব তো দায়িত্বই, অফিসে কথা বলে মহিলার ওপরে নজর রাখা দরকার, এ বিপদে পড়লে আমাদেরও বিপদ।'

'এখন করবেটা কী?' সোহেলের প্রশ্নের জবাবে বাশার কিছু না বলে চুপ করে রইল।

'বস, করবেটা কী?' সোহেল একই প্রশ্ন করল আবার।

'ভাবতেছি, ঝরনা যদি নদীর কাছে না যায় নদীকেই ঝরনার কাছে আসতে হয়,'

'কী বলতাছ বস, বিড়বিড় করে,' সোহেলে টকিতে কথা বলার ফাঁকে বলে উঠল।

'শোনো, সোহেল, মহিলার কাছে থেকা কোনো হেল্প পেলাম না, একটাই উপায়, সে হেল্প না করলেও তাকে টোপ বানিয়ে একটা ফাঁদ পাতা যায় কি না ভাবতেছি।'

সোহেলের দিকে তাকিয়ে আছে বাশার। 'বস, তোমার বলার টোন আমার ভালো লাগতেছে না। খুলে বলো তো।'

'কেস শুরু হবার আগেই এটার যে অবস্থা ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। হয় এসপার না হয় ওসপার। মন দিয়ে শোন কী বলি। অমি নিশ্চিত পৃথার ওপরে কেউ-না-কেউ নজর রাখতেছে কাজেই–' সে তার পরিকল্পনা খুলে বলতে লাগল আর সোহেল ঘন ঘন মাথা নেড়ে আপত্তি জানাতে লাগল।

***

তার কাজ এই মুহূর্তে একজন মানুষের ওপরে নজর রাখা। আর মানুষের ওপরে নজর রাখাটা সে কোনোভাবেই উপভোগ করতে পারছে না। কিন্তু সে জানে এই বয়সটার গুরুত্ব অপরিসীম এবং এটার ওপরে এখন অনেক কিছু নির্ভর করতেছে। কাজেই না চাইলেও তাকে এই কাজ করতেই হবে এবং করতে হবেই। বাইনোকুলারে চোখ রাখতে রাখতে চোখ ব্যথা হয়ে গেছে। কিন্তু উপায় নেই। হঠাৎ তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। যার ওপরে নজর রাখছে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে দেখে সামান্য মাথা নাড়ল সে। এখন দ্রুত ঘটনা ঘটতে শুরু করলেই হয়।

অধ্যায় পনেরো

সময়: ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ

জল-জঙ্গল এলাকার শুরুর অংশ

তীব্র বিপদ কিংবা ঝামলোর সময়ে কখনও কখনও মাসুমের মাথা কাজ করে খুবই ভিন্নভাবে। কোনো এক অদ্ভুত উপায়ে মূল যে বিপদের বিষয়টা, সেটাকে নিজের মস্তিষ্কের একপাশে সরিয়ে রেখে বরং চারপাশে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করে ও। দেখার এবং বোঝার চেষ্টা করে কী ঘটছে আশপাশে। যেমন এই মুহূর্তে সে নৌকার দুলুনির ভেতরে বসে আশপাশে মনোযোগ দিয়ে দেখার এবং বোঝার চেষ্টা করছে।

গেড়ুয়ারা ওদেরকে বন্দি করার পর আরও বেশ কিছু সময় নৌকা চালিয়ে এই জংলা দ্বীপের প্রান্তে সরু খালের মতো একটা জায়গায় এনে নৌকার নোঙর ফেলেছে। মাসুম এর আগেও জল-জঙ্গল এলাকায় এসেছে, কাজেই এই জায়গার বিচিত্র আর অদ্ভুত প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সাথে সে পরিচিত। এই জংলার জল এবং জঙ্গলের অবস্থান খুবই অদ্ভুত আর আজব। বড়ো নদী খাল আর মূল জলধারাগুলোকে বাদ দিলে অনেক জায়গাতেই পানির ভেতর থেকে গাছ উঠে গেছে ওপরের দিকে। সেই সাথে পানির ওপরে ছড়িয়ে পড়েছে জঙ্গলের মতো আকৃতি। ওরা এই মুহূর্তেও এরকম একটা স্যাঁতসেঁতে জঙ্গুলে জলা এলাকায় অবস্থান করছে।

মাসুমের নিজের হাত-পা দুটোই বাঁধা। তবে এরচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো ওরা শুধু আলাদাভাবে মাসুমের হাত-পা বাঁধেনি, ওরা খুবই বিচিত্র এক উপায়ে ওদের তিনজনকেই এমনভাবে বেঁধে রেখেছে একজনের হাতে টান পড়লে আরেকজনের ঘাড় ঘুরে যায়। ফলে ওরা তিনজনেই বসে আছে খুবই কষ্টকরভাবে একেবারে সটান সোজা হয়ে তিনজনেরই পরস্পরের পিঠ লেগে আছে একে-অপরের সাথে। ওদেরকে রাখা হয়েছে নৌকার একপাশে, আর ওদের জন্যে পাহারায় রাখা হয়েছে দুপাশে দুজনকে। একজনের হাতে তেল চকচকে বাঁশের লাঠি, আর অপরজনের হাতে কুঠার। দুজনেই এমন অদ্ভুত নিস্পৃহভাবে তাকিয়ে আছে দেখলেই ভয় লাগে। আর ওদেরকে বেঁধে রেখে যাবার সময় গেড়ুয়া বলে গেছে: ওরা যদি উলটাপালটা কিছু করে তবে ওদেরকে হত্যা করা হবে না, কারণ ওদেরকে ওরা এনেছেই দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দেবার জন্যে। কাজেই ওদেরকে

হত্যা করে এত কষ্ট করে করা আয়োজন নষ্ট করা হবে না। এমনকি ওরা যদি উলটাপালটা কিছু করে তবে পাহারাদারেরা ওদেরকে সরাসরি মারবে না। বরং এমনভাবে আঘাত করবে যাতে ওদের রক্তপাত না হয় কিন্তু শরীরের ভেতরে গুরুতর ক্ষতি হয়। সে উদাহরণও বলে গেছে। যেমন প্রথমেই ওদেরকে লাঠির ডগা বা কুঠারের উলটোপিঠ দিয়ে মারা হবে হাতের কবজি কনুই কিংবা ঘাড়ের সংযোগস্থলে। মারগুলো এমনভাবে মারা হবে যাতে হাড় ভেঙে ওই নির্দিষ্ট অংশগুলো অকেজো হয়ে পড়ে, কিন্তু ওরা মারা না পড়ে। খুবই শান্ত স্বরে ভয়ঙ্কর কথাগুলো বলে গেড়ুয়া চলে গেল নৌকার মাঝামাঝি জায়গায় যেখানে ওরা সবাই গোল হয়ে বসতেই কেউ একজন বিড়বিড় করে মন্ত্রগোছের কিছু একটা পড়তে শুরু করেছে। আর বাকিরা থেকে থেকে একটু পরপর *কাররা কাররা* বলে রব তুলছে, সেই সাথে ওদের মাঝে হাত বদল হচ্ছে সিদ্ধি ভরা বাঁশি, মানে নলের মতো জিনিসটা।

আলগোছে নিজের বাঁধন থেকে শুরু করে সব পরীক্ষা করে মাসুম আফসোসের সাথে মাথা নাড়ল, 'আমার আসলে আগেই বোঝা উচিত ছিল, এমন বোকামি জীবনেও হয় নাই।'

'তুমি হুদাই নিজেরে দুষতেছ,' মাসুম মাথা নাড়তেই টান পড়ল ধোবলের বাঁধনে। 'এখানে তোমার কোনো দোষই নাই,' মাসুম অবাক হয়ে খেয়াল করল ধোবলের গলার স্বর একেবারে শান্ত হয়ে গেছে। সে ভেবেছিল ধোবল সবচেয়ে বেশি অবাক হবে কিংবা অস্থির হয়ে উঠবে কিন্তু আদতে সেটা হয়নি। 'কিন্তু আমার কথা অইল এরা কারা? আর এমন করতাছে ক্যান?'

'এরা হইল পাঙ্গু,' ওদের আরেকপাশ থেকে বরখা বলে উঠল। 'তোমরা ঠগীগো নাম শুনছো না? এরাও এক রঙ্গের ঠগী, এরা অইল পানির ঠগী।'

'ঠগীর নাম তো শুনছি কিন্তু এইটা আবার কী?'

'ঠগী বা ঠগের আসলে নানা রকমফের আছে,' বলে আফসোসের সাথে মাথা নাড়ল মাসুম, 'গেড়ুয়া যখন আমার কাছে আসল প্রথমবার, আমি তখনই পিতরাজের তেলের গন্ধ পাইছিলাম,' মাসুমের ভেতরে ভেতরে রাগ উঠতে শুরু করেছে এখন। 'তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল, এমনকি ওগো তো বটেই, আমগোরে যে পোশাক দিছে ওইটাতেও পিতরাজের তেলের গন্ধ ছিল, পিতরাজের তেল শুধুমাত্র একটা কামেই ব্যবহার করা অয়–'

'পানির দেবীর পূজা করতে,' ওদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে গেড়ুয়া বলে উঠল। তার চোখজোড়া টকটকে লাল হয়ে উঠেছে কিন্তু তার মুখে বেশ একটা প্রসন্নতার হাসি। 'জি হুজুর, আপনে ঠিকই বলছেন, পিতরাজের তেলের একটাই সমস্যা। গন্ধটা কোনোমতেই দূর অয় না। তয়, এই গন্ধটা আমরা পছন্দ করি,'

বলে সে বুক ভরে বাতাস টেনে নিলো। তারপর তার রক্তচক্ষু মাসুমের দিকে তাক করে বলে উঠল, 'এই গন্ধটা পাইলে মনে অয় বাঁইচা আছি আমি, দেবী সবসময় আমগো লগে আছে। তার নিগ্রহের তলেই আছি সবসময়। হুজুর, আপনেরা–'

'আমি একটা জিনিস বুঝলাম না,' মাসুমও গেড়ুয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে ঠিক একই দৃষ্টিতে। 'তোমরা অইলা পাঙ্গু, আমি যতদূর জানি তোমরা মানুষ শিকার করো টাকা-পয়সার লাইগা আর তাগোরে শিকার কাইরা মাইরা পানিতে ফালায় দাও, তাইলে আমগোরে ক্যান? আমগো লগে তো কিছুই নাই।'

মাসুমের কথা শুনে মৃদু হেসে উঠল গেড়ুয়া। 'হুজুর, একটা কথা কই, আপনে অনেক বুদ্ধিমান মানুষ। লগে সাহসীও, আপনেরা তিনজনেই,' বলে সে নৌকার পাটাতনে দুই পা জুড়ে বসে গেল। 'আমার এই জীবনে বহু মানুষ মারছি, কত মারছি তার হিসাবও নাই,' সে তার পাকানো দড়ির মতো পেশীবহুল হাত দুটো তুলে মুখের সামনে দেখছে। 'হিসাবের দরকারও নাই, দেবীর লাইগা সবই করা সম্ভব,' বলে সে মাথা নাড়ল। 'কথা সেইটা নয়, মূলকথা অইল আমার অভিজ্ঞতা কয় যহন কাউরে এমনে ধইরা এমনে বাইন্ধা রাইখা আমি তাগো চোহের দিকে চাই, অনেকে ভয়ে মুইতা তো দিছেই, অনেকে তো হাইগাও দিছে ডরে। আর আপনে হুজুর, সুজা আমার চোহের দিকে চাইয়া কথা কইতাছেন এবং স্বীকার করতে দ্বিধা নাই আপনের চোক্ষে আমি কোনো ডর দেখতাছি না,' বলে সে নিজের সঙ্গীদের দিকে দেখল। তার একেকজন একেক কাজে ব্যস্ত। মাসুম অনুমান করল ওদেরকে নিয়ে যাই করতে যাচ্ছে, সেটার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য আছে এবং সেটার জন্যেই এই আয়োজন চলছে। 'আর এইজন্যেই আপনেগো ধইরা আনা হইছে এত ঝামেলা কইরা।'

'মানে বুঝলাম না,' মাসুম বলার আগেই বরখা বলে উঠল।

'গোস্তাকি, হুজুর,' বলে সে মাথা নিচু করে নাড়তে লাগল। ছেলেটার একটা বিষয়ে মাসুম খুব অবাক হচ্ছে। সে তাদেরকে ধরে এনেছে বিচিত্র এক উপায়ে ঠগবাজি করে, তাদেরকে সম্ভবত দেবীর উদ্দেশ্যে হত্যা করা হবে বা এরকম কিছু; কিন্তু তাদের সাথে কথা বলার সময়ে একবিন্দু অসম্মান দেখিয়ে কথা বলছে না সে। 'হুজুর, আমি বুঝায়া বলতে পারি নাই। আপনে ঠিকই কইছেন আমরা পাঙ্গু, যদি ঠগীগো নাম শুইনা থাকেন তয় আমরা অইলাম পানির ঠগী। যদিও ঠগীগো লগে আমগো অনেক তফাৎ। ওরা করে কালী মাতা মানে মা ভবানীর পূজা আর আমরা করি জলদেবীর পূজা। আমগো হিসাব খুব সহজ, আমরা নিয়মিত দেবীর পূজা করি, তার নামেই হোমের যজ্ঞ কইরা বৈঠা পবিত্র করি,' বলে সে নৌকার পাটাতনের ওপরে একটা বেদির মতো জায়গায় রাখা গেড়ুয়া কাপড় দিয়ে মোড়ানো একটা বৈঠা দেখাল। 'ওইটাকে যজ্ঞ কইরা পবিত্র করার পরে গেড়ুয়া কাপড় দিয়া

আলগাইয়া রাখা অয়, এই গেড়ুয়া কাপড় আইল তার রক্ষক। আমার নামও ওইখান থেইকাই রাখা। আমিও যেমন এই দলের নেতা এবং রক্ষক। এরপর আমরা শিকারে নামি, অনেকটা ঠগীগো মতোই। ঠগীরা পথে নামে। আমরা পানিতে নামি। নানা জায়গায় নানা লোকালয়ে লোকজনের লগে মিশা যাই, কখনও যাত্রী সাইজা, কখনও জেলে সাইজা। তারপর সুযোগ বুইঝা জায়গামতো আইলে দেবীর ইশারা পাইলেই পবিত্র বৈঠা দিয়া তিনবার ঠুকনা দেওয়া অয় নৌকার পাটাতনে। এইটা অইল আমগো ইশারা।'

'এরপরে মানুষ খুন করে পানিত ফালাইয়া দাও, আর হেগো জিনিসপত্র রাইখা দাও,' অনেকক্ষণ পর বরখা কথা বলে উঠল তার গলায় রাগ।

আপনাতেই জিভ কাটলো গেড়ুয়া, 'ছি ছি হুজুর! কী বলেন, আমরা মানুষ মারবো ক্যান। দেবী নিজে আমগোরে ইশারা করছে তার শিকাররে পরিণাম দেওনের লাইগা। আমরা স্রেফ তার ইশারা পালন করতাছি। দেবী যারে ইশারা করছে হেরে ফাঁস দিয়া সামনে থেইকা আটকায় ফালানি হয় বুকে পা রাইখা। এইখানেও আমরা ঠগীগো থেইকা আলদা। ওরা ফাঁস পরায় পিছন থেইকা। ওরা মারে গলায় দম বন্ধ কইরা আমরা মারি ঘাড় ভাইঙা। তয় একটা মিল আছে, ওগোরও রক্তপাত নিষেদ, আমগোরও। এরপর মানুষ মাইরা তার পিঠের হাড্ডি বিশেষ প্রক্রিয়ায় ভাইঙা তারে দেবীর উদ্দেশ্যে জলে বিসর্জন দেওয়া হয়, আর দেবী আমগোরে উপহারস্বরূপ তাগোর সব জিনিস ভোগ করার অনুমতি দেয়।'

'দেবী দেয়! শালা চোরের দল–'

'ছি ছি, হুজুর, আমরা চোর না,' মাসুমের মনে হলো ধোবলের কথা শুনে গেড়ুয়ার চোখ মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠল কিন্তু বলতে গেলে সে প্রায় সাথে সাথেই নিজেকে সামলে নিলো। 'আমরা স্রেফ দেবীর আদেশ পালন করি।'

'ঠিক আছে বুঝছি, তুমি কিন্তু এহনো আমার প্রশ্নের উত্তর দেও নাই–'

'জি, আজ্ঞে, আসল ঘটনা অইতাছে আমরা অনেকটা বাইদাগো মতন, আমগোর কোনো স্থায়ী ঠিকানা নাই। জলে জলেই আমগো জীবন। এই কারণেই জলের অনেক তর-তরিকা আমগো মাইনা চলতে অয়। গত কিছুদিন যাবৎ আমরা না পাইতেছি কোনো শিকার, না পাইতেছি দেবীর তরফ থেইকা কোনো ইশারা, এমন সময় আমগো মাঝে-মধ্যে আহে, এই সময়ে একটাই করার থাহে। দেবীর লাইগা বড়ো কিছু উৎসর্গ করা।'

'আর এইবার তোমরা পাইছ আমগোরে–'

'জি হুজুর, বাঘে বা কুমিরে যেমন বড়ো শিকার পাইলে খুশি অয়, দেবীরে সন্তুষ্ট করার লাইগা কখনও কখনও অনেক বড়ো কিছু উৎসর্গ করতে অয়। এমন কিছু করতে গেলে অনেক কষ্ট অয়, অনেক ঝামেলা অয় কিন্তু ফল অয় বড়ো, দেবী

খুশি অয়। এর আগেরবার যেমন এক ঝালাইকাররে ধইরা আইনা উৎসর্গ করছিলাম। হেরে উৎসর্গ করার পর এক বছর আমগো শিকার পাইতে কুনো সমস্যা অয় নাই। আমরা গত কিছুদিন ধইরাই তক্কে তক্কে ছিলাম বিশেষ শিকারের লাইগা। তাই গতকাইল যখন শুনলাম হুজুর রসুল খাঁর লোকেরা কাঠুরিয়া আর নাইলে জেলে খুঁজতাছে। পুরাটা শুইনাই বুঝছি এইবার দেবী যোদ্ধা রক্ত চায়।'

'এইজন্যেই বারবার তুমি জিগাইতাছিলা আমরা যোদ্ধা কি না,' মাসুম রাগের সাথে বলে উঠল।

'জি হুজুর, আমরাই কৌশলে শেরুর পরিচিত কাঠুরিয়ারে মাইরা তারে লুকাইয়া আমরা গিয়া তার লগে দেহা করছি। হেরাও কিছু ধরতে পারে নাই। আমি জানতাম ঝুঁকি আছিল কিন্তু উপায় কি, দেবীর ইশারা বইলা কথা,' বলে সে ওপরের দিকে দেখাল। 'যাক গা, এরপরে আপনেগো লগে দেখা অওয়াতে বহুত খুশি হইয়া গেছি যা ভাবছিলাম আপনেরা তারেচেয়েও বড়ো যোদ্ধা। দেবী এইবার অনেক খুশি অইব,' বলে সে আনমনেই ভক্তিভরে দেবীর উদ্দেশ্যে নত করে মাথা নাড়ল।

'কিন্তু রসুল খাঁরে সামলাবা কেমনে?'

গেড়ুয়া হেসে উঠল। 'হেরা জানলে তো। আপনেগো কী অইছে, কে জানব, আর আমগোরেই বা পাইলে তো। আমরা অইলাম বাইদাগো মতন। আপনেগো উৎসর্গ করনের পরে আমরা এই এলাকায় আর পাই রাখুম না কয়েক বছর।'

'তা বইসা আছ ক্যানো?' যা করার করো।

'ছি হুজুর,' বলে সে আফসোসের সাথে মাথা নাড়ল। 'আমগোরে কি এত কাঁচা মনে অয়? আয়োজন আছে না? আরেকটা কথা অইল আমগো আরও কিছু লোক আইব এইখানে। ওগো লাইগা অপেক্ষা করতাছি,' বলে সে উঠে দাঁড়াল। 'হুজুর, আসলে কিছু মনে কইরেন না আপনেগো আমার অনেক ভালো লাইগা গেছিল, কিন্তু আমি অক্ষেম,' বলে সে মৃদু হেসে উঠল।

মাসুম তার সাথে কথা বলতে বলতে কঠিন ফাঁসের ভেতরেও নিজের হাতটাকে আলগা করে ফেলেছে অনেকটাই। কিন্তু এখনও সেটাকে নিজের লুকানো ছুরি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেনি। গেড়ুয়া উঠে দাঁড়াতেই নৌকাটা সামান্য দুলে উঠল, এই সুযোগে সে ছুরির হাতলটা চেপে ধরল নিজের মতো করে। ধরেই বরখার দিকে তাকাতে বরখা ভ্রু নাচিয়ে বিশেষ একটা ইশারা করল। মাসুম বুঝতে পারল বরখাও প্রস্তুত আছে। এবার সবধান করতে হবে ধোবলকে। ধোবলকে উদ্দেশ্যে করে কিছু একটা বলতে যাবে তার আগেই ওদের চোখের কোণে আরেকটা নৌকা দৃশ্যমান হলো। মাসুম দেখতে পেল সেটার অগ্রভাগে মাথায় মাথলা পরা একজন হ্যাংলা পাতলা মানুষ লম্বা লাঠির মতো একটা বৈঠা দিয়ে ঠেলে ঠেলে নৌকাটাকে এগিয়ে নিয়ে আসছে।

‘হুজুর, আপনেগো অপেক্ষার আর বেশি সময় নাই, আমগো লোকেরা চইলা আসছে,’ গেড়ুয়ার গলায় আনন্দ।

মাসুম ড্যাগারের হাতলটা আরও শক্ত করে চেপে ধরল। আরও লোক চলে আসার আগেই যা করার করতে হবে। কারণ আরও লোক চলে এলে পালাবার সম্ভাবনা আরও কমে যাবে। মাসুম ছুরি পর্যন্ত ধরতে পারলেও এখনও আসলে জানে না কতটা কী করতে পারবে। কারণ এরা দক্ষহাতে ওদেরকে যেভাবে বেঁধেছে সেটা আসলে কতটা কার্যকরী হবে কে জানে। তবে এমনিতেই মরতে হবে, অমনিতেও কিছু করার নেই। ‘ধোবল, বরখা,’ খুব মৃদুস্বরে প্রায় শোনা যায় না এমনভাবে বলে উঠল মাসুম, ‘প্রস্তুত।’ প্রথম দুটো শব্দ পাহারাদারদের কানে না গেলেও সে তৃতীয় শব্দটা ঠিকই শুনতে পেল। চট করে মাসুমের দিকে ফিরে ধমকে উঠল। সাথে সাথে ঘটে গেল বেশ কয়েকটা ঘটনা।

মাসুম যে হাতে ছুরি ধরেছে সেটার ফাঁস আটকানো ধোবলের গলার সাথে, সেটা আবার সংযুক্ত করে রাখা হয়েছে বরখার অন্য হাতের সাথে। ফলে মাসুম চট করে ছুরিটা বের করে আনতেই টান লেগে ধোবলের দম বন্ধ হয়ে এলো। সেই সাথে বরখার হাত ছুটে গেল ছুরির হাতল থেকে। সে টান দিতেই মাসুমের হাত সরে গেল, কিন্তু মাঝখানে ধোবলের অবস্থা হলো মরার মতো। আর টানাটানিতে তিনজনেই কাত হয়ে পড়ল একদিকে। টের পেয়ে গেল ওদের পাহারায় থাকা দুই পাঙ্গু। দুজনের একজন লাঠি তুলল আঘাত করার জন্যে, আর অন্যজন বরখার গলার পেছনের মেরুদণ্ডের গোড়ায় কুঠারের মাথা ঠেকাল। মাসুম মরিয়া হয়ে টানাটানি শুরু করল কিন্তু কিছু হলো না। সে বুঝতে পারল হিসেবে ভুল হয়ে গেছে ওর। আর এক মুহূর্তের ভেতরেই লাঠি আর কুঠারের বাড়িতে ফেটে যাবে ওদের হাড়গুলো। আনমনেই চোখ বন্ধ করে ফেলল মাসুম, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ভীষণভাবে দুলে উঠল ওদের নৌকা। ওরা তো বটেই এমনকি নৌকায় উপস্থিত প্রতিটা লোক গড়িয়ে পড়ে গেল পাটাতনে। একাধিক ঝপ ঝপ শব্দের সাথে মাসুম অনুমান করল পাঙ্গুদের অন্তত দুজন পানিতে পড়ে গেছে। ওরা ফাঁসের কবল থেকে খানিকটা মুক্ত হয়েছিল আপনাতেই। ঘ্যাচ ঘ্যাচ ছুরির টানে বাকি গুলো মুক্ত করেই ছুরিটা ধোবলের হাতে ধরিয়ে দিয়েই সোজা হয়ে দাঁড়াল মাসুম এবং অবাক হয়ে দেখল যে নৌকাটা এগিয়ে আসছিল সেটা এগিয়ে এসে সোজা বাড়ি মেরেছে ওদের নৌকাটাকে। মুহূর্তের ভেতরে সব এলো মেলো হয়ে গেছে এই নৌকায়। পাঙ্গুদের চেঁচামেচি আর পাহারাদরদের চিৎকারে মাসুম ফিরে দেখল ও যেমন উঠে দাঁড়িয়েছে ঠিক তেমনি নৌকার মাঝামাঝি উঠে দাঁড়িয়েছে গেড়ুয়াও সে একবার আগুয়ান নৌকাটার দিকে দেখে নিয়ে চট করে ফিরে তাকাল মাসুমের দিকে। দুজনেই দুজনার দিকে আগুন চোখে তাকিয়ে রইল মুহূর্তের জন্যে। গলা আর কাঁধ

থেকে আলগা ফাঁসের কাপড় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাটাতন থেকে একটা লাঠি তুলে নিলো মাসুম, সেটাকে পাটাতনের ওপরে ঠেকিয়ে এক লাফে এগিয়ে গেল গেড়ুয়ার দিকে, গেড়ুয়াও ছুটে আসছে ওদের দিকে। দুজনেই প্রায় ধরে ফেলবে দুজনকে এমন সময় কিছু একটা এসে বাড়ি মারল গেড়ুয়ার পায়ে, উড়ে গিয়ে পানিতে পড়ে গেল সে। মাসুম অবাক হয়ে দেখল অন্য নৌকাটাতে যে মানুষটা ছিল সে তার হাতে থাকা লম্বা বৈঠাটা দিয়ে বাড়ি মেরেছে গেড়ুয়াকে। সে আরও অবাক হয়ে দেখল মানুষটা আর কেউ না, নুক্কুন নামের সেই লোকটা যাকে ওরা সাথে আনতে অস্বীকার করেছিল!

'হুজুর, জলদি জলদি,' লাঠির মতো বৈঠাটাকে টেনে নিতে নিতে সে চিৎকার করে ওদেরকে ওই নৌকায় যাবার জন্যে ইশারা করছে। মাসুম তাকিয়ে দেখল ধোবল আর বরখা এখনও দুই পাহারাদের সাথে লড়ছে। 'জলদি জলদি,' চিৎকার করে উঠল ও। হাতের লাঠি চালাল সামনের দিকে। এক পাঙ্গু দৌড়ে আসছিল, বাড়ি খেয়ে ফাটা মাথা নিয়ে পটাতনের ওপরে পড়ে গেল সে। আরেক পাঙ্গু হাতে কুঠার নিয়ে এগিয়ে আসছিল একটা লাঠি উড়ে এসে বাড়ি মারল তার মুখে। এই লোকটাও পড়ে যেতেই মাসুম দেখল ধোবল লাঠিটা ছুড়েছে। 'জলদি,' বলেই সে পা বাড়লো অন্য নৌকাটার দিকে। ওর ঠিক পেছনেই ধোবল আর বরখা। তিনজনেই সেই নৌকাটায় লাফিয়ে নামল। উঠে দাঁড়াল মাসুম, 'জলদি নৌকা ঘুরাও,' বলে নুক্কুনকে নির্দেশ দিয়ে সে আবারও উঠে দাঁড়িয়ে লাফিয়ে ফিরে এলো আগের নৌকায়। নুক্কুন ধোবল আর বরখা অবাক হয়ে দেখতে লাগল করছে কী মাসুম।

মাসুম পাঙ্গু নৌকায় লাফিয়ে পড়েই এক লাফে উঠে এলো যেখানে মাঝি বসে ছিল সেখানে। মাঝি লোকটা হাল ছেড়ে ওকে ধরতে যাবে এক লাথিতে তাকে পানিতে ফেলে ছুরি বের করে কেটে দিলো নোঙরের দড়িটা, তারপর হাতের লাঠিটা হালের নিচে ঠেকিয়ে প্রাণপণে টানতে লাগল। এমনিতেই নোঙর কাটতেই নৌকাটা টালমাটালের মতো করতে শুরু করেছিল হালে চাপ পড়তেই সেটা ঘুরে যেতে শুরু করল। নৌকার ভারসাম্য নষ্ট হতেই লাফিয়ে উঠে আগের নৌকায় ফিরে আসতে গিয়ে শরীরের ভারসাম্য রাখতে পারল না মাসুম। নৌকাটাও ঘুরে গেল, মাসুমও পড়ে গেল পানিতে। দুই ডুব দিয়ে যেদিকে নুক্কুনের নৌকা সেদিকে আন্দাজ করে ডুব সাঁতার দিয়ে খানিকটা সরে আসতেই পানির ওপরে মাথা তুলে দেখল ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বরখা। ওকে টেনে ধরতেই ধোবল আর নুক্কুন প্রাণপণে বৈঠা আর দাঁড় চালাতে লাগল। প্রথমত কয়েক মুহূর্ত দম নিলো মাসুম তারপর চোখ তুলে দেখতে পেল পাঙ্গু নৌকাটা পুরোপুরি উলটে গেছে। ওটার আশপাশে কিছু মানুষের হাত পা নাড়ানাড়ি দেখে বুঝলো পাঙ্গুরা চেষ্টা করছে

ওটাকে সোজা করতে। কয়েকজনকে দেখতে পেল সাঁতার কেটে সবচেয়ে কাছের ডাঙার দিকে যাবার চেষ্টা করছে। মাসুম জোরে নাও বাইতে নির্দেশ দিলো। অল্প সময়ের ভেতরেই ওরা সরে এলো বড়ো একটা নদীর মতো মূল জলধারায়। যথেষ্ট পরিমাণ বিশ্রাম নেওয়া হতেই প্রথমে মাসুম নিজের শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করে দেখল। বেশ কয়েক জায়গায় কেটে-ছড়ে গেলেও সে ঠিক আছে। হাড়-টাড় ভেঙেনি।

ওদের নৌকা কেবল নদীতে পড়েছে, তাতেই খোলা হাওয়া আর বাতাসে মন জুড়িয়ে গেল ওর। যদিও আগের চেয়ে অনেক বাজে অবস্থায় পড়েছে কিন্তু বেঁচে তো আছে। মনে মনে আরেকবার অনুভব করল আসলে বেঁচে থাকার চেয়ে বড়ো নিয়ামত আর কিছু হতেই পারে না। মনে মনে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দিয়ে সে সরে এলো নৌকার যেদিকে বাকিরা আছে।

'তোরা ঠিক আছস?' প্রশ্নটা করেছে সে বরখা আর ধোবলের দিকে তাকিয়ে। দুজনেই মাথা নেড়ে সায় জানাতেই সে ফিরে তাকাল নুক্কুনের দিকে। মাসুম ফিরে তাকাতেই সে নিজে দাড়ির জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে পবিত্র একটা হাসি দিলো। 'অনেক ধন্যবাদ নুক্কুন, আজ তুমি না থাকলে–'

'হুজুর, আপনেরা মা-বাপ এমনে শরম দিয়েন না,' বলে সে এককার ধোবল আর বরখার দিকে দেখে নিলো।

'কিন্তু আমার বেশ কিছু জিনিস জানবার আছে,' মাসুম বলে উঠল।

'আজ্ঞে হুজুর,' সে হাল ধরে রেখে ওর দিকে ফিরে জবাব দিলো।

'প্রথমেই আমি দুঃখ প্রকাশ করছি তোমারে না নিয়া আসার জন্যে–'

'হুজুর, এইখানে আপনের দোষ নাই, ওরা কোনোরহমেই আমারে আনতে দিত না, কারণ শুরু থাইকাই ওগো নিয়ত আছিল খারাপ। হেরা আপনেগো কী কইছে জানি না কিন্তু হেগোর কতাবার্তা উলটা-পালটা আছিল শুরু থেইকাই।'

'আমি একটা জিনিস বুঝতে পারলাম না। শেরু বা বাসিমের অন্য লোকেরা কেউই ব্যাপারটা বুঝতে পারল না,' বরখা বলে উঠল। সে আর ধোবল দুজনেই বৈঠা চালাচ্ছে বেশ মনোযোগের সাথে।

'হুজুর, গোস্তাকি না নিলে একটা কথা কই,' নৌকার হাল চেপে ধরে নুক্কুন তাকিয়ে অছে অন্যদিকে। 'এই সমাজের উপরের তলার মাইনষেরা নিচের তলার মানুষগোরে যদি বুঝতেই পারত তাইলে তো সমস্যাই থাকত না। হুজুর, রসুল খাঁর লোকেরা যা ভাবছিল হেরা ডাকলেই দশ জনে পায়ের উপরে ঝাঁপায়া পড়ব সাহাইয্য করার লাইগা, কারণ হেগোর একটা ধারণাই অইল হেরাই খালি গরিবগোরে কামড় দিতে পারে, কিন্তু সময়ে যে গরিবগোর ভিতরেও ভয়ঙ্কর মানুষ থাকতে পারে। হেরাও ক্ষতির কারণ হয়া উঠতে পারে, সেইটা হেরা বুঝতে পারে নাই।'

'তুমি আসলা ক্যামনে?' নুক্কুন দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকলেও মাসুম তাকিয়ে আছে নুক্কুনের দিকে। 'তুমি তো এইটা পার হওয়ার লাইগা কোনো রাস্তাই পাইতেছিলা না, সেইজন্যেই তো আমগো লগে আইতে চাইছিলা। এত সহজে পাইলা ক্যামনে?'

'হুজুর, কপাল জোরে পাইয়া গেছি। আসলে কপাল জোরে না। প্রথমে আপনেরা যেমনে লুকায় এইহানে ঢোকার বুদ্ধি করছিলেন এইটা আপনেগো দেইখাই মাথায় আসছে, আগে এই বুদ্ধি আহে নাই,' বলে সে মাথা চুলকালো দুবার। 'এরপরে কাইল আপনেরা বাইর হইতেই পিছে পিছে গেলাম, আপনেরা রওনা দিতে চইলা গেলাম আরেক ঘাটে। ওইখানে গিয়া দেখি কাঠুরিয়াগোর আরেক দল রওনা দিতাছে। হেগোরে হাতে পায়ে ধইরা বহুত কান্দাকাটি কইরা রওনা দিলাম হেগো লগে। হেগো লগে কথা কইতে কইতে যখন কইলাম আরও একদল কাঠুরিয়া গেছে আগে, হেরা খুব অবাক অইছে কারণ হেরা নাকি এমন কারও কথা শুনে নাই। এগো সমাজের কেউই জানে না। আমি ভাবছিলাম হয়তো হেরা জানে না। কিন্তু ঘাটে আপনেগো নৌকার ঠিক দুই নৌকা পরের নৌকাতেই আমরা ছিলাম। ওইখানে বইসা যখন দেখাইলাম তখন হেরা কইল এই কাঠুরিয়ার দল হেরা জীবনেও দেহে নাই এই মুল্লুকে। সন্দেহ অইল, কালীঘাটে নাইমা গেলাম। ওইখান থেইকা দেখলাম আরেকটা নৌকা যাইতাছে আপনেরা যেদিক গেছেন হেদিকে। কালীঘাট থেইকা একটা নৌকা চুরি কইরা আগাইতে লাগলাম। এরপরে ওইদিকে যাইতে আপনেগো যেই জলার ওইখানে নিয়া আটকাইয়া রাখছিল ওইটার উলটাদিকে দেখলাম হেগো মতন পোশাক পরা আরও একদল লোক আছে। ওইখানে নাইমা দ্বীপের উলটাপাশে গিয়া হেগো নৌকা চুরি করলাম তারপর তো আপনেরা জানেনেই।'

'তুমি এখন তো এইখানে আসতে পারছ, তাহলে তোমার পরিবার—'

'মাসুম, বাদ দে তো ওর আলাপ,' এই প্রথমবারের মতো বরখা বেশ অস্থির হয়ে বলে উঠল। 'যা পরিকল্পনা করা আছিল সব তো বরবাদ হয়া গেল। এখন আমরা করব কি, খালি কয়ডা ছুরি আর এই নৌকাডা বাদে তো আর কিছু নাই। এই এলাকাও ঠিকমতো চিনি না আমরা। যে বিরাট দায়িত্ব নিয়া আসছি সেইটার কী করব কিছুই তো বুঝতাছি না।'

ধোবল আর বরখা দুজনেই তাকিয়ে আছে মাসুমের দিকে।

মাসুমকে দেখে অবশ্য খুব বেশি বিচলিত বলে মনে হচ্ছে না। সে দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নুক্কুনের দিকে। 'নুক্কুন, তুমি এই এলাকা কেমন চিন?'

'হুজুর, আমি মোডামুডি সবই চিনি,' কোনোরকম দ্বিধা ছাড়াই নুক্কুন এক বাক্যে বলে উঠল।

মাসুম, কোমরে হাত দিয়ে ওর ধূতির কোচর থেকে ভেজা একটা কাপড়ের মানচিত্র বের করে আনল। 'নৌকাটা কোনো এক জায়গায় ভিড়াও তোমার সাথে আলাপ আছে।'

'তুই এইটা কখন আনলি?'

'গেড়ুয়ারা যতই মানা করুক শরীরের ভেতরে যা কিছু সম্ভব টুকটাক কয়টা জিনিস আমি নিছিলাম কারণ এইটা জানতাম একবকার এইখানে আসলে এইগুলা লাগবই। যাক গা, এই মানচিত্র দেইখা একটা বিশেষ জায়গায় যাইতে হবে আমগো।'

'সেইটা কোনো জায়গায়?'

'কোনো জায়গায়, তারচায়া বড়ো কথা সেইখানে কী আছে,' মাসুম রহস্যের মতো ভ্রু নাচিয়ে বলে উঠল।

'কী আছে?' ধোবলও আগ্রহের সাথে তাকিয়ে আছে মাসুমের দিকে।

'ওইখানে মোঘলগোর একটা বাহিনী আছে,' বলে সে মৃদু হেসে উঠল। 'সবচেয়ে বাজে অবস্থাতেই সবচায়া ভয়ঙ্কর কাজ করতে হয়। আমরা যে অবস্থায় আছি তাতে বাঘের গুহাতে ঢুইকাই বাঘের খাবার ছিনায়া আনতে অইব।'

বরখা আর ধোবল তো বটেই এমনকি নুক্কুনও তাকিয়ে আছে মাসুমের দিকে।

'আমগোরে মোঘলগোর আস্তানায় ঢুকতে অইব। মোঘলগোর আস্তনায় ডাকাতি করব আমরা,' খুব তরল গলায় বলে উঠল মাসুম।

অধ্যায় ষোলো

বর্তমান সময়

মোহাম্মদপুর, ঢাকা

যারা বলে কর্মব্যস্ত ঢাকা আসলে কখনও ঘুমায় না–ব্যাপারটা একেবারেই ঠিক নয়। হয় তারা জানে না অথবা তারা কখনও রাতের ঢাকাতে ঘুরে বেড়ায়নি। যদি তাই হতো তবে অবশ্যই জানত যে শহরে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক ঢোকে আর বের হয়, আর কোটির ওপরে মানুষ বসবাস করে সেই শহর রাত এগারোটার কোঠা পার হতেই ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসতে থাকে। আর রাত বারোটা পার হয়ে একটার দিকে রওনা দিলে ক্লান্ত শহরবাসীর মতো রাতও যেন ঘুমিয়ে পড়তে শুরু করে। রাতের এমনই এক প্রহরে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুলের মাঠের একপাশের রাস্তাতে অন্ধকারে দাঁড়ানো জিপের ভেতরে বসে আছে দুজন মানুষ।

'বস, কী মনে হয় কাজ হবে?' স্যান্ডুইচে কামড় বসাতে বসাতে সোহেল প্রশ্ন করল। স্যান্ডুইচে কামড় দিয়ে ঠান্ডা কোকের ক্যানে চুমুক দিলো একবার।

সোহেলের প্রশ্নের জবাবে বাশার কিছু বলল না। সে জিপের জানালা নামিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। 'মনে তো হচ্ছে, কিন্তু এখন বাকিটা দেখা যাক।'

ওদের দুজনারই সারাদিন বেশ ব্যস্ততার ভেতরে কেটেছে। প্রফেসর ইফতেখারের মেয়ে পৃথার সাথে ব্যর্থ কথোপকথনের পর তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে প্রথমে পিবিআই অফিসে কথা বলে তারপর লোকাল থানায় কথা বলে পৃথার ওপরে নজরদারির ব্যবস্থা করে ওরা। তারপর অফিসে ফিরে গিয়ে এই কেসের সাথে সংযুক্ত সমস্ত ফাইল নিয়ে সোহেলের এবং মৌসুমির সাথে মিটিংয়ে বসে। সমস্ত ফাইল অ্যানালাইসিস করার পর বাশার ওর প্রস্তাবনাটা জানায় সোহেল আর মৌসুমিকে। ওর পরিকল্পনাটা ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু কাজ হবার সম্ভাবনা আছে। তবে পরিকল্পনাটাকে ওরা ইচ্ছে করেই পুরোপুরি অফিসিয়াল করেনি। কারণ এই পরিকল্পনায় কাজ হবার সম্ভাবনা যেমন আছে ঠিক তেমনি কাজ নাও হতে পারে। তাই এখনি বিষয়টাকে অফিসিয়াল করতে চায়নি ওরা।

বাশারের পরিকল্পনাটা খুবই সহজ। যেহেতু ওদের কেসের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রথম এক্সপ্লোরিং এরিয়া চৌধুরী ইতিমধ্যেই মিসিং এবং পৃথা হাসান ওদের সাথে কোনো

ধরনের কো-অপারেট করতে নারাজ, কাজেই এই মুহূর্তে ওদেরকে রিস্ক ফ্যাক্টরে যেতেই হবে। বাশার পৃথা হাসানকে দিয়ে একটা ফাঁদ পাততে চাচ্ছে। ওর বক্তব্য হলো যেহেতু প্রফেসর আবদেলের ঘটনার পর প্রফেসর ইফতেখারকে নিয়ে একটা আলোড়ন তৈরি হয়েছে এবং নিশ্চিত একাধিক মহল তাকে খুঁজে বের করতে চাইছে, চৌধুরীর মিসিং এর ঘটনা এটা প্রমাণও করে। কাজেই জোরদার সম্ভাবনা আছে যে বা যারাই তার পেছনে লাগুক, তারা অবশ্যই পৃথার কাছ পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। আর সে কারণে তার ওপরে নজর রাখার সম্ভাবনাও আছে। কাজেই আজ সন্ধ্যার দিকে একটা আননোন নম্বর থেকে পৃথার মোবাইলে একটা টেক্সট পাঠানো হয় আজ রাত বারোটার পর তার বাড়ির ঠিক সামনেই একটা স্কুলের গেটের পাশে মাঠে দেখা করার জন্যে। কোনো নাম লেখা হয়নি, বা অন্য কিছুও না।

টেক্সটের ভাষা থেকে শুরু করে, লোকেশন সবই চুজ করা হয়েছে খুব সাবধানে।

এর পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে। কোনো নাম রাখা হয়নি যাতে যে-কেউ যাই খুশি ভেবে নিতে পারে। কিন্তু খুব সূক্ষ্ম একটা ইঙ্গিত দেওয়া আছে এটা প্রফেসর আবদেল হতে পারে। আবার লোকেশনটাও এমনভাবে চুজ করা হয়েছে যাতে সেখানে যাবার জন্যে পৃথা ঠিক আক্ষরিক অর্থে ঝুঁকিপূর্ণ ফিল না করে, কারণ বেশি ঝুঁকি ফিল করলে সে যাবে না। এই কারণেই এমন জায়গা বেছে নিয়েছে ওরা, যাতে নজরও রাখতে পারে, আবার রাস্তার পাশেও হয় আবার খানিকটা নির্জনও থাকে।

'শোন, সোহেল, আসলে বিষয়টা একটা জুয়ার বাজি ছাড়া আর কিছুই না,' বাশার ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে উঠল। সারাদিন একসাথে কাজের পর ওর সাথে সোহেলের সম্পর্ক তুমি থেকে তুইতে নেমে এসেছে। 'কারণ এখানে অনেকগুলো ফ্যাক্টও আছে। আমি আসলে আবেগ যুক্তি আর কৌতূহলের মাঝামাঝি একটা জায়গায় বাজি ধরতে চাইছি, যদিও কাজ হবার সম্ভাবনা প্রায় নেই বলতে গেলে।'

'কীভাবে, বস?' সোহেল তার খাওয়ার প্রায় শেষ পর্যায়ে।

'প্রথমত, পৃথার সাথে বাপের সম্পর্ক খুবই খারাপ, কিন্তু বেলা শেষে সে তার বাপেরই মেয়ে তার বাপের প্রতি একটা টান অবশ্যই আছে, এটা হলো আবেগ। পরিস্থিতি উত্তপ্ত, এমন অবস্থায় তাকে মেসেজ কে পাঠাবে এটা নিয়ে তার ভেতরে একটা অস্বস্তি কাজ করবেই, এটা কৌতূহল। একই কথা আমাদের সম্ভাব্য অদৃশ্য প্রতিপক্ষের জন্যেও প্রযোজ্য।'

'আর যুক্তি?' সোহলে খাওয়া শেষ করে প্যাকেট আর ক্যান দুটোই মুড়িয়ে রেখে দিলো নিচে।

'দুঃখের বিষয় হলো আমাদের কাজের প্রসিজারে ওটাই সবচেয়ে শক্তিশালী হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এখানে ওটাই সবচেয়ে দুর্বল। যুক্তি হলো, এই ক্রুশিয়াল অবস্থায় প্রফেসর ইফতেখার তার মেয়ের সাথে যোগাযোগ করতেই পারেন তাকে সাবধান করে দেবার জন্যে হলেও। আবার অন্যদিকে প্রফেসরের সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে। প্রথমটা অদৃশ্য শত্রুর জন্যে, আর পরেরটা পৃথার জন্যে। সব মিলিয়ে যে টেক্সটটা আমরা পাঠিয়েছি পৃথা কিংবা অন্য পক্ষের ওপরে এটার একটা প্রভাব হবার সম্ভাবনা আছে। অন্তত পক্ষে ঘটনাটা কী সেটা চেক করার একটা প্রচেষ্টা করে দেখতে পারে যে কেউ। অতীব দুর্বল, কিন্তু এটাই আপাতত আমার যুক্তি।'

'কিন্তু কয়েকটা বিষয় মিলিয়ে আমার কাছে একেবারে খারাপ মনে হচ্ছে না। অন্তত কিছুই না করার চেয়ে কিছু করাটা অনেক বেটার,' বলে সে বাশারের দিকে ফিরে একটা হাসি দিয়ে বলে উঠল। 'বস, তোমার মাথায় কুবুদ্ধি একেবারে খারাপ না। মনে হচ্ছে তোমার সাথে থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবো।'

'হুম, সেটা সময়ই বলে দিবে তুই কি আমার সাথে থেকে কিছু শিখবি নাকি মারা খাবি,' কথাটা বলার সাথে সাথেই বাশারের মনের ভেতরে রাজুর স্মৃতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছিল কিন্তু বাশার সেটাকে গলা চেপে দাবিয়ে দিয়ে বরং সম্প্রতি ওর সাথে কাজ করা টিমটার কথা মনে করার চেষ্টা করল। রমিজ দারোগা আর আবদুল্লার সাথে দারুণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ওর। ওদের কী অবস্থা কে জানে। বাশার হাতের আংটিটা ধরে মোচড়াতে লাগল। আজ সারাদিন রিফাতের সাথেও কথা হয়নি।

বাশার জিপের বাইরে মাথা বাড়িয়ে একবার চারপাশটা দেখে নিলো। রাতের ঢাকায় রাস্তার পাশটা যেরকম হয় অনেকটা তেমনই আশপাশটা। ওর মনে হলো লোকেশনের সিদ্ধান্তটা একেবারে ঠিক আছে। রাস্তার একপাশে কয়েকজন মানুষ কম্বল বিছিয়ে রাতের শোয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ফুটপাতের একটা ছাউনির নিচে। একটা ছোটো বিড়ির দোকানদার রাস্তার কুকুরকে বনরুটি খাওয়াচ্ছে। একপাশে একটা ফকির থালা নিয়ে বসে আছে, *ব্যাটার বুদ্ধির বলিহারি। এই রাতের বেলা কে ভিক্ষা দিবে ওকে?* চারপাশটা দেখে নিয়ে বাশার একবার ঘড়ি দেখল, নির্ধারিত সময়ের আর কয়েক মিনিট বাকি। 'আর অল্প কিছুক্ষণের ভেতরেই প্রমাণ হয়ে যাবে বলদ আমরা, নাকি অন্যরা,' বলে সে মৃদু হেসে উঠল।

'বস,' বলে খপ করে সোহেল একটা হাত চেপে ধরল বাশারের। সে এত জোরে চেপে ধরেছে যে প্রায় একটা নখ ঢুকে গেছে বাশারের হাতে। 'আরে আস্তে, করিস কী?'

'আরে ওইদিকে দেখ,' বাশার দেখল টাইস, হুডি আর কেডস পরে দ্রুত পায়ে এদিকে এগিয়ে আসছে পৃথা। সে এমন পোশাক পরেছে এবং এমনভাবে হাঁটছে যে

কেউ দেখে ভাববে সে আসলে ইভিনিং ওয়াকে বের হয়েছে, যেটা ঢাকা শহরে এখন খুব অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা না। অনেক মহিলা তো বটেই এমনকি পুরুষরাও অনেকে এখন সন্ধেবেলা বা রাতের বেলা রাস্তাঘাটের ভিড় একটু কমলে হাঁটতে বের হন। খোঁজ নিলে দেখা যাবে স্কুলের মাঠের চারপাশে অনেকেই হাঁটছে। পৃথার কোনোদিকে মনোযোগ নেই, সে একমনে জোর কদমে পা চালিয়ে ওদের সামনে দিয়ে চলে গেল। জিপের ভেতরে বলতে গেল একরকম ঘ্যাট মেরে বসে রইল দুজনে। সোহেল টকিটা তুলে নিচ্ছিল, বাশার একটা হাত তুলে থামিয়ে দিলো। 'এখন না, আরও পরে।'

পৃথা ওদেরকে পার হয়ে ফুটপাতে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিতে থাকা লোকগুলোকে ছাড়িয়ে সেই বিড়ির দোকানটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাশার দেখল সে কিছু একটা কিনছে ওখান থেকে। কিছু একটা নিয়ে মুখে পুরে দোকানদারকে টাকা দিয়ে চারপাশে একবার নজর বোলাল। বাশার অনুমান করল মেয়েটা আসলে চারপাশে নজর বোলানোর জন্যেই দোকানটার সামনে থেমেছে। দোকানি থেকে টাকা নিয়ে সে আবারও সামনে হাঁটতে লাগল। 'বেশি আগে চলে না গেলেই হয়,' বিড়বিড় করে বলে উঠল বাশার। কিন্তু তার ভয় ভুল প্রমাণ করে পৃথা সামনের ছাউনির একপাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সোহেল এবং বাশার দুজনেই মনোযোগের সাথে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। সোহেলের হাতে ওয়াকিটকি প্রস্তুত, যদি ব্যাকআপের প্রয়োজন হয় সেজন্য।

পৃথা দাঁড়িয়ে আছে, একবার সে সাইডব্যাগের মতো করে ঝোলানো ব্যাগ থেকে মোবাইল বের করে পরীক্ষা করে নিলো। সময় যেন খুব ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে। পৃথা আরও দশ মিনিটের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার নড়াচড়া দেখে মনে হচ্ছে সেও ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠেছে। আরেকবার মোবাইল বের করে দেখে নিয়ে সে চারপাশে তাকাল তারপর এগোনোর জন্যে পা বাড়াবে হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা প্রেমিও গাড়ি বেরিয়ে আসতে দেখল ওরা। 'সোহেল,' সোহেলকে সাবধান করে দেবার আগেই ঘটনা ঘটতে শুরু করল। পৃথা হাঁটতে শুরু করবে গাড়িটা এসে ঠিক তার পাশে রাস্তায় থেমে গেল। বাশার দেখল ওটার সামনে একপাশের কাচ নেমে গেল। পৃথা সামান্য ঝুঁকে কথা বলছে। গাড়ির ড্রাইভার আর পৃথার ভেতরে কথোপকথন চলছে। হঠাৎ কিছু একটা হলো বলে মনে হলো। বাশার দেখল গাড়ির দরজাটা খুলে যাচ্ছে আর পৃথা দৌড়াতে শুরু করল, কিন্তু সে কয়েক পা এগিয়ে যাবার আগেই গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা এক লোক তারচেয়ে দ্রুত গতিতে এসে ধরে ফেলল তাকে। 'জলদি চল,' সোহেলকে সাবধান করে দিয়ে জিপের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাশার, পেছনে শুনতে পেল

সোহেল বারবার টকিতে কথা বলার চেষ্টা করছে কিন্তু যোগাযোগ করতে পারছে না। জিপ থেকে বেরিয়ে বাশার দৌড়াতে শুরু করেছে। ওর হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল।

ওদিকে ফুটপাথের ওপরে ধস্তাধস্তি আরও বেড়েছে। চারপাশে অল্প লোকজন যারা আছে তারা অবাক হয়ে বোঝার চেষ্টা করছে কী হচ্ছে। বাশার প্রাণপণে দৌড়াতে দৌড়াতে পিস্তলটা উঁচিয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল। 'হল্ট, পুলিশ,' সে চিৎকার করে উঠতেই লোকটা পৃথাকে ছেড়ে দিয়ে ওর দিকে ফিরে তাকাল। পৃথা চূড়ান্ত বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছে, সে নিশ্চিত বুঝতে পারছে না আসলে হচ্ছেটা কী এবং বাশাররাই বা এলো কোথা থেকে। কিন্তু বাশারের মনোযোগ পৃথার দিকে নয়, অন্য লোকটার দিকে। পৃথাকে ছেড়ে দিয়ে সে সোজা হতে শুরু করেছে। 'হাত ওপরে,' বাশার ধমকে উঠে একটু অবাক হয়ে দেখল কালো প্যান্ট, কালো জুতা, কালো কোট পরা এক লোক। তাকে দেখে মনে হলো না সে বাশারকে দেখে খুব একটা অবাক হয়েছে, সে বরং হাসিমুখে তাকিয়ে আছে বাশারের দিকে। বাশার হাত দিয়ে ইশারা করে সোহেলকে বলে উঠল, 'তুই এই ব্যাটাকে আটকা,' বলে সে লোকটার দিকে ফিরে দেখল সে এখনও হাসছে। কিন্তু তার অবাক হবার পালা বাকি ছিল। ভীষণ অবাক হয়ে সে শুনতে পেল লোকটা তার নাম ধরে ডেকে উঠল, 'মিস্টার আহমেদ বাশার,' সে এখনও ঠিক আগের মতোই হাসছে। 'নাকি আমার বলা উচিত, ইন্সপেক্টর আহমেদ বাশার?'

'হচ্ছেটা কি, আপনারা এখানে কীভাবে?' পৃথাকে চূড়ান্ত বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে।

'মিস পৃথা, আপনি যে টেক্সট মেসেজ পেয়েছেন, ওরাই পাঠিয়েছেন আমাদেরকে ফাঁদে ফেলার জন্যে,' বলে সে বাশারের দিকে ফিরে তাকাল, 'তাই না, মিস্টার বাশার?'

'এই চুপ,' বাশার একটু অস্থির হয়ে উঠেছে একই অবস্থা সোহেলেরও। 'সোহেল ব্যাকআপ কল করেছিস?' সে জানতে চাইল।

'বস–'

'উনার টকিটা কাজ করছে না, সেই কালো কোট লোকটা শান্ত সুরে বলে উঠল। লোকটার কথা শুনে কেন জানি বাশারের মনে হলো লোকটা ভারতের, কথার ভেতরে ক্যালকেশিয়ান একটা টান আছে। 'টকিটা কাজ করছে না কারণ এখানে কয়েকশো মিটার রেডিয়াসের ভেতরে জ্যামার লাগানো আছে। দেখুন আপনাদের কারও মোবাইলে টাওয়ার নেই,' লোকটার গলা এখনও একেবারে শান্ত।

'ব্যাপার না, কারণ পিস্তল আমার হাতে,' বাশার পিস্তল উঁচিয়ে তার দিকে দুই কদম এগিয়ে গেল। 'চুপচাপ দুই হাত তুলে সারেন্ডার করো।'

'তা না হয় করবো, কিন্তু তার আগে আপনাকে একবার চারপাশে তাকাতে হবে,' বলে সে ওদের পেছনে ইশারা করল। সাধারণ যুক্তি বলে ওর এখন পেছনে তাকানো উচিত না কিন্তু নিজের কৌতূহল দমন করতে না পেরে বাশার পাশে এবং পেছনে তাকিয়ে ওর মুখ হাঁ হয়ে গেল। ফুটপাথের সেই ছিন্নমূল লোকগুলো, সেই বিড়ির দোকানদার, সেই ভিখিরি সবাই সটান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওদেরকে ঘিরে, সবার হাতে আধুনিক অস্ত্র। আসলে ওরা লোকগুলোকে ফাঁদে ফেলেনি, ওদেরকেই ফাঁদে ফেলেছে ওরা।

'এখন বুঝতে পেরেছেন মিস্টার বাশার, কে কাকে ফাঁদে ফেলেছে?' কালো কোটের মুখে হাসি নেই তবে গলায় একটা তরল ভাব।

হাঁ করা মুখেই সোহেলের আর পৃথার দিকে তাকিয়ে দেখল ওদের দুজনার চেহারাও ওর মতোই সাদা হয়ে গেছে।

পরিস্থিতি একেবারে টান টান কিন্তু লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে খুব একটা ব্যস্ততার ভেতরে আছে। সে বরং বাশারকে দেখে হেসে বলে উঠল, 'ইন্সপেক্টর, তুমি ভেবেছিলে তুমি ফাঁদ পাতছ। আসলে তোমার পাতা ফাঁদে তোমাদেরকে নিয়ে যাবার জন্যে আয়োজন করা ছিল আগে থেকেই। তোমার কি মনে হয় মানুষ এত বোকা, এই মেসেজ দেখে বুঝতে পারবে না এটা একটা ফালতু জিনিস? তবে ধন্যবাদ ম্যাডামকে, এরকম অরক্ষিত অবস্থায় আমাদের কাছ পর্যন্ত আসার জন্যে,' বলে সে একটা হাত নাড়ল। 'এদের ব্যবস্থা করো, আর উনাকে নিয়ে চলো,' বলে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই কালো গাড়িটাকে এগোনোর জন্যে ইশারা করল। গাড়িটা নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে মুহূর্তের জন্যে অত্যন্ত মরিয়া অনুভব করল বাশার। সে বুঝতে পেরেছে এরা যারাই হোক এই কালো কোট এদের নেতা এবং এরা অত্যন্ত শক্তিশালী। সম্ভবত এরা ওদের অনেক আগে থেকেই পুরো এলাকা অ্যাকোয়ার করে ফেলেছিল। বাশার ভরসায় ছিল নিজেদের ওপরে আর ব্যাকআপের ওপরে, কিন্তু ব্যাকআপ ডাকার ব্যবস্থাও যে এভাবে আটকে ফেলা হবে সেটা কে জানত। বাশার নিজের পিস্তল তুলতে গিয়েও নামিয়ে নিলো। এদের হাব-ভাব এতটাই প্রফেশনাল যে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ওরা যে-কেউ উলটা-পালটা কিছু করলেই এরা অ্যাকশনে যাবে এবং এই মুহূর্তে ওদের কাছে পৃথা বাদে আর কেউই গুরুত্বপূর্ণ না। 'শিট,' রাগের সাথে নিজেকেই ধমকে উঠল বাশার।

'বস, কিছু করো,' সোহেল কথাটা বলে উঠতে ও আরেকবার চারপাশে তাকাল বাশার প্রতিটা লোক এমনভাবে অস্ত্র ধরে আছে যেন কিছুই হয়নি, ওরা এমনকি এমন ভাব করছে যে, কেউ পাশ দিয়ে গেলেও ঠিকমতো বুঝতে পারবে না এখানে কী হচ্ছে। চোখের কোনে বাশারের দুটো জিনিস ধরা পড়ল। প্রথমত,

কালো গাড়িটা প্রায় চলে এসেছে এবং ওদের লোকদের ভেতরে অন্তত দুজন বাশারের পাশে একজন আর অন্যজন সোহেলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। দুজনের হাতেই বেরিয়ে এসেছে পিপার স্প্রের মতো দেখতে ছোটো দুটো ক্যান। বাশার বুঝতে পারল কী হতে যাচ্ছে, এরা ওদের গায়ে হাত তুলবে না, ওদেরকে অজ্ঞান করে জাস্ট পৃথাকে নিয়ে সরে পড়বে।

বাশার লোকদুটো থেকে এগিয়ে পৃথার দিকে তাকাল। মেয়েটা সোজা ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। তার চোখে যেন আগুন জ্বলছে, পারলে বাশার আর সোহেলকে ভস্ম করে দেয়। বাশার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই পৃথার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা তাকে ধরে ফেলল। গাড়িটাও প্রায় চলে এসেছে, ওটা কাছে এসে থেমে যেতেই দরজাটা খুলে যেতে লাগল নিঃশব্দে। হঠাৎ জোরে কোথাও হর্ন বেজে উঠল সেই সাথে একজোড়া হেডলাইটের আলো যেন এসে বাড়ি মারল ওদের সবার চোখে। সাথে সাথে চোখ কুঁচকে ফেলল বাশার। কিন্তু ওরা কেউই সচেতন হবার আগেই ঝড়ের বেগে একটা জিপের মতো গাড়ি ধেয়ে এলো ওদের সবার দিকে।

জিপটা সোজা ধেয়ে এসে বাড়ি মারল কালো গাড়িটার পেছনে। ওটা ফুটপাথের কাছাকাছি থেমে যাচ্ছিল তার আগেই তীব্র বাড়ি খেয়ে গাড়িটার গতি বেড়ে গেল আচমকা, ওটার একটা পাশ উঠে পড়ল ফুটপাথের ওপরে, আর কোনাটা সোজা বাড়ি মারল সেই কালো কোটের গায়ে। কালো কোট দাঁড়িয়েছিল পৃথা আর তাকে ধরে থাকা লোকটার একেবারে সামনে। সে গিয়ে পড়ল ওদের দুজনার ওপরে। তিনজনেই গড়িয়ে পড়ে গেল ফুটপাথের ওপরে।

বাশার দেখল এই সুযোগ সে নিজের পিস্তল তুলে ওর পাশের লোকটার স্প্রে ধরা হাতে বাড়ি মারতেই লোকটার হাত থেকে স্প্রে ক্যানটা ছিটকে চলে গেল সোহেলের পায়ের কাছে, সোহেলের পেছনের লোকটা হতবিহ্বল হয়ে দেখছিল কী ঘটছে। সোহেল চট করে নিচু হয়ে ওর পাশের লোকটার মুখে স্প্রে করে দিলো আর বাশারের সাথে লোকটা হাতে বাড়ি খেয়ে একদিকে কাত হয়ে গেছিল, বাশার সোজা লাথি মেরে তাকে ফেলে দিয়ে ফুটপাথের দিকে ড্রাইভ দিলো। একটা গড়ান দিয়ে সোজা হয়েই সে মাটিতে পড়ে থাকা পৃথাকে সোজা করে ফেলল। ওরা জিপের দিকে এগোবে কিন্তু তার আগে সেই জিপটা তীব্র ব্রেকের সাথে থেমে গেল ওদের পাশে।

জিপের ভেতর থেকে কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'জলদি জলদি,' বাশার দেখল এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। সে প্রথমে পৃথাকে ঠেলে জিপের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো তারপর নিজেও লাফিয়ে পড়ল জিপের পেছনের সিটে। 'আমার আরেক সঙ্গী,' কথাটা বলেই সে জিপের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে

দেখল সোহেল দৌড়ে আসছে, কিন্তু তার ঠিক পেছনেই সোজা হতে শুরু করেছে একজন। বাশার সোহেলের পেছন দিকে ফাঁকা ফায়ার করল দুই রাউন্ড, সেই সাথে জিপটাও ঘুরতে শুরু করেছে ড্রাইভিং সিটের পাশের দরজাটা মেলে ধরতেই তাতে লাফিয় চড়ে বসল সোহেল। জিপওয়ালা সাঁই সাঁই করে স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে উঠে এলো মূল রাস্তায়।

***

কালো কোট ফুটপাথ থেকে এমনভাবে উঠে দাঁড়াল যেন কোনো পার্টিতে প্রবেশ করতে গিয়ে হঠাৎ সামান্য হোঁচট খেয়েছে সে। উঠেই সে আগে ধুলো ঝাড়তে লাগল কোটের। তারপর সটান সোজা হয়ে গাড়িটাকে ঠিক অবস্থানে আনতে থাকা ড্রাইভারকে ইশারা করল। ড্রাইভার গাড়িটাকে স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করছে, সেসময় সে দরজা খুলে পাশের সিটে উঠে বসল। তারপর গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করে গার্ডদের একজনকে বলে উঠল, 'এক মিনিটের ভেতরে সবাই সরে পড়ো।' ছদ্মবেশে থাকা বিড়িওয়ালা, ফকির আর বাকিরা মুহূর্তের ভেতরে আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেল। মনে মনে খুশি হয়ে উঠল সে, এই কারণেই সে নিজের প্রতিষ্ঠান এবং লোকদেরকে ভালোবাসে। এরা সেরাদের সেরা, সর্বোচ্চ লেভেলের প্রফেশনাল।

এখানে যা ঘটেছে তা কেউই টের পাবার আগেই ওরা সরে পড়তে পারবে।

'কী ব্যাপার, স্টার্ট হচ্ছে না কেন?' একটু বিরক্তই হলো সে ড্রাইভারের ওপরে।

তবে সে কথাটা বলে শেষ করার আগেই গাড়িটা স্টার্ট হয়ে গেল দেখে খুশি হয়ে উঠল। ড্রাইভার গাড়িটাকে ফুটপাথের ওপর থেকে নামিয়ে কোনোরকম তাড়াহুড়ো না করে স্বাভাবিক গতিতে এগোতে শুরু করতেই সে আরেকবার দেখে নিলো পুরো রাস্তা একেবারে স্বাভাবিক। স্প্রের শিকার অজ্ঞান লোকটাকে সরানো হয়েছে, বাকিরা যার যার জায়গাও মোটামুটি গুটিয়ে ফেলেছে। জ্যামারটাও ওরাই সরিয়ে ফেলবে।

সে পকেট থেকে মোবাইল বের করে দিয়ে রিপোর্ট করল সব বিস্তারিত। সব শেষে বলে উঠল, 'আমাদের একজন আহত হলেও নাটকটা ঠিক যেভাবে সাজিয়েছিলাম এবং যে-উদ্দেশ্যে সাজিয়েছিলাম সেটা পুরোপুরি সফল হয়েছে, স্যার। সবকিছুই আমাদের মুঠোর ভেতরেই আছে, স্যার।' বলে সে ওপাশের কথা শুনলো নীরবে তারপর ফোন রেখে দিলো।

'স্যার, আপনি একটা জিনিয়াস,' তার পাশের ড্রাইভার ছেলেটা বলে উঠল। কথাটা শুনে কালো কোটের খুশি হবার কথা ছিল। কিন্তু সে হলো না। কারণ সে

জানে সে প্রতিভাবান। তার কাজ এবং পরিকল্পনা কোনোটাই কখনোই ব্যর্থ হয় না। আজ রাতেও হয়নি, ঝুঁকি ছিল অনেক বেশি, কিন্তু কাজ হয়েছে, বলে সে নিজের মোবাইলে একটা অ্যাপ ওপেন করল। সেটাতে ব্লিঙ্ক করতে থাকা বিন্দুটা পরিষ্কার জানান দিচ্ছে যার অবস্থান এবং উদ্দেশ্য সে জানতে চায়। প্রশংসায় খুশি না হলেও ডিভাইসটা ঠিকঠাক কাজ করছে দেখে সে খুশি হয়ে উঠল।

***

'উফফফ, কী বাঁচাটা বেঁচে গেলাম,' সোহেল কথাটা বলে উঠলেও কেউ তার কথায় তেমন পাত্তা দিলো না। কিন্তু বাশার বলে উঠল। 'সোহেল, আগে অফিসে রিপোর্ট করো, ফোর্স পাঠাতে বলো। এরপরে–'

'এক মিনিট,' বাশার কথা শেষ করার আগেই সামনের সিট থেকে ড্রাইভার প্রায় ধমকের সুরে কথা বলে উঠল। 'কোনো রিপোর্ট করা যাবে না, তোমাদেরকে বাঁচানো হয়েছে বিশেষ প্রয়োজনে। সেটা যদি পূরণ করতে চাও তবে আমার সাথে আগে ডিলে আসতে হবে। আর আমি কোনো ধরনের পুলিশ বা এরকম কাউকে চাইনা এসবের ভেতরে। যদি কথা না শোনো তাহলে–'

'আপনি কে আগে সেটা বলেন–'

'শাট আপ,' বাশার এটার জন্যেই অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ ধরে। পৃথা চুপ করে আছে কেন এটা তার মাথায় ধরছিল না, মেয়েটার ধমক শুনে এখন সে নিশ্চিন্ত হলো সে ঠিক আছে। বাশারের একটা হাত ধরা ছিল তার কনুই। ঝটকা মেরে সেটা ছাড়িয়ে নিলো সে। 'আগে আপনারা আমাকে কেউ বলবেন হচ্ছেটা কী?' সে একবার বাশারের দিকে দেখছে তারপর সামনের সিটে বসা বাকি দুজনার দিকে। 'ওইখানে আসলে হলোটা কি, আপনারাই বা ওখানে গেলেন কীভাবে আর আমাকে কেন ধরতে চাইছে লোকগুলো?'

সে একটানে কথাগুলো বলে গেল কিন্তু কেউই তার কথার জবাব দিলো না। সে একে একে সবাইকে দেখছে। বাশার তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আমি সবই বলব আপনি আগে বলেন তো এই রাতের বেলা ওই যাত্রী ছাউনির নিচে কী করছিলেন?'

বাশার ভেবেছিল সে খানিকটা নরম হবে কিন্তু হলো উলটোটা, বাশারের কথা শুনে সে বরং আরও জোরে ঝটকা মেরে উঠল। 'কেন, ওই যাত্রী ছাউনি কি কোনো নিষিদ্ধ জায়গা, ওখানে যাওয়াটা কি বেআইনি? আমি রাতে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম।' বাশারের চেয়ে আরও দ্বিগুণ জোরে ধমকে বলে উঠল মেয়েটা।

'ঠিক আছে আপনি যদি এটাই বলেন তাহলে আমি বলব, আমরা ওই এলাকাতে টহলে ছিলাম আপনাকে বিপদে পড়তে দেখে এগিয়ে গেছিলাম সাহায্য করার জন্যে। কেমন লাগছে শুনতে?' বাশার ভ্রু নাচালো। 'ব্যাখ্যা ঠিক আছে তো?'

পৃথা আবারও ফোলা মুরগির মতো ঝাপটা দিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই সামনের সিট থেকে আবারও ড্রাইভার ঝামটা দিয়ে বলে উঠল, 'শাট আপ, সবাই শাট আপ,' বলে সে চট করে হার্ড ব্রেক করে নির্জন রাস্তার একপাশে গাড়ি থামিয়ে ফেলল। তারপর ওদের দিকে ঘুরে তাকাল।

'কুত্তা-বিলাইয়ের মতো ঝগড়া বন্ধ করো,' লোকটা কড়া সুরে ধমকে উঠল ওদেরকে। বাশার চট করে ফিরে তাকাল তার দিকে। লোকটার মাথায় হুডি তুলে দেওয়া, মুখে একটা পাতলা মাস্ক, চেহারা বোঝার কোনো উপায় নেই। ওর একটা হাত পিস্তলের ওপরে। খুব সূক্ষ্মভাবে একবার সোহেলের দিকে ইশারা করল, তারপর লোকটার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আপনি কিন্তু এখনও বলেননি আপনি কে? আর একেবারে ঠিক সময়ে জায়গামতো কীভাবে এলেন, আমাদেরকেই বা চেনেন কীভাবে? আর পুরো ঘটনায় আপনার ভূমিকা কী?' ওপাশ থেকে সোহেল তাকিয়ে আছে তার দিকে, বাশার ধরেই নিলো সে-ও প্রস্তুত আছে পৃথার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে লোকটার দিকে ফিরে তাকাল। মানুষটা কিছু বলতে যাচ্ছিল থামিয়ে দিলো বাশার। 'আপনাকে শক্ত ব্যাখ্যা দিতে হবে, ভুগিচুগি কিছু বললে এখনই অ্যারেস্ট করা হবে, যতই আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে থাকেন না কেন।'

'আপনারা যা যা জানতে চাইলেন তার কোনো ব্যাখ্যাই আমার দিতে হবে না। আমার কোনো ব্যাখ্যাই দিতে হবে না,' মাথা থেকে হুডির হুডটা নামিয়ে দিলো লোকটা। 'আমার চেহারাটাই যথেষ্ঠ,' বলে সে মুখ থেকে মাস্কটাও সরিয়ে ফেলল।

বাশার আর পৃথা তাকিয়ে রইল তার দিকে, ওপাশ থেকে সোহেল তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। দুজনার কেউই কিছু বলছে না দেখে সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানতে চাইল, 'কে?'

বাশার চট করে জবাব দিলো না, বরং পিস্তলের হাতলে ওর হাতটা আরও শক্ত হলো। 'চৌধুরী হাসান শেখ,' বলে একটু থেমে একবার পৃথা আরেকবার সোহেলের দিকে দেখে নিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল লোকটার মুখের ওপরে। 'প্রফেসর ইফতেখারের জেল পালানো সেক্রেটারি।'

লোকটা মৃদু হেসে উঠল, 'একদম ঠিক বলেছেন, ইন্সপেক্টর।'

অধ্যায় সতেরো

সময়: ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ

জল-জঙ্গলের ভেতরে মোঘলদের দখলকৃত এলাকার এক প্রান্তে

'হায় রে, কপাল এমনও দিন আইব কে জানত!' ছোটো গোল দেখতে চারা গাছটার গা থেকে ছুরি দিয়ে ছোটো ছোটো শাখা ডালপাতা ছাঁটতে ছাঁটতে কথাটা বলে উঠল ধোবল। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নুক্কুনের দিকে। নুক্কুন নিজেও লাঠি বানানোর জন্যে আরেকটা চারা গাছ বাছতে ব্যস্ত। ধোবল তার দিকে তাকাতেই দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলের ভেতর থেকে তাকিয়ে সে একটা সরল হাসি দিলো। 'পাগলটারে আমি কী বলি, আর এই ব্যাটা দেখি খালি হাসে!' লাঠিটা বানানো শেষ করে সে ওটাকে শূন্যে দুইবার পাক খাওয়ালো। 'মনে অইতাছ তো কাম অইব, কী মনে অয়?' এবার সে প্রশ্নটা উচ্চারণ করেছে বরখাকে উদ্দেশ্য করে।

বরখা নিজেও একই ধরনের আরেকটা লাঠি পরীক্ষা করতে ব্যস্ত। 'শোন, কাজ চললেই অইব। একবার মোঘলগোর ওইখানে হানা দিতে পারলে আর চিন্তা নাই, ওইখান থেইকা জরুরি সব জিনিস চুরি করতে পারবো আমরা।'

'একদম ঠিক কথা বলছোস,' লাঠিটা পরীক্ষা করা শেষ করে ওটাকে মাটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সে বরখার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। 'কারণ, হয় জরুরি জিনিস পাইয়া যাব আর যদি ধরা পইড়া যাই তয় জীবনে আর কোনো জিনিসের দরকারই পড়ব না,' বলে সে বরখার উদ্দেশ্যে মুখ ভেঙচে দিয়ে চরের বালির ওপরে বসে থাকা মাসুমের দিকে দেখাল। 'হেয় কী করে?'

ধোবলের ইশরা পেয়ে সেদিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বরখা কথা বলে উঠল। 'কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করতাছে মনে অয়,' মাসুম বালিতে কাঠি দিয়ে কিছু একটা এঁকেছে একটু আগে। তারপর সেটা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেছে নুক্কুনের সাথে, তারপর নুক্কুনকে লাঠি তৈরি করতে বলে সে আবারও লেগে গেছে নিজের বোঝাপড়া নিয়ে। 'আমরা আমগো কাম করি। ওরে মতন থাকতে দেই,'

বলে বরখা নিজের লাঠিটা পরীক্ষা শেষ করে নুক্কুনের দিকে তাকাল। 'কিরে তোর অইছে?' নুক্কুন কাজ চলার মতো একটা লাঠি বানিয়ে নিয়েছে ছোটো একটা গাছের কাণ্ড দিয়ে। লাঠির কাজ শেষ হতেই বরখা চোখ তুলে তাকাল আকাশের দিকে। 'বৃষ্টি আইব নাকি?' একে তো সন্ধের অন্ধকার নেমে এসেছে তার ওপরে আকাশে জমতে থাকা কালো মেঘ দিনকে আরও অন্ধকার করে তুলেছে। 'মনে অইতাছে ওস্তাদ আইজ রাতে ঝড়ও অইতে পারে।'

ওরা এই মুহূর্তে অবস্থান করছে ছোটো একটা দীপের মতো জায়গার এক প্রান্তে। ওরা দুপুরের পর দিকে মাসুমের মুখে যখন শুনতে পায় মাসুম মোঘলদের আস্তানায় হানা দেওয়ার কথা চিন্তা করছে, প্রথমে সবাই খুব হয়রান হয়ে ওঠে। তারপর মাসুম বিয়ষটা বুঝিয়ে বলে ওদেরকে। প্রথমত, ওদের রসদ প্রয়োজন; দ্বিতীয়ত, ওদের তথ্য প্রয়াজন; তৃতীয়ত, ওদের প্রয়োজন নির্দেশনা। কাজেই এই তিনটে জিনিস একসাথে পেতে হলে মোঘলদের আস্তানাই সেরা জায়গা এবং ওরা এখন যে-অবস্থায় আছে সেটাতে সফল হতে হলে ওদেরকে ঝুঁকি নিতেই হবে। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এরপরের সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন যেটা আসে সেটা হলো ওরা কোনো জায়গায় এবং কীভাবে হানা দিবে।

মাসুম ওর সাথে নিয়ে আসা কাপড়ের মানচিত্রটা নিয়ে বসে নুক্কুনের সাথে বিস্তারিত আলাপ করে। যে মানচিত্রটা সে রসুল খাঁর ছেলে বাসিমের কাছ থেকে নিয়ে এসেছে সেটার একটা আলাদা বিশেষত্ব হলো: মানচিত্রটাতে জঙ্গলমহালের আগের দখলদার আসলাম শেঠের বাহিনীর অবস্থান পরিষ্কার করে নির্দেশ করা আছে। জোরদার সম্ভাবনা হলো মোঘলরা জঙ্গলমহাল দখল করার পর প্রথম এইসব ঘাঁটিগুলোর দখল নিয়েছে, কাজেই চেষ্টা করলে এগুলোর একটার অবস্থান বের করে সেখানে হানা দেওয়া সম্ভব।

'প্রশ্ন অইল কোনোডাতে আমরা হানা দিব?' বরখা ভ্রু নাচিয়ে জানতে চায়।

মাসুম মনোযোগের সাথে মানচিত্রটা দেখতে দেখতে একটা জায়গায় আঙুল রাখে, তারপর চোখ তুলে নুক্কুনের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, 'চেন?'

নুক্কুন মানচিত্রটার দিকে তাকিয়ে থেকে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে পর্যবেক্ষণ করে তারপর নিজের আঙুল কামরাতে কামরাতে জবাব দেয়, 'হুজুর, এইটাই সবচেয়ে ভালো অইব, কারণ এইটা জঙ্গলমহাল থেইকা অনেক দূরে।'

'তারচেয়ে বড়ো কথা এইটা ঠিক একটা আস্তানা না,' বলে সে বাকিদের দিকে তাকিয়ে একবার ভ্রু নাচিয়ে যোগ করল। 'জায়গাটা এইখান থেইকা কতদূরে, আর কেমন?'

'হুজুর, জায়গা একেবারে কাছে না আবার খুব বেশি দূরেও না। এই নাওটা ভালোই আছে। আমরা যদি তিনজনে টানা বৈঠা চালাই আধাবেলার ভিতরে পৌঁছানি সম্ভব।'

'মানে এখন দুপুর অইলে সইন্ধ্যার ভিতরে পৌঁছানো সম্ভব। ভালো, আজ জায়গাটা কেমন কও দেখি।'

'হুজুর,' বলে সে মানচিত্রের ওই জায়গাতে আবারও হাত রাখল। 'আপনের যেই জায়গাটা ঠিক করছেন ওইটা জঙ্গলমহাল থেইকা রওনা দিয়ে বাউয়া বিল হয়া বমার নদীতে পড়ব। বমার থেইকা মাইল আষ্টেক গেলে পরে বিরাট একটা ফসলি হাওড় আর বমার নদীর মাঝামাঝি একটা গেরামের মতন, ওইখানে সারা বছর কেউই থাকে না। বিশেষ কইরা এই সময়ে কেউই থাকে না। বছরে দুইবার কইরা বাহির গাও থেকে চাষীরা আহে, হাওড় শুকায়া গেলে সেইহানে ধান চাষ করে। আর বাকি সময় খালিই পইড়া থাকে। আপনে যেহেতু জাহাজের কথা কইলেন জোর সম্ভাবনা ওইটা একটা ঘাটের মতন। ওইখানে জাহাজ ভিড়ানি আছে। আগে আসলাম শেঠের লোকেরা ওই এলাকা নিয়ন্ত্রণ করত ওইখান থেইকা। এই জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর পরেই বমার নদী শুরু অই গেছে আর ওইখান থেইকা। মেঘালয়ের একটা যাতায়াতের জায়গা সরাসরি যুক্ত। কিন্তু ওই এলাকাতে অনেক ডাকাইতের উৎপাত আছে। বিশেষ কইরা বিশা নামে এক ডাকাইতের দল ওই এলাকা নিয়ন্ত্রণ করত এক সময়। আসলাম শেঠের লগে হেগো বহুবার গন্ডগোল লাগছিল। এহন কি অবস্থা জানি না।'

'বুঝতে পারছি,' মাসুম দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বড়ো করে দম নিলো একবার। কিন্তু ওইখানে হানা দেওয়ার আগে আমগো বেশ কিছু কাম করতে অইব। প্রথমত, আমগো খাবারের ব্যবস্থা করতে অইব, কারণ পুরা দিনই পইরা আছে। কিন্তু কোনো খাওন নাই।'

'হুজুর, এইটার ব্যবস্থা আমি করতে পারবো। আশপাশে অনেক মাছুয়াগো গেরাম আছে।'

'মোটেই না, কোনো জায়গায় আমরা চেহারা দেখাইতে পারবো না,' মাসুম জোর গলায় মানা করে উঠল। 'জঙ্গল থেইকা ফলটল পাইলে খাইয়া কাম চালাইতে অইব চেহারা দেখাইলেই বিপদ। একদিকে মোঘলরা, অন্যদিকে গেড়ুয়ার লোকেরা কোনো জায়গায় আছে আমরা জানি না। কাজেই কোনো ঝুঁকিতে যাওন যাইব না। এরপরে লগে হালকা পাতলা কিছু অস্ত্র, আমগো খালি তিনটা,' বলে সে নিজেকে

শুধরে নিলো। 'দুইটা ছুরি আছে। আর কিছু না অইলে অন্তত কিছু লাঠি বানায়া নিতে অইব। আর দ্রুত যাইতে হবে, চল কামে লাগি।'

মাসুমের নির্দেশনা অনুযায়ী ওরা সবাই কাছের জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ে যে যা পারে টুকটাক কিছু ফলমূল নিয়ে আসে। নুক্কুন পাখির বাসা থেকে কিছু ডিমও নিয়ে আসে। সেগুলোই খেতে হয়েছে। মাছ ধরার চেষ্টা করেনি, কারণ একে তো ধরার মতো কিছু নাই, তার ওপরে ধরলেও কাঁচা খেতে হবে, কাজেই সেই চেষ্টা না করে ওরা দ্রুত রওনা দিয়ে দিয়েছে খাওয়া শেষ করে। নুক্কুনের অনুমান ভুল প্রমাণিত করে ওদের প্রায় ছয় ঘণ্টার মতো লেগেছে সেই দ্বীপের মতো গ্রাম, যেখানে মোঘলদের পাহারা আছে বলে ধারণা করছে সেটার অন্য প্রান্তে পৌঁছাতে। আগের জঙ্গলে দেরি হয়ে যাবে বলে সেখানে লাঠি বানানোর জন্যো আলাদা কোনো সময় নেয়নি ওরা। আর তাই এখানে এসে নামার পর ওরা কয়েকটা লাঠি বানিয়ে নিয়েছে।

'ঝড় হইলে হবে, কিন্তু আমগো থামার উপায় নাই, জলদি করো,' মাসুমের তাগাদা শুনে ওরা জলদি রওনা দিলো দ্বীপের অপর প্রান্তের দিকে।

'নুক্কুন, তুমি আগে যাও,' বলে নুক্কুনকে আগে যেতে দিয়ে ওরা তিনজন ওকে অনুসরণ করতে শুরু করল। আকাশে মেঘের ডাক আরও বেড়েছে, যেকোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে বলে মনে হচ্ছে ওদের কাছে।

'সামনেই গেরামডা,' আধ মাইলের মতো এগোতেই নুক্কুন অনেকটা ঘোষণার মতো করে বলে উঠল। 'বছরের এই সময় খালিই থাহুনের কতা।'

'সবাই সাবধান, খালি না লোক আছে আমরা জানি না,' মাসুম মৃদুস্বরে সাবধান করে দিলো সবাইকে। আর তাছাড়া মোঘলরাও এই ঝড় বৃষ্টির রাতে আস্তানা নিতে গ্রামের কোনো বাড়িতে।'

'মনে অয় না, ওস্তাদ। কারণ এইগুলা ওগো থাকার মতন ভালো কোনো বাড়িঘর না,' ওরা আরেকটু এগোতেই সারি সারি ঝুপড়ি দেখতে পেল। দেখলেই বোঝা যায় নির্দিষ্ট প্রয়োজনের সময় বাদে এগুলোতে সারা বছর কেউই থাকে না। এমনকি এগুলো আসলে সেভাবে থাকার মতোও নয়।

ওরা সারি সারি ঝুপড়িগুলো পার হতে হতে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। এমনিতে শোঁ শোঁ বাতাস বৃষ্টি আর অন্ধকারের ভেতরে পথচলাকে করে তুলল আরও কঠিন। 'ওই যে, ওস্তাদ,' নুক্কুন না বললেও চলত। কারণ এই অন্ধকারের ভেতরে সারি সারি ঝুপড়িগুলো পার হতেই দ্বীপের একমাত্র আলো আছে এমন জায়গাটা খুব ভালোভাবেই চোখে পড়ে। সেই স্বল্প আলোতে ওরা দেখতে পেল,

দ্বীপের অন্যপাশে একটা ঘাটের মতো। কাঠের বানানো ঘাটটা চলে গেছে বেশ গভীর পানি পর্যন্ত, আর সেখানে বড়ো একটা বিশ-পঁচিশ হাতি জালিয়া নৌকা বাঁধা। ঘাটের আশপাশে ছোটো ছোটো কয়টা ছাউনির মতো আছে। সেগুলোর ভেতরেই বাতি জ্বলছে কিন্তু কোনো মানুষ দেখা গেল না।

'মাসুম, আমরা কি জাহাজে উঠব?'

মাসুম বৃষ্টির ভেতরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঘাটের দিকে। 'প্রথমে আমরা ছাউনিগুলা দেখব। মনে রাখবা দুইটা উদ্দেশ্য, অস্ত্র আর খাবার আর পারলে খবর,' বলে সে হাসল।

'তাইলে তো–'

মাসুম মুখের সামনে আঙুল তুলে ধোবলকে থামিয়ে দিলো। 'শশ, ছাউনিতে কিছু নাই। জাহাজেই যাইতে অইব, উপায় নাই। চল।'

ওরা সন্তর্পণে এগিয়ে ছাউনির কাছাকাছি চলে এলো। ওগুলোর কাছাকাছি গিয়ে দুইজন বাইরে পাহারায় রইল আর বাকিরা ওগুলোর ভেতরটা পরীক্ষা করল। কিন্তু শুধু দুচারটে বাতি বাদে আর কিছুই পেল না।

মাসুম ফিরে তাকাল জাহাজের দিকে। 'যারাই আছে জাহাজেই আছে, এইখানে ঠিক যেমনে দুইজন দুইজন কইরা গেছিলাম ওইখানেও তাই করব। আমি ধোবল আর নুক্কুন জাহাজে উঠব। বরখা তুই বাইরে পাহারায় থাকবি।'

ওরা খুব সাবধানে পায়ে পায়ে এগোল জালিয়াটার দিকে। ওটার কাছাকাছি পৌঁছে ঘাট থেকে পানিতে নেমে পড়ল। শুধু ঘাটের নিচে রয়ে গেল বরখা। কারণ কেউ পাহারায় থাকলে ওদিকেই দেখতে পাবে। ওরা পানিতে নেমে সাঁতরে চলে এলো জালিয়াটার অন্যপাশে সেখান থেকে নোঙরের দড়ি বেয়ে তিনজনে একে একে উঠে এলো জাহাজের ওপরে। বৃষ্টির বেগ বাড়তে শুরু করেছে। জালিয়াটার পাটাতনের ওপরে কেউই নেই শুধু একটা বাতি জ্বলছে। সেটার আলোতে চারপাশে কাউকে দেখতে পেলনা ওরা। এমনকি ভেতর থেকেও কোনো শব্দ ভেসে আসছে না।

'ঘটনা কী?' ধোবল খুব অবাক হয়ে বলে উঠল।

'মনে অয় বৃষ্টির কারণে সবাই ভিতরে। খুব সাবধানে,' মাসুম এগিয়ে গেল। ওরা দুজন পাহারায় রইল। এক হাতে ছুরি চেপে ধরে আরেক হাতে লাঠি নিয়ে জালিয়ার খোলের ভেতরে ঢুকে চট করে একপাশে সরে গেল ও। ভেতরটা খালি। এখানেও একটা বাতি জ্বলছে, মাসুম ওদেরকে ভেতরে ঢোকার জন্যে ইশারা

করল। পুরো জাহাজ খালি, চারপাশে উঁকি দিয়ে খাবার দাবার পড়ে থাকতে দেখল, 'ঘটনা কি, ওস্তাদ? জাহাজে তো কেউই নাই–'

খট করে উড়ে এসে কিছু একটা লাগল কাঠের দেওয়ালে। মাসুম তাকিয়ে দেখল একটা তির।

'সাবধান,' বলেই ও মাথা নিচু করে দৌড় দিলো দরজার দিকে। মাসুমও দরজার কাছে পৌঁছে গেছে এক শক্তিশালী ধাক্কায় খুলে গেল ওটা। আর দরজার ধাক্কায় ভেতরে ছিটকে পড়ল ও। একেবারে ধোবল আর নুক্কুনের গায়ের ওপরে, হাত থেকে ছুটে গেল লাঠি। কিন্তু পড়ে গিয়েই উঠে দাঁড়াল ও। হাতে বেরিয়ে এসেছে ছুরি, ওর দুপাশে উঠে দাঁড়াল নুক্কুন আর ধোবল। বিশেষ করে ধোবল একেবারে অবস্থানে চলে গেছে। কারণ ও জানে এখন কীভাবে আক্রমণ ঠেকাতে হবে।

কিন্তু খোলা দরজা দিয়ে যে ভেতরে ঢুকল তাকে দেখে থেমে গেল ওরা দুজন। দুই কাঁধ ঝুলে পড়েছে, মুখে বোকা ভাব নিয়ে ভেতরে ঢুকল বরখা। 'দুঃখিত, মাসুম, আমি কিছু টের পাবার আগেই ওরা–'

সে কথা শেষ করার অগেই দুইপাশে দুই জন করে চারজন মোঘল সৈনিক ভেতরে ঢুকল। তাদের ঠিক পেছনেই দলের সেনাপতি। মুখে লাল দাড়িওয়ালা মধ্যবয়স্ক সেনাপতি ভেতরে ঢুকেই ওদের দিকে তাকিয়ে টিটকিরির হাসি দিলো, সে তার সৈনিকদের দেখিয়ে বলে উঠল, 'দেহো অবস্থা, এই মরার লাডি নিয়া ওরা আমগোরে আক্রমণ করতে আসছে,' কথাটা করতেই তার সৈনিকেরাও হেসে উঠল।

ধোবল আর নুক্কুন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে অসহায় একটা ভাব করল। ওরা হানা দেয়নি মোঘলদের জালিয়াতে, মোঘলরাই ফাঁদ পেতে রেখেছিল আর তাতে বোকার মতো এসে ধরা পড়েছে ওরা।

***

যজ্ঞের আগুনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। খুব কাছ থেকে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকাটা খুব সুখকর কোনো কাজ না। কিন্তু এই কাজটা করে সে বেশ সুখ পায়, শুধু সুখ পায় বললে ভুল হবে এটা বাদেও আরও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে সে নিজেকে পীড়নের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে পারলে কেন জানি অদ্ভুত আর বিচিত্র এক আনন্দ লাভ করে। মানুষটা এমনিতে সে খুব একটা গরম

মাথার নয়, আসলে উলটোটা। মানুষটা খুবই ঠান্ডা মাথার, বলতে গেলে পাথরের মতো শীতল ধরনের। এমন ধরনের শীতল একজন মানুষ যে বলতে গেলে কোনো কিছুতেই উত্তেজনা বোধ করে না, শুধুমাত্র দুটো বিষয় বাদে। এক, নিজেকে পীড়নের মধ্যে সে কেন জানি অদ্ভুত বিচিত্র আর বিকৃত আনন্দ লাভ করে, সেই সাথে তীব্র উত্তেজনাও।

দুই, দেবীর আরাধনা। তার পৃথিবীর বলতে গেলে প্রায় পুরোটাই বরাদ্দ তার নিজের গোত্রের মানুষ আর তার দেবীর জন্যে। এই কারণে সচেতন হবার পর থেকে যখনই সে তাদের একজন হয়েছে দেবীর আরাধনা করতে শিখেছে, মানুষ শিকার করতে শিখেছে তখন থেকেই সে নিজেকে এই দুটো বিষয়ের এক অদ্ভুত সমন্বয়ে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে প্রতিটা মুহূর্ত।

কথায় বলে মানুষের জীবনে নাকি দুটো মুহূর্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেই মুহূর্তে সে জন্ম নেয়, আর যেই মুহূর্তে সে অনুধাবন করতে পারে তার জন্ম নেওয়ার উদ্দেশ্য। আর গেড়ুয়ার জন্যে সেই মুহূর্তটা ছিল যেদিন সে অনুধাবন করতে পারে বাকি জীবন সে দেবীর আরাধনা আর নিজের গোত্রের মানুষের কল্যাণের জন্যে কাজ করে যেতে চায়। সেদিনই সে নিয়ত করেছিল এই দুটোর জন্যে সে প্রয়োজনে যেকোনো কিছু করতে রাজি, এমনকি এই দুটো লক্ষ্যের সামনে তার নিজের জীবনও কিছুই না। সেদিন থেকে সে নিজের ভেতরের দুটো সত্তাকে এক করার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করে গেছে একনাগাড়ে। দুটো সত্তার প্রথমটা হলো নিজেকে পীড়নের মাধ্যমে উত্তেজিত হওয়া, আর দ্বিতীয়টা হলো দেবীর জন্যে আরাধনা। দুটো একসাথে করে সে সবসময় দেবীর আরাধনা করার জন্যে নিজেকে পীড়নের মধ্যে দিয়ে সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি লাভ করে।

একে তো পাঙ্গুরা নিজেরাই বিচিত্র এক জাতি, তার ওপরে গেড়ুয়া যে-দলের প্রধান সেই দলটা আবার পাঙ্গুদের ভেতরেও সবচেয়ে পুরনো আর গোড়া মতাদর্শ অনুসরণ করে এমন দলগুলোর ভেতরে একটা। তার এতটাই রক্ষণশীল যে তাদের রক্ষণশীলতার কারণে এমনকি তাদের অনেক জ্ঞাতি ভাই তুসুমবাজ, ভাগিনারাও তাদেরকে ভয় পায়, এড়িয়ে চলে। কিন্তু তাতে গেড়ুয়ার কিছু আসে যায় না, নিজের দল আর নিজের আরাধনাকে সে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে যেতে চায় এবং সে পারবে বলে বিশ্বাস করে।

পাঙ্গুদের নির্দিষ্ট কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই, তারা কখনও বিয়ে করে না। তাদের সমাজে এমনকি যৌনসঙ্গম করাটাও অনেকটা নিষিদ্ধের মতোই। তবে হ্যাঁ তাদেরও বিয়ে করে স্থায়ী হবার সুযোগ আছে, তবে সেটা সবক্ষেত্রে নয়, সবার

জন্যেও নয়। পাঙ্গুদের জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটে পানির ওপরে। তাদের সবারই নিজেদের দল আছে, কখনও দলগতভাবে আবার কখনও নিজেদের মতো করে তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছদ্মবেশ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানুষের সাথে মিশে যায়। কখনও যাত্রীর ছদ্মবেশে, কখনও মাঝিমাল্লার ছদ্মবেশে, কখনও জেলে, কখনও খালাসি। তারা সারা বছর ভ্রমণের ওপরে। তবে সবসময় শিকার করে না। তাদের শিকারের খুবই শক্ত নিয়মকানুন আছে, আর সেগুলো পুরোপুরি পালন না হলে দেবীর পরিষ্কার ইশারা না পেলে তারা শিকারে নামবে না কখনোই।

তারা সবাই জলদেবীর পূজা করে। পূজার জন্যেও রয়েছে নির্দিষ্ট স্থান এবং নির্দিষ্ট উপায়। রয়েছে দেবী নির্মাণের উপায় থেকে শুরু করে বিসর্জন পর্যন্ত সবক্ষেত্রেই বিশেষ পন্থা। পাঙ্গুরা দলগতভাবে পথ চলে। তারা যখন ডাঙা থেকে পানিতে নামে, তখন তারা তাদের সম্ভাব্য অঞ্চলগুলোতে আগে নিজেরা চষে বেড়িয়ে পুরোপুরিভাবে খুব ভালো ধারণা করে নেয়। ধরে নেওয়া যাক তারা আগামী কয়েকমাস কুশিয়ারা নদীর এক এলাকা থেকে আরেক এলাকাতে ভ্রমণ করবে, এরজন্যে তারা আগে নিজেরা দলগতভাবে প্রতিটা ঘাট, প্রতিটা অঞ্চল আগে নিজেরা চষে বেড়িয়ে খুব ভালোভাবে ধারণা করে নিবে এবং এসব পথে কারা চলাচল করে, কোনো দিনগুলোতে হাট বসে, কোনো ব্যবসায়ীর কাছে কেমন টাকা থাকবে–এসব খবর তারা আগেভাবেই বের করে ফেলবে। তারপর প্রতিটা সম্ভাব্য শিকারের জায়গা থেকে তারা দুটো জিনিস সংগ্রহ করবে, এক সেই পানিতে ডুব দিয়ে যদি সম্ভব হয় জলধারার তলদেশ থেকে এঁটেল মাটি আর সেটা সম্ভব না হলে অন্তত এর কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে তারা তুলে আনবে পলিমাটি। পলি বা এঁটেল ছাড়া কাজ হবে না। সেই সাথে সেই জলের বিশেষ এক ধরনের জলজ আগাছা। এগুলো সংগ্রহের পর প্রস্তুতি চলবে দুই ধাপে। একদিকে এঁটেল মাটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় জলে ভিজিয়ে সেটাকে আর্দ্র করে রাখা হবে, অন্যদিকে আবার আগাছাগুলোকেও রোদে শুকিয়ে করে তোলা হবে খরখরে। এরপর দুটোকে একসাথে মিলিয়ে তারা নির্মাণ করবে নিজেদের প্রতীক দেবী-মূর্তি। বানানোর পর সেই মূর্তিকে মাদী শূকর অথবা পাঠার রক্ত দিয়ে রঙিন করে তাতে চড়ানো হবে পাট ও নলখাড়া দিয় তৈরি বিশেষ বস্ত্র। বস্ত্রধারণের পর পুরো দল মিলে পিতরাজের তেল দিয়ে বানানো বিশেষ প্রদীপ দেবীর পাদদেশে অর্পণ করবে। তিনদিন যাবৎ শুকনো শালুক ফুল, পীতরাজের তেলের প্রদীপ দিয়ে পূজা চলবে। এই তিনদিনে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলবে। সেটা হলো একটা বৈঠা নির্মাণ। বিশেষ এক

ধরনের কড়ুই কাঠ দিয়ে বানানো হবে এই বৈঠা। বানানোর পর এই বৈধী দেবীর পায়ের কাছে অর্পণ করে তারা মাছ শিকারে নামবে। পানি আর শুকনো ফল ছাড়া আর কিছু খাওয়া বারণ এই কয়দিন। তিনদিনের পূজা সম্পন্ন হবার পর তৃতীয় দিনের শেষ প্রহরে সূর্য উদয়ের আগে তারা পানিতে নামবে মাছ মারতে। যদি সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ার আগে অন্তত পাঁচ সের ওজনের একটা মাছ ধরা না পড়ে, তবে বুঝতে হবে দেবী সন্তুষ্ট হননি। তাহলে আবার চলবে পূজা আবার মাছ মারার প্রচেষ্টা। চলতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত দেবীর ইশারা না পায় তারা। আর যদি পেয়ে যায় তবে সেই মাছ দেবীর পায়ের কাছে অর্পণ করার পর, দেবী মূর্তিতে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হবে। সেই ছাই ভাসিয়ে দেওয়া হবে পানিতে। দেবী বিসর্জনের পর তাদের ভোজ চলবে মাছের ঝোল আর ভাত দিয়ে।

এরপর তারা দলগতভাবে সুবিধামতো ছদ্মবেশ নিয়ে শিকারে নামবে। শিকারের প্রক্রিয়া এবং প্রস্তুতি আগে থেকেই সম্পন্ন করা থাকে। তারা স্রেফ নিজেদের প্রয়োজনমতো ছদ্মবেশ নিয়ে সঠিক সময়ের অপেক্ষা করবে। দেখা গেল হয়তো তারা কোনো এক ঘাটে কোনো এক বুধবার, মানে ওই এলাকার হাটবারে কোনো এক ব্যবসায়ীকে উদ্দেশ্য করেছে শিকার হিসেবে বেছে নেওয়ার জন্যে। ওইদিন দেখা গেল ওই হাটবার শেষে ব্যবসায়ী তার সঙ্গী সাথীদের দিয়ে যাত্রীবাহী নৌকায় এসে উঠল, তাদের সাথে হয়তো ব্যাবসার টাকা আছে। নৌকা মাঝ নদীতে যেতে যেতে হঠাৎ দেখা গেল মাঝি নৌকার গতি কমিয়ে এনেছে, এমন সময় হয়তো নদীতে কোনো একটা মাছ ঘাই মারল, কিংবা মাছরাঙা একটা মাছ শিকার করল, এমন সময় হঠাৎ যাত্রীদের কেউ একজন বৈঠা তুলে ঠুক ঠুক ঠিক করে তিনবার ঠুকে দিলো নৌকার পাটাতনে, সাথেসাথে মাঝি নৌকা থামিয়ে ফেলবে। শিকার সতর্ক হবার আগেই অবিষ্কার করবে নৌকার নিরীহ যাত্রীরা হঠাৎ সবাই তাদেরকে ঘিরে আক্রমণ চালিয়েছে। কেউ বের করে এনেছে ফাঁস, নৌকার পাটাতন থেকে তুলে নিয়েছে লাঠি, আবার কেউবা চেপে ধরেছে তাদের হাত। আসলে শিকার বাদে নৌকার বাকি সব যাত্রীই ছদ্মবেশী পাঙ্গু।

মাঝ নদীতে কারও পালাবার উপায় নেই। তাদের শিকারকে কাবু করার পন্থা দুইটা। প্রথমে তারা হঠাৎ ঘিরে ফেলে শিকারকে। সাধারণত একটা শিকারের জন্যে তিনজন বরাদ্দ থাকে। একজন চেপে ধরে শিকারের হাত আরেকজন পিঠে বা বুকে পা তুলে দেয়। তৃতীয় জন ফাঁস বা দড়ি পরিয়ে দেয় গলায়। যদি পিঠে পা তুলে দিয়ে থাকে তবে ফাঁস টানা হয় সামনে থেকে। যদি বুকে পা তোলা হয় তবে

ফাঁস টানা হয় পেছন থেকে। এভাবে শিকারকে হত্যার পর, একজন মৃতদেহটা চেপে ধরে নৌকার পাটাতনের ওপরে, অন্যজন গলার নিচে হাত ঢুকিয়ে বিশেষ কায়দায় ভেঙে দেয় শিকারের মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ড এমনভাবে ভাঙা হয় যে এদেরকে পানিতে ফেললেও লাশ আর ভেসে উঠবে না। এরপর পানিতে ফেলে দেয় হয় শিকারকে। আর দেবীর উপহার স্বরূপ করায়ত্ত করা হয় তার সমস্ত মালামাল।

এই পুরো প্রক্রিয়াতে কিছু জিনিস মানা হয় খুব সতর্কতার সাথে। প্রথমত, যদি কোনো মাছরাঙা শিকার না করে, কিংবা পাঙ্গুরা শিকার নিয়ে রওনা দেওয়ার পর কেউই পানিতে কোনো মাছকে ঘাই মারতে না দেখে তারা কোনো অবস্থাতেই শিকার করবে না। এগুলো হলো দেবীর ইশারা, এটা ছাড়া শিকার অসম্ভব। দেখা গেল দীর্ঘদিন প্রস্তুতি নিয়ে কাউকে বাগে আনা হলো, কিন্তু স্রেফ ইশারা না পাওয়াতে ছেড়ে দিতে হচ্ছে শিকার, যে মানুষটা শিকার ছিল সে জানতেও পারল না মৃত্যুর কতটা কাছাকাছি চলে গেছিল। শিকার করার সময় কোনো অবস্থাতেই রক্তপাত ঘটানো যাবে না। রক্তপাত ঘটলে শিকারের সাথে যত মূল্যবান জিনিসই থাকনা কেন সেগুলো ফেলে দিতে হবে পানিতে। না হলে দেবী ক্রোধিত হবেন। আর যদি ভুলেও রক্তপাত ঘটে এবং সেটা সরাসরি নদী-খাল-বিল বা হাওড়ের পানিতে পড়ে তবেই সর্বনাশ! সেখানেই সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করে ফিরে যেতে হবে এবং বিশেষ পূজা করতে হবে। পাঙ্গুরা সবসময় শুধু মালামাল বা সম্পদের জন্যে শিকার করে না, কখনও কখনও তারা শিকার করে ছোটো বাচ্চাদের জন্যে। যেহেতু তারা পরিবার ধর্ম করে না, কাজেই তাদের ছোটো বাচ্চা সংগ্রহ করা হয় বিশেষ প্রক্রিয়ায় এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে। এসব ক্ষেত্রে তারা শিকার হিসেবে বেছে নেয় এমন পরিবারকে যাদের অবুঝ ছেলে সন্তান আছে। ঠিক একই প্রক্রিয়ায় শিকারকে মেরে তাদের শিশু সন্তানকে রেখে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে বড়ো করে তোলা হয় পাঙ্গু হিসেবে। ঠিক যেভাবে গেড়ুয়া বড়ো হয়েছে পাঙ্গুদের এমনই এক দলের মাঝে।

গেড়ুয়ার বাবা ছিল পাঙ্গুদের এই দলের নেতা। সে বড়ো হবার পর নিজের যোগ্যতা আর শক্তির প্রমাণ দিয়ে এই দলের নেতা হয়েছে। সে নেতা হবার পর দলকে অনেক শক্তিশালী আর সম্পদশালী করেছে কিন্তু এখন সে চাইছে আরও বড়ো কিছু করার। কারণ দেবীর কাছ থেকে স্বপ্নে সে বিশেষ ইশারা পেয়েছে। পাঙ্গু সমাজের কারও যদি স্বপ্নে দেবী দেখা দেয় তবে ধরে নেওয়া হয় দেবী তার জন্যে বড়ো কিছুই অপেক্ষা করিয়ে রেখেছেন। এটা অনেক বড়ো সৌভাগ্য, গেড়ুয়া সেই

সৌভাগ্যধারীদের একজন। যজ্ঞের দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে বিড়বিড় করে দেবীকে একবার ধন্যবাদ জানাল তাকে বিশেষভাবে নিজের আরাধনার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে তারপর দলের বাকিদের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'জরুরি আলোচনা আছে।'

***

'মোঘল সেনাপতি বরকত উল্লাহ?' মাসুম হাতের লাঠিটা নেড়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল। 'একসময় তোমার দায়িত্ব ছিল সেনা ছাউনিতে সেনাপতি কাবুলির জন্যে খাবার নিয়া আসা, তার ছোটোখাটো কাজকর্ম কইরা দেওয়া। আর এহন তুমি পুরা একটা জাহাজের দায়িত্ব পাইয়া গেছ!'

বরকত উল্লাহ মাসুমের দিকে এগিয়ে আসছে। তার পাশাপাশি তার সাথের সৈনিকেরাও। ওদের পেছনে অসহায়ের মতো বন্দি করে রাখা হয়েছে বরখাকে, আর মাসুমের সাথে একদিকে নুক্কুন আর অন্যদিকে ধোবল। যদিও তিনজনেই নিজেদের বিচিত্র লাঠি চেপে ধরে আছে এখনও কিন্তু পুরোদস্তুর অস্ত্রে সজ্জিত মোঘল বাহিনীর সামনে সেগুলো দেখাচ্ছে খেলনার মতো। আর যেহেতু বরখা ওদের কবজায় চাইলেও ওরা কিছু করতে পারবে কি না সন্দেহ। বরকত উল্লাহ একবার পেছনে বরখাকে দেখে নিয়ে মাসুমের দিকে ফিরে ইশারা করল। মাসুমের হাতের লাঠিটা আপনাতেই নিচের দিকে নেমে গেল। আক্রমণাত্মক অবস্থা থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। বরকত উল্লাহ এগিয়ে এসে তার হাত থেকে লাঠিটা একটানে নিয়ে নিলো। তারপর সেটার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে উঠল, 'প্রাক্তন মোঘল সেনাবাহিনীর লোক,' ইচ্ছে করেই সে প্রাক্তন শব্দটার ওপরে জোর দিলো। 'মাসুম খাঁ কাবুলি, এখন বাঙাল মুল্লুকে বিদ্রোহী বারো ভূঁইয়াগো একজন,' বলে সে মুখ দিয়ে চুক চুক করে শব্দ করতে লাগল। 'বীরের এই অধঃপতন, গাছের ডালের লাঠি দিয়া যুদ্ধ করতে অইতাছে,' বলে সে ঝটকা দিয়ে লাঠিটা ফেলে দিলো একপাশে, তারপর মাসুমের একটা হাত ধরে তাকে জোরের সাথে টেনে নিয়ে চেপে ধরল নিজের বিশাল বুকের সাথে। 'হা হা হা, বন্ধু কতদিন পর।'

ধোবল নিজের হাতের লাঠিটা নামিয়ে নিলো, তারপর অবাক হয়ে তাকাল নুক্কুনের দিকে, তারপর বরখার দিকে। আনমনেই একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে ইশারা করল, *হচ্ছেটা কী!*

***

যজ্ঞ শেষ হবার পর খাবার পরিবেশন করা হলো। আজকের যজ্ঞটা তাদের নিয়মিত কোনো যজ্ঞ না। এটা বিশেষ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বিশেষ কাজের জন্যে। যজ্ঞ শেষ হবার পর খাবার পরিবেশন করা হলেও গেড়ুয়া খেল না। আজকের যজ্ঞের উদ্যোক্তা ছিল সে নিজে। তাই দেবী মায়ের সন্তুষ্টির জন্যে আজ বিশেষ উপবাস রাখবে সে। সবাই যখন খেতে বসল সে নলীতে ভরে আরও কয়েক দফা সিদ্ধি টানল। সবার খাওয়া শেষ হতে প্রায় নিভু নিভু যজ্ঞের আগুনের চারপাশে তারা সবাই গোল হয়ে আলোচনায় বসল। পরিবেশন করা হলো পান আর ধোঁয়া ভরা বাঁশের নলী। গেড়ুয়া শুধু সিদ্ধি ছাড়া আর কিছুই খেল না।

সিদ্ধি মেশানো ধোঁয়া টানা হতেই তাদের আলোচনা জমে উঠল। দলের নেতার প্রধান একজন সহকারী থাকে। প্রথমেই সে পুরো পরিস্থিতি বয়ান করার পর চলবে প্রশ্নোত্তর পর্ব, এরপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গেড়ুয়া তার চাচার দিকে ইশারা করতেই সে পুরো পরিস্থিতি বয়ান করার পর, প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হতেই আলোচনা খানিকটা উত্তপ্ত হয়ে উঠল। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে গেড়ুয়ার বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে দলের অনেক বয়স্ক সদস্যরা ঠিক খুশি নয়।

'প্রথম কথা অইল আমরা আমগো নিয়মের অনেক বাইরে চইলা গেছি, এইটা কি ঠিক অইছে?' লম্বা দাড়িওয়ালা এক পাঙ্গু মাথা নেড়ে বলে উঠল।

তার কথার জবাবে আরেকজন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু গেড়ুয়া একটা হাত তুলে থামিয়ে দিলো। 'দেবীর ইশারার বাইরে কি কিছু করা অইছে?'

বয়স্ক সদস্য মাথা নেড়ে আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই আরেকজন বলে উঠল, 'তোমার কথা ঠিক আছে গেড়ুয়া, কিন্তু এতহানি ঝুঁকি নেওয়া কি উচিত অইছে?'

গেড়ুয়া কিছু বলতে গিয়ে আবার চুপ হয়ে গেল। আরেকজন পাঙ্গু কথা বলে উঠল, 'আজকের ঘটনায় আমগো ক্ষয়ক্ষতিও কিন্তু কম অয় নাই, আমগো দলের দুইজন আহতও অইছে? এই বিষয়ে তোমার কি কওয়ার আছে?'

দলের নেতা হলেও পাঙ্গুদের ভেতরে জবাবদিহিতার নিয়ম আছে। দলের যেকোনো সদস্য নিজের মতো প্রশ্ন করার ক্ষমতা রাখে দলের নেতাকে।

দলের সব সদস্যরা তাকিয়ে আছে গেড়ুয়ার দিকে। গেড়ুয়া চুপচাপ কিছুক্ষণ ধোঁয়া টানল তারপর বাকিদের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে শুরু করল। 'শোনো,

আমি প্রথমেই একটা কথা বইলা নেই, তোমরা আমার কাছে যা জানতে চাইতেছ, আমরা সবসময় যেমন কাম করি, আমি দলের নেতা হওনের পর থেইকা এর অনেক বাইরে চইলা আসছি। বিশেষ কইরা বিগত কিছুদিনের ব্যাপারগুলা তোমগো সবার উপরে চাপ ফালাইতাছে আমি বুঝতেছি। কিন্তু আমারে একটা কথা কও, আমি দলের নেতা অওয়ার পর থেইকা কি দলের ভিতরের নিয়ম আরও শক্ত অইছে কি না?'

প্রশ্নটা করে গেডুয়া কিছুক্ষণ চুপ থেকে দেখে নিলো দলের সবাইকে। 'আমি নেতা হওনের পর থেকেই গত কয়েক বছরে আমরা সবচেয়ে বেশি দেবীর আশীর্বাদ পাইছি কি না?' গেডুয়া জানে এর কোনো জবাব নেই ওদের কাছে দেবীর আশীর্বাদ মানে লুট থেকে কামানো টাকা। দলের সবাই অনেক বেশি সম্পদ করেছে বিগত কয়েক বছরে। কাজেই এরও কোনো জবাব নেই তাদের কাছে। 'আরেকটা কথা, আইজ থেইকা বছরখানেক আগে আমি যখন আমার বিশেষ পরিকল্পনার কথা বললাম সবাই খুশি অইছিলা কি না?' দলের সবাই চুপ। 'এরপর থেইকাই আমরা তক্কে তক্কে ছিলাম। কিছুদিন আগে মোঘল আর বাঙাল মুলুকের ভিতরে যখন যুদ্ধ লাগল তখনই আমি জানতাম এইটাই আমগো সুযোগ। আর এরপর আমগো হাতে আসল আরেকটা বিরাট সুযোগ। এই সুযোগ আমগো কাজে লাগাইতে অইতোই, ঝুঁকি নিতে অইতোই,' গেডুয়া কখনোই তার গলা উঁচু করে কথা বলে না। এখনও একেবারে শান্ত স্বরেই কথা বলে চলেছে সে। কিন্তু তার বক্তব্য যত সামনে এগোচ্ছে তত বেশি গলা শক্ত হয়ে উঠছে ওর। 'শোনো, আজকে ঘটনা নিয়ে শাই চিন্তিত অইয়া পড়তাছ ক্যান এইটা আমি বুঝলাম না। বড়ো কিছু করতে অইলে ঝুঁকি তো নিতেই অইব। আর তাই অইছে,' বলে সে থেমে গেল। আরেকটা কথা অইল যেই উদ্দেশ্যে আজকের ঘটনা ঘটানো অইছে, সেইটা করা গেছে কি না?'

দলের সবাই চুপ, আরেক বয়স্ক সদস্য মুখের সামনে দুই হাত তুলে বলে উঠল, 'গেডুয়া ঠিকই বলছে এবং ঠিকই করছে। আমি ওর লাগে আছি,' তার সাথে আরও কয়েকজন সায় জানাল।

'তুমরা আমার লগে থাক, যা আমরা চাই, দেবী মা চাইলে তাই করতে পারবোই,' সে সাথে সাথে বাকিরাও গুঞ্জন তুলল। প্রত্যন্ত দ্বীপের ছাউনির বাইরের বৃষ্টির শব্দ ম্লান হয়ে গেল তাতে।

গেডুয়া বাইরে ফিরে তাকাল, আজকের নাটকটা যে-উদ্দেশ্যে সাজানো হয়েছিল সেটা শতভাগ সফল হয়েছে ভাবতেই তার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

তিন যোদ্ধা তার আয়ত্বের ভিতরেই আছে। এখন খালি সঠিক সময়ের অপেক্ষা, আর আশা করি যাতে তারা তাগো কামড়া ঠিকমতো করতে পারে। তাহলেই বাকিটা সে সামলাইতে পারবে। মনে মনে আরেকবার দেবী মাতার স্তুতি করে দেবীর আশীর্বাদ প্রর্থনা করল সে।

***

দস্তারখানের ওপরে সাজানো খাবারের ওপরে রীতিমতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওরা। বলতে গেলে চব্বিশ ঘণ্টার ওপরে হয়েছে ওরা সেভাবে কিছু খেতে পারেনি, গাছের কিছু ফলমূল আর কিছু পাখির ডিম ছাড়া, তার ওপরে বিশ্রামহীন ভয়াবহ পরিশ্রান্ত এবং চিন্তিত সময় কেটেছে এলাকায় পা রাখার পর থেকেই। বাইরে রীতিমতো ঝড়-বৃষ্টি তাণ্ডব চলছে আর এর ভেতরেই জালিয়ার খাবার ঘরে বসে খেতে খেতে আলোচনা চলতে লাগল ওদের ভেতরে।

মোঘল সেনাপতি বরকত উল্লাহর সাথে ওদের মোলাকাত হবার পর বাকিরা যখন অনুভব করল আসলে মাসুম এবং এই সেনাপতি পুরনো বন্ধু, ব্যাপারটা ওদের জন্যে বেশ অবাক করার মতোই ছিল।

বরকতের সাথে দেখা হবার পরে মাসুম প্রথমে পরিস্থিতি এবং খবর নিয়ে আলোচনা করতে চাইলে বরকত উল্লাহ সাফ মানা করে আগে ওদের জন্যে পরিষ্কার কাপড় আর খাবারের ব্যবস্থা করতে বলে নিজের লোকদেরকে। ওরা পরিচ্ছন্ন হয়ে পোশাক পালটে যখন খাবারের জন্যে বসতে যাবে ধোবল প্রথমেই মাসুমকে ধরে বসে, 'এইটা কি অইল? তুমি আগে থেইকা জাইনা বুইঝা আসছ আর আমগোরে অন্ধকারে রাখছ, কামড়া কি ঠিক অইছে?'

মাসুম মৃদু হেসে নিজের অপরাধ কবুল করে পুরো বিষয়টা ওদেরকে খুলে বলে। ঈশা খাঁর সাথে যখন ওর কথা হয় সেদিন রাতে ঈশা খাঁ ওকে জানায়, ওকে এই এলাকায় পাঠানোর পেছনে যতগুলো কারণ আছে তার ভেতরে অন্যতম একটা কারণ হলো ও নিজে মোঘল বাহিনীর সেনাপতি ছিল এবং দীর্ঘদিন ওর সাথে কাজ করেছে এবং ওর বন্ধুসম বরকত উল্লাহ বাহরাম খাঁর বাহিনীতে আছে এবং সেও জঙ্গলমহালের দখলদারদের একজন হিসেবেই এই এলাকাতে এসেছে। সত্যি কথা হলো বরকত উল্লাহ নিজেই ঈশা খাঁর সাথে যোগাযোগ করেছিল এবং ভেতরের অনেক তথ্যও তাকে জানিয়েছে। আর একারণেই ঈশা খাঁ ওইদিন ওদের সাথে আলোচনা করার পর এই গোপন মানচিত্রটা ওকে দিয়েছিল। ওরা জল-জঙ্গলে

প্রবেশ করার পর বরকত উল্লাহর বাহিনী সম্ভাব্য কোনো কোনো জায়গায় থাকতে পারে সে-বিষয়ে নির্দেশনাও দিয়েছিল। কিন্তু মাসুম বিষয়টা গোপন রেখেছিল কয়েকটা কারণে। প্রথমত, ও আসলে নিজেই নিশ্চিত ছিল না ওদেরকে বের করতে পারবে কি না, তার ওপরে গেড়ুয়াদের সাথে গন্ডগোলটা লাগাতে ও খানিকটা হলেও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল, তার ওপরে নিশ্চিত ছিল না বরকত উল্লাহ পারবে কি না। তাই ও বৃথা কোনো আশা জাগাতে চায়নি বাকিদের মনে। আর বরকত উল্লাহকে না পেলে আসল মোঘলদের কাউকে ধরেই তথ্য বের করতে হতো। সবমিলিয়ে এখন পেয়ে যাওয়াতে অনেক সুবিধা হবে ওদের জন্যে।

'এখন বলো পরিস্থিতি কী?' বরকত উল্লাহ দস্তরখানের ওপাশে বসে ওদেরকে দেখছে। 'মাসুম, তুমি অনেক বদলাই গেছ।'

মাসুম কিছু না বলে মৃদু হাসল। 'তুমি আগে বলো এইখানে আমরা কতখানি নিরাপদ, তারচেয়ে বড়ো কথা আমগোরে সাহায্য করতে গিয়া তুমি নিজের উপরে কতখানি বিপদ ডাইক্কা আনছ?"

বরকত উল্লাহ হেসে উঠল, 'মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা খেলে যারা, হেগো আবার বিপদের ভয় কীসের, কথাডা কে কইতো, কও তো দেহি?' মাসুম হেসে উঠল, সে নিজেই এক সময়ে এই কথাটা দিনে কয়েকবার করে বলত। 'তুমি এখনও কথার রাজাই আছ, বরকত। যা জিগাইছি সেইটার কথা বলো, নিজের উপরে ঠিক কী ধরনের বিপদ ডাইক্কা আনছ সেইটা বলো।'

বরকত উল্লাহ মাছি তাড়ানোর মতো করে হাত নাড়ল। 'শোনো,, তুমি ফৌজে থাকতে এতবার এতভাবে আমারে বাঁচাইছ। তোমার জন্যে একবার না একের বেশি সময় মরতে পারি আমি, আর বিপদ তো কোনো ঘটনাই না,' বলে সে নিজের লোকদেরকে ইশারা করে খাবার সরিয়ে তামাক দিতে বলল। 'আর যদি বলি নিরাপত্তার কথা, আশা করি তোমরা আমার এইখানে শতভাগ নিরাপদে আছ। আমি ঈশা খাঁ সাহেবরে তিনটা জায়গার কথা জানাইছিলাম যেইখানে আমার থাকার সম্ভাবনা ছিল। এর মধ্যে এইটাই সবচেয়ে বেশি কইরা বলছিলাম, কারণ এইখানে কেউই আইতে চায় না, কারণ এইখানের পর থেইকা বিশা ডাকাইতের এলাকা শুরু। তবে, আমার দলের আরও একটা ভাগ আছে ওইখানে আরও এক সেনা দলের লগে যৌথভাবে আমার টহল দিতে অইতেছে। কিন্তু হেরে কৌশল কইরা সরায়া দিছি আইজ রাইতে। হেরাও এই ঝড়বৃষ্টির ভিতরে মূল ঘাঁটিতে ফিরা গিয়া খুশিই অইছে। আর এহন এইহানে যারা আছে হেরা একেবারেই আমার নিজের লোক, এগোরে নিয়া কোনো সমস্যা নাই।'

'বুঝতে পারছি। ওগো সাথে তো পরিচয় আছেই, ধোবল আর বরখা আমার একেবারে ছোটোবেলার বন্ধু, আর ও অইল নুক্কুন,' বলে নুক্কুনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে পাঙ্গুদের সাথে যা-ঘটেছে সেটা বিস্তারিত বলল মাসুম।

একটু ভ্রু কুঁচকে আনমেনই মাথা নাড়ল বরকত উল্লাহ। 'বড়ো বাঁচা বাইচা গেছ, এগো খপ্পরে পড়লে শেষ। মুশকিল অইল এই এলাকা এখন ডাকাইত, পাঙ্গু, তুসুমবাজ আর নানা বাহিনীর লোকে ভইরা গেছে। এর ভিতরে থেইকা যা করতে আসছ সেইটা করতে অইলে বহুত ঝামেলা পোহাইতে হবে।'

মাসুম একটা হাত তুলল। 'আইচ্ছা, তোমার সাথে সব বিস্তারিত আলোচনা করব আগে আমারে একটা কথা বলো, জঙ্গলমহালে কী অইছিল, পতন ক্যামনে অইল?'

গড়গড়ায় তামাক টানতে টানতে বরকত উল্লাহ সব খুলে বলল ওইখানে কী ঘটেছিল এবং সবশেষে সে যখন জানাল সুবাদার আসলাম শেঠের স্ত্রী তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়া আসলেই সরে পড়েছিল সেটা শুনে মাসুমের সমস্ত শরীরে একটা স্বস্তির পরশ বয়ে গেল। এই প্রথমবারের মতো কেউ বিষয়টা শতভাগ নিশ্চিত করল যে সুবাদারের স্ত্রী আসলেই মোঘলদের খপ্পর থেকে পালিয়েছে। তাহলে এখনও সম্ভাবনা অছে। 'সে তাইলে আসলেই পলাইতে পারছে?'

বরকত উল্লাহ মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, 'সে তো গেছে কিন্তু তারপরে তো–'

'শোনো, আমারে এখন বিস্তারিত জানাও জঙ্গলমহালের পতনের পর বিগত কয়েক দিনে কী কী অইছে এবং–'

'সব বলতাছি,' বলে সে নিজের এক সৈনিকের দিকে ইশারা করতেই সে গোল করে পাকানো এক টুকরো কাপড় এনে ওদের সামনে বিছিয়ে দিলো। 'এইটা দেখ ভালো কইরা,' বলে সে মানচিত্রটার দিকে নির্দেশ করল। 'এই হইল পুরা জল-জঙ্গল এলাকা,' মাসুম এইটার পাশাপাশি নিজের নিয়ে আসা মানচিত্রটাও বিছিয়ে নিলো কারণ ওটার ব্যাপারে ওর নিজের ধারণাটা তুলনামূলক পরিষ্কার। 'আর এইটা হইল জঙ্গলমহাল। তোমরা আসছ রসুল খাঁর এলাকা মানে এদিক থেইকা, আর এখন আমরা আছি এইখানে। এইদিকে হইল বমার নদী, এইটা হাওড় এলাকা, এইদিকে মেঘালয় থেইকা একেবারে হিন্দুস্থান পর্যন্ত চলাচলের পথ, প্রার পুরাটাই এখন মোঘলরা নিয়ন্ত্রণ করতাছে।'

মাসুম মনোযোগের সাথে দেখে বোঝার চেষ্টা করছে এবং পুরো অবস্থানটা মানচিত্র এবং মাথার ভেতরে নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। 'আচ্ছা, এইবার বলো তোমরা জঙ্গলমহাল দখল করার পর সুবাদারের স্ত্রী এবং তার লোকেরা কোনোদিকে

পলাইতে পারে এবং এখন পর্যন্ত তোমরা মানে মোঘল বাহিনী কোনো কোনো দিকে নরজদারি করতে পারছ।'

'মন দিয়া দেখ,' বলে সে নিজের আঙুল দিয়ে মানচিত্রের ভেতরে নির্দেশ করে দেখাতে লাগল সে। জঙ্গলমহালের সম্ভাব্য কোনোদিক দিয়ে ওরা বের হইছে এবং সেদিক থেকে বের হবার পর কোনো কোনো জায়গায় ওরা অভিযান চালিয়েছে এবং কোনো কোনো জায়গা বাকি আছে পুরোটাই বুঝিয়ে দিলো সে মাসুমদেরকে। বুঝিয়ে দিয়ে সে মাসুমের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'মাসুম এইবার মন দিয়া শোনো, ঝামেলাগুলা কোনোখানে। প্রথম কথা অইল পাঙ্গুগোর লগে তোমার মোলাকাত হইছে কাজেই বুঝতে পারছ এই এলাকা এহন উত্তপ্ত চুলার মতন, সবাই জানে সুবাদারের স্ত্রীর লগে কিছু-না-কিছু আছিল, বেশির ভাগই মনে করে অনেক সম্পদ নিয়া পলাইছে সে। তার লগে কী আছিল সেইটা নিয়া আমার কোনো আগ্রহ নাই। আমার আগ্রহ তোমারে সাহাইয্য করা নিয়া। কিন্তু সমস্যা অইল সুবাদারের স্ত্রী জল-জঙ্গলের একেবারে ভিতরে ঢুইকা গেছে সম্ভবত নিজেরে মোঘলগোর থেইকা বাঁচানোর লাইগা সে কোনো ঝুঁকি নিতে চায় নাই,' বলে সে মানচিত্রে একটা জায়গা নির্দেশ করল। 'জায়গাটা এইখান থেইকা চাইর ক্রোশ দূরে, সমস্যা এঁইটা না। সমস্যা অইল ওইটা বিশা ডাকাইতের এলাকা। সে এমনিতেই এমন ভয়ঙ্কর যে সুবাদার অসলাম শেঠ কিংবা সবাই তারে সইমঝা চলত। এমনকি মোঘলগোর লগেও তার টক্কর লাগছে বরাবরই। সমস্যা অইল জোরদার সম্ভাবনা সুবাদারের স্ত্রী তার এলাকাতেই আছে এহন। কপাল খারাপ অইলে সে ওগো হাতে ধরাও পইরা গিয়া থাকতে পারে। আর কপাল ভালো অইলে এহনো মুক্ত আছে, কিন্তু তুমগো ওগো লগে টক্কর লাগতে পারে এইটার সম্ভবনা শতকরা শতভাগ,' বলে সে একটু থেমে নিজের পাহারাদার সৈনিকদের বাইরে যেতে বলল। ওরা বাইরে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিতেই সে মাসুমের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'মানসিংহের বিষয়টা তো তোমরা জানোই। সে এখন এগারো সিন্ধুর দুর্গ দখল কইরা ফালাইছে। ধীরে ধীরে সে নিজের জাল ছোটো কইরা আনতাছে। যেহেতু সে এগারো সিন্ধু দখল কইরা ফালাইছে কাজেই এহন সে নজর দিব রসুল খাঁর এলাকার দিকে। আর সেইটা করতে গেলেই খাঁ সাহেবরা বাধা দিব। লাইগা যাইব যুদ্ধ। এরমানে অইল তুমরা যদি তাগোরে উদ্ধার করতেও চাও জলদি করতে অইব।'

'করণীয় কী?' মাসুম পুরো বিষয়টার অসম্ভাব্যতা যাচাই করার চেষ্টা করছে নিজের মাথার ভেতরে। পুরোপুরি একজন সৈনিকের মতো সে সম্ভাবনা ঝুঁকি এবং বিপদ সবকিছু হিসেব করে নিজের করণীয় ঠিক করার চেষ্টা করছে।

'প্রথমেই অবস্থা বুইঝা ব্যবস্থা,' বলে বরকত উল্লাহ হেসে উঠল। 'মাসুম, তুমি আমার বন্ধু তোমারে আমি বৃথা আশ্বাস দিব না। তোমারে খুব বেশি সাহায্য আমি করতে পারবো না। বরং সেইটা করতে গেলে তোমারে আরও বড়ো বিপদে ফালানি অইবে।'

'আমি সেইটা বুঝি তুমি আইজ রাইতে যে আমগোরে সাহায্য করতাছ এতেই কত বড়ো ঝুঁকি নিছ আমি জানি। কাজেই প্রয়োজন নাই আরও বেশি কিছু করার। তুমি এক কাম করো আমগোরে অস্ত্রসহ সব রসদ দিয়া এই এইখানে, বলে,' সে মানচিত্রের যেখানে আসলামের শেঠের স্ত্রী অবস্থান করতে পারে বলে ধারণা করছ সেখানের একপ্রান্তে দেখাল। এইখানের একপ্রান্তে নামায়ে দাও, বাকিটা আমগোরেই করতে হবে।'

'এইটা সম্ভব, তোমরা এখন বিশ্রাম লও, আমি যত ঝড় বৃষ্টি থাক রাইতের দ্বিপ্রহরের আগেই ওইখানে যাবার ব্যবস্থা করতাছি। ওইখানে গেলেই শুরু অইব তুমগো মূল অভিযান।'

মাসুম আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল একবার। মাসুম মনে মনে জানে বরকত ঠিকই বলেছে। ওখানে গেলেই শুরু হবে ওদের মূল কাজ।

অধ্যায় আঠারো
বর্তমান সময়
ধানমন্ডি এলাকা, ঢাকা

'আপনাকে না ভুয়া পরিচয়ধারী আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন তুলে নিয়ে গেছে?' বাশার এখনও ওর পিস্তলের ওপরে নিজের হাত সতর্কভাবে রেখে দিয়েছে যাতে প্রয়োজন হলেই সেটা বের করে আনতে পারে।

চৌধুরী তাকিয়ে আছে বাশারের দিকে, বাশারও তাকিয়ে আছে তার দিকে। চৌধুরী তার দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে একবার পৃথাকে দেখে নিলো তারপর আবারও বাশারের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'ইন্সপেক্টর, আমাকে আপনার থ্রেট মনে করার কোনো দরকার নেই। আমি যে আপনাদের বন্ধু, আশা করি সেটা প্রমাণ করতে পেরেছি,' বলে চুপ হয়ে গেল।

বাশার এখনও তাকিয়ে আছে তার দিকে। আজ সকালে অফিসে লোকটার তিন বছর অগের ছবি দেখেছিল, সেই হিসেবে লোকটার বয়স এখন চল্লিশের আশপাশে হওয়া উচিত। কিন্তু তার সামনে যে-মানুষটা উপস্থিত তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় মানুষটার জেলজীবন খুব একটা ভালো কাটেনি। ভালো কাটার অবশ্য কোনো কারণও নেই, বাশার মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো, একটা বাজি ধরেই দেখবে। সে নিজের পিস্তলের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বড়ো করে একবার দম নিলো। তারপর সোহেলের দিকে ফিরে ইশারা করল তাকে রিল্যাক্স হবার জন্যে। 'মিস্টার চৌধুরী, আমি আপনার কথা স্বীকার করে নিচ্ছি, আপনি আমাদেরকে সাহায্য করেছেন, কিন্তু আপনাকেও কিছু জিনিস বুঝতে হবে। আপানাকেও অনেক কিছু ব্যাখ্যা দিতে হবে। যদি সেগুলো সন্তুষ্টিজনক হয় তবেই আমরা পরস্পরের ভরসা অর্জন করতে পারবো,' বাশার এখনও এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চৌধুরীর দিকে। 'আর যদি আমরা পরস্পরকে সাহায্য করতে চাই তবে বিশ্বাস অর্জন করাটা খুবই জরুরি।'

চৌধুরীও তাকিয়ে আছে ওর দিকে, অনেকটা যেন আনমনেই সম্মতিসুচক মাথা নাড়ল সে। 'ফেয়ার এনাফ।'

'আপনি জেল থেকে কীভাবে পালালেন সেটা দিয়ে শুরু করুন।'

আবারও কাঁধ ঝাঁকাল চৌধুরী। 'আমার জেল থেকে পালানোর ব্যাপারটার সাথে অনেকগুলো বিষয় জড়িয়ে আছে। আপনারা যেটা শুনেছেন সেটাও পুরোপুরি মিথ্যে নয়। কিছু লোক আসলেও এসেছিল আমাকে জেল থেকে বের করে নেওয়ার জন্যে। কিন্তু সেটা হয়নি, কারণ আমি আগেই সরে পড়েছিলাম। প্রথমত, আমার সাজার মেয়াদ প্রায় শেষ দিকে চলে এসেছিল। আমার জেল হয়েছিল পাঁচ বছরের, জেলখানায় বছরের হিসাব দশ মাসে হয়। তার ওপরে আমার ভালো আচরণের জন্যে সেটা আরও কমে এসেছিল। তার ওপরে, আমি একসময় জেলারকে একটা বিষয়ে সাহায্য করেছিলাম, তার মেয়ে মৃত্যুশয্যায় ছিল আমি একটা কিডনি দান করেছিলাম তাকে। ফলে জেলের ভেতরেও আমি কিছু সুবিধা পেতাম, বাইরের কিছু খবরাখবর রাখার সুযোগ থাকত। আর তাই প্রফেসর আবদেলের খবরটা আমি জানতাম। আমি এটাও জানতাম তাকে যেহেতু লোকেট করা গেছে এবার আমার দিকে নজর পড়বেই। সেটা পুলিশের হোক আর অন্যদের হোক। তাই জেলারকে অনুরোধ করে আমার মুক্তির কিছুদিন আগেই আমি বের হয়েছিলাম, সেটা অবশ্য খুব যে লিগ্যাল পন্থায় তা না। যাই হোক, সব সম্ভবের দেশে এটাও সম্ভব। এরপরের দিনই আমাকে নিতে ভুয়া লোক আসে, জেলার বুঝতে পেরে তাদের ফিরিয়ে দিলেও উচ্চাবাচ্য করেনি, বরং এটাকে সে এক্সকিউজ হিসেবে দাঁড় করিয়েছে পরে।'

'এরপরদিন পিবিআইয়ের লোক যায় আপনার খোঁজ করতে ' সোহেল বলে উঠল।

'জেল থেকে বের হবার পর কী করলেন?'

'আপনারা যা করেছেন,' বলে সে পৃথাকে দেখাল। 'আমি সম্ভবত আমার জীবনে গত তিন বছর সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেছি প্রফেসর ইফতেখারকে,' বলে সে বয়ান করল তিন বছর আগে কী ঘটেছিল। 'আমি জানতাম প্রফেসর আবদেল আবিষ্কার হবার পর এবং আমি পালানোর পর সবার নজর পড়বে প্রফেসর ইফতেখারের মেয়ের দিকে। কাজেই আমি তার ওপরে নজর রাখতে শুরু করি। আর বাকিটা–' নিজের বাক্য সমাপ্ত না করে সে কাঁধ ঝাঁকাল।

'আমাকে একটা কথা বলেন তো,' বাশার আলোচনার ভঙ্গিতে বলে উঠল। 'পুরো বিষয়টা আসলে কী নিয়ে? আমরা সবাই পুরো ব্যাপারটার খণ্ড খণ্ড চিত্র দেখতে পাচ্ছি, কখনও আগা কখনও মাথা। ময়মনসিংহ থেকে টুইন কালী, সিলেট থেকে বুদ্ধ মূর্তি, চট্টগ্রাম থেকে রাজদ্রোহী নামের অদ্ভুত এক অমীমাংসিত রহস্যের সন্ধান বের হয়েছে। এগুলো আসলে কী? প্রফেসর আবদেল আর প্রফেসর ইফতেখার আসলে কী নিয়ে গবেষণা করছিলেন, কীসের সন্ধান পেয়েছিলেন তারা?'

বাশারের প্রশ্নের জবাবে মৃদু হেসে উঠল চৌধুরী। 'এগুলো তো আমিও জানতে চাই।'

'মানে আপনি উনাদের অ্যাসিসটন্টে ছিলেন, আপনি কিছুই জানেন না এটা কেমন কথা?' বাশার আনমনেই মাথা নাড়ল। 'এটা তো বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না।'

'ইন্সপেক্টর, আমি বুঝতে পারছি আমার কথা শুনতে অদ্ভুত শোনাচ্ছে, হয়তো বা অযৌক্তিকও, কিন্তু আমি পুরো বিষয়টা বললে আপনারা বুঝতে পারবেন। সেটা বলার আগে আরেকটা কথা বলে নেই,' চৌধুরী পৃথার দিকে একবার তাকাল। 'ম্যাডাম, আমি কোনো ক্রিমিনাল নই, কিংবা কে জানে গত তিন বছরে হয়তো হয়েই গেছি কি না। আমি জানি প্রফেসর ইফতেখার আপনার বাবা, এক সময় অনেক মহান চিন্তা করতাম। কিন্তু এই যে রহস্য ইত্যাদি, এগুলোর বিষয়ে আমার আর কোনো আগ্রহ নেই। আমার একমাত্র আগ্রহ প্রফেসর ইফতেখারকে খুঁজে বের করা। পাগলের মতো শ্রদ্ধা করতাম আমি, অথচ মানুষটা আমার জীবনটা শেষ করে দিলেন! জীবনে একবারের জন্যে হলেও তার সামনে দাঁড়াতে হবে আমাকে এবং একবারের জন্যে হলেও তার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করতে হবে, কেন তিনি এমন করলেন?'

'আমাকেও সেটাই করতে হবে ' বাশারের পাশ থেকে পৃথা বিড়বিড় করে বলে উঠল। 'আমিও তার চোখে চোখ রেখে জানতে চাই সে কেন আমার আর আমার মায়ের জীবনটা নষ্ট করল।'

'যাক গে, সে অন্য কথা,' বাশার দেখল একদিকে চৌধরীর চোখে অশ্রু, আবার তার চোখে অদ্ভুত এক আলোও বিদ্যমান। 'প্রফেসর আর প্রফেসর ইফতেখারের সাথে আমি ইন্টিমেটলি কাজ করতে শুরু করি আজ থেকে তিন বছর আগে উনারা যখন হারিয়ে যান তার এক বছর আগে থেকে,' বাশার দেখল চৌধুরী আঙুলের কড়ে হিসেব করতে করতে বলে উঠল। 'এর আগে আমি প্রফেসর ইফতেখারের ডক্টরেট স্টুডেন্ট ছিলাম, ওই সময়টাতে উনারা বেশ কিছু প্রপোজাল নিয়ে কাজ করছিলেন। এগুলোর ফাইলিংয়ের কাজের জন্যেই মূলত প্রফেসর ইফতেখার আমাকে ফুল টাইম উনার সাথে কাজ করতে বলেন।'

'যখন আপনি উনাদের সাথে কাজ করতে শুরু করেন তখন উনারা কোনো স্টেজে ছিলেন, মানে অ্যাডভান্স স্টেজে নিশ্চয়ই, তা না হলে তো–'

'অনেকটা তাই,' চৌধুরী জবাব দিলো। 'এরপরেই উনাদের সাথে অথরিটির গন্ডগোল লাগে উনারা কিছু অর্গানাইজেশনের সাথে জড়িয়ে যান এবং এর এক বছর পরেই পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয় যে তারা আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যেতে বাধ্য হন, আমিও ছিলাম তাদের সাথে,' বলে সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল। 'আসলে

যাদেরকে সারাজীবন গুরু মেনে এসেছি তাদের বিপদের সময়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে পারিনি বলেই স্রেফ নিজের ক্যারিয়ার বিসর্জন করে উনাদের হেল্প করেছিলাম। প্রফেসর বারবার বলতেন উনারা বিরাট কিছু একটা করতে যাচ্ছেন, আমিও একদিন এর অংশীদার হবো,' বলে সে দুঃখের হাসি দিলো। 'কেমন অংশীদারিত্ব পেয়েছি সে তো দেখতেই পাচ্ছেন।'

'তাই বলে আপনি কিছুই জানেন না, এটা কি–'

চৌধুরী চোখ তুলে তাকাল বাশারের দিকে, 'আমি কি একবারও বলেছি আমি কিছুই জানি না, আমি বলেছি আমি সবটা জানি না। আমি যা জানি সেটা অবশ্যই শেয়ার করব, কিন্তু তার আগে আমাকে জানতে হবে কেন? এটা করে আমার লাভ কী হবে? আমাকে আপনাদের প্রয়োজন, আপনাদেরকে আমার প্রয়োজন নেই।'

'আমি আপনাকে আপনার কোনো লাভের ব্যাপারে প্রমিজ করতে পারবো না,' বাশার সরাসরি তাকিয়ে আছে, চৌধুরীর চোখের দিকে। 'আমি নিজেই যে-ফোর্সের হয়ে কাজ করছি সেই অফিসে আমি জয়েন করেছি আজকে সকালে। এখানে আমি কী ধরনের নেগোসিয়েশন করব, বলেন। তার ওপরে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে শুরু করে এমনকি জেল পালানোর বিষয়টা নিয়ে হাজারো সমস্যা,' বলে বাশার দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল। 'কিন্তু আমি এটাও অস্বীকার করব না যে, আপনার হেল্প আমাদের প্রয়োজন।'

বাশারের কথা শুনে চৌধুরী হেসে উঠল, 'মানে আমার মতো একজন ক্রিমিনালের হেল্প আপনার প্রয়োজন কিন্তু আমাকে হেল্প করার কোনো সুযোগ বা ইচ্ছা আপনার নেই।'

'দেখুন, আমি অস্বীকার করছি না শুধু আপনি না আপনাদের দুজনেরই হেল্প আমাদের প্রয়োজন,' সে পৃথা আর চৌধুরী দুজনকেই দেখাল। 'আমি চাইলেই বলতে পারতাম, হ্যাঁ, আমাকে হেল্প করুন, বিনিময়ে সব মাফ করিয়ে দেব আমি বা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমি সেটা করছি না,' বাশার এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চৌধুরীর দিকে। 'আমি আপনাদেরকে শুধু সত্যিকারের পরিস্থিতিটা বলছি, মিথ্যে প্রমিজ আমি আপনাদেরকে করব না। কারণ আমি এটা বুঝতে পারছি আপনারা দুজনেই প্রচলিত সিস্টেমের চাপে হোক আর নিজের শ্রদ্ধেয়জন হোক বা আপনজন হোক সব মিলিয়ে যথেষ্ট সাফার করেছেন এবং এখনও করছেন। আর সিস্টেমের সাথে লড়াই করলে কেমন লাগে আমি এটা খুব ভালোভাবেই জানি।'

'আমি একটু কথা বলি–' সোহেল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই পৃথা তাকে থামিয়ে দিলো।

'এই পুরো ব্যাপারটাতে আমার ভূমিকাটা কি আমি বুঝতে পারছি না। আপনারা আমাকে ট্র্যাপ করে বিপদে ফেলেছেন। আমি চাইলেই আপনাদেরকে সু করতে পারি। আর আমি–'

'শোনো, পৃথা, একটা ব্যাপার তোমাকে বুঝতে হবে, আমরা সবাই একদিকে যেমন সাফার করেছি আবার না চাইলেও এই বিষয়টার সাথে জড়িয়ে গেছি,' চৌধুরীর গলা একেবারে শান্ত শোনাচ্ছে, সে মনে হয় ইচ্ছে করেই পৃথাকে তুমি ডাকল। 'তুমি হয়তো বুঝতে পারছ না, হয়তো ভাবছ তোমাকে এখানে এক্সপ্লয়েট করা হচ্ছে,' বলে সে মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ, তোমাকে আমাদের প্রয়োজন, কিন্তু তোমারও আমাদেরকে প্রয়োজন। তুমি তোমার বাপকে পছন্দ করো বা না করো একটা বিষয় তো বুঝতে পারছ একাধিক মহলের কাছে প্রফেসর ইফতেখারের মূল্য এখন অনেক। আর সেই একাধিক মহলে তার কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম একমাত্র তুমি।'

'অথবা আপনি–' চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল সোহেল।

'অস্বীকার করছি না,' বলে চৌধুরী থামল। সে সোহেলের দিক থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বাশারের দিকে তাকাল। 'ধন্যবাদ ইন্সপেক্টর, মিথ্যে কোনো প্রমিজ না করার জন্যে। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার আমরা এখানে যারাই আছি পরস্পরের কাছ থেকে কোনো সুবিধা পাই বা না-পাই, পরস্পরকে আমাদের প্রয়োজন। আপনাদের কেস সলভ করতে হলে প্রফেসর ইফতেখারকে প্রয়োজন, আর তাকে খুঁজে বের করতে হলে আমি এবং পৃথা দুজনেই সমান গুরুত্বপূর্ণ, পৃথার আমাদেরকে প্রয়োজন, কারণ প্রফেসর ইফতেখারকে না পাওয়া পর্যন্ত সে মোটেই সেফ না।'

'তারচেয়েও বড়ো কথা তাকে আমার কিছু কথা জিজ্ঞেস করার আছে–' চিবিয়ে চিবিয়ে কথাটা বলল পৃথা। বাশার এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'আমার তার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা আছে, তার চোখে চোখ রেখে আমাকে কিছু কথা জানতে হবে। আর আমি এই রহস্যেরও সমাধান চাই, আর তাই প্রফেসরকে প্রয়োজন আমাদের।'

'আমি আগেই বলেছি কোনো মিথ্যে প্রমিজ করব না,' বাশার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে উঠল। 'আপনার জন্যে আমি সর্বোচ্চ এটুকু করতে করতে পারি। যেহেতু আমাদের পরস্পরকে প্রয়োজন কাজেই এই মুহূর্তেই আপনার বিষয়ে আমি অথরিটিকে জানাব না। তবে যদি আমরা প্রফেসরকে খুঁজে বের করতে পারি এবং এই কেস সলভ করতে পারি এবং–' ইচ্ছে করেই ও নেক্রপলিস বা রেলিকের নামগুলো এড়িয়ে গেল। 'সেইক্ষেত্রে হয়তো আমি আপনাকে সহায়তা করতেও পারি–'

'ফেয়ার এনাফ,' চৌধুরী স্টিয়ারিংয়ের দিকে ঘুরে গেল। 'আমাদের পরস্পরকে প্রয়োজন আর বিশেষ প্রয়োজন প্রফেসর ইফতেখারকে। কারণ সমস্ত রহস্যের গোড়া জুড়ে আছে তার সাথে। কাজেই সবার আগে তাকেই খুঁজে বের করতে। তবে সেটা করতে হলে আগে আমাদেরকে জানতে হবে পুরনো কিছু বিষয় এবং–'

'আপনি এই সমস্ত রহস্যের বিষয়ে কী জানেন, এর শুরু কোথা থেকে, বিষয়টা আদৌ কি নিয়ে এবং রাজদ্রোহীর ব্যাপারটাই বা কি আমাদেরকে আগে বিস্তারিত বুঝতে হবে–'

'লেটস স্টার্ট দ্য জার্নি– তার আগে এখান থেকে সরে পড়তে হবে। রাতে খোলা থাকে এমন কোনো রেস্টুরেন্টে বসে কথা বলতে পারি আমরা–'

'লেটস গো–'

***

আজ রাতের অভিযান এতটা সফল হবে সে ভাবতে পারেনি। সাধারণত কোনো সাফল্যে খুব বেশি খুশি হয়ে ওঠার মতো মানুষ সে নয়, আবার ব্যর্থতায় একেবারে ভেঙে পড়ার মতো মানুষও সে নয়। জীবনের নানা ঘাতপ্রতিঘাত তাকে যে-কয়েকটা জিনিস মারাত্মকভাবে শিখিয়েছে তার ভেতরে অন্যতম একটা হলো স্থির থাকা। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন কখনোই কোনো অবস্থাতেই সে অস্থির হয়ে ওঠে না। কারণ সে জানে বেলা শেষে যাই ঘটুক না কেন, সাফল্য আর ব্যর্থতা সবই স্রেফ সময়ের ব্যাপার। কোনোটাই স্থায়ী নয়। আর তাই যেকোনো অবস্থায় যেকোনো সময়ে অস্থির না হয়ে নিজেকে ঠিক রেখে যেকোনো মূল্যে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু সে এটাও উপলব্ধি করতে পেরেছে বেশিরভাগ মানুষই এটা করতে পারে না। এ-ক্ষেত্রে বাঘ কিংবা সিংহের শিকার করার প্রক্রিয়াটাকে সে সবসময় নিজের আদর্শ বলে মনে করে। একটা বাঘ যখন হরিণের পালের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকার করার জন্যে তখন সে একটা নির্দিষ্ট হরিণকে টার্গেট করে ওটাকেই ধরার জন্যে আক্রমণ করে। ওটাকে আক্রমণ করতে গিয়ে বা ধরতে গিয়ে তার সামনে যদি আরও কোনোটা এসে পড়ে খুব সহজেই সে ওটাকে বাদ দিয়ে এটাকে ধরতে পারবে, বাঘ কখনোই সেটা করবে না। সে যেটাকে উদ্দেশ্য করবে সেটাকেই ধরার চেষ্টা করবে। সেটা যতই কঠিন কিংবা অসম্ভবই হোক না কেন এমনকি যদি ধরতে নাও পারে তাও কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু সে তার উদ্দেশ্য থেকে সরবে না।

সে নিজেও এভাবেই চিন্তা করে, এভাবেই ভাবার চেষ্টা করে এবং এভাবেই নিজের কর্মপন্থা ঠিক করার চেষ্টা করে। কিন্তু সে এটাও জানে বেশিরভাগ মানুষ আসলে এটা পারে না। প্রথমত, বেশিরভাগ মানুষ জানেই না যে তাদের জীবনের লক্ষ্য কি, তারপর সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে কী করতে হবে আবার সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে হাজারটা বাধা আর ডিসট্র্যাকশন তাকে নানাভাবে বিমুখ করে চলে প্রতিনিয়ত। কিন্তু সে এমন নয়, সে একেকবারেই ভিন্ন পন্থায় চলে এবং ভিন্ন পন্থায়

কাজ করে। বহু ভেবেচিন্তে সে কাজে নামে, বহু ভেবেচিন্তে সে নিজের লক্ষ্য স্থির করে, আর যখন সে একবার লক্ষ্য স্থির করে ফেলে তখন আর সেটা থেকে মুক্তি নেই। যেকোনোমূল্যে যেকোনোভাবে তাকে ওটার কাছাকাছি পৌঁছাতেই হবে।

নিজের ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এসে সে তার পাশে ল্যাপটপে কাজ করতে থাকা চুল ঝুঁটি করা ছেলেটার দিকে ফিরে তাকাল। টেকনোলজি জিনিসটা ঠিক তার ধাতে সয় না, কিন্তু সে বোকা নয়, সে জানে এই যুগে টেকনোলজি ছাড়া চলবে না। আর তাই একদিকে এইসব তথাকথিত 'টেকগাই'দেরকে তার কেন জানি বিরক্ত লাগে, অন্যদিকে এরা কাজের মানুষ এটাও সে উপলব্ধি করতে পারে।

'কি, কাজ হচ্ছে?' গম্ভীর গলায় জানতে চাইল সে।

চুল ঝুঁটি করা ছেলেটা অতীব উৎসাহের সাথে মাথা নেড়ে নেড়ে তাকে অনেককিছু বোঝানোর জন্যে উঠে পড়ে লাগছিল কিন্তু সে একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো। 'সহজ দুইটা প্রশ্ন করব, সহজে দুইটা উত্তর দিবা।'

ঝুঁটির চুল নেড়ে ছেলেটা সায় জানাল, কখনোই জোরে কথা বলে না, ধমক দেয় না লোকটা, কিন্তু তাকে সে ভয় পায়।

'ওরা কই আছে আমরা জানি?' বলে সে ভ্রু কুঁচকালো। 'ওরা কী করতেছে সেইটা বোঝা যাইতেছে? এইবার বলো।'

ছেলেটা ধীরে ধীরে সব বুঝিয়ে দিলো তাকে যতটা সম্ভব সহজে সব বোঝা শেষ হবার পর সে মুখ তুলে হাসি দিলো একটা। এবার খেলা জমে উঠেছে পুরোপুরি।

দ্বিতীয় অংশ : সত্যাভিযান

অধ্যায় উনিশ

সময়: ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ

জল-জঙ্গল এলাকা

তীব্র ঝড়-বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ে গেল নিজের মায়ের মুখে শোনা গল্প। ঠিক এরকমই এক ঝড়ের রাতে নাকি তার জন্ম হয়েছিল। তার মায়ের বেশ বয়সকালের সন্তান ছিল সে। চার ভাইয়ের পর জন্ম হয়েছিল তার। তার বাবার খুব শখ ছিল একটা মেয়ের আর তাই তার জন্মের পর পুরো এলাকাতে খুশির বন্যা বয়ে গেছিল। নিজের মায়ের মুখে শুনেছে সে। কিন্তু তার জন্মের আগে নাকি অনেক ঝামেলা হয়েছিল, বিশেষ করে তাদের পারিবারিক বৈদ্য অনেক চেষ্টা করেও তার মায়ের সমস্যা দূর করতে পারেনি। এত ঝামেলার পরও তার জন্ম হয় ভালোভাবেই। খুশির বন্যা বয়ে যায় পুরো এলাকাতে। কারণ রাজকুমারীর জন্ম বলে কথা।

শেষ কথাটা মাথায় আসতেই নিজের মুখেই খানিকটা টিটকারির একটা হাসি ফুটে উঠল তার। রাজকুমারী! এই পোড়ো জঙ্গল আর পানির এলাকার এক ছোটো ঝুপড়ি ঘরে বসে নিজের জীবনের সবচেয়ে বাজে সময়ের মুখোমুখি হয়ে ঝড় দেখতে দেখতে সে কি না নিজেকে   যাই হোক, যেমনই হোক নিজের পরিচয় তো আর ফেলে দেওয়া যায় না। জন্ম তো হয়েছিল তার রাজকুমারী হিসেবেই। বাঙাল মুল্লুক থেকে হাজারো ক্রোশ দূরের এক দেশে রাজপরিবারেই জন্ম হয়েছিল তার। পাহার আর সমতলভূমির সঙ্গমস্থলে বিচিত্র আর শক্তিশালী রাজ্যের রাজপরিবারে, যারা এক সময় পাহাড় জঙ্গল আর সমভূমির পুরোটাই শাসন করত সুখ-শান্তির সাথে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হাজার বছরের পুরনো রাজ্যের সুখ-শান্তি কি না তার জীবদ্দশাতেই এসে শেষ হয়ে গেল। এটাকে সে কী বলবে নিজের দুর্ভাগ্য, রাজ্যের দুর্ভাগ্য, নাকি সময়ের দাবি? এক সময় বিষয়টা নিয়ে খুব ভাবত সে কিন্তু এখন আর সেটা নিয়ে খুব একটা ভাবে না। কী হবে সেই অতীত নিয়ে ভেবে যে অতীত অতীতের গর্ভেই হারিয়ে গেছে? যাই হোক, তার জন্মের পর সে আর দিনটা রাজকুমারীর মতোই বড়ো হয়ে উঠছিল। কিন্তু তাদের রাজ্যের কিছু কঠিন নিয়ম ছিল। এর ভেতরে অন্যতম একটা হলো, রাজপরিবার হোক আর সাধারণ পরিবার

হোক কারও, জন্ম হলে তাকে কোনো একটা বিশেষ গোত্র কিংবা পেশার সাথে জড়িয়ে থাকতে হবে এবং ছোটোবেলা থেকে সে রাজপরিবারের সাথে থাকলেও তার জীবন ধারা পরিচালিত হবে সেই বিশেষ গোত্রের মতো করেই। তাদের রাজ্যে তিনটে মূল ভাগ ছিল। আর এই তিনটে মূল ভাগের মধ্যে একটা ছিল যারা জঙ্গলে বাস করত এবং জঙ্গলের পথ নিয়ন্ত্রণ করত; আরেকটা ছিল পাহাড়ি ভাগ, যেটা ছিল তাদের মায়েদের গোত্র; আরেকটা ছিল মূল রাজপরিবার যারা দুর্গে বাস করত। আর রাজ্যের পুরুষদের সাথে সাথে নারী যোদ্ধাদেরও একটা শ্রেণী ছিল, সে তার নিজের লোকদের মুখে শুনেছে এই নারী যোদ্ধাদের জন্ম হয়েছিল বহু বছর আগে এক যুদ্ধের সময়ে যখন পুরুষদের সাথে নারীরাও রাজ্য রক্ষার জন্যে যুদ্ধে মেতেছিল শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে। সেই যুদ্ধের পর থেকে রাজ্যে নারী যোদ্ধাদেরও একটা গোত্র পরিচালিত হতে শুরু করে।

ছোটোবেলাতেই সিদ্ধান্ত হয় রাজকুমারী এই নারী যোদ্ধা গোত্রের সাথেই বড়ো হয়ে উঠবে। কাজেই রাজমহলে বড়ো হলেও একেবারে ছোটোবেলা থেকেই কঠিন প্রশিক্ষণ আর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে বড়ো হয়ে উঠতে থাকে। সেই জীবনটা কঠিন হলেও কেন জানি আজো সেই জীবনটাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে সে। এভাবেই একদিকে গোত্র প্রশিক্ষণ আর অন্যদিকে রাজপরিবারের শিক্ষায় বড়ো হয়ে উঠতে থাকে সে। কিন্তু গোলটা বাধে সে বড়ো হয়ে ওঠার পর। ছোটোবেলা থেকেই সে দেখে এসেছে তাদের রাজ্য সবদিক থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী, সমন্বিত এবং পরিপূর্ণ। একদিকে রাজ্যের অবস্থানগত কারণে পথযাত্রীদের টোল আদায়ের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ আয় হতো, সেই সাথে পাহাড়ি গোত্র ছিল চাষে পরিপূর্ণ, অন্যদিকে জঙ্গলের পথ নিয়ন্ত্রণকারী ছিল সবদিক থেকেই সামরিক শক্তিতে পরিপূর্ণ। কাজেই তাদের রাজ্যে কোনো সমস্যা ছিল না কখনোই। এছাড়াও তাদের রাজ্যে ছিল বিরাট এক দুর্গ যা সুরক্ষিত ছিল সবদিক থেকেই। সে পরিবারের সবার মুখে শুনেছে–হাজার দুই বছর আগে একবার তাদের রাজ্যে বাহির শত্রুর আক্রমণ ছাড়া আর কখনোই কিছু হয়নি।

কিন্তু একটা রাজ্য তো আর শুধু শক্তি আর অর্থনীতি দিয়ে টিকে থাকে না। টিকে থাকে মানুষ নিয়ে। সে কিংবা তার পরিবার জানত না–বহিঃস্থ শত্রু নয়, বরং তাদের রাজ্য ফাঁপা হয়ে উঠেছে ভেতরের দুর্জনদের কারণে। সে যখন কৈশোরে পদার্পণ করল তখন জানতে পারল: প্রকৃতপক্ষে কেন তাকে তার পরিবার নারী যোদ্ধা গোত্রের একজন সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলেছে আর সব রাজ্যের রাজারা ছেলের জন্যে উতলা হয়ে থাকলেও, কেন তার বাপ নিজের চার ছেলে সন্তান থাকার পরও একটা মেয়ের জন্যে এতটা অস্থির হয়ে উঠেছিল! তাদের রাজ্যের এক গোপন রহস্য ছিল, যেটা তারা বহু বহু বছর ধরে অত্যন্ত সংগোপনে লালন করে

এসেছে। শুধুমাত্র রাজ্যের খুবই গুটিকয় কর্তাব্যক্তি আর এই বিশেষ নারী যোদ্ধা গোত্রের একটা অংশ বাদে এই রহস্যের ব্যাপারে খুব বেশি মানুষ জানে না। যে-কারণে মূলত এই রহস্যকে আগলে রাখাই এই নারী গোত্রের মূল কাজ। আর এদের একজন হিসেবে নিজের পারিবারিক রহস্যকে লালন করে যাবার জন্যেই এই গোত্রের অংশ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে তাকে। এই বিষয়টা এমনকি তার রাজ্যের ভেতরের মানুষও জানে না। কৈশোরে পদার্পণ করার পর বিষয়টা তাকে জানানো হয় এবং এই বিষয়ে তাকে সুশিক্ষিত করে তোলা হয় ধীরে ধীরে। কিন্তু এই বিষয়ে পুরোপুরি শিক্ষিত হয়ে ওঠার আগেই ঘটে যায় চূড়ান্ত বিপর্যয়। ভেঙে পড়ে তাদের রাজ্য, শাসন ব্যবস্থা এবং পুরো পরিবার।

একটা রাজ্য যে-কয়টা সম্ভাব্য পন্থায় ভেঙে পড়তে পারে কিংবা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে তার মধ্যে অন্যতম এবং ভয়ঙ্করতম হলো অন্তর্কোন্দল। আর তাদের রাজ্যের এই একই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তার বাবা সুশাসক হলেও ঠিক সেই অর্থে শক্ত মানুষ ছিল না। বলতে গেলে সে অনেকটা সুন্দরের চর্চা করা আমুদে ভালো মানুষ ছিল। আর নিজের ছেলেদেরকেও অনেকটা সেভাবেই গড়ে তুলছিল সে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল সে নিজে, এটাও ঘটেছিল মূলত তার মায়ের এবং নারী গোত্রের যোদ্ধাদের কারণে। যাই হোক, তার বাবা শাসক হিসেবে ভালো হলেও তার মধ্যে একদিকে দূরদর্শিতার অভাব তো ছিলই, সেই সাথে ছিল মানুষের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস। আর এর সুযোগ নিয়েই তার পরিবারের ভেতরেই জন্ম নিচ্ছিল এক দানবের। তার নিজেরই চাচা।

আগেই বলা হয়েছে: তাদের রাজ্যে রাজা একজন থাকলেও মূল তিনটা ভাগ আছে এবং রাজপরিবার পুরো রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করলেও এই তিনটা ভাগ অনেকটা স্বতন্ত্রভাবেই নিজেদের কাজ পরিচালনা করে। কিন্তু প্রত্যেকভাগেই রাজপরিবার থেকে একজন প্রতিনিধি তো থাকে, এমনকি প্রতিভাগের সাথে অন্যভাগের পারিবারিক বন্ধনও তৈরি করা হয় তাদের ভেতরে বিয়ে দিয়ে। এতে করে রাজ্য শাসন চলে সুন্দরভাবে এবং বলতে গেলে সবার সাথে সুসম্পর্কও বজায় থাকে। অন্তত বিবাহের কারণে সবাই পরস্পরের সাথে আত্মীয়তার সম্বন্ধে আবদ্ধ হবার কারণে। এমনটাই চলে এসেছে তাদের রাজ্যের হাজার বছরের ইতিহাসে।

কিন্তু এই সাম্য ভেঙে যায় তার বাবার আমলে এসে। এর পেছনে কারণ ছিল তার চাচা। তার চাচা তার বাপের চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোটো ছিল, সত্য কথা হলো–তার বাবা সবদিক থেকে মানুষ হিসেবে ভালো হলেও, তার চাচা ছিল ছোটোবেলা থেকেই অনেক বেশি যোগ্য শক্তিশালী এবং শক্ত প্রকৃতির। এই কারণেই তার চাচাকে জঙ্গলপথের গোত্রের সাথে জুড়ে দেওয়া হয় ছোটোবেলা থেকে। কারণ সামরিক দিকেই তার আগ্রহ ছিল। তার বাবার আমলে রাজ্য

ভালোভাবেই শাসন হলেও, তার চাচা দিন দিন শক্তি বৃদ্ধি করে নিজের ভাইকে সরিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করছিল। ভেতরে ভেতরে নিজের ভাইকে সরিয়ে পুরো রাজ্য দখল করে রাজা হয়ে যাবার বাসনা দিন দিন বৃদ্ধি পেতেই থাকে তার। আর ছোটো এই বীজ একসময় মহীরুহে পরিণত হয়। একসময় সরাসরি সে তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে সে, দখল করে নেয় পুরো দুর্গ। একে তো সে যে গোত্রের সাথে বড়ো হয়ে উঠে সেটা সামরিক গোত্রই, অন্যদিকে তার শাসন ব্যবস্থায় সমস্ত সৈনিকেরা পরিচালিত হয়। তার ওপরে রাজ্যের একটা বড়ো অংশের প্রহরাও পরিচালিত হয় তার অধীনেই, তাই যখন সে সুযোগ বুঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল, তার বাবার আসলে তেমন কিছু করার ছিল না সামান্য প্রতিরোধ করা ছাড়া। তবে তার বাপ নিজের ছোটো বাহিনী নিয়ে তাদের হাজার বছর ধরে লালন করে আসা রহস্য রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর ছিল। আর তাই সেই আরাধ্য রহস্য সে তার কাছে গচ্ছিত রেখে রাজ্য প্রতিরোধ করে নারী বাহিনীর অল্পকিছু সদস্যসহ তাদেরকে দুর্গের গোপন পথ দিয়ে বের করে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেয় কাছাকাছি বন্দরে। সেখানে আগে থেকেই একটা জাহাজ ছিল, সেটা দিয়ে মধ্য জলধারা পার হয়ে তারা চলে আসে উপমহাদেশের অন্যপ্রান্তে।

কিন্তু এলে কী হবে? বিপদ তাদের পিছু ছাড়ছিল না। এর পেছনে কারণও ছিল। তারা যখন মধ্য জলধারা পার হচ্ছে এমন সময় তার চাচা পুরো রাজ্য দখল করে নেয় এবং চারপাশে তাদের নামে হুলিয়া জারি করে অনেক স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কারও ঘোষণা করে। কাজেই মধ্য জলধারা পার হলেও তারা অন্য যে বন্দরে পৌঁছায় সেখানে পৌঁছে ঠিক নিরাপদ বোধ করছিলা না। এমন সময় সেই বন্দরে তার সাথে পরিচয় হয় এক ভিনদেশির–সুবাদার অসলাম শেঠ। ঠিক তাদের মতো রাজপরিবার না হলেও বাঙাল মুল্লুকের বেশ সুশিক্ষিত এবং সমৃদ্ধ পরিবারের ছেলে। একদিকে যোদ্ধা, আরেকদিকে খানিকটা পাগল, আবার হৃদয়বান। কচিৎ এক ঘটনার মাধ্যমে তার পরিচয় হবার পর সে তাকে সব খুলেই বলে। শুধু সেই রহস্যের বিয়ষটা বাদে। সব শুনে আসলাম শেঠ তাকে সহায়তা করার আশ্বাস দেয়।

অনেক ঘাতপ্রতিঘাত পার হয়ে পারস্য দেশের সেই প্রান্ত থেকে তারা পৌঁছায় তুর্কির আরেক অঞ্চলে। সেখানেও বহু ঘটনার আর অঘটনার পর অবশেষে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের মতো যা করার উপায় ছিল সেটাই করার চেষ্টা করে আসলাম শেঠ, তাকে নিয়ে রওনা দেয় নিজের দেশ বাঙাল মুল্লুকের উদ্দেশ্যে। তখন তাকে নিরাপদে রাখতে হলে ওটাই ছিল সর্বোত্তম পন্থা। সে কখনোই ভাবেনি এরকম ভিনদেশি এক পুরুষের সাথে তাকে সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে ভিনদেশের পথে রওনা দিতে হবে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যে। কিন্তু তাই করতে হয়, প্রথম বিষয়টা তাকে ভেতরে ভেতরে একেবারে কুড়েকুড়ে খেত, কিন্তু সেই সমুদ্র যাত্রায় সেই

বাঙাল মুল্লুকের হৃদয়বান মানুষটার প্রেমে পড়ে যায় সে। ভারতবর্ষের প্রথম বন্দরে পা রাখতেই বিয়ে করে তারা দুজনে, তারপরও আরও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তারা অবশেষে পৌঁছায় বাঙাল মুল্লুকে। পরিবারের একমাত্র ছেলেকে পেয়ে আসলাম শেঠের বাবা-মা যারপর নাই খুশি হয়েছিল, তার ওপরে ভিনদেশি বউ পেয়ে তাদের খুশি যেন বাধ মানছিল না। সে প্রথমে ভেবেছিল ভিনদেশ, ভিন্ন মানুষ হয়তো মতের মিল হবে না কিন্তু আসলাম শেঠের পরিবারের সাথে এতটাই ভালোভাবে মিশে যায় কখনও মনেই হতো না সে ভিন্ন দেশ ভিন্ন পরিবার থেকে এসেছে। ভিন্ন দেশে এসে আবারও নিজের আরেক নতুন পরিবার খুঁজে পায় সে। ধীরে ধীরে আসলাম শেঠ পরিবারের কর্তা হয়ে ওঠে, একে-একে মারা যায় তার বাবা মা। নিজের শাসন অঞ্চল আর রাজ্যের দিকে মনোযোগ দেয় সে। কিন্তু শান্তি যেন তার কপালে নেই। এবার বাঙাল মুল্লুকে দেখা দেয় দুর্যোগের ঘনঘটা।

বাঙাল মুল্লুকের ওপরে নজর পড়ে মোঘলদের। এই অঞ্চলে এমনিতেই কিছুটা স্বাধীনচেতা শাসকেরা বাস করত, সুবাদার আসলাম শেঠও তাদেরই একজন ছিল। আর তাই মোঘলদের নজরে পড়ার পরও তারা নিজেদের সম্মান বজায় রেখে স্বাধীনতাই ঘোষণা করে বসে এবং নিজেদের নামে খুতবা চালু করে। আর এটার প্রভাব গিয়ে ঠেকে দিল্লিতে। লেগে যায় যুদ্ধ, যুদ্ধের পর পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়ে ওঠে একসময় তাদের ওপরেও নজর পড়ে শত্রুদের। এমন সময় নিজের পরিবারের প্রথা ভেঙে সে তার স্বামীকে জানিয়ে দেয় তার রহস্যের কথা, সেটা শুনে খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে সুবাদার। সে শলাপরামর্শ করে বাঙাল মুল্লুকের বারো ভূঁইয়াদের প্রধান ঈশা খাঁর সাথে। তার ঠিক পর দিকেই আক্রমণ হয় জঙ্গলমহালে। সুবাদার আসলাম শেঠ আসলে ঠিক বুঝতে পারেনি যে এত দ্রুত আক্রমণ হবে তাদের ওপরে। তারপর একসময় যখন সে বুঝতে পারে জঙ্গলমহাল পতনের দারপ্রান্তে, তখন নিজের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বাহিনী প্রধানের সাথে তাদের নারী যোদ্ধাদের দলটাকে জঙ্গলমহাল থেকে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দেয়। এরপর–বাকিটা ভাবতেই তার চোখ অশ্রুতে ভরে উঠল। নিজের মাতৃভুমি থেকে হাজারো ক্রোশ দূরে যে ভূমিতে নিজের আশ্রয় এবং ভালোবাসা খুঁজে পেয়েছিল সেটাও ধরে রাখতে পারল না সে। আগলে রাখতে পারল না নিজের ভালোবাসার মানুষটাকে। তবে নিজের দায়িত্ব এখন পর্যন্ত সে রাখতে পেরেছে, আগলে রেখেছে হাজার বছরের পুরনো সেই–

'বেগম সাহেবা মেহের, গোস্তাকি না নিলে ভিতরে আসব–'

মানুষটার কথা শুনে অশ্রু চোখেই হেসে ফেলল সে। রাজ্য চলে গেছে অথচ রাজকীয় আদব যায়নি। মানুষটা বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজছে কিন্তু তার অনুমতি না নিয়ে ঝুপড়ির ভেতরে আসতে চাচ্ছে না।

'আসো, সুলতান। জলদি ভেতরো আসো,' বলা মাত্রই ভেতরে প্রবেশ করল। সে এবং তার প্রধান রক্ষী রায়েলির দিকে একবার দেখে নিয়ে তার দিকে ফিরে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মান প্রদর্শন করল। 'বলো সুলতান, পরিস্থিতি কী?' সুলতান ছিল আসলাম শেঠের সেনাবাহিনীর কনিষ্ঠতম সেনাপতিদের একজন। বলিষ্ঠ, সাহসী এবং তারুণ্যে ভরপুর ছেলেটার নেতৃত্বেই আসলাম শেঠ তাদেরকে পালিয়ে যাবার জন্যে ব্যবস্থা করেছিল আর এখন পর্যন্ত সুলতান সেই ভরসা খুব ভালোভাবেই রেখেছে। আর হ্যাঁ, অবশ্যই তার প্রধানরক্ষী এবং নারী যোদ্ধাদের প্রধান রায়েলিও আছে।

সুলতান ভেতরে প্রবেশ করতেই মেহের দেখতে পেল ছেলেটা একেবারে ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে। তারমানে ওরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছে সেই জায়গার অবস্থা ওদের এই ঝুপড়ির চেয়ে অনেক খারাপ। ব্যাপারটা মেহের আরও ভালোভাবে ধরতে পারল ছেলেটার লাল দুই চোখ দেখে। যদি সে শুধুমাত্র এখানে আসার সময়ে ভিজত তবে তার চোখদুটো লাল হতো না, এটা হয়েছে দীর্ঘক্ষণ ধরে ভেজার কারণে। জঙ্গলমহাল থেকে ওরা যারা পালাতে পেরেছিল তাদের সবার অবস্থাই যে একেবারে শেষ পর্যায়ে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। জঙ্গলমহাল থেকে ওরা পালাতে পেরেছিল মোট নয়জন। এর ভেতরে ছিল সুবাদার অসলাম শেঠের স্ত্রী মেহের, তার সবচেয়ে কাছের মানুষ এবং তার নারী দলের প্রধান রায়েলি, আর রায়েলির সাথে আরও তিনজন নারী যোদ্ধা, যারা তার সাথে সেই পারস্য থেকে ভ্রমণ করে বাংলায় এসেছিল। আর সুলতান এবং তার সাথে আরও তিনজন। এই নয়জন মোট মানুষ, খুবই স্বল্প কিছু জিনিসপত্র এবং মেহেরের নিজের বড়ো একটা লোহার বাক্স। এই নয়জন থাকার পেছনে মূল কারণ ছিল, ওরা জঙ্গলমহালের গোপন পথে বের হয়ে যে সরু ছিপ নৌকাটায় করে পলিয়েছিল সেটাতে এরচেয়ে বেশি মানুষ ধরার কোনো উপায় ছিল না। এছাড়াও যত বেশি মানুষ হতো ধরা পড়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যেত। ওরা জঙ্গলমহাল থেকে পালিয়েছে রাতের শেষ প্রহরে, জঙ্গলমহাল থেকে নৌকাটায় করে পালানোর সময়ে ভোরের আলোয় দেখতে পেয়েছে দাউ দাউ করে জ্বলছে জঙ্গলমহাল। কিন্তু খুব বেশি সময় আসলে আবেগি হবার সময় ছিল না। ওরা যেখান থেকে পালিয়েছে সেখান থেকে বড়ো নৌকায় করে পালাবার কোনো উপায় ছিল না। আর এই ছোটো নৌকায় করে উপায় ছিল না খুব বেশি দূরে যাবার, কাজেই ওরা যতটা দ্রুত পেরেছে সবাই হাত লাগিয়ে বৈঠা চালিয়েছে কারণ এটাই ছিল নৌকাটা নিয়ে দ্রুততম সময় সরে পড়ার একমাত্র উপায়। তবে সুবাদার আসলাম শেঠ বুদ্ধিমান মানুষ ছিল, কাজেই এরকম কিছু হতে পারে সে আগে থেকেই জানত এবং মেহেরদেরকে নির্দেশনাও দিয়েছিল

সেই মতো। ওরা নৌকাটা নিয়ে জানপ্রাণে পালিয়ে যখন বুঝতে পেরেছে আপাতত বাহরাম খাঁর আয়ত্ত থেকে বেরোতে পেরেছে সাথে সাথে ওরা সুবাদার আসলামের পরিকল্পনা অনুসরণ করতে শুরু করে। ওখান থেকে তার প্রথমে পৌঁছায় একটা জেলেদের গ্রামে। ওখানে আগে থেকেই একটা মধ্যম আকারের নৌকা রাখা ছিল, যেটা মোটামুটি দূরত্ব পাড়ি দিতে সক্ষম। ওটাতে খাবার, প্রয়োজনীয় অস্ত্রসস্ত্রসহ আরও বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় রসদও রাখা ছিল। সুবাদার আসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী ওদের পরিকল্পনা ছিল দুটো। এক, ওরা ওখান থেকে বেরিয়ে হয় বমার নদী হয়ে হাওড়ে গিয়ে পড়বে এবং সেখান থেকে পূর্ব দিকে সরতে সরতে মোঘলদের চোখ ফাঁকি দিয়ে রসুল খাঁর এলাকায় যাবার চেষ্টা করবে। তবে সুবাদার আসলাম এটাও বলে দিয়েছিল যে এটা বাস্তবায়ন হবার সম্ভাবনা কম, কারণ মোঘলরাও জানে ওরা পালাতে চাইলে এটাই সহজ পথ, কাজেই ওদের নজর এদিকেই থাকবে সবচেয়ে বেশি। আর হয়ও সেটাই, ওদিক দিয়ে পালাতে গিয়ে ওরা গিয়ে পড়ে মোঘলদের টহলরত এক বাহিনীর সামনে, যদিও বেশ দূর থেকে ধাওয়া করাতে তারা ওদেরকে ধরতে পারেনি, কিন্তু ওটা থেকে পালাতে গিয়ে ওরা ঢুকে পড়ে জল-জঙ্গল এলাকার একেবারে গভীরে। এখানে এসে এক দ্বীপে আশ্রয় নিয়ে একদিন কাটানোর পরদিন যখন ওরা পূর্বে কাজ না হাওয়াতে পশ্চিমে রওনা হয়, কিন্তু কিছুদূরে এগানোর সাথে সাথে বুঝতে পারে ওদের পেছনে লেগেছে অন্তত তিনটে বড়ো বড়ো জালিয়া ও সুবেদারি। দূর থেকে জালিয়াগুলোর নিশানা দেখেই সুলতান ওদেরকে নিশ্চিত করে এগুলো বিশা ডাকাতের জালিয়া। ছোটো খালবিলে ওদেরকে ধাওয়া করে বেশি একটা সুবিধা করতে পারছে না ওরা। কিন্তু একবার খোলা পানিতে গিয়ে পড়লেই আর দেখতে হবে না, মুহূর্তের ভেতরে ধরে ফেলবে ওদেরকে। প্রায় দেড় দিনের মতো বিশা ডাকাতের বাহিনীর সাথে লুকোচুরি খেলে ওরা উলটো পথে আবারও ঢুকে পড়ে জল-জঙ্গলের আরও গভীরে। তারপর পেরিয়ে গেছে একদিন। এখানেই মাঝিদের কয়েকটা ঝুপড়িতে আশ্রয় নিয়েছে ওরা। আজ রাতের শেষ প্রহরে জোয়ার আসামাত্র নৌকা ভাসানোর কথা ছিল কিন্তু তার আগেই শুরু হয় ঝড় বৃষ্টি।

মেহের অনুমতি দেওয়া মাত্রই পরিস্থিতি বয়ান করা শুরু করল, 'বেগম সাহেবা, বৃষ্টির বেগ তো বাড়তেই আছে।'

'তোমরা যে ঝুপড়িগুলাতে আশ্রয় নিছ, সেইগুলা তো খুব সুবিধার মনে অইতেছে না। তোমরা কি খাইতে পারছ?'

মেহেরের প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না সুলতান, সাথে সাথে বিয়ষটা বুকের ভেতরে *খচ* করে লাগল মেহেরের। এরমানে খাবার যা ছিল সাথে সেগুলো শেষ।

তার মানে দুপুরের পর ওদের দলের কেউ ঠিকমতো খেতেও পারেনি। 'সুলতান, আমার কাছে কিছু শুকনা খাবার আছে সেইগুলা তোমরা নিয়া যাইয়ো। নৌকা আর শত্রুর খবর কও দেখি,' মেহেরের বাংলায় এখনও পারস্যের টান প্রকট।

'বেগম সাহেবা,' সুলতান তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আবার নামিয়ে নিলো। 'নৌকার অবস্থা এখনও বেশি ভালো না, কাম শেষ করনের আগেই বেলা পইড়া গেল। তারপর তো বৃষ্টি আইয়া পড়ল,' বিশা ডাকাতের তাড়া খেয়ে পালানোর সময়ে নৌকাটা আঘাত পেয়েছিল, সেটা মেরামত করাটাও এখানে থামার অন্যতম একটা কারণ।

'নাও কি পানিতে নামানি যাইব?' রায়েলি জানতে চাইল।

'পানিতে হয়তো নামানি যাইব কিন্তু–'

'যাই আছে সেইটা লইয়াই প্রস্তুত থাকতে কও সবাইরে,' বলে সে বড়ো করে একবার দম নিলো সবচেয়ে বাজে খবরটা এখন জানতে হবে।

'এইবার বলো মোঘলরা কিংবা বিশা ডাতাইতের বাহিনীর কোনো খোঁজ আছে কি না?' মেহের দেখল সুলতান দ্বিধা করছে। 'তারমানে খবর ভালো না, তাই না?'

'জি বেগম সাহেবা, শেষ বার যখন হেরা আমগোর পিছে লাগছিল এইখানে ঢুকুনের আগে আমি ভাবছিলাম হেগোরে খসানি গেছে, কিন্তু আদতে সেইটা হয় নাই। আসলে ওরা ঠিকই টের পাইছিল, অন্তত ধারণা করতে পারছিল আমরা কুনদিকে যাইতে পারি। অন্তত দুইটা বড়ো নাওরে আমরা দেখছি এই এলাকার অশেপাশে চক্কর কাটতে।'

'বুঝতে পারছি ওরা ঝড়ের কারণে নাও ভিড়াইতে পারতাছে না,' খুব শান্ত স্বরে কথা বলে উঠল। 'শোনো, রায়েলির কাছ থেইকা খাবারগুলা নিয়া যাও। গিয়া সবাই ভাগ কইরা খাও, তারপর সব গুছায়া বিশ্রাম করার চেষ্টা করো, তবে,' বলে সে একটা আঙুল তুলল প্রস্তুত অবস্থায়। যাতে যেকোনো সময় যেকোনো পরিস্থিতি সামলানি যায়। আর অন্তত দুইজন বাইরে পাহারায় রাখ। দেখি কী করা যায়।'

মেহের বুঝতে পারছে না ঝড়টা তাদের জন্যে আশীর্বাদ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে নাকি অভিশাপ হিসেবে! কারণ এই ঝড়ের কারণে একদিকে ওরা আটকে গেছে, কষ্ট পাচ্ছে। আবার এটার কারণেই শত্রুরা ওদের ওপরে আক্রমণ করতে পারছে না। আবার অন্যদিকে এই ঝড় না থামলে ওরাও পালাতে পারবে না, আবার ঝড় থামলেই শত্রুরা আক্রমণ চালাবে। ও কি এটা থামার জন্যে প্রার্থনা করবে, নাকি চলতে থাকার জন্যে–ঠিক বুঝতে পারছে না। হঠাৎ করেই তার একটা কথা মনে পড়ল, তার স্বামী বিদায়ের ঠিক আগমুহূর্তে তাকে বলেছিল ঈশা খাঁ জানলে অবশ্যই সাহায্যের জন্যে লোক পাঠাবে। মনে মনে ভাবতে লাগল, কী করছেন খাঁ সাহেব?

***

মাসুমদের রসুল খাঁর এলাকায় পাঠানোর পরেই ঈশা খাঁ বারো ভূঁইয়াদের কয়েকজন এবং নিজের পরিষদদের নিয়ে জরুরি আলোচনা সভায় বসেছে। নিজের সভাসদ সরফরাজ, প্রধান উপদেষ্টা লতিফ খাঁ থেকে শুরু করে ভূঁইয়াদের ভেতরেও অনেকে উপস্থিত তার এই অস্থায়ী আস্তানাতে।

'পরিস্থিতি বয়ান করো,' নিজের দাড়িতে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে সে নিজের একান্ত সচিবকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল ঈশা খাঁ।

'হুজুর, কত্রাবো থেকে মোঘলেরা পিছু হটে গেছে, অন্যান্য এলাকাও ওরা ধইরা রাখতে পারবো না,' সচিব কথা বলার সাথে সাথে সবাই ঈশা খাঁর দিকে তাকাল। স্বাভাবিকভাবেই এটা সুখবর, কিন্তু খাঁ সাহেবের মুখে কোনো হাসি ফুটে উঠল না, সে বরং চিন্তিত ভঙ্গিতে নিজের দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলে উঠল, 'এটা তো হওয়ারই ছিল। এই কারণেই তো ওই এলাকাগুলাতে বেশি একটা জোর লাগাই নাই আমরা। বরং বুঝতে চেষ্টা করতেছিলাম যে ওরা কতখানি শক্তি যোগাইতেছে,' বলে সে চোখ তুলে তাকাল তার সভাসদদের দিকে। 'এত তাড়াতাড়ি ওরা ছাইড়া দিবে আমি ভাবি নাই। আমি ভাবছিলাম ওরা অরো কিছুদিন বলদের মতন ধইরা রাখবে। কিন্তু সেইটা তো হইল না। অন্যান্য এলাকার কী অবস্থা বয়ান করো এবং মানসিংহের বাহিনীর কী অবস্থা সেইটাও জানতে অইব।'

'হুজুর, ওইদিকে খারাপ খবর আছে একটা,' খাঁ সাহেবের সচিব কিছু বলার আগেই আরেক সভাসদ বলে উঠল, 'মানসিংহ এগারো সিন্ধু দখল কইরা নিছে আর সেই সাথে–'

'বাকি মোঘল ফৌজগো লগে সে ওই এলাকায় জড়ো হওয়া শুরু করছে তাই না?' ঈশা খাঁ চিন্তিত ভঙ্গিতে দাড়িতে হাত বুলাতে লাগল। তাকে এতটা চিন্তিত এর আগে কেউই দেখেনি কখনও। 'এইটা পরিষ্কার যুদ্ধের এলান। আমগোরেও প্রস্তুত অইতে হবে,' বলে সে নিজের সভাসদদের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'আমগো সব শেঠ, সুবাদার আর বারো ভূঁইয়াগো খবর পাঠায়ে দাও, সবাইরে ফৌজ প্রস্তুত করতে বলো। আর আমার নিজেরও অভিযানের প্রস্তুতি নিতে শুরু করো। যেকোনো সময় বাইর হওয়া লাগতে পারে।'

নিজের সভাসদদের সাথে জরুরি আলোচনা শেষ করে সমস্ত নির্দেশনা শেষ করে সে যখন মুক্ত হলো ততক্ষণে রাত অনেক গভীর, নিজের শোবার কামরায় যেতে যতে তার শুধু মনে হতে লাগল, একরকম বলতে গেলে যুদ্ধের ঘোষণা হয়ে

গেছে। যেকোনো সময় সেইটা হয় দাপ্তরিক রূপ পাবে আর হয় শুরু হয়ে যাবে। সবাইকে নিজেদের ফৌজ প্রস্তুত করতে বললেও সে জানে মোঘল বাহিনী কিংবা মানসিংহের সাথে লড়াই করার জন্যে তার ফৌজ মোটেই যথেষ্ট নয়। এই শক্তি মোঘলগোর সামনে স্রেফ হাওয়ায় উড়ে যাবে। এরজন্যে তার অতিরিক্ত শক্তির দরকার। বা প্রয়োজন কোনো একটা দৈবক্রম। মাসুম, তুমি আছ কোথায়? মনে মনে বিড়বিড় করে বলে উঠল সে।

***

মেহেরের লোকেরা যখন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে শুকনো খাবার চিবুচ্ছে মাসুম, বরখা, ধোবল আর নুক্কুন তখন নিজেদের পোশাক পরিচ্ছদ সব ভালোভাবে শরীরের সাথে পেঁচিয়ে নিয়ে, অস্ত্রগুলো শরীরের সাথে বেঁধে নিয়ে উথাল-পাথাল কালো পানির দিকে তাকিয়ে আছে।

মাসুম পানিরই মানুষ এবং জল-কাদা খাল বিল নদীর সাথে তার আত্মার সম্পর্ক কিন্তু তারপরও এই ভয়ঙ্কর ঝড়ের ভেতরে অন্ধকার কালো পানির দিকে তাকিয়ে তারও বুক ভয়ে কেঁপে উঠছে। সে বরকত আর তার লোকদের দিকে ফিরে তাকাতেই বরকত আনমনেই মাথা নেড়ে মানা করল।

মাসুমও মাথা নেড়ে সায় জানাল। সে জানে কেন বরকত তাকে মানা করছে। একে তো গভীর রাতের সময়, তার ওপরে তুমুল ঝড় হচ্ছে সেই সাথে পানিতে জোয়ার আসার প্রস্তুতি সবমিলিয়ে সবচেয়ে সেরা সাঁতারুর জন্যেও এই পানি খুব এটা উপযুক্ত না, তবে এইগুলার কোনোটাই বড়ো ধরনের ঝুঁকি না, সবচেয়ে বড়ো ঝুঁকি হলো পানিতে বিভিন্ন ধরনের গাছের কাণ্ড, টুকরো টুকরো অংশ ভেসে যাচ্ছে ক্রমাগত। একবার এগুলোর কোনোটার সাথে লাগলে আর দেখতে হবে না। তার ওপরে আছে অন্ধকারে দিক হারিয়ে ফেলার ভয়। কিন্তু মাসুম বুঝতে পারছে এমনিতে ওরা পিছিয়ে আছে। যদি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায় তবে, পিছিয়ে থাকার সময় নেই, তার ওপরে আরেকটা ঝুঁকি আছে। সেটা হলো ওদেরকে নামিয়ে দিয়ে বরকতকে ফিরে যেতে হবে সময়মতো, তা না হলে ওরা বরকতকেও ঝুঁকিতে ফেলে দিবে আরও বেশি, ইতিমধ্যেই সে যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছে। মাসুম পানির দিকে তাকিয়ে আনমনেই একবার ঢোক গিলে ধোবল আর বরখাকে দেখল, ওরাও ভয় পাচ্ছে কিন্তু মাসুম অবাক হচ্ছে নুক্কুনকে দেখে। নিজের নোংরা দাঁত বের করে পানির দিকে তাকিয়ে সে এমনভাবে হাসছে যেন কোনো শিকারি নিজের শিকারকে দেখছে। মাসুম তার দিকে তাকাতেই সে কথা বলে উঠল। 'হুজুর, বুঝতাছি আপনেরা ডরাইতাছেন, কিন্তু আমার ডরানি সাজে না, আমার পরিবার

এই এলাকাতে কোনোহানে বিপদে আছে, তাগো জন্যে আমার বিপদ কিছুই না,' বলে মাসুমের দিকে একবার তাকিয়ে পিচ্ছিল পাটাতনের ওপর দিয়ে সে রীতিমতো দৌড় দিলো, তারপর নৌকার কিনারায় পৌঁছায়ে লাফিয়ে হারিয়ে গেল কালো পানির ভেতরে।

মাসুম ধোবল আর বরখার দিকে তাকিয়ে, একবার মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'আর ডরায়া লাভ নাই,' বলে সে দৌড় দিলো। কয়েক ধাপ গিয়েই সাঁতারুর মতো দুই হাত তুলে, থুতনিটাকে বুকের সাথে ঠেকিয়ে সোজা ঝাঁপ দিলো পানিতে, মনে মনে একটাই প্রার্থনাঃ ভাসমান কোনো গাছের গুঁড়ি কিংবা ডালের সাথে বাড়ি না খেলেই হয়।

অধ্যায় বিশ

বর্তমান সময়,
চাঙ্খার পুল এলাকা, ঢাকা

'আমাকে আগে একটা কথা বলেন, পুরো বিষয়টা কী নিয়ে?' বাশার খেতে খেতে সালাদের প্লেট থেকে একটা কাঁচামরিচ তুলে নিয়ে সেটাকে চৌধুরীর দিকে পিস্তলের মতো তাক করে জানতে চাইল।

চৌধুরী খেতে খেতে আনমনেই মাথা নেড়ে জবাব দিলো। 'তোমাদেরকে তো আগেই বলেছি পুরো ব্যাপারটা আসলে কী নিয়ে, সেটা এমনকি আমিও পরিষ্কার জানি না। তবে যেটুকু জানি সেটুকু বলছি,' বলে সে মৃদু হেসে উঠল। 'একটা অবাক করা তথ্য দিয়ে শুরু করি, এখনকার আলোচনায় বারবার শুধু প্রফেসর ইফতেখার আর প্রফেসর আবদেলের নাম এলেও গোটা ব্যাপারটা কিন্তু তারা শুরু করেননি। এর শুরুর ব্যক্তিটা ছিল একেবারেই ভিন্ন কেউ।'

'কে?' বাশার খাওয়া থামিয়ে জানতে চাইল।

সবাই তাকিয়ে আছে চৌধুরীর দিকে। ব্যাপারটা চৌধুরীও অনুধাবন করছে আর তাই সে নাটকীয়তার সুযোগটা ছাড়ল না। মদু হেসে সে ফিরে তাকাল পৃথার দিকে। 'মানুষটা আর কেউ না...তোমার মা, গোটা ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল তোমার মায়ের থেকে।'

'হোয়াট!' শব্দটা এতটাই জোরে উচ্চারণ করল পৃথা আশপাশের টেবিলে খেতে থাকা লোকজন ফিরে তাকাল তাদের দিকে। মুখ থেকে আরেকটু হলে পরোটা আর ডিম ভাজির টুকরো পড়ে যাচ্ছিল তার।

ওরা এই মুহূর্তে অবস্থান করছে পুরনো ঢাকার কাছাকাছি চাঙ্খার পুল এলাকার একটা রেস্টুরেন্টে। এই জায়গার হোটেল রেস্টুরেন্টগুলো বলতে গেলে সারারাতই খোলা থাকে, কারণ এখানে সবসময় লোকজনের সমাগম থাকেই বিশেষ করে বুয়েট, ঢাকা ইউনিভার্সিটিসহ আশপাশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছেলেপেলেরা প্রায়ই রাত বিরাতে খেতে আসে এখানে। আর তাছাড়া জায়গাটা বেশ জনবহুলও বটে। তাই বলতে গেলে ওদের জন্যে নিরাপদও।

এই রেস্টুরেন্টগুলোতে খেতে এসে বাশারেরও বেশ একটা নস্টালজিয়া ফিল হচ্ছে। ভার্সিটিতে পড়ার সময়ে সে একুশে হলে থাকত আর, সেখানে থাকা অবস্থায় এখানেই ছিল তার নিয়মিত যাতায়াত আর খাবারের আয়োজন। বিশেষ করে রাজুর সাথে এখানে কতবার এসেছে ইয়ত্তা নেই। একটা সময় ছিল বন্ধুরা মিলে কয়েকদিন পর পর চাঙ্খার পুলের কালা ভুনা না খেলে জীবন বৃথা মনে হতো। হায় রে, জীবন মানুষকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যায়।

'আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি,' পৃথা প্রথমে ভীষণ অবাক হয়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলে উঠল, 'আপনি কি আমার মায়ের কথা বলছেন?'

চৌধুরী তার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল, 'জি, পৃথা। আমি তোমার মায়ের কথাই বলছি। প্রফেসর ইলা হাসান মাহমুদ।'

'এক মিনিট, উনার নাম শুধু ইলা হাসান, আমি এবং আমার মা, আমরা দুজনেই আমাদের নাম থেকে মাহমুদ অংশটুক এফিডেভিট করে বাদ দিয়েছি, কাজেই ওটা আর বলার প্রয়োজন নেই,' ঝাঁঝের সাথে বলে উঠল পৃথা। বাশার মনোযোগের সাথে দেখছে তাকে।

'ওকে। ইলা হাসান, মানে তোমার মায়ের কথাই বলছি। পুরো ব্যাপারটাতে বারবার প্রফেসর ইফতেখার আর আবদেলের বিষয়টা এলেও শুরুটা তাদের হাত ধরে হয়নি। শুরুটা হয়েছিল প্রফেসর ইলার মাধ্যমে।'

'আর ইউ শিয়োর?' পৃথা আবারও প্রশ্ন করল। সে খাওয়া পুরোপুরি থামিয়ে চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে আছে।

'আমি ব্যাখ্যা করছি, প্রফেসর ইলার জন্ম বাংলাদেশে হলেও খুব অল্প বয়সেই উনি লন্ডনে চলে যান। সেখানেই বড়ো হয়ে ওঠেন এবং প্রফেসর ইফতেখারের সাথে ওখানেই তার পরিচয় এবং বিয়ে হয়। প্রফেসর ইফতেখার তখন অন্য বিষয় নিয়ে স্টাডি করছিলেন। আর ডক্টর ইলার গবেষণার বিষয় ছিল মধ্যপ্রাচ্য এবং ভারতের মাইগ্রেটরি সিস্টেম নিয়ে। উনি আসলে পুরোপুরি আর্কিয়োলজিস্ট ছিলেন না। উনার পড়ালেখার বিষয় ছিল এনথ্রোপলজি এবং আর্কিয়োলজির মিক্সড। এখন যা ঘটছে এই সমস্ত ঘটনার বেশ অনেক বছর আগে উনি একটা বিশেষ কাজে বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশ সরকারের সাথে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বেশ বড়ো একটা প্রজেক্টের কাজে এসেছিলেন উনি। তখন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরটা সেগুন বাগিচায় ছিল, ওটাকে তখন ধীরে ধীরে আগারগাঁও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে স্থানান্তর করা হচ্ছিল। সেইসময়ে উনি কিছু একটার সন্ধান পান, ব্যাপারটার সাথে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, দেশভাগ এবং সিপাহী বিদ্রোহেরও সংযোগ আছে এবং ওটার একটা বড়ো অংশ জড়িয়ে আছে ব্রিটিশ ভারত, শায়েস্তা খাঁ এমনকি বাংলার মোঘল সুবাদার শাহ সুজা

এবং তার আগে বারো ভূঁইয়াদের সাথে,' বলে সে কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমি তো আর বিস্তারিত বিষয়টা জানি না। কিন্তু উনি ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত এমন কিছু একটার সংযোগ পেয়েছিলেন যেটা ওতোপ্রতোভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে। শুধু ভারতবর্ষ বললে ভুল হবে, বলতে গেলে প্রায় পুরো বিশ্ব ইতিহাসের সাথেই জড়িয়ে আছে। উনি এটা নিয়ে বেশ কিছুদিন কাজ করার পর ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে সম্ভবত প্রফেসরের সঙ্গে বিশদভাবে বিষয়টা শেয়ার করেন। প্রফেসর ইফতেখার দীর্ঘদিন কাজ করতে করতে বিরক্ত হয়ে উনার ফিল্ড অব স্টাডি পরিবর্তন করতে চাইছিলেন এবং এটাই তার জন্যে বিরাট একটা সুযোগ হয়ে দেখা দেয়। উনি প্রফেসর ইলাকে নিয়ে বাংলাদেশে চলে আসেন। এরপরের ঘটনা আমার কাছে ঠিক পরিষ্কার না, প্রফেসর ইফতেখারও এই বিষয়ে কথা উঠলে পরিষ্কার কিছু বলতেন না। সম্ভবত এই সময়েই দুজনার ভেতরে সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে এবং প্রফেসর ইলা আবারও ইংল্যান্ডে ফিরে যান। প্রফেসর ইফতেখারের তখন আরেকজন পার্টনার প্রয়োজন ছিল যে-তার মতোই স্কলার হবে এবং এই ফিল্ডে দক্ষতা থাকবে। এরপরে উনারা দুজনে কাজ শুরু করে।'

এবার সোহেল জানতে চাইল, 'ইতিহাসের এতগুলো বিষয় এর সাথে জড়িত, ব্যাপারটা কী হতে পারে? কোনো ধরনের কন্সপিরেসি–'

'ট্রেজার হতে পারে–' পৃথা যোগ করল।

'ট্রেজারের বিষয়ে আমাদের সেকশনের প্রধান হাবিব আনোয়ার পাশা স্যারও বলেছেন,' বাশার বলে উঠল। 'মোঘলদের হারানো কোনো ট্রেজারের সাথে নাকি রাজদ্রোহীর রহস্যের যোগসূত্র থাকতে পারে।'

চৌধুরী কাঁধ ঝাঁকাল। 'হতে পারে আবার নাও পারে, আবার ভিন্ন কিছুও হতে পারে। আমি তো বলেছি প্রফেসর আবদেল আর প্রফেসর ইফতেখার খুব সাবধানে এবং গোপনীয়তা বজায় রেখে কাজ করতেন। আর আমাকে এমনভাবে কাজগুলো দেখাতেন বা দিতেন যে কখনও হাতির ঠ্যাঙ, কখনও শুঁড়, আবার কখনও কান দেখতে পেতাম। কাজেই এগুলো সব একসাথে মিলিয়ে পুরো হাতিটা কেমন সেটা আমি বুঝতেই পারিনি। এবং এখন এটা পরিষ্কার অনুধাবন করতে পারি যে আসলে উনারাই আমাকে বুঝতে দেননি। তবে ট্রেজারের ব্যাপারটা মেলে, কারণ শাহ সুজার যে সময়টার কথা আমরা বলছি সেই সময়টা নিয়ে কাজ করার সময়ে কিছু জিনিস দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। সেটা একটা সম্ভাবনা হতে পারে।'

'ট্রেজারের ব্যাপারটা আরও বেশি সম্ভাবনাময় কারণ এরকম কিছু একটার ইনভলভমেন্ট না থাকলে রেলিক বা নেক্রপলিসের মতো সংগঠনগুলো এসব ক্ষেত্রে এতটা আগ্রহ দেখাতো না,' বাশার অনেকটা মন্তব্য করার মতো করে বলে উঠল। অর্গানাইজেশন দুটোর কথাও সে এবারই প্রথম মেনশন করল। 'কাজেই ট্রেজারের বিষয়টা যায়।'

'কিন্তু এখানে একটা কথা আছে,' চৌধুরী খাওয়া শেষে করে আশপাশে তাকিয়ে বলে উঠল। 'চা পাওয়া যাবে?' বাশার চা অর্ডার দিতেই সে আবারও বলতে শুরু করল। 'ট্রেজার ব্যাপারটার ভেতরেও কিন্তু রকমফের অছে। যেমন তোমরা ময়মনসিংহে যে টুইন কালী উদ্ধার করেছ এটাও কিন্তু একধরনের ট্রেজার, আবার সিলেটে ব্ল্যাক বুদ্ধা পাওয়া গেছে এটাও এক ধরনের ট্রেজার।'

'সেটাই,' বলে মৃদু হেসে উঠল সোহেল। 'আগের দিনের বাংলা কিংবা হিন্দি সিনেমায় যেভাবে দেখাত যে, শুধু মণি-মুক্তা, হীরে-জহরত আর মোহরই যে ট্রেজার হবে, তা কিন্তু না। ধরেন কেউ একজন কোনো জায়গায় অনেক পুরানো কোনো ফসিল খুঁজে পেল কিংবা অনেক মূল্যবান কোনো ধাতু খুঁজে পেল সেটাও কিন্তু ট্রেজার। ক্ষেত্রবিশেষে এগুলো আরও অনেক বেশি দামি ট্রেজার।'

'তারমানে তোমরা বলতে চাইছ–প্রফেসর আবদেল বা ইফতেখার কিংবা পৃথার মা ম্যাডাম ইলা, তারা যেটার সাথেই সংশ্লিষ্ট ছিল সেটা যেকোনো কিছুই হতে পারে?' বাশার চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে উঠল।

'হ্যাঁ, তবে সেটা যাই হোক না কেন এটা অনেক অনেক বড়ো কিছু, আর যদি প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ট্রেজার হয়ও তবে সেটা পুরো ব্যাপারটার একটা অংশমাত্র হবে, গোটা ব্যাপারটা আরও অনেক অনেক বড়ো কিছু–'

'তা না হলে ইতিহাসের এতগুলো অংশের সাথে এত মানুষ এভাবে জড়িয়ে যেত না,' পৃথা ফোড়ন কাটল। 'এতগুলো জীবনও এভাবে নষ্ট হতো না।'

'মোদ্দা কথা, গোটা ব্যাপারটা যাই হোক না কেন, আর এই মুহূর্তে যে অবস্থানেই থাকুক না কেন, এটা বুঝতে হলে কিংবা এর ব্যাপারে জানতে হলে একমাত্র উপায় যেকোনোভাবে প্রফেসর ইফতেখারের কাছে পৌঁছানো।'

'–এবং দ্রুত পৌঁছানো,' বাশার মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল। 'কোত্থেকে শুরু করব আমরা?' প্রশ্নটা সে পৃথা এবং চৌধুরী দুজনের দিকে তাকিয়েই করেছে।

পৃথা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে উঠল। 'আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।'

'তোমার মায়ের থেকে,' চৌধুরী ঘোষণার সুরে বলে উঠল। 'অমি যতটুকু জানি তাতে গোটা ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল তোমার মায়ের থেকে, কাজেই আমাদেরও ওখান থেকেই শুরু করতে হবে।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু বাবাকে খুঁজে বের করতে হলে মাকে দিয়ে শুরু করে লাভ হবে কি আদৌ?'

'হবে,' চৌধুরী চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বলে উঠল। 'কারণ যতদিন দুই প্রফেসরের সাথে কাজ করেছি ততদিনে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে না পারলেও আমাদের ভেতরে কথোপকথন তো হতো। আমার পরিষ্কার মনে আছে প্রফেসর ইফতেখার মাঝে-মধ্যেই দুষ্টামি করে বলতেন: তার যদি কখনও কিছু হয় কিংবা

তিনি যদি কখনও হারিয়ে যান, তাহলে ইলা মানে তার স্ত্রীর মাঝে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে,' এটুকু বলে চৌধুরী মাথা নাড়ল। 'বাই দ্য ওয়ে, প্রফেসর ইফতেখার আমার সাথে যা করেছেন তাতে তাকে একটা দানব ছাড়া আর কিছু বলার উপায় নেই। কিন্তু এটাও ঠিক তিনি তোমার মাকে ভীষণ ভালোবাসতেন।'

'ভালোবাসা যদি বেঁচে থাকতেই মূল্য না পায় তবে–'

'আচ্ছা, আমরা ম্যাডাম ইলাকে নিয়ে ঠিক কীভাবে শুরু করব?' পৃথার কথার মাঝেই বাশার বলে উঠল, সে আরেক দফা ইমোশনাল আলোচনার ভেতরে যেতে চাচ্ছে না, তাই কাজের কথা বলে উঠল। 'তার গবেষণা, তার পরিবার, ইতিহাস, পড়ালেখা নাকি–'

'তার কবর,' চৌধুরীর কথা শুনে পৃথা মাথা নিচু করে ফেলেছিল, হঠাৎই সে মাথা তুলে বলে উঠল। 'আসলে আমি সেভাবে কখনও ভেবে দেখিনি। কিন্তু এখন আপনাদের কথা শোনার পর মনে হচ্ছে মাম্মির আসলে কিছু কিছু বিষয় খানিকটা অদ্ভুতই ছিল। যেমন সে জীবনের একটা বড়ো অংশই কাটিয়েছে ইংল্যান্ডে। এমনকি জীবনের শেষ সময়টাও কিন্তু সে বারবার করে বলে গেছে তার মৃত্যুর পর তার ডেডবডি যেন এদেশে নিয়ে আসা হয় এবং তার মৃত্যু এবং দাফন নিয়ে অনেক ঝামেলাও হয়েছিল।'

'কী রকম?' বাশার বেশ কৌতূহলের সাথে জানতে চাইল।

মাম্মি তার শরীরে বেশিরভাগ অংশই দান করে গেছিল মানুষের প্রয়োজনের জন্যে। মরেণোত্তর দান যেটাকে বলে। কিন্তু সেইসাথে সে উইল করে এটাও বলে গেছিল যে, তার দেহের অবশিষ্টাংশ দাফন করতে হবে একটা বিশেষ জায়গায়। বলে সে হঠাৎই সম্পূর্ণভাবে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলে উঠল, 'আচ্ছা, আমরা যখন মারা যাই তখন তো আমাদেরকে দাফন করা হয় বা মৃতদেহের সৎকার করা হয় আমাদের ধর্ম অনুযায়ী, তাই না? যেমন, মুসলমান হলে কবর দেওয়া হয় জানাযা পড়ে, হিন্দু হলে তাকে পোড়ানো হয় মুখাগ্নি করে, আবার খ্রিস্টান হলে–'

'আপনি পয়েন্টটা কি মেক করতে চাইছেন?' সোহেল একটু অস্থির হয়ে বলে উঠল।

'সেটা বুঝতে হলে তো পুরোটা শুনতে হবে,' পৃথা হেসে কথাটা বললেও সোহেল মনে হলো খানিকটা লজ্জা পেল। 'ধরেন যদি কারও ধর্ম না থাকে, মানে কেউ যদি কোনো ধর্মেরই অনুসারী না হয়, সে অফিসিয়ালি নিজেকে ডিক্লেয়ার করে যে তার কোনো ধর্ম নেই, তবে তার সৎকার কীভাবে হবে?'

'সাধারণত তো পরিবার করে–'

'যদি পরিবারেরও এই বিষয়ে কোনো এখতিয়ার না থাকে?'

বাশার কাঁধ ঝাঁকাল, 'জানি না। এভাবে তো কখনও ভেবে দেখিনি। ইউরোপ-আমেরিকাতে এটা নাকি প্রচলিত, আমাদের দেশে এরকম কেউ করে বলে তো জানি না।'

'অনেক কিছুই আছে আমরা জানি না,' পৃথা হেসে যোগ করল। 'যেমন দুজন মানুষ যদি নিজেদের ধর্ম বজায় রেখে বিয়ে করতে চায়, মানে ইন্টার রিলিজিয়ন ম্যারেজ, সেই ব্যবস্থাও আছে আমাদের দেশে, যেমন পুরো দেশে তিনটা না চারটা এরকম জায়গা আছে যারা অফিসিয়ালি ইন্টার রিলিজিয়ন ম্যারেজ করায়। পুরনো ঢাকার ব্রাহ্ম উপাসনালয় এর ভেতরে একটা। ঠিক ওরকমই কেউ যদি নিজেকে অফিসিয়ালি কোনো ধর্মের অনুসারী ঘোষণা না করে তবে তাদের জন্যে ব্যবস্থা আছে। পুরনো ঢাকাতেই একটা চার্চ আছে যারা তাদের মৃতদেহের সৎকার করে।'

'মানে কীভাবে করে?' যেহেতু কোনো পন্থাই নেই।

'সে আমি জানি না, তবে মাকে কবর দেওয়া হয়েছে এরকম একটা জায়গাতেই সৎকার করা হয়েছে পুরনো ঢাকার সেই চার্চে। আর তার সমস্ত জিনিসপত্র ইত্যাদিও ওখানেই রয়েছে।'

'তাহলে তোমার পরামর্শ মতে ওখান থেকেই আমাদের শুরু করা উচিত?' বাশার বলে উঠল।

'আমার মায়ের থেকে শুরু করার আইডিয়া তো আমার ছিল না, উনার ছিল,' বলে সে চৌধুরীকে দেখাল। 'মার জীবনের কোনো অংশ বা কোনো জায়গা থেকে এটা করা যেতে পারে অমি সেটা বলেছি স্রেফ।'

'ওকে লেটস গো,' আমাদের কাজ শুরু করতে হবে।

ওরা সবাই মিলে বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠতেই সেই চার্চের নাম আর ঠিকানাটা বলতেই বাশার গুগল ম্যাপ সেটার অ্যাড্রেস বসিয়ে চৌধুরীকে দেখাল। চৌধুরী ওদেরকে নিয়ে সেদিকে রওনা দিলো।

***

প্রতিটা কথা এবং আলোচনা সে পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে নিজের জায়গায় বসে। প্রযুক্তি আসলে এতটা এগিয়ে গেছে ব্যাপারটা ভাবতে সে খানিকটা অবাকওই হলো। এতটা ভালো পারফরমেন্স সে আশা করেনি। তারা যখন কাজ করত তখন প্রযুক্তির চেয়ে মানুষের ধ্যানধারণা ইত্যাদির ওপরে নির্ভর করা হতো অনেক বেশি। তাতে যেমন অনেক সুবিধা ছিল ভালো দিক ছিল, আবার খারাপটাও ছিল। তবে আজকের দিনে অনেকে হায় হায় করে প্রযুক্তি সব শেষ করে দিলো বলে, এটাও সে মনে করে না। খারাপ তখনও ছিল, এখনও আছে। কে কীভাবে কোনোটা ব্যবহার করছে তার ওপরে নির্ভর করে সবকিছু।

তবে এসব দার্শনিক কথা ভেবে লাভ নেই। সে বরং নিজের কাজে মনোযোগ দিলো। বেশ অনেকক্ষণ শোনার পর সে যখন বুঝতে পারল সবকিছু তার পরিকল্পনা মতোই এগোচ্ছে মনে মনে আরেরকবার প্রশান্তি অনুভব করল সে। দীর্ঘ এক প্রতীক্ষার অবসান হতে যাচ্ছে অবশেষে। সব যেভাবে এগোচ্ছে সেভাবেই চলতে থাকলে বিষয়টা ধারণা করা যেতেই পারে। তবে সে জীবনে এত বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে যে জানে সব এভাবে আগাবে না। ঝামেলা হবেই। তবে এখন পর্যন্ত তার পরিকল্পনা শতভাগ সফল। দেখা যাক সামনে কী ঘটে।

***

রাতের ঢাকায় তেমন কোনো জ্যাম থাকে না। এখনও নেই। আর তাই রাতের ঢাকাতে গাড়ি চালিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গেলে সত্যিকার অর্থে বোঝা যায় যে আসলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে কতটা সময় লাগে। যেমন চাঙ্খার পুল থেকে রওনা দিয়ে ওরা পনেরো মিনিটের ভেতরেই পুরনো ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছাকাছি সেই চার্চে চলে এলো। চার্চের গেটের কাছে গাড়ি পার্ক করে ওরা গেটের কাছে চলে এল, গেটে তালা মারা এবং কাউকে দেখাও যাচ্ছে না।

'ভেতরে যাব কীভাবে?' চৌধুরী জানতে চাইল।

'ভেতরে যাওয়া কোনো সমস্যা না,' পুলিশের আইডি আছে না?' বাশার বলে উঠল, 'কিন্তু কাউকে তো দেখতেই পাচ্ছি না। মানুষ কাউকে না পেলে তো আইডি কার্ড দেখাবে কাকে। গেট ভেঙে তো আর ঢোকা যাবে না।'

'ভেঙে না ঢোকা যাক, টপকে তো ঢোকা যেতেই পারে কী বলো, বস?' মৃদু হেসে বলে উঠল সোহেল। বাশার কৃত্রিম রাগের ভঙ্গিতে ফিরে তাকাল তার দিকে।

'ওই যে তোমার সমস্যার সামাধান এগিয়ে আসছে,' কথাটা শুনে বাশার সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল একজন লোক এগিয়ে আসছে গেটের দিকে। চার্চটা বেশ বড়ো একটা জায়গার ওপরে। মূল গেট পার হয়ে একটা আঙিনার মতো, তার পাশে আবার ফুলের বাগান, আর সেটার পরে চার্চের মূল ভবন। বাশার দেখল চার্চের মূল ভবনের পাশেই ছোটো একটা কামরার মতো। সেটা থেকে একজন লোক বেরিয়ে আসছে। লোকটার পরনে ইউনিফর্ম এবং তাতে একটা সিকিউরিটি কম্পানির লোগো। বাশার অনুমান করল এরা চার্চের সিকিউরিটি এবং লোকটা হঠাৎ করে কীভাবে ওদের উপস্থিতি টের পেয়েছে সেটাও বুঝতে পারল। সম্ভবত চার্চের মূল ভবনের সাথে ওটা সিকিউরিটি রুম এবং বাশার নিশ্চিত ওই রুমে সিকিউরিটি ক্যামেরা আছে। সেটাতে ওদেরকে দেখেই লোকটা বেরিয়ে এসেছে।

সিকিউরিটির লোকটা এগিয়ে এসে গেটের ওপাশ থেকে ওদের পরিচয় জানতে চাইল। বাশার এগিয়ে গিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই পৃথা সামনের দিকে এগিয়ে গেল; সে জানাল–তার মায়ের দেহাবশেষ এখানে সৎকার করা হয়েছিল, সে বিদেশ থেকে এসেছে একবার দেখার জন্যে। কথাটা বলার সাথে সাথে লোকটার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। সে প্রায় বিনা প্রশ্নে গেটের তালা খুলে ওদেরকে ভেতরে ঢুকতে দিয়ে পৃথার মায়ের নাম জানতে চাইল এবং ওদেরকে ওখানেই অপেক্ষা করতে বলে সে ভেতরে চলে গেল।

'বাহ, ভালো বলেছ তো,' মেয়েটার উপস্থিত বুদ্ধিতে বাশার রীতিমতো খুশি।

'আমি আগেও এখানে এসেছি বহুবার, কাজেই মোটামুটি জানি এখানে কীভাবে কাজ করে ওরা। আর রাতের বেলাতেও প্রায়ই গেস্ট আসে, বিশেষ করে বিদেশে যারা থাকে তারা বা বিদেশ চলে যাচ্ছে, কাজেই রাতের বেলাতেও তাদের গেস্ট অ্যাটেন্ড করার অপশন থাকার কথা,' পৃথা জানাল ওদেরকে। 'মানে গতবার যখন এসেছিলাম তখন ছিল, এখন কী অবস্থা জানি না। তবে এরা নাম ইত্যাদি চেক করে খুব ভালোভাবে।'

লোকটা ফিরে এলো তবে অনেক সময় নিয়ে। তবে সে ফিরে এলো হাসিমুখে। 'দুঃখিত, আপনাদেরকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখলাম। আসলে রাতে তো সবাই চলে গেছে, তাই ফোন করে ম্যাডামের নাম মিলিয়ে মৃতের লিস্ট থেকে বের করে উনার মেয়ে কি না ভেরিফাই করে তারপর নিশ্চিত করতে হলো। আপনারা আসুন প্লিজ,' ওরা লোকটাকে অনুসরণ করে এই ইয়ার্ডের মতো জায়গাটা পার হয়ে চার্চের পেছন দিকে চলে এলো। সেখানে কবরস্থানের মতো একটা জায়গা দেখিয়ে লোকটা ওদেরকে নির্দেশনা দিতে যাচ্ছিল তার আগেই পৃথা ধন্যবাদ জানিয়ে বলে উঠল ও চেনে, কাজেই এখান থেকে সে যেতে পারবে। এবার ওরা সবাই মিলে পৃথাকে অনুসরণ করে সারি সারি কবর পার হয়ে নির্দিষ্ট কবরের সামনে চলে এলো। ওদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল, 'দেখুন যদি কিছু চোখে পড়ে।'

বাশার দেখল সাধারণ একটা কবর, তবে গোরস্তানের মতো বেড়া দেওয়া না, ঢিবি করে রাখা। খুব যত্নের সাথে ঘাস ছেটে রাখা হয়েছে। আর মৃতের মাথার কাছে একটা ফলক পাথর, যেটাকে ইংরেজিতে টুম্বস্টোন বলা হয়। সেখানে মৃতের নাম জন্ম-মৃত্যুর সাল লেখা আর তার নিচে একটা সিম্বল। বাশার মোবাইল বের করে বেশ কয়েকটা ছবি তুলে নিলো। ওরা বেশ কিছুক্ষণ ভালোভাবে চেক করার পরও কিছুই পেল না।

'এখানে বিশেষ কিছু আছে বলে তো মনে হচ্ছে না,' বেশ হতাশার সুরে বলে উঠল সোহেল।

'আসলে ভুলটা আমাদেরই, এখানে আদৌ কিছু আশা করাটাই উচিত হয়নি,' চৌধুরী এখনও মনোযোগ দিয়ে দেখছে কিন্তু তার গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছে সে বেশ হতাশ বোধ করছে।

'সেক্ষেত্রে ডক্টর ইলার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সব জায়গা চেক করতে হবে, আপনি বলেছিলেন এখানে উনার বেশ কিছু ডকুমেন্ট আছে, সেগুলো কি–' শেষ কথাটা সে বলেছে পৃথাকে উদ্দেশ্য করে।

'হুম, তা আছে তবে সেগুলো এখন চেক করতে পারবেন বলে মনে হয় না, চলুন কথা বলে দেখি,' ওরা সিকিউরিটির সেই লোকটার সাথে কথা বলে জানতে পারল ডকুমেন্টস চেক করতে হলে অফিস আওয়ারে যেতে হবে। ওরা সবাই বেশ ব্যর্থ মনোরথে গাড়িতে এসে উঠল।

'এখন কোনোদিকে?' এবার গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসেছে সোহেল।

'কী?' বাশার মোবাইলে কিছু একটা দেখছিল মনোযোগ দিয়ে তাই সোহেলের কথাটা ঠিক ধরতে পারেনি।

'বলছিলাম এবার কোনোদিকে যাব?'

বাশারের কোনো জবাব নেই, সে মনোযোগ দিয়ে মোবাইলে দেখছে। 'বস–'

'এক মিনিট,' বাশার মোবাইল দেখতে দেখতেই বলে উঠল। 'এই ছবিটা দেখেন তো সবাই,' বলে সে মোবাইলটা তার পাশে বসে থাকা পৃথার দিকে এগিয়ে দিলো।

'বিশেষ করে তুমি।'

পৃথা মোবাইল হাতে নিয়ে দেখল তাতে একটু আগে দেখে আসা ওর মায়ের কবরের ছবি। 'ছবিতে কী দেখব, একটু আগে তো বাস্তবেই দেখে এলাম।'

'দেখার আছে, মনোযোগ দিয়ে দেখ, অস্বাভাবিক কিছু কি চোখে পড়ছে?'

পৃথা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলতে লাগল। 'অস্বাভাবিক, কই মাম্মির নাম, জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ, নিচে একটা লোগো–'

'এক্স্যাক্টলি, এখানে অস্বাভাবিক কিছু লাগছে না?' ও এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পৃথার দিকে।

'কই, আমি তো–'

'উনার কবরের ফলকে ওই লোগো বা সিম্বলটা কীসের?'

'সিম্বল, হ্যাঁ! তাই তো–'

'দেখি,' বলে তার হাত থেকে মোবাইলটা নিয়ে দেখতে লাগল চৌধুরী। 'এই লোগো আমি এর আগেও দেখেছি।'

'আপনি কোথায় দেখেছেন আমি জানি না, মিস্টার চৌধুরী। এই লোগো সম্প্রতি আমি খুব ভালোভাবে দেখেছি,' ও তাকিয়ে আছে পৃথার দিকে।

'কী?' বাশারের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেছে পৃথা। 'ওহ শিট,' বলে চট করে নিচের হুডির ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলো ও। বের করে আনল গলায় চেইনের সাথে ঝুলতে থাকা লকেটটা। সেটার গায়ে খোদাই করে আঁকা একই লোগো। 'শিট, মাই গড।'

'আমিও ধরতে পারতাম না যদি ফিল্ড এজেন্ট শারিয়ারের চট্টগ্রাম কেসের ফাইলটা ডিটেইলে না পড়া থাকত,' বলে সে হাত বাড়িয়ে লকেটটা ধরতেই, পৃথা ওটা চেইনসহ খুলে দিলো। 'আমার যদি ভুল না হয় আমরা রাজদ্রোহীর অসমাপ্ত অংশের ক্লু পেয়ে গেছি, যদি তা নাও হয় অন্তত পরবর্তী ধাপে কী করতে হবে সেইটা অন্তত জানতে পেরেছি,' বলে বাশার বাকিদের দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিলো।

অধ্যায় একুশ
সময়: ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ
জল-জঙ্গল এলাকা

মাসুম পানিতে লাফটা দিয়েছিল একেবারে দক্ষ সাঁতারুর মতো, মনে মনে আশা করেছিল–কপাল ভালো হলে হয়তো ঠিকমতো পানিতে নামতে তো পারবে, যদি কোনো মোটা ডাল বা গাছের গুঁড়ির সাথে বাড়ি না খায়। কিন্তু যত দক্ষতার সাথেই সে লাফ দিক না কেন, ঝড়-বৃষ্টি আর বাতাসের বেগে শরীর এমনভাবে তালগোল পাকিয়ে গেল আর পানিতে শরীরটা এমনভাবে নেমে এলো যে পানির বাড়িতেই ওর মনে হলো বুকের ভেতরে আগুন লেগে গেছে। পানিতে নামতেই কয়েক ডুব দিয়ে মাথা তুলল পানির ওপরে। সাথে সাথে দেখতে পেল কালো কিছু একটা ধেয়ে আসছে ওর দিকে। মুহূর্তের জন্যে ওর কাছে মনে হলো কুমির। ঘড়িয়ালের সাথে লড়াইয়ের স্মৃতি এখনও একেবারে তাজা। কিন্তু পলকের জন্যে বুঝতে পারল ওটা আসলে একটা গাছের গুঁড়ি, তবে এটাও কম ভয়ঙ্কর নয়, লাগলে মাথা ছাতু হয়ে যাবে।

পলকের ব্যবধানে মাসুম অনুধাবন করতে পারল ডানে কিংবা বাঁয়ে সরার মতো সময় নেই। শরীরটাকে আবারও বাঁকিয়ে নিচের দিকে ডুব মারল। কিন্তু গুঁড়িটা পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে পারল না। ডুব দিলেও কাঁধের কাছটায় ভীষণ বেগে বাড়ি মারল ওটা। ডুবন্ত অবস্থাতেও মুখ দিয়ে তীব্র চিৎকার বেরিয়ে গেল। পানির নিচে তো আর চিৎকার বের হলো না বরং বুদ্বুদের সাথে সাথে ফুসফুস থেকে সব বাতাস বেরিয়ে গেল। খাবি খেতে খেতে কোনোরকমে পানির ওপরে মাথা তুলে দম নিতে লাগল ও। সামনে এগোনো তো দূরে থাক স্রেফ ভেসে থাকতেই জান বের হয়ে যাচ্ছে, তবে সামনে এগোতে হবে। কারণ স্রোতের বেগ এত বেশি, সামনে এগোনোর চেষ্টা না করলে স্রোতে স্রেফ আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। যত বেশি দূরে সরবে তত বেশি জীবনের ঝুঁকি বাড়তে থাকবে। শরীরটাকে যতটা সম্ভব স্থির করে কিছুক্ষণ দম নিলো মাসুম। আশপাশে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল বাকিদের কী অবস্থা। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেল না ঠিকমতো। এখন অন্যদের চিন্তা করে লাভ নেই, কারণ কাউকে সাহায্য তো করতে পারবে না। মাসুম স্রোতের বেগ

ঠেলে কিছুক্ষণ এগোনোর চেষ্টা করেও খুব বেশি এগোতে পারল না। এ-ক্ষেত্রে কী করতে হবে সেটাও সে ভালোভাবেই জানে। এরকম পরিস্থিতি ওর জন্যে নতুন না। সাঁতার বাদ দিয়ে পানির ওপরে মাথা তুলে দম নিলো বুক ভরে, তারপর ডুব দিলো পানিতে। সেই সাথে শরীর বাঁকিয়ে যতটা সম্ভব তিরের মতো করে ফেলল নিজের হাতদুটো তারপর ডুব সাঁতার দিয়ে এগোতে লাগল। এটা বহু পুরনো একটা টেকনিক। অতিরিক্ত স্রোতের ভেতরে শুধু সাঁতারের চেয়ে ডুব সাঁতার অনেকসময় বেশি কাজে লাগে। তবে এক্ষেত্রে অনেক দক্ষ সাঁতারু হতে হয়, আর মাসুমের সেই বিষয়ে কোনো সমস্যা নেই।

যদিও খুব ধীর গতিতে তাও একটু একটু করে ডুব সাঁতার দিয়ে সামান্য করে এগোতে এগোতে যখন মনে হতে লাগল এ-জীবনে আর বোধহয় তীরে পৌঁছাতে পারবে না অবশেষে পায়ের নিচে মাটি ঠেকল। কোনোমতে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে জলকাদা ঠেলে তীরে এসে এলিয়ে পড়ল ও। মনে মনে আরেকবার ধন্যবাদ দিলো স্রষ্টাকে। আসলে বেঁচে থাকার চেয়ে বড়ো আনন্দ আর কিছুতে হতে পারে না। বড়ো বড়ো করে স্রেফ দম নিলো কিছুক্ষণ।

'মাসুম?' কণ্ঠস্বরটা পরিচিত ঠেকলেও ওটা যে ধোবলের গলা সেটা বুঝে উঠতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল ওর। কথা বলার চেষ্টা করেও কয়েকবার মুখ খুলে কথা বলতে পারল না মাসুম। হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিলো, ও ঠিক আছে। আরেকটু দম পেয়ে জানতে চাইল, 'তুই ঠিক আছিস, ধোবল? বাকিরা কই?'

'আমি, ঠিক আছি, নুক্কুন আছে আমার সাথে। কিন্তু বরখা–'

মাসুম মুখ তুলে দেখল কোমর পানিতে একটা মূর্তি ওর মতোই হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে আসছে। 'ওটা বরখা না হয়েই যায় না–' স্বস্তির সাথে হাত নেড়ে আবারও দম নিতে লাগল ও এলিয়ে পড়ে।

ঝড়-বৃষ্টির কোনো কমতি নেই। বেগ যেন বেড়েই চলেছে। খানিকটা দম ফিরে পেতেই মাসুম বাকিদের উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, 'এইখান থেইকা সরতে অইব। এইভাবে বেশিক্ষণ থাকলে পাগল হইয়া যাইতে অইব,' বলে মাসুম নিজে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। ধোবল আর নুক্কুনও সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, বরখা এখনও এলিয়ে আছে মাটিতেই। কাঁধ ডলতে ডলতে মাসুম নুক্কুনের কাছে জানতে চাইল, 'নুক্কুন, তুই কি এই এই এলাকা চিনিস? ' কাঁধে ব্যথা পেলেও খুব বেশি খারাপ অবস্থা না এখনও, মাসুম কাঁধ পরীক্ষা করে এবার হিসেব করতে বসল, অস্ত্র আর অন্যান্য জিনিস যা যা নিয়ে এসেছিল সাথে করে সেগুলোর কয়টা রক্ষা পেয়েছে।

'ওস্তাদ, এইখানে আমি আগে আসি নাই, তবে এইসব দ্বীপগুলার বেশিরভাগগুলাতেই মাঝামাঝি উঁচা জায়গায় বাড়িঘর থাকে। আর না অইলে মাঝি বা জেলেগো ঝুপড়ি থাকেই, সেইখানে আমরা আশ্রয় নিতে পারবো, আর যদি না পাই–'

মাসুম বরখার দিকে তাকিয়ে ধোবলকে ইশারা করল, 'ওরে তোল,' বলে সে নিজের অস্ত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে আবিষ্কার করল ওর মানচিত্রটা আছে, ড্যাগারটাও আছে, সাথে আনা ধনুকটাও আছে। তিরও কয়েকটা আছে, বর্শা আর তলোয়ার দুটোই গেছে। আফসোসের সাথে মাথা নাড়ল। ধোবল বরখাকে টেনে নিয়ে এসেছে। মাসুম আকাশের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল, 'জলদি আশ্রয় খুঁজতে অইবে। তগো অস্ত্রসস্ত্রের কী অবস্থা–'

সে প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না, তার আগেই ওদের পাশ থেকে নুক্কুনের আঁতকে ওঠার শব্দ পেল। 'হুজুর, আপনেরা কিছু শুনছেন?'

মাসুম একবার বরখা আরেকবার ধোবলের দিকে দেখে নিয়ে ফিরে তাকাল নুক্কুনের দিকে। 'কীসের শব্দ? এই ঝড়ের ভিতরে তুই কীসের শব্দ শুনলি, গাছ টাছ পড়ছে মনে হয়।'

'না, না। আমি পরিষ্কার শুনলাম–' বলেই সে আবারও থেমে গেল।

মাসুম কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই আবারও সে ওকে ইশারায় চুপ থাকতে বলল।

'মাসুম, এইবার আমিও কিছু একটা শুনলাম,' বলেই চট করে নিজের তলোয়ারটা বের করে আনল বরখা। ওর দেখাদেখি সতর্ক হয়ে উঠেছে ধোবলও।

বরখা যেহেতু শুনেছে তবে একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না। মাসুম আলতো করে কাঁধ থেকে ধনুকটা নামিয়ে আনল। 'কিন্তু আমি তো–'

সে কথা শেষ করার আগেই পরিষ্কার শুনতে পেল খসখস শব্দ শুধু একদিকে না, ওদের চারপাশ থেকেও আসছে, অন্তত দুইদিকে তো বটেই। বাকিদের সাবধান করার আগেই অন্ধকারের ভেতর থেকে কিছু একটা উড়ে এসে খট করে লাগল ওর ধনুকে, সাথে সাথে হাত থেকে ছুটে গেল ওটা। ছুরিটা বের করার জন্যে হাত দিয়ে ওটার হাতল চেপে ধরেও থেমে গেল মাসুম একদল অস্ত্রধারী ঘিরে ধরেছে ওদেরকে চারপাশ থেকে।

'এরা আইল কই থেকে?' কথাটা নুক্কুন বলে উঠল। কিন্তু মাসুম আফসোসের সাথে মাথা নাড়ল, যেখান থেকেই আসুক না কেন জেনে আর লাভ কী? বন্দি তো হয়েই গেছে।

***

তীব্র ঝড়-বৃষ্টি যেন তার গায়ে লাগছেই না। নিজের বিরাট জাহাজের মতো সওদাগরি নাওয়ের পাটাতনের ওপরে দাঁড়িয়ে হাতের বিরাট লাঠিটা দিয়ে একটু পর পর পাটাতনে বাড়ি মারছে সে। আর অন্য হাতের মুঠোর ভেতরে বিশেষ

কায়দায় ধরে থাকা আগুন দেওয়া প্যাঁচানো পাতার দড়ি মুখে লাগিয়ে টান মারছে সে। মাথার কালো পাগড়িটা ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে। কপালে লাল তিলকটাও গলে গড়িয়ে পড়ছে মুখের ওপরে। সেই সাথে ভিজে নিচের দিকে নেমে গেছে গোঁফের চোখা অংশ কিন্তু তার কোনো বিকার নেই, টকটকে লাল চোখে নেই কোনো শান্তির পরশ। ততক্ষণ পর্যন্ত হবেও না যতক্ষণ পর্যন্ত শিকারকে সে নিজের হাতের মুঠোয় আনতে পারছে।

ব্রহ্মপুত্র আর শীতলক্ষ্যা এলাকার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আর হিংস্র ডাকাত বিশা সওদাগরের থেকে খানিকটা পেছনে দাঁড়িয়ে আছে তার দুই সহযোগী। যেহেতু তাদের সর্দার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কাজেই চাইলেও তারা নাওয়ের আচ্ছাদনের ভেতরে আরামে বসে থাকতে পারে না। সর্দারকে তাদের জরুরি কিছু কথা বলার প্রয়োজন কিন্তু সাহসের অভাবে সেটা বলতে পারছে না। তবে সর্দারের এই অস্থিরতা তারা খুব ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পারছে। যে-লোকের হাত থেকে কখনোই কোনো শিকার হাতছাড়া হয়ে যেতে দেখেনি, সেই লোকের হাত থেকে যদি তার সবচেয়ে আরাধ্য শিকারটা বারবার হাতছাড়া হয়ে যায়–তবে তো ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠবেই।

বিশা সওদাগরের প্রকৃত নাম আসলে বিশাও নয়, আর সওদাগর তো অবশ্যই নয়। এই দুটো নামই সে নিজে দিয়েছে ডাকাতি শুরু করার পর। নিজের প্রকৃত নাম সে জানতই না, আর জানলেও সেটা এত আগে নিজের জীবন থেকে দূর করে দিয়েছে সে যে ওটা আর তার মনে অছে কি না সন্দেহ আছে। অন্ধকার পল্লীতে জন্ম নেওয়া বিশার পারিবারিক কোনো পরিচয় কখনোই ছিল না, নেইও। জীবনের বহু ঘাতপ্রতিঘাত পেরিয়ে নিজের ভয়ঙ্কর সাহস, ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা আর হিংস্রতা দিয়ে সে পুরো এলাকায় নিজের ত্রাসের রজত্ব কায়েম করেছে। তার ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে তাকে নাকি পুরো এলাকার প্রতিটা মাছও ভয় পায়। আর পাবে নাই-বা কেন। সে হলো এমন এক ডাকাত যে জল এবং ডাঙা দুই জায়গাতেই সমানভাবে ডাকাতি করতে সক্ষম। তার উপর, তার রয়েছে সবচেয়ে শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী আর দক্ষ জল ডাকাতের দল। পুরো এলাকার যেকোনো জায়গায় যেকোনো সময় সে হানা দিতে পারে নিজের দ্রুতগতির জালিয়া নিয়ে। শুধু তাই না, বড়ো নাও নিয়ে তো বটেই ছোটো ছোটো কোষা আর ছিপ নৌকা চালানো এবং সেগুলো দিয়ে আক্রমণ করতেও সমান দক্ষ তার বাহিনী।

বিগত পাঁচ বছরে শুধুমাত্র আসলাম শেঠ বাদে কাউকেই সে পরোয়া করেনি, দিনের-পর-দিন একের-পর-এক সওদাগরি নাও থেকে শুরু করে মেঘালদের ব্যবসায়ী, কাউকেই ছাড়েনি তার লুটেরা দল। তার নিয়ম একটাই, কোনো নৌকার পিছনে সে একবার লাগলে সেটাকে লুট না করা পর্যন্ত তার কোনো স্বস্তি

নেই। আর লুট করার প্রর প্রতিটি পুরুষকে হত্যা করা এবং প্রতিটা নারীকে ধর্ষণ করার পর দাসী হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া তার সবচেয়ে নিষ্ঠুর কার্যক্রমগুলোর মধ্যে অন্যতম। তার ব্যাপারে আরও বলা হয়: অত্র এলাকার প্রায় সব জায়গাতে তার একাধিক ঘাঁটি আছে, রাজা থেকে শুরু করে প্রজা, সব জায়গাতে তার চর আছে। পুরো জল-জঙ্গল এলাকায় একটা মাছ লেজ নাড়ালেও সে জানতে পারে।

কাজেই এহেন বিশা সওদাগর যখন জানতে পারল জঙ্গলমহালের পতনের পর তার প্রধান এবং এক নম্বর শত্রু আসলাম শেঠের স্ত্রী কিছু লোক নিয়ে জল-জঙ্গলের ভেতরে পালিয়ে গেছে তখন তো সে প্রতিশোধ নিতে উদ্যোগী হবেই। সেই সাথে ব্যাপারটাতে আরও মাখন লেগেছে যখন সে জানতে পেরেছে ওদের সাথে আছে বিপুল পরিমাণ সম্পদ এবং মোঘলরা আবার তাদের মাথার ওপরে পুরস্কারও ঘোষণা করেছে। এমন অবস্থায় সে নিজের সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগ করে লেগেছে ওদের পেছনে। কিন্তু এদের পিছে লাগার পর থেকে কপাল যেন আর ফিরছেই না। প্রথমেই এদের পিছে লাগার সাথে সাথে মোঘলদের সাথে একবার টক্কর লেগেছে। তারপর বহু কাঠ খড় পুড়িয়ে যখন আবার বের করতে পারল তখন পিছু নিতে গিয়ে হারিয়ে ফেলল। এরপর থেকে একটা বড়ো জালিয়া আর দুটো সওদাগরি নিয়ে পুরো এলাকা চষে ফেলার পরে যখন ওদের সন্ধান বের করতে পারল শুরু হলো তুমুল ঝড়। একদিকে ঝড় থামার অপেক্ষা করতে হবে অন্যদিকে ঝড় থামার কোনো নাম গন্ধও নেই। তাই অস্থির হয়ে উঠেছে বিশা।

'সর্দার,' তার পেছন থেকে নিজের দলের দুই প্রধানের একজন বলে উঠল। 'বিয়ানের আগে কিছু করণ যাইব বইলা মনে অয় না,' কথাটা ভয়ে ভয়ে বললেও সে জানে এটা যুক্তির কথা আর সর্দার বিশা যতই খারাপ আর হিংস্র হোক না কেন, যুক্তি না মানার মতো লোক নয় সে।

আর তার ধারণাকে সত্যি প্রমাণ করে দিয়ে ডাকাত সর্দার বিশা দ্বীপের মতো গ্রামটার দিকে তাকিয়ে থেকেই সম্মতিসুচক মাথা নাড়ল। তবে সাথে এটা যোগ করতেও ভুলল না। 'ছিপ আর কোষাগুলা সব প্রস্তুত রাখতে কও সবাইরে, লগে অস্ত্রসস্ত্র। বিয়ান অইতেই আমরা দ্বীপে হানা দিমু। আর হ্যাঁ, শকুনের নজর রাখতে কও দ্বীপের উপরে যাতে একটা পক্ষীও পলাইতে না পারে।'

তার দুই প্রধান সহযোগীই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। সর্দারের আরও কোনো নির্দেশনা আছে কি না জিজ্ঞেস করতে যাবে তার আগেই পেছনে ধুপধাপ শব্দ শোনা যেতে তিনজনেই ফিরে তাকাল সেদিকে। ওদেরই এক সাগরেদ দৌড়ে আসছে।

'সর্দার, সর্দার, নতুন খবর আছে, নতুন খবর আছে,' লোকটা জোরে জোরে বলে উঠল।

'ওই মাতারির পো, খবরটা কী সেইটা বল,' বিশালদেহী বিশা দুই পা এগিয়ে এসে পা দিয়ে জোরে ঠুকে দিতেই পুরনো নাওয়ের পাটাতন কেঁপে উঠল। তাকে দেখে সাথে সাথে মুখ-চোখের জল শুকিয়ে গেল তিনজনেরই। যে-দৌড়ে এসেছে সে কোনোমতে বলে উঠল। 'হুজুর, এলাকাতে মোঘলগোর জাহাজ দেখা গেছে একটা।'

'চক্কর দিতাছিল? এই ঝড়ের রাইতে!' কথাটা শুনে বেশ অবাক হয়েছে বিশা সওদাগর।

'না, হুজুর, স্রেফ একবার দেখছে আমগো একজন, ওইদিকে আগায়া গিয়া তারপর আবার ফিরা গেল,' বলে সে দ্বীপের দিকে দেখাল।

'খালি এই?' চোখ সরু হয়ে গেছে বিশার। 'এই সবাই মন দিয়া শোন আমি কী কই।'

***

'এই তোমরা কারা?' অস্ত্রধারী লোকগুলোর ভেতরে সর্বাগ্রে থাকা লোকটা জানতে চাইল। মাসুম দেখল সে হাঁটু গেঁড়ে বসে একটা তির তাক করে রেখেছে ওদের দিকে। লোকটার অবয়ব বেশ শক্তিশালী হলেও তার গলার স্বর শুনে খানিকটা অবাকই হলো মাসুম। কণ্ঠস্বরের মালিকের বয়স খুব বেশি না।

নিজের দুই হাত শরীরের দুপাশে তুলতে তুলতে মাসুম চারপাশে তাকিয়ে দেখল একবার, ওদেরকে ঘিরে ধরেছে অন্তত ছয়-সাতজনের একটা দল। এদের ভিতরে তিনজনের পোশাক এক রকম অন্য তিনজনের পোশাক আবার আলাদা। মনে মনে একবার হিসাব করে নিলো মাসুম। এরা কেউই এই দ্বীপের লোক না। এরা মোঘল অবশ্যই না। হয় এরা কোনো ডাকাত দলের আর না হয়

'আস্তে, এমনে অস্ত্র ধইরো না, ঘড় বৃষ্টির ভিতরে একটা তির ছুইটা গেলে সবারই ক্ষতি,' নিজের একেবারে মান্ত গলা শুনে সে নিজেই বেশ খানিকটা অবাক হয়ে গেছে। 'তোমরা কারা?'

'এই, কথা কানে গেল না, আগে নিজেগো পরিচয় দাও,' ছেলেটা ধমকে উঠল, তাকে দেখে মোটেই স্বস্তি পাচ্ছে না মাসুম। দেখেই বোঝা যায় এরা বেশ ভয়ে আছে। আর ভয়ে থাকলে মানুষ সবচেয়ে বেশি অস্থির হয়ে ওঠে আর এমতাবস্থায় অস্ত্র ধরা থাকলে সমূহ বিপদ। কাজেই কোনো ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। 'আমার নাম মাসুম খাঁ কাবুলি। আমি ভূঁইয়া প্রধান ঈশা খাঁর লোক। এইখানে সুবাদার আসলাম শেঠের স্ত্রীর সন্ধানে আসছি,' বাজিটা সঠিক ধরল কি না ঠিক বুঝতে পারছে না মাসুম। ভুল হয়ে গেলে বিপদ, অবশ্য এমনিতেও কম বিপদে নেই ওরা।

ছেলেটা কিছু বলার আগে তার পাশ থেকে অস্ত্র ধরে রাখা আরেকজন এগিয়ে এলো। 'এই সবাই অস্ত্র নামাও,' বলে সে পেছন ফিরে ইশারা করল। মাসুম অনুমান করল সে অস্ত্র নামাতে বললেও ওদেরকে সাবধান থাকার ইশারা করল পেছন ফিরে। ওরা পরিচয় দিয়েছে কিন্তু সেটা সঠিক কি না যাচাই করার উপায় নেই, সেজন্যেই এই সাবধানতা। তার জায়গায় মাসুম হলেও তাই করত। কথাটা মনে আসতেই খানিকটা স্বস্তি বোধ করল মাসুম কিন্তু সাথে সাথে কণ্ঠস্বরটা মনে পড়তেই বেশ চমকে উঠল সে।

মানুষটা এগিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আবারও বলে উঠল, 'মাসুম কাবুলি? ঈশা খাঁর পাঠানো লোক? আপনে মিথ্যা বলতাছেন কি না বুঝব ক্যামনে?'

'তুমি মেয়ে মানুষ?' মাসুম ভ্রু কুঁচকে বলে উঠল। সে পাশে তাকিয়ে দেখল ধোবল বরখা আর নুক্কুনও অবাক হয়ে গেছে। এরকম ঝড়ের রাতে এরকম অন্ধকার দ্বীপে কি না নারী যোদ্ধাদের দলের মুখোমুখি হতে হয়েছে ওদের। তবে পরমুহূর্তে আসলাম শেঠের স্ত্রীর ইতিহাস এবং তার বিশেষ বাহিনীর কথা মনে পড়ে গেল মাসুমের। সাথে সাথে নিশ্চিত হলো সে জায়গামতো পৌঁছে গেছে।

'যাক পাইলাম তুমগোরে, সুবাদার সাহেবের স্ত্রী কই?' মাসুম খুঁশি খুশি গলায় জানতে চাইল।

'কথার উত্তর দেও আগে, তোমরা ঈশা খাঁর লোক বুঝব ক্যামনে? তোমরা ডাকাইত না সেইটা বা নিশ্চিত করবো ক্যামনে?' মেয়েটার গলায় অদ্ভুত এক টান। সেই টানে বাংলা কথা খুব অদ্ভুত শোনায়। মাসুম ভারতবর্ষের বহু জায়গাতে ভ্রমণ করেছে, বহু রকমের ভাষা-উপভাষা শুনেছে কিন্তু এরকম কখনও শোনেনি।

'নিশ্চিত করার উপায় নাই,' মাসুম নিজের অস্ত্র পুরোপুরি নামিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বলে উঠল। 'কিন্তু আমরা তুমগোরে সাহায্য করতেই আসছি। আমগোরে জলদি সুবাদার পত্নীর কাছে নিয়া চলো।'

মেয়েটা এখনও তাকিয়ে আছে ওর দিকে, মাসুম দেখল বড়ো বড়ো একজোড়া চোখ, তাতে সন্দেহ আর অবিশ্বাস, তবে সবচেয়ে বড়ো কথা তাতে যেন খানিকটা অসহায়ত্বের ছায়া। সে একবার পেছন ফিরে সেই ছেলেটার দিকে তাকাল। ছেলেটা দুইপাশে মাথা নেড়ে মানা করছে। কিন্তু সে ওর দিকে ফিরে বলে উঠল, 'তুমি কি সুবাদারকে চিনতা?'

'খুব বেশি জানা পরিচয় ছিল না। কিন্তু তার সাথে দুই-একবার আলাপচারিতা হইছিল,' মাসুমও সরাসরি তাকিয়ে আছে মেয়েটার চোখের দিকে। সে কথাটা বলতেই মেয়েটা বাকিদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'অস্ত্র নামাও সবাই। ঠিক আছে।'

'কিন্তু—'

ছেলেটা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই মেয়েটা থামিয়ে দিলো ওকে। 'জলদি চলো, ভিজতে ভিজতে ত্যানা হয়ে যাইতেছি,' বলে সে মাসুম আর বাকিদের দিকে একবার দেখে নিয়ে বলে উঠল, 'জলদি চলো, সময় কম, তবে তোমরা এখনও পুরাপুরি বিশ্বাস করা অয় নাই, কাজেই সাবধান।'

মাসুম হেসে উঠল। মেয়েটা এত স্বচ্ছন্দে ওকে তুমি বলছে ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত লাগল ওর কাছে। 'সমস্যা নাই, আমরা মানুষ খাই না,' বলে ও হেসে উঠল। 'মেয়েমানুষ তো আরও না।'

মেয়েটা মনে হলো মৃদু হাসল কিন্তু অন্ধকারের ভেতরে ঠিক বুঝতে পারল না মাসুম। 'আমি রায়েলি, বেগম সাহেবার নিজের লোক।'

'তার নারী বাহিনীর প্রধান?' মাসুম জানতে চাইল।

'বলতে পারো যোদ্ধা। বাহিনীই নাই, তার আবার প্রধান। জলদি চলো।'

অন্ধকারের ভেতরেই ওরা দ্রুত এগোল। তারপরও আরও আধা ঘণ্টা হাঁটার পর সামনে কালো কালো অবয়বের মতো দেখতে পেল মাসুম। এগুলো নিশ্চয়ই জেলেদের ঝুপড়ি। আর তাতেই আশ্রয় নিয়েছে ওরা।

ওরা ঝুপড়িগুলোর কাছাকাছি আসতেই জোরে শিস বাজিয়ে উঠল মেয়েটা, সাথে সাথে ওপাশ থেকেও ভেসে এলো প্রায় একইরকম শিসের শব্দ। এই ঝড়ের ভেতরেও শিসের শব্দের জোর শুনে অবাক হয়ে গেল মাসুম। শখানেক গজ পার হয়ে ওদেরকে একটা ঝুপড়ির ভেতরে নিয়ে এলো ওরা। মাসুম দেখল ওটার ভেতরে কিছুই নেই বলতে গেলে। স্যাঁতস্যাতে মেঝেতে একটা পুরনো পাটি বিছানো। ওদেরকে অপেক্ষা করতে বলে চলে গেল সবাই।

'এ কই আসলাম?' গায়ের কাপড় থেকে পানি ঝড়াতে ঝাড়তে বলে উঠল ধোবল।

'তারচেয়ে বড়ো কথা,' ধোবলের দেখাদেখি মাসুম নিজেও অস্ত্রগুলো একে একে মেঝেতে রেখে নিজের গা থেকে পরিধেয়র পানি ঝরাতে লাগল। 'যাগোরে খুঁজতে আসছি তাগোরে পাওয়া গেছে। কিন্তু ঝামেলা অন্য জায়গাতে,' পানি ঝরিয়ে আবার পোশাক পরে নিতে নিতে কথা বলছে মাসুম।

'কোনো জায়গাতে?' বরখা তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'আমি পরিস্থিতি যা ভাবছিলাম তারচেয়ে বেশি খারাপ। প্রথমত, এরা এতটা খারাপ অবস্থায় না পড়লে এরকম একটা জায়গায় আশ্রয় নেওয়ার দরকার পড়ত না। এইখানে যেহেতু আশ্রয় নিছে কাজেই বুঝতে অইব খুবই বাজে অবস্থার ভিতরে আছে এরা। তার ওপরে মোঘলরা তো আছেই, সেই সাথে বিশা নামে এক ডাকাইত লাগছে এদের পিছে, এইটা আমারে বরকত বলছে। তুমি তো চেনই?'

বিশা নামটা উচ্চারণ করতেই নুক্কুনের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল, 'তারে আমি ভালো কইরাই চিনি। আমার পরিবারের লোকজনের তো হের কারণেই

'আইচ্ছা, নুক্কুন, তুমি যে আমগো লগে আছ তোমার পরিবার–'

মাসুম কথা শেষ করতে পারল না, তার আগেই দরজায় দেখা দিলো একজন, তার হাতে কয়েকটা জিনিস, মাসুম দেখল হালকা কিছু খাবার আর গা মোছার জন্যে শুকনা কাপড়। সেই ছেলেটা নিয়ে এসেছে। মাসুম কাপড়টা তুলে নিতে নিতে জানতে চাইল, 'তোমার নাম কী? বয়সে ছোটো হবা তাই তুমি বললাম। সুবাদার তোমার কী লাগত?'

'ঠিক আছে,' ছেলেটা মাথা নেড়ে হাসিমুখে বলে উঠল। এই প্রথমবারের মতো বাতির আলোয় মাসুম ভালো করে দেখল ছেলেটাকে, সদ্য কৈশোরে পদার্পণ করেছে কিন্তু বেশ লম্বা আর বলিষ্ঠ শরীর। মাসুম মনে মনে অনুধাবন করল, ছেলেটাকে নিশ্চিত খুব ভালোবাসতো সুবাদার, তা না হলে একে এদের সাথে ভিড়িয়ে দিত না। 'আমার নাম সুলতান, সুবাদার আসলাম আমার মামা ছিলেন।'

'সুলতান, আমরা এখন কিছু খাবো না, তুমি বেগম সাহেবারে জলদি গিয়া বলোঃ তার সাথে দেখা করা খুব জরুরি, আমগো হাতে সময় নাই।'

'অপেক্ষা করতে হইবে না, আপনেরা আমার সাথে চলেন,' বলে ছেলেটা বাইরের দিকে যেতেই মাসুম দ্রুত তার পিছু নিলো। আবারও ভিজতে হবে উপায় নেই। কিন্তু বেশি ভিজতে হলো না, দুটো ঝুপড়ি পরেই ছেলেটার পিছু নিয়ে ঢুকে গেল ওরা। ভেতরে ঢুকে দেখল, এই ঝুপড়িটা আগেরটার তুলনায় বড়ো। এখানে দুইপাশে দাঁড়িয়ে সবাই। ঝুপড়ির মাঝখানে একটা পাটি বিছানো জলচৌকির ওপরে বসে আছে মুখে ঘোমটা দেওয়া এক মহিলা। মাসুম ভিতরে গিয়ে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সালাম দিবে না কী করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

ওর অস্বস্তি দূর করল রায়েলি, যে মেয়েটার সাথে ওদের প্রথম দেখা হয়েছিল। 'বেগম সাহেবা, এই সেই যোদ্ধা যারে ঈশা খাঁ পাঠাইছেন।'

'আমার নাম মাসুম খাঁ কাবুলি, আমি সুবাদারের খুব ঘনিষ্ট মিত্র ছিলাম না কিন্তু তার মৃত্যু বাঙাল মুলুকের জন্যে বিরাট ক্ষতি,' এর বেশি আর কী বলবে ঠিক বুঝতে পারল না মাসুম। ওর প্রশ্নের জবাবে সুবাদারের স্ত্রী মেহের শুধু মাথা নাড়ল।

'আপনারা স্রেফ তিনজন আসলেন?' রায়েলি বলে উঠল। 'আমরা আশা করছিলাম, ঈশা খাঁ তার মিত্রের জন্যে আরও বড়ো বাহিনী পাঠাবেন।'

মাসুম মাথা নেড়ে দুঃখ প্রকাশ করে বুঝিয়ে বলল কেন সে সেটা পারেনি। সেই সাথে যোগ করল, 'আমরা একবার যেহেতু আসছি একটা না একটা উপায় বাইর কইরাই ফালাব। কিন্তু তার আগে আমগো কিছু বিষয়ে আলোচনা করাটা অত্যন্ত

জরুরি। বিশেষ কইরা বিগত কিছুদিন যাবৎ কী হইল এবং–' মাসুম ঈশা খাঁর নির্দেশ অনুযায়ী সেই বিশেষ আলোচনাটা করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই বাইরে কারও পদশব্দ শোনা গেল। আসলে একাধিক এবং বেশ জোরে দৌড়ে আসছে তা না হলে এই ঝড়ের ভেতরে সব বোঝা যেত না।

সবাই সেদিকেই তাকিয়ে আছে ওদেরই মতো পোশাক পরা দুজন দৌড়ে এসে ভেতরে ঢুকল।

'কী ব্যাপার, তোমরা পাহারা ছাইড়া আসছ কেন?'

'বেগম সাহেবা, খারাপ খবর আছে,' বলে দম নিতে লাগল। সবাই তাকিয়ে আছে ওদের দিকে দ্বিতীয় জন বলে উঠল। 'শত্রু, শত্রুরা আক্রমণ চালাইতে যাইতেছে।'

কথাটা শুনে চমকে উঠল মাসুম, আর যাই হোক এত দ্রুত আক্রমণ আশা করেনি ও।

অধ্যায় বাইশ
বর্তমান সময়
ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে, ঢাকা

গাড়ির ভেতরে থাকা সবাই খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে লকেটটার দিকে। চৌধুরী সেটাকে হাতে নিয়ে উলটেপালটে দেখতে লাগল, তারপর বাশারের কাছ থেকে মোবাইলটা নিয়ে সেটাকে মোবাইলের ছবির সাথে মিলিয়ে দেখল। তারপর পৃথার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আচ্ছা, এটা তুমি কোথায় পেয়েছ? তোমার মা দিয়েছিল?'

'জিনিসটা মারই ছিল, মা সবসময় এটা পরে থাকত কিন্তু মার মৃত্যুর পর এটা ছিল বাবার কাছে। আমার একেবারে সঠিক মনে নেই, তবে যতটুকু মনে পড়ে এটা কয়েক বছর আগে কুরিয়ারে এসেছিল। মায়ের অনেক জিনিস ইংল্যান্ড থেকে মাঝে মধ্যে আমাকে পাঠানো হয় সেই কারণে এটা যখন পাঠানো হয় আমি ভেবেছিলাম এটা হয়তো ওভাবেই ওখান থেকে পাঠানো। আমি আসলে অত ভালোভাবে খেয়াল করিনি। জিনিসটা পেয়ে এত খুশি হয়েছিলাম বলার বাইরে। তাই সেভাবে আর কিছু ভাবার কথা মাথাতেই আসেনি,' বলে সে মাথা নাড়ল, 'কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এটা বাবাও পাঠিয়ে থাকতে পারে, কারণ বাবার অন্তর্ধানের সময় আর এটা পাঠানোর সময় দুটোই প্রায় কাছাকাছি সময়ে ঘটেছে।'

'তারমানে এটার ভেতরে অবশ্যই কোনো-না-কোনো ক্লু আছে,' বাশারের গলায় স্বস্তি। সে তাকিয়ে আছে চৌধুরীর দিকে। 'আমাদের মনে হয় দ্রুত এটা পরীক্ষা করে দেখা উচিত আমাদের।'

কিন্তু চৌধুরীর ভেতরে কোনো তাড়াহুড়ো দেখা গেল না, সে এমনকি জিনিসটার দিকে তাকিয়েও নেই। সে তাকিয়ে আছে বাশারের দিকে। 'একটা প্রশ্ন করতে পারি?' বাশার মাথা নেড়ে সায় জানাল। 'আপনি বুঝলেন কীভাবে যে এই ফলকের ওপরের চিহ্ন আর ওর লকেটের ওপরেও একই চিহ্ন। শুধুই অবজারভেশন নাকি আরও কোনো কারণ আছে?'

'আপনি বুদ্ধিমান মানুষ,' বাশার বলে উঠল। 'সত্যি কথা হলো আমার কাছে ক্লু ছিল। আমি সেভাবে হয়তো চট করে ধরতে পারতাম না কিন্তু কিছুদিন আগে

প্রফেসর আবদেলের কেসের সময়ে প্রায় কাছাকাছি ধরনের একটা ঘটে ফিল্ড এজেন্ট শারিয়ারের সাথে। আমি রিপোর্টে বিস্তারিত পড়েছি, কাজেই সেটা ব্যাক অব দ্য মাইন্ড কাজ করেছে।'

চৌধরী কিছু না বলে আনমনে মাথা নাড়ল, তারপর বাশারের মোবাইল দিয়ে লকেটের ওপরে থাকা প্রতীক চিহ্নটার একটা ছবি তুলে লকেট আর মোবাইল দুটোই ফেরত দিলো বাশারের কাছে। বাশার খানিকটা স্বস্তি বোধ করল জিনিসটা নিজের হাতের মুঠোতে নিয়ে। 'আমাদের এটা পরীক্ষা করে দেখা উচিত,' বাশার আবারও একই কথা বলে উঠল।

'তা তো অবশ্যই উচিত কিন্তু, তার আগে একটা কাজ কি করা সম্ভব?' চৌধুরী বাশার আর সোহেলকে দেখল একবার। 'এই প্রতীকটার ছবি দিয়ে কি একটা সার্চ দেওয়া সম্ভব? কারণ আমি মনে হয় জিনিসটা নিয়ে কিছু একটা অনুমান করতে পারছি, তবে যদি সার্চ দেওয়া যায় সেটাতে আরও নিশ্চিত হওয়া যাবে।'

'অবশ্যই সম্ভব। বস, তোমার মোবাইলটা দাও দেখি,' সামনের সিট থেকে সোহেল বলে উঠল। বাশার মোবাইলটা ওর দিকে দিতে সে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'এই ফলকের ওপরে এই সিম্বলটা এলো কীভাবে, মানে এটা কি শুরু থেকেই ছিল নাকি—'

'আই হ্যাভ নো ক্লু,' সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে উঠল পৃথা। 'আমার আসলেই কোনো ধারণা নেই। তবে এটা ঠিক এর সাথে অবশ্যই পুরো ব্যাপারটার কোনো-না-কোনো সংযোগ তো অবশ্যই আছে। কারণ লকেটটা অনেক পুরনো এবং এটা মাম্মির কাছে সবসময়ই ছিল।'

বাশার লকেটটা চোখের সামনে তুলে ধরল সাধারণ একটা লকেট। পাতলা একটা রূপোর চেইনের সাথে আটকানো। লকেটটাও রূপালি রংয়েরই, গোল, পাঁচ টাকার কয়েনের চেয়ে সামান্য মোটা হবে। জিনিসটাকে উলটাতেই দেখল পেছনে একেবারে পালিশ করা, বাশার সাবধানে কয়েনটা চারপাশে নখ দিয়ে খুঁটতে লাগল। একেবারে সমান করে বসানো। কোনো দিকে কোনো ফাটল বা সূক্ষ্মতম কোনো দাগ পর্যন্ত নেই। আবার উলটে দেখতে পাবে সামনে থেকে। সোহেল বলে উঠল, 'গট ইট, বস।'

সবাই ফিরে তাকাল তার দিকে। 'ইট ওয়াজ সো অভিয়াস, প্রথম হিটেই চলে এসেছে সার্চে।'

তার হাত থেকে মোবাইলটা নিতে নিতে বাশার পেজের টাইটেলটা দেখতে পেল। 'বারো ভূঁইয়া।'

'এক্স্যাক্টলি, এটা বারো ভূঁইয়াদের সাথে সংশ্লিষ্ট একটা প্রতীক। পনেরো শতকের,' বাশার মোবাইলটা তুলে দেখাল সবাইকে। 'কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো শুধু

কি এটাই? নাকি আরও কিছু আছে?' বলে সে মোবাইলটা পৃথার হাতে দিয়ে আবারও লকেটটা তুলে ধরল চোখের সামনে। রূপালি রংয়ের লকেটটার সামনের অংশে সুন্দর করে খোদাই করে বসানো প্রতীকটা। মাঝখানে একটা কারুকাজ করা ঢাল, তার নিচে দুটো বর্শা। 'কাজটা যদি হাতে করা হয়ে থাকে তবে বলতেই হবে খুবই দারুণ এবং দক্ষ হাতের কাজ,' ঢালের ওপরের অংশে ছোটো একটা ঢিবির মতো। জিনিসটা নখ দিয়ে খুঁটে দেখল ও। ছোটো অংশটা নখ দিয়ে চাপ দিতে যেন একটু বসে গেল। কিন্তু কিছু হলো না, বাশার আবারও চাপ দিতে যাবে তার আগেই চৌধুরী হাত বাড়াল ওর দিকে, 'দেখি আমি–'

কিন্তু সে কথা শেষ করার অগেই আবারও চাপ দিয়ে ফেলেছে বাশার। এবার খানিকটা জোরে, মৃদু কট করে যেন শব্দ হলো, দুপাশে যেন সামান্য বাতাসের মতো বেরিয়ে গেল, আর সেই সাথে ওটার গোড়া যেখানে চেইনটা আটকানো সেটাকে কেন্দ্র করে দুই ভাগ হয়ে গেল লকেটটা।

'শিট,' আনমনেই বলে উঠল পৃথা। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে লকেটটার দিকে। জিনিসটা মেলে ধরে খুব সাবধানে ভেতর থেকে মসলিনের মতো পাতলা একটা ভাঁজ করা কাপড় চোখের সামনে তুলে ধরল। 'জিনিসটা একটা ম্যাপ।'

'এবং জোরদার সম্ভাবনা ম্যাপটা এই জায়গার,' সবাই ফিরে তাকাল চৌধুরীর দিকে। সে বাশারের মোবাইলেই একটা জায়গার ছবি দেখাচ্ছে। সেখানে বড়ো করে এই প্রতীকটা আঁকা।

'সর্বনাশ, এটা তো এই প্রতীকটাই, কোন জায়গা এটা?' আনমনেই জানতে চাইল বাশার।

'এটা সোনার গাঁ, ঈশা খাঁর রাজধানী, মানে একভাবে বলতে গেলে সোনারগাঁওয়ের রাজধানী।'

'এর মানে পুরোটা সময় আমি এই জিনিস গলায় নিয়ে ঘুরেছি,' পৃথার মুখ লিটারেলি হাঁ হয়ে গেছে। বাশার ম্যাপটা দেখছে একবার, আরেকবার সে ফিরে তাকাল মোবাইলের দিকে। কিন্তু ও কিছু বলার আগে চৌধুরীই বলে উঠল। 'নিঃসন্দেহে এটা পুরো ব্যাপারটাকে জোড়া লাগালে খুব ভালোভাবে মিলে যায়। প্রথমত–'

'মাম্মি এবং আব্বু দীর্ঘদিন কাজ করেছে সোনারগাঁওতে,' পৃথা মুখ তুলে বলে উঠল। 'এটা আপনারা জানেন কি না, আমি জানি না।'

'আমি জানি,' চৌধুরী বলে উঠল। 'এটাই বলতে চাচ্ছিলাম আমরা। প্রথম কথা প্রফেসর আবদেল এবং প্রফেসর ইলা দুজনেই এই জায়গাতে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন,' বলে সে মোবাইলের দিকে ইশারা করল। 'দ্বিতীয়ত, এই লোগো বা

প্রতীক বা সিম্বল–যাই বলি না কেন, এটা লকেট এবং প্রফেসর ইলার কবরের ফলকের ওপরে আঁকা ছিল। এই দুটোকে জোড়া লাগালে নিঃসন্দেহে বলা যায় এই বিষয়টা সোনারগাঁওয়ের দিকে নির্দেশ করে।'

'এবং রাজদ্রোহীর রহস্যের সাথে বারো ভূঁইয়াদের সংযোগ আছে। কাজেই–' বাশার কথা শেষ করার আগেই ধপ করে একটা আলো এসে বাড়ি মারল ওদের সবাইকে। নিজেদের আলোচনায় ওরা এতটাই মগ্ন হয়ে গেছিল যে খেয়ালই করেনি দুটো গাড়ি এসে থেমেছে ওদের গাড়িটা থেকে বেশ খানিকটা দূরত্বে বজায় রেখে। হঠাৎই ওদের সামনের গাড়িটার হেডলাইট এসে বাড়ি মারল ওদেরকে।

'পাগল নাকি?' পৃথা ব্যাপারটা ধরতে পারেনি, বাশার চট করে তার একটা হাত ধরে ফেলেলো। সাথে সাথে পেছনে আরেকটা গাড়ির হেডলাইট জ্বলে উঠল। সেই আলোতে ওরা পরিষ্কার দেখতে পেল সামনেসেই কালো গাড়িটা আর ওটার ভেতরে বসে থাকা ড্রাইভার আর কালো কোটকেও পরিষ্কার দেখা গেল, কালো কোটের মুখে লেগে থাকা হাসিটাও পরিষ্কার দেখতে পেল ওরা।

'সর্বনাশ,' বাশার চট করে আশপাশে দেখতে শুরু করেছে। ও এবং সোহেল দুজনেই বের করে এনেছে নিজেদের পিস্তল। ওরা যে জায়গাতে আছে এটা সদরঘাট থেকে খুব বেশি দূরে না। ফলে লোকজনের যাতায়াত রাতে হলেও একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু ওরা নীরবে আলোচনা করার জন্যে গাড়িটাকে নিয়ে এসেছিল একটা নির্জন গলির ভেতরে। ফলে এখানটা একেবারে নীরব। একটা মানুষ তো দূরে একটা কুত্তাও নেই। গলির একদিকে দাঁড়িয়ে আছে সেই কালো গাড়িটা অন্যদিকে পেছনে আরেকটা।

'ওরা এভাবে একেবারে সময়মতো–'

'আমরা আটকে গেছি,' বাশার ঘোষণার সুরে বলে উঠল। 'তবে–' সে কিছু বলার আগেই চৌধুরী চট করে গাড়িটাকে স্টার্ট দিয়ে ফুল গিয়ারে সামনে ঠেলে দিলো। ওরা কেউ তো বটেই এমনকি সামনের গাড়ির মানুষেরাও অনুধাবন করতে পারেনি ওদের গাড়িটা এত দ্রুত এভাবে রিঅ্যাক্ট করে উঠবে, ওরা কেউ নিজেদেরকে সামলানোর আগেই কিংবা সামনের গাড়িটা কিছু করার আগেই ওদের গাড়ি গিয়ে তীব্র স্পিডে বাড়ি মারল সামনের গাড়িটাকে। প্রায় বোমা বিস্ফোরোণের মতো শব্দ হলো। ওরা সবাই গড়িয়ে পড়ল একে-অপরের ওপরে।

'হ্যাং অন–' বলে চৌধুরী গাড়িটাকে আবারও পিছিয়ে নিলো।

'আরে আপনি করছেন কী–'

ওদের গাড়িটা আবারও গিয়ে বাড়ি মারল সামনের গাড়িটাকে। এবার এতটাই জোরে যে সামনের গাড়টা প্রায় চল্লিশ ডিগ্রির মতো ঘুরে গেল। বাশার তাকিয়ে দেখল ওর পেছনের গাড়িটা এগিয়ে এসে আটকে দিতে চাইছে ওদেরকে। চৌধুরী

আবারও পেছাতে শুরু করেছে, *সবাই মাথা নিচু করো*—বলে বাশার সাইড মিরর দিয়ে নিজের পিস্তল ধরা হাতটা বের করে পেছনের দিকে দুটো ফাঁকা ফায়ার করল। পেছনের গাড়িটা কী করছে দেখার আগেই আবারও ওদের গাড়ি এগিয়ে বাড়ি মারল সামনের গাড়িটাকে। বাশার দেখল সামনের তো বটেই ওদের গাড়ির দুটো কাচ ভেঙে গেল, তীব্র ধাক্কার চোটে। গাড়ির ভেতরে পৃথা চিৎকার করতে শুরু করেছে। বাশার দেখল চৌধুরীর পাগলামিতে কিংবা ওর গুলিতে পেছনের গাড়িটাও থেমে গেছে। চৌধুরী আবারও পিছিয়ে গিয়ে ফুল স্পিডে বাড়ি মারতে যাবে সামনের গাড়িটাকে এবার চট করে ওটা পিছিয়ে গেল খানিকাটা আর ওদের গাড়িটা বোতলের ছিপির মতো ছিটকে বেরিয়ে এলো বড়ো রাস্তায়।

'আপনি পাগল নাকি?' নিজের তালগোল পাকানো শরীরটাকে কোনোমতে সামলে নিয়ে ঝাঁঝের সাথে বলে উঠল। কিন্তু সে পুরোপুরি ঠিক হবার আগেই আবারও তীব্র ঝাঁকির সাথে গাড়িটা ঘুরে গেল একপাশে। 'অল অব ইউ আর ওয়েলকাম,' বলেই গাড়ির স্পিড আরও বাড়িয়ে দিলো চৌধুরী।

'সবাইকে মারার তাল করছেন নাকি আপনি?' আবারও পৃথা বলে উঠল। বাশার বোঝার চেষ্টা করছে আসলে হচ্ছেটা কি আর চৌধুরীই বা কি করছে।

'মারার তাল করছি না, বাঁচানোর চেষ্টা করছি,' চৌধুরী গাড়িটাকে বনবন করে ঘুরিয়ে বাঁয়ের একটা রাস্তায় ঢুকিয়ে দিলো। ডানে গেলে সদরঘাট কিন্তু সেদিকে না গিয়ে এদিকে কেন এলো বুঝতে পারছে না বাশার। তবে খালি রাস্তায় গাড়ি মোটামুটি বেশ ভালো গতিতেই এগোতে শুরু করেছে।

'ব্যাপার কী?' বাশার এখনও পেছনেই তাকিয়ে আছে, তারপর চট করে বুঝে ফেলল সে, কথাটা বলার জন্যে মুখ খুলল কিন্তু তার আগেই চৌধুরীই বলে উঠল, 'গলি থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি আমরা ঠিকই, কিন্তু ওরা পিছু নিয়েছে।'

চট করে প্রায় সবাই পেছনে ফিরে দেখার চেষ্টা করল। প্রথমে প্রায় কেউই দেখতে পেল না কিন্তু ভালোভাবে তাকাতেই দেখল একটা গাড়ি ওদের পেছনে পেছনে আসতে শুরু করেছে।

অধ্যায় তেইশ

সময়: ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ

জল-জঙ্গল এলাকা

'হুম, তোমাদের কথা ঠিকই ওরা আসলেই আক্রমণের প্রস্তুতি নিতেছে,' মাথা নেড়ে মাসুম বলে উঠল। আপনাতেই একবার আকাশের দিকে তাকাল। ঘন কালো রাতের আকাশ, তবে বৃষ্টির বেগ অনেকটাই কমেছে সেই সাথে কমেছে ঝড়ের বেগও। আকাশের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সামনের পানির দিকে তাকাল। যদিও বেশ অন্ধকার, কিন্তু অন্ধকারের ভেতরেও পানির ওপরে অন্তত দুটো জাহাজের মতো নৌকার আকৃতি বেশ পরিষ্কারভাবেই চোখে পড়ছে। মাসুম ভালোভাবে খেয়াল করে দেখল একটা জালিয়া হবে, আরেকটা সম্ভবত সওদাগরি নৌকা। দুটোই আকৃতিতে বিশাল এবং মাসুম প্রায় নিশ্চিত সওদাগরী নৌকাটার ওপর অনেক কাজ করা হয়েছে, ওটার গতি বৃদ্ধি থেকে শুরু করে অন্যান্য অনেক দিক থেকে ওটাকে চৌকস করার জন্যে। দুটো নৌকার ওপরেই লোকজন ছুটাছুটি করছে এবং দীর্ঘদিন এরকম নৌকায় কাজ করার সুবাদে এবং সেনাবাহিনীতে থাকার কারণে কাজের ধরনটাও মোটামুটি ও আন্দাজ করতে পারে। ওরা নৌকা দুটো থেকে চরে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর সেটা যে চরটা আক্রমণ করার জন্যে–এটা বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। সম্ভবত বৃষ্টির বেগ খানিকটা কমলেই ওরা আক্রমণ চালাবে। এমন অবস্থায় যেকোনো স্বাভাবিক বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের জন্যে ভোরের আলো ফোঁটার অপেক্ষায় থেকে এবং তারপরে আক্রমণ চালানোই বুদ্ধিমানের মতো কাজ বলে প্রতীয়মান হবে কিন্তু বিশা ডাকাত কেন আক্রমণ চালাতে যাচ্ছে সেটাও মাসুম আন্দাজ করতে পারে।

বিশা আসলে পুরোপুরি আন্দাজ করতে পারছে না দ্বীপে যারা আছে তারা কী করছে, তাদের কাছে কী ধরনের রসদ আছে এবং দ্বীপ থেকে পালানোর জন্যে ওরা কতটা প্রস্তুত। এটা আন্দাজ করতে না পারার কারণে সে ধরেই নিয়েছে ভোরের জন্যে অপেক্ষা করাটা দেরি হয়ে যেতে পারে। আরেকটা বিষয় হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। সম্ভবত বিশার লোকেরা বরকতের জাহাজটাকে দেখেছে। ঝড়ের ভেতরে হয়তো ওদেরকে দ্বীপে নামতে দেখেনি কিন্তু জোরদার সম্ভাবনা আছে তারা

জাহাজটাকে দেখেছে। এমনিতে পরিস্থিতি হয়ে আছে টান টান। তার ওপরে আবার এলাকায় একটা মোঘল জাহাজের উপস্থিতি, সেটা যে কারণেই হোক, বিশাকে অস্থির করে তোলার জন্যে যথেষ্ট। কাজেই সে আর কোনো ঝুঁকিতে যেতে চাইছে না। কিন্তু একটা প্রশ্ন মাসুমের মাথায় উঁকি দিচ্ছে। প্রশ্নটা সে জিজ্ঞেস করেই ফেলল।

'শুনছিলাম বিশার তিনটা জাহাজ আছে। আরেকটা কই?' মাসুম সুলতান আর রায়েলির দিকে একবার দেখে নিলো। 'তুমগো কারও চোখে পড়ছে?'

'হুম,' সুলতানই বলে উঠল। 'ওইটা অন্যদিকে আছে,' ওইটাতে অবশ্য তেমন কোনো নড়াচড়া চোখে পড়ে নাই।'

কেন ওটাতে কোনো নড়াচড়া চোখে পড়ে নাই—মাসুম সেটা ভালোভাবেই আন্দাজ করতে পারে। 'ওইদিকেই কি তুমগো নাওটা রাখা আছে, যেইটা দিয়া তুমরা এইখানে আসছিলা?'

যদিও মাসুম জানে উত্তরটা কী হতে পারে, তবুও নিশ্চিত হবার জন্যেই এই প্রশ্ন করা। সুলতান মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'হ, ওইদিকেই রাখা, আপনে বুঝলেন ক্যামনে?' মাসুম কোনো জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। মনে মনে সে বলে উঠল: *বালক, এইটাকে বলে অভিজ্ঞতা*।

বিশার পরিকল্পনাটা মাসুম ধরতে পারছে। তার জালিয়া কিংবা সওদাগরি থেকে ছিপ নৌকায় করে দলে দলে লোক এসে আক্রমণ চালাবে দ্বীপে, ওদেরকে ধরার জন্যে। আরেকটা জালিয়া পাহারায় থাকবে। আর তৃতীয় জাহাজটা নজর রাখছে অন্যদিকে। এতে দুটো কাজ হচ্ছে। প্রথমত, ওরা নৌকা নিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে তৃতীয় নৌকা থেকে দেখা যাবে, দ্বিতীয়ত দ্বীপের পেছন দিকেও নজর রাখছে ওটা। যাতে ওরা ওদিক দিয়ে সরে পড়তে চাইলে বা অন্য কোনো উপায়ে পালানোর চেষ্টা করলে ধাওয়া করতে পারে। মাসুম অনুধাবন করল বিশা ডাকাতের কুখ্যাতি পুরো এলাকাতে এমনি এমনি হয়নি, লোকটা ডাকাত হতে পারে কিন্তু তার ঘটে বুদ্ধি আছে। 'চলো, সবাই জলদি চলো, জরুরি আলোচনা আছে।'

ওরা ফেরার জন্যে ঘুরে হাঁটতে শুরু করতেই রায়েলি ওর পাশে চলে এলো। তারপর নিজের সেই বিচিত্র টানে সে জানতে চাইল, 'আপনে কী করার কথা ভাবতাছেন? পালানির উপায় কী?' মাসুম মেয়েটার চোখের দিকে তাকাল হাঁটতে হাঁটতেই। যদিও অন্ধকারের কারণে সেভাবে দেখা যাচ্ছে না। তবুও সে মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে বেশ খানিকটা অবাকই হলো। এই প্রথমবারের মতো আধো অন্ধকারের ভেতরেও মেয়েটাকে ভালোভাবে খেয়াল করল। তার পরনের পোশাক অনেকটা ছেলেদের মতোই। লম্বা শক্তিশালী গড়ন অনেকটাই পুরুষালি। আর যেভাবে অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করছে তাতে এটাও বেশ পরিষ্কার যে, এগুলো

চালানোর এবং সামলানোর মতো ক্ষমতা তার বেশ ভালোই আছে। মাসুম তার জীবনে এমন মেয়ে কোনোদিন দেখেনি। রাজপরিবার বাদে সাধারণ মেয়েমানুষ মাত্রই ভঙ্গুর এবং অসহায় হিসেবেই দেখে এসেছে সে সবসময়। কিন্তু এই মেয়ের আবয়ব থেকে শুরু করে সবকিছুই তার জন্যে একেবারেই নতুন এবং একেবারেই ভিন্ন কিছু। কিন্তু তারপরও এগুলোর কোনোটাই তাকে অবাক করেনি, অবাক করেছে মেয়েটার শান্ত চোখের ভাষা, যদিও সে মাসুমের কাছে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছে, কিন্তু তার চোখের তারা একেবারেই শান্ত। আর এই শান্ত চোখের তারা ওকে জানান দিচ্ছে—ওর মতোই এরকম বিপজ্জনক অভিজ্ঞতা মেয়েটার জন্যেও নতুন কিছু নয়।

মেয়েটার প্রশ্ন শুনে মাসুম মৃদু হেসে উঠল, 'প্রথম কথা অইল পলানির উপায় নাই। কাজেই ভিন্ন কিছু করতে অইব,' বলে সে সামনের দিকে দেখাল। 'আমরা প্রায় চইলা আসছি, আপনেগো বেগম সাহেবার সামনে গিয়া সবাইরে একসাথে কইরাই আলোচনা করতে হবে,' মাসুম জবাব দিয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই সে থেমে গেল মেয়েটার কাজ দেখে। মেয়েটা চট করে দুই কদম এগিয়ে ওর পথ রোধ করে দাঁড়াল। দলের সবাই খানিকটা চমকে গিয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দুজনার দিকে। রায়েলি বাকিদেরকে এগোনোর জন্যে ইশারা করল। তারা খানিকটা এগোতেই সে সরাসরি মাসুমের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'বাঙালি, যে-মানুষগুলারে দেখতাছ এই পৃথিবীতে এরাই আমার সব, এগো দায়িত্ব আমার উপরে, কাজেই এগো বাঁচানির লাইগা আমি সব করতে পারি। কিন্তু এরচেয়েও বড়ো দায়িত্ব আমগো উপরে আছে, কাজেই তুমি হয়তো জানো—'

'আমি খুব ভালো কইরাই জানি, কাজেই ভরসা রাখতে পার আমার উপরে,' মেয়েটাকে হঠাৎ এভাবে *তুমি* করে কেন বলে উঠল মাসুম নিজেও জানে না। কিন্তু অদ্ভুত এক অনুভূতি কাজ করছে এই ভিনদেশি মেয়েটার প্রতি, তবে ও পরিস্থিতি খুব ভালো বুঝতে পারছে। 'চলো দেখি, কী করা যায়।'

ওরা দুজনে যখন সেই ঝুপড়ির ভেতরে ঢুকল, দেখল সবাই বাতির আলোয় তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

মাসুম ভেতরে ঢুকে একটা পাটির ওপরে বসে পড়ল। সে কিছু বলার আগেই ঘোমটায় মুখ ঢাকা মেহের কথা বলে উঠল, 'বাঙালি, যা শুনলাম তা কি সত্যি, ওরা নাকি—'

'হুম,' মাসুম মাথা নেড়ে সায় জানাল। ওর ভীষণ তামাকের তৃষ্ণা পেয়েছে। অন্তত খানিকটা সুপুরি চিবাতে পারলেও মুখটা শান্তি পেত কিন্তু এই অবস্থায় এরকম কিছু বলার মতো স্পৃহা হলো না ওর। 'আমি কোনোকিছু লুকাব না, বরং সব খুইলা

বলব আপনেগো,' মাসুম একে একে সবার দিকে দেখে নিলো। সবশেষে তার দৃষ্টি এসে স্থির হলো ঠিক ওর সামনে বসে থাকা মুখ ঢাকা মহিলার ওপরে। তারদিকে একবার দেখে নিয়ে রায়েলির দিকে তাকিয়ে, আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল বেগম সাহেবার ওপরে।

'বেগম সাহেবা–'

'আমারে মেহের বলতে পারেন।'

চট করে মহিলার কথাটা শুনে মাসুম একটু থতমত খেয়ে গেল। 'মেহের, শোনেন, ওরা বিশা ডাকাইত। আপনেগো এবং মোঘলগোর তথ্য মতে যদি ওইটা বিশাই হয়া থাকে, ওরা আক্রমণ করতে যাইতাছে এইটা নিশ্চিত। তবে এইটা বড়ো খারাপ খবর না। খারাপ খবর অন্য জায়গায়। প্রথম খারাপ খবর ওরা সম্ভবত আক্রমণের জন্যে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবো না, বাইরে বৃষ্টির বেগ কইমা আসছে, আরেকটু কমলেই ছিপ নাওগুলা পানিতে নামানির মতন অবস্থায় আসব, আর সাথে সাথে ওরা আক্রমণ চালাবো। ওগো তিনটা বড়ো নাও, একটা থেইকা লোক আইসা ছিপ নৌকা দিয়া আক্রমণ চালাবো, আরেকটা ওইটার সাথে থাকবো। আর ওগো আরেকটা নাও সম্ভবত দ্বীপের পিছের দিকে নজর রাখতাছে কেউ পলানির চেষ্টা করলে ওরা ঠেকাইবো। মানে পলানির কোনো উপায় নাই। আক্রমণ অইব যেকোনো সময়। এইটা হইল বর্তমান বাস্তব অবস্থা। সবার আগে এইটা বুঝতে অইব।'

'এখন তাইলে করণীয় কী?' মেহের তাকিয়ে আছে ওর দিকে। প্রশ্নটা করল রায়েলি।

'আমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে,' মাসুম তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। 'প্রথম কথা, আমগো লোক আছে মোট কয়জন?'

রায়েলি সুলতানের দিকে দেখে বলে উঠল, 'আমরা নয়জন আর তোমরা চাইরজন।'

'মোট তেরো জন,' বলে আনমনে মাসুম মাথা নাড়ল। 'যারা আছে সবাই কি যুদ্ধ করার মতন?' রায়েলি উত্তর দিতে যাচ্ছিল তার আগেই মাসুম আবারও বলে উঠল। 'এর সাথে জানা দরকার আমগো অস্ত্র কী কী আছে?'

'সবাই যুদ্ধ করার মতন,' এবার জবাব দিলো সুলতান। 'অস্ত্র আছে, সবার সাথে ছুরি আর লাঠি আছে, যথেষ্ট পরিমাণ বর্শা আর তির-ধনুক আছে। নাওয়ে কয়টা কোঁচও থাকতে পারে।'

'জাল আছে?' মাসুম ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে।

'জাল!' সুলতান অবাক হয়ে রায়েলির দিকে তাকাল।

'জাল আমগো নাই, তয়ে একটা ঝুপড়ি আছে। ওইখানে অনেকগুলা দেখছি,' সুলাতানের পাশে থেকে ওদের নারী যোদ্ধাদের আরেকজন বলে উঠল।'

'বুঝতে পারছি,' মাসুম মাথা নাড়ল। এইবার আমাকে পুরা দ্বীপটার বিস্তারিত বুঝায়া দেন কেউ একজন, যেহেতু আমি দিনের বেলা আসি নাই কাজেই আমার আপনেগো মাধ্যমেই বুঝতে অইব।'

সুলতান ওদের সামনে এসে একটা কাঠি নিয়ে মেঝেতে পুরো দ্বীপের মতো আকৃতি বানিয়ে বলতে লাগল। 'পুরা জায়গাটা অনেকটা মোচার মতন। এইখানে এখন আমরা আছি, যেখানে অনেকগুলা ঝুপড়ি আছে, এইদিকে একটা আর ওইদিকে আরেকটা, দুইটা ঘাট আছে মোট। এইখানে জেলেরা শুঁটকি বানায়, ওইখানে বাঁশের মাচা বানানি আছে অনেকগুলা। এইখানে ছোটো একটা জঙ্গল আছে।'

'এইখানে কী?' জঙ্গলের মতো জায়গাটার সামনে একটা জায়গা দেখিয়ে বলে উঠল।

'এইখানে ছোটো ছোটো পানির চৌবাচ্চার মতন আছে অনেকগুলা।'

সুলতানের কথাটা শুনে মাসুম মনে মনে খুশি হয়ে উঠল, ও মনে মনে এরকম কিছু একটাই খুঁজছিল। আর জানত জেলেদের গ্রাম যেহেতু অবশ্যই এরকম কিছু একটা থাকবে এখানে। মাছ ধরার সময়ে জেলেরা মাছ জিয়ানোর জন্যে এইগুলা ব্যবহার করে। 'বুঝতে পারছি, আমার একটা পরিকল্পনা আছে। আমি একটা একটা কইরা বলবো, সবাই মন দিয়া শুনবা। প্রথমেই আমি বইলা রাখি আমার কী কী লাগবো। প্রথমে তুমগো ভিতরে সবচেয় দক্ষ তিরন্দাজ কারা আছ, হেগোরো লাগবো আমার। সবার কাছে যা যা অস্ত্র আছে সেইগুলা তো লাগবই, সেই সাথে প্রচুর জাল লাগবো আমার, লাগবো বাঁশের লগি, যেইটা অবশ্যই দ্বীপে আছে। আর আমি যা যা বলবো, সেইমতো প্রত্যেকটা কাম করতে অইব সবার।'

'বাঙালি, তুমি কি করতে চাইতেছ কও তো ঠিক কইরা?' রায়েলি তো বটেই সবাই ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

মাসুম ওর দিকে তাকাল না, সে চোখ তুলে তাকাল ধোবল আর বরখার দিকে। সে ওদের দিকে তাকিয়েই আছে, ধীরে ধীরে ওর মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি। তারপর সে চোখ তুলে তাকিয়ে বেগম মেহেরকে দেখল, সবশেষে সে ফিরে তাকাল রায়েলি আর সুলতানের দিকে। 'ওরা আক্রমণ করবই নিশ্চিত। বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ব্যবস্থা। প্রথমে আমরা ওগোর আক্রমণ ঠেকাব, তারপর উলটা ওগোরে আক্রমণ করব।'

সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে মাসুমের দিকে, সবার মাথায় একটাই ধারণা—বাঙালি পাগল হয়ে গেছে। শুধু ধোবল আর বরখার মুখে মৃদু হাসি, উত্তেজনার গন্ধ পেতে শুরু করেছে ওরা, সেই সাথে ওরা কিছুটা অনুধাবন করতে পারছে, মাসুম আসলে কী করতে চলেছে।

অধ্যায় চব্বিশ

বর্তমান সময়

বুড়িগঙ্গার পাড়, ঢাকা

'আমরা কি নিশ্চিত ওরা আসলে আমাদেরকেই ধাওয়া করছে?' পৃথার চোখ দুটো ভয়ে বড়ো বড়ো হয়ে গেছে। বারবার সে পেছনে ফিরে বোঝার চেষ্টা করছে? কী হচ্ছে আসলে ওখানে। তবে শুধু পৃথাকে দোষ দিয়ে লাভ কী? আসলে সবাই ঘাবড়ে গেছে বেশ ভালোভাবেই। স্বাভাবিক, সন্ধে থেকে একের-পর-এক যেভাবে ঘটনা ঘটেই চলেছে তাতে মাথা খারাপের জোগাড় হবারই কথা। প্রথমে মোহাম্মদপুরে পৃথাকে অপহরণের চেষ্টা, তারপর পুরনো ঢাকায় কবরস্থান থেকে ক্লু আবিষ্কার এবং আবিষ্কার সাথে সাথে ওদের ওপরে আক্রমণ, আর সেখান থেকে কোনোমতে পালানোতে সফল হবার পরও অনুসরণ করতে শুরু করেছে একাধিক গাড়ি।

'আপনার কি মনে হয় পেছনে যে গাড়িটা আসছে সেটা অকারণেই আমাদের পেছনে পেছনে আসছে?' কথাটা চৌধুরী বলে উঠল। তার নজর সামনের রাস্তাতে। রাতের ঢাকা হবার কারণে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি গতিতে গাড়ি ছুটছে কিন্তু পেছনের গাড়িটা ওদের চেয়ে বেশি দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে। দেখলেই বোঝা যাচ্ছে কোনোকিছুরই পরোয়া করছে না ওরা। 'অবশ্যই ওরা আমাদেরকে অনুসরণ করছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না চার্চের ওখানে যে-গাড়ি দুটো আমাদের পথ রোধ করেছিল ও দুটোকে যেভাবে আঘাত করা হয়েছে তাতে ও দুটোর এভাবে এত দ্রুত আমাদের পিছু নিতে পারার কথা না।'

'যারাই আমাদের ওপরে আক্রমণ করছে ওদের দুটো গাড়িই থাকবে এমন তো কোনো কথা নেই, ওদের আরেকটা গাড়িও হতে পারে,' সোহেল বলে উঠল। বাশার দেখল তার চেহারা সাদা হয়ে গেছে; নিশ্চিত সে আইনপ্রয়গকারী সংস্থার লোক হলেও এরকম অভিজ্ঞতা তার এবারই প্রথম। 'বস, আমরা ফোর্সে কেন খবর দিচ্ছি না?'

'কিংবা কোনো পুলিশ চৌকিতে গিয়ে পৌঁছালেই তো হয়,' পৃথার গলার আওয়াজ বাড়তে বাড়তে সেটা প্রায় চিৎকারের পর্যায়ে যেতে শুরু করেছে। বাশার

দেখল চৌধুরী ওদের গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ওদের বাঁয়ে বুড়িগঙ্গা নদী, সেটার পাশ দিয়ে লম্বা রাস্তাটা ধরে গড়ি প্রায় ঝড়ের বেগে এগোতে শুরু করেছে। বাশার ঠিক মনে করতে পারল না এই এলাকাতে সে আগে এসেছে কি না এবং ওরা আসলে আদৌ কোনোদিকে যাচ্ছে।

'আমরা এদিকে এলামই বা কেন? আমাদের তো উচিত ছিল কোনো একটা পাবলিক প্লেসে চলে যাওয়া কিংবা কোনো পুলিশ পোস্ট বা এরকম কোথাও যাওয়া,' সোহেলই আবারও বলে উঠল। চৌধুরী জিপের গতি বাড়িয়ে দেওয়াতে সে এখন ড্রাইভারের পাশের সিটে রীতিমতো চেপে বসে আছে।

'সেটা আরও বড়ো ভুল হতো, যারা আমাদেরকে আক্রমণ করেছে, তারা যদি প্রায় পাবলিক প্লেসের কাছাকাছি জায়গাতে আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারে তবে আপনাদের কীভাবে মনে হয় যে পাবলিক প্লেসে গেলেই আমরা নিরাপদ হয়ে যেতাম? আপনাদের ভালোর জন্যে আরেকটা কথা বলি, এমনকি পুলিশ পোস্টে গেলেও লাভ হবে না, এরা যা মন চায় করবেই,' বলে সে একবার পেছনে ওদের দিকে দেখে নিলো। 'ট্রাস্ট মি, এদের সাথে আমার মোলাকাত এবারই প্রথম নয়।'

'আপনি প্লিজ সামনে দেখুন,' বাশার কথাটা শেষ করার আগেই ওদের গাড়ির পেছনের কাচ ঝুর ঝুর করে ভেঙে পড়ল সেই সাথে *ঠন* করে শব্দ হলো কোথাও।

'শিট! ওরা গুলি করছে,' বাশার সিটের নিচে নিচু হতে হতে আপনাতেই বলে উঠল। 'সবাই সাবধান।'

'বলেছিলাম না,' চৌধুরীর গলা শুনে মনে হচ্ছে ওরা গুলি করাতে সে একরকম খুশি হয়েছে। 'সবাই সাবধান,' সে কথাটা বলে শেষ করার আগেই জোরে জোরে গাড়ির স্টিয়ারিং ঘোরালো এবং সাথে সাথে ওরা বলতে গেলে গাড়ির একদিক থেকে গড়িয়ে সরে গেল আরেক দিকে। বাশারের হাত থেকে ছুটে গেল পিস্তলটা, ও গিয়ে গড়িয়ে পড়েছে পৃথার ওপরে।

'এই লোকটা আসলেই পাগল,' নিজেকে কোনোমতে মেয়েটার ওপর থেকে সরিয়ে আনতে আনতে বাশার শুনতে পেল বিড়বিড় করে গাল বকে উঠল পৃথা। সিটের নিচে হাতড়ে নিজের পিস্তলটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে বাশার, সামনে থেকে আবারও বলতে গেলে প্রায় আঁতকে উঠল সোহেল। 'বস, কিছু একটা করো।'

বাশার পিস্তলটা হাতের নাগালে পেয়ে চেপে ধরার আগেই আবারও গাড়ি ঘোরালো চৌধুরী এবং পিস্তলটা আবারও ওর হাত থেকে ছুটে গেল। সেই সাথে সে অনুভব করতে পারল ঠনঠন করে আবারও শব্দ হলো। মানে আবারও গুলি করেছে পেছনের গাড়ি থেকে।

'এরা তো দেখি যুদ্ধ শুরু করে দিলো,' সামনে থেকে সোহেল চিৎকার করে উঠল। বাশার সিটের নিচ হাতড়ে পিস্তলটা পেয়ে এবার চট করে ধরে ফেলল ওটা।

'ডেসপারেট টাইম ডেসপারেট মেজার,' বলেই সে কোনোমতে সোজা হয়ে পিস্তল তুলল গাড়ির পেছনের জানালার ভাঙা কাচের এপাশ থেকে, কিন্তু গুলি করতে যাবে তার আগেই দেখতে পেল পেছনের গাড়িটা একেবারে ওদের গায়ের ওপরে উঠে পড়েছে। বাশারও পিস্তল তুলল পেছনের গাড়িটা সর্বশক্তি দিয়ে এসে বাড়ি মারল ওদের গাড়ির বাম্পারে। গুলি করার আগেই ব্যালেন্স হারিয়ে বাশার সরে গেল একপাশে। ওর পিস্তল থেকে গুলি বের হতে হতেও কোনোমতে নিজেকে সামলে নিলো বাশার, তা না হলে ওর পিস্তলের গুলি গাড়ির ভেতরে কারও গায়ে লাগার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু গুলি সামলাতে গিয়ে নিজেকে সে সামলাতে পারল না, তার আগেই তীব্র ধাক্কার চোটে পেছনের সিট থেকে গিয়ে বাড়ি খেল সামনের সিটে। নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা হতেই যা দেখল তাকে আতঙ্কের চোটে বাশারের মুখ হাঁ হয়ে গেল। সেই সাথে অনুভব করতে পারল গাড়িটা পুরোপুরি ব্যালেন্স হারিয়ে রাস্তার একপাশের খাদের দিকে ছুটে চলেছে।

চট করে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল–চৌধুরী নিজেকে সামলে প্রাণপণে চেষ্টা করছে হুইল সামলানোর। কিন্তু গাড়িটার নাক সোজা হবার বদলে ক্রমাগত পিছলেই চলেছে সামনের রাস্তার একপাশের দিকে।

'চৌধুরী, সাবধান,' বাশার চিৎকার করে উঠল। কারণ পেছনের গাড়িটা আবারও ছুটে আসছে। এবার ধাক্কা দিলে আর দেখতে হবে না পুরোপুরিই ওটা ছিটকে পড়বে রাস্তার পাশের খাদে, আর পেছনের গাড়িটারও সেটাই উদ্দেশ্য। বাশার আবারও পিস্তল তুলল, পেছনের গাড়িটা চলে এসেছে বলতে গেলে প্রায় নাগালের ভেতরে, একসাথে ঘটে গেল বেশ কয়েকটা ঘটনা।

বাশার পিস্তল তুলল। ও গুলি করার আগেই পেছনের গাড়িটা এসে বাড়ি মারতে উদ্যত হলো পেছনের বাম্পারে কিন্তু, ওটা পুরোপুরি আঘাত করার আগেই চৌধুরী হুইলের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতেই ওটাকে রাস্তার বাঁদিক থেকে ঘুরিয়ে ফেলল ডানে। ফলে গাড়িটা ওদের গাড়িকে আঘাত করতে গিয়েও অল্পের জন্যে মিস করল। কিন্তু আবারও ওরা নিজেদের শরীরের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গড়িয়ে গেল একদিকে। এবার বাঁ থেকে ডানে।

দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে পিস্তলটা কোমরে আটকে সিটের কোনা চেপে নিজেকে সোজা করল বাশার। বারবার এভাবে ফসকাতে ফসকাতে নিজের ওপরে জিদ চেপে বসেছে ওর। এভাবে খোলা থাকলে আবারও শরীরের ভারসাম্য হারাবে কাজেই একহাতে সিটের কোনা চেপে ধরল, তারপর নিজের আরেকটা পা ঠেকাল পেছনের দিকে, সামনের সিটের গোড়াতে, সেই সাথে ডান হাতে কোমর থেকে বের করে আনল পিস্তলটা। এবার সামনের গাড়িটা ওদের জন্যে সুবিধা করে দিলো। আবারও ওদের গাড়িকে আঘাত করার জন্যে এগিয়ে এসেছিল ওটা।

বাশার সোজা গুলি করল গাড়িটা লক্ষ্য করে। তিন রাউন্ড গুলি করেই নিচু হয়ে গেল ও। কারণ এরকম খোলা জানালা দিয়ে ওর শরীরের পুরোটাই দেখতে পাবার কথা পেছনের গাড়িটা থেকে।

'এক দুই তিন,' গুনেই আবারও সোজা হলো ও। সাথে সাথে বেশ কয়েকটা জিনিস ধরা পড়ল ওর চোখে। গাড়ির একপাশের জানালার কাচ ভেঙে গেছে, একটা সাইড মিরর ভেঙেছে, কিন্তু গাড়িটার কোনো ভাইটাল পয়েন্টে গুলি লাগাতে পারেনি ও। আবারও গুলি করতে যাবে তার আগেই টানা প্রায় ব্রাশ ফায়ারের মতো গুলি এসে লাগল ওদের গাড়ির এখানে ওখানে। সাথে সাথে মাথা নিচু করে ফেলল বাশার।

কিন্তু বাশার খুব ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পারছে, এই ধাওয়াটা এখন ভয়াবহ ঝুঁকির দিকে যাচ্ছে। যেকোনো সময়ে যেকারও গায়ে গুলি লাগতে পারে, যেকোনো সময় পেছনের গাড়ির ধাক্কায় ওদের গাড়িটাও ছিটকে পড়তে পারে মূল রাস্তা থেকে পাশের খাদে।

আবার দুই রাউন্ড গুলি হলো। সামনের সিট থেকে সোহেল আর চৌধুরী দুজনেই চিৎকার করতে শুরু করেছে। 'বস, কিছু একটা করো,' পরিষ্কার শুনতে পেল বাশার। ওর পাশের সিট থেকে চিৎকার করছে পৃথা। মুহূর্তের জন্যে বাশারের মনে হলো ওর মাথা শূন্য হয়ে গেল, তারপর ও বুঝতে পারল আসলেই এই মুহূর্তে কিছু করতে না পারলে আর করার সুযোগই পাবে না। চট করে মাথা তুলে খোলা জানালা দিয়ে পেছনের গাড়িটার দিকে নিজের পিস্তলের অবশিষ্ট প্রায় সবকটা রাউন্ড সে খালি করে দিলো। সাথে সাথেই আবারও নিচু হয়ে গেল ও চট করে। বাশার ভালো করেই জানে আসেলে ওদের চেয়ে পেছনের গাড়ির পাওয়ার এবং ওদের অস্ত্র আরও শক্তিশালী, কাজেই ওদেরকে ঠেকাতে হলে একটাই উপায় আছে। নিজের পকেটে হাত দিয়ে জিনিসটা চেপে ধরল ও। ওরা যা নেওয়ার জন্যে এসেছে সেটা দিয়ে দিতে হবে বাঁচতে হলে। 'সোহেল, তুই কি পেছনে গুলি করতে পারবি, আমাকে কভার করার জন্যে?'

'জি, বস। চেষ্টা করবো,' সামনে থেকে সোহেল বলে উঠল।

'আমি দশ গুনলেই তোর পাশের জানালা দিয়ে কভার ফায়ার করবি। এক, দুই তিন,' বাশার গুনতে গুনতেই পকেট থেকে জিনিসটা বের করে আনল। মুহূর্তের জন্যে পৃথার দিকে চোখ পড়ল ওর। যে-মুহূর্তে পৃথা অনুধাবন করতে পারল বাশার আসলে কী করতে যাচ্ছে, মাথা নাড়তে নাড়তে জোরে চিৎকার করে উঠল ও, 'নো,' কিন্তু ততক্ষণে বাশারের দশ গোনা শেষ। সোহেল নিজের একটা হাত বের করে কভার ফায়ার করতে শুরু করেছে। বাশার সোজা হয়ে নিজের

শরীরটাকে অনেকখানি বের করে আনল খোলা জানালা দিয়ে। ভয়াবহ একটা ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে ও। কারণ যেকোনো সময় গুলি ছুটে আসতে পারে।

শরীরটাকে বের করে এনেই হাতে ধরে ঘোরাতে শুরু করল চেইনটা। বাশার জানে পেছনের গাড়ি থেকে ঠিকই দেখতে পাচ্ছে। যেকোনো সময়ে গুলি করতে পারে কিন্তু যেই মুহূর্তে সে চেইনটা ঘোরাতে শুরু করেছে সে সম্ভাবনা কমে গেল। বাশার চেইনটাকে দুই তিন পাক খাইয়ে ঘুরিয়ে ছুড়ে মারল রাস্তার পাশের দিকে। সাথে সাথে অনুভব করতে পারল সোহেলের গুলি থেমে গেছে। গাড়ির পেছনের সিটটা ধরে নিজেকে নিয়ে এলো ভেতরে। বড়ো বড়ো করে কয়েকবার নিশ্বাস নিতে লাগল ও। তারপর চট করে মুখ তুলে দেখল পেছনের গাড়িটা থেমে গেছে রাস্তার পাশে। চৌধুরী গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিতেই দ্রুত ছোটো হয়ে আসতে লাগল পেছনের গাড়িটা।

স্বস্তির নিশ্বাসের সাথে সিটে হেলান দিলে বাশার, আর সাথে সাথে ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল পৃথা।

অধ্যায় পঁচিশ

সময়: ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ

জল-জঙ্গল এলাকা

'কি মনে হয়, কাজ হবে?' রায়েলির করা প্রশ্নটা শুনে মাসুম ফিরে তাকাল তার দিকে। মেয়েটার বাংলা বলার ধরন এতটাই অদ্ভুত আর বিচিত্র যে মাসুমের কানে শুনতে খুবই অদ্ভুত শোনায়। আর তার আচার-আচরণ থেকে শুরু করে পোশাক-আশাক তো বটেই। এখন খালি দেখার বাকি আছে, যুদ্ধটা সে আসলে কেমন পারে।

মাসুম তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে উঠল। 'দেখা যাক কী অয়, আমগো হারানোর কিছু নাই। যে-অবস্থায় আছি তা থেইকা চেষ্টা করলে যাই করা সম্ভব তাই করার চেষ্টা করতেছি আমরা। এরচেয়ে বেশি কিছু কি আর আদৌ সম্ভব? আর যদি তাও না হয়–' বলে আনমনেই কাঁধ ঝাঁকাল মাসুম। 'মরণ যদি এই চরেই লেখা থাহে তাইলে আর করনের কী আছে। মরণের চেয়ে খারাপ কিছু তো আর অইতে পারে না। খোদার স্মরণে চইলা গেলে তো বরং ভালোই।'

'মরণের চেয়েও খারাপ অইতে পারে বাঙালি, ওরে দেখ,' বলে রায়েলি মেয়েটা মাসুমের অন্যপাশে বইসা থাকা নুক্কুনকে দেখাল। 'এখানে পরে শুনলাম ও এইখানে ক্যান আসছে। ও যদি নিজের পরিবাররে খুইজ্জা বাইর কইরা নিরাপদ করতে না পারে তাইলে ওর লাইগা এইডা মরণের চাইয়াও খারাপ অইব, তোমার কি সেইটা মনে অয় না? আমগোর কাছে যা আছে সেইটা যদি শত্রুর হাতে পড়ে তাইলে সেইটা আমগোর মরণের চায়া খারাপ অইব,' মেয়েটার চোখের পলক পড়ছে না, মাসুম দেখল।

'ওর পরিবারের কিছু অইব না,' মাসুম কাঁধ ঝাঁকাল। 'আর তোমগোর কাছেও যা আছে সেইটাও খাঁ সাহেবের কাছে পৌঁছাইবো,' খুবই তরল গলায় বলে উঠল মাসুম। বলে সে একটা হাত রাখল নুক্কুনের কাঁধে। 'ওর পরিবাররে আমি, খুঁইজা বাইর করব যদি ওরা এই এলাকায় থাকে,' বলে সে রায়েলির দিকে তাকাল। 'আমি মাসুম কাবুলি কথা দিলে কথা রাখি,' বলে ও মৃদু হেসে উঠল। 'আর তোমগোরেও নিরপাদে খাঁ সাহেবের কাছে পৌঁছায়া দিবো–এইটা আমি তারে কথা দিয়া আসছি।

কাজেই–' এইটুকু বলে ও আর বাক্যটা শেষ করল না। রায়েলি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে, ওদের আরেকপাশ থেকে ধোবল বলে উঠল, 'সবই ঠিক আছে খালি ক্যামনে করব ওইটা জানে না আরকি,' বলে সে খুক খুক করে মৃদু হেসে উঠল। আরেক দিক থেকে বরখা আর সুলতানও হেসে উঠল। মাসুম নিজেও মৃদু হাসছিল শুধু দেখল ওদের ভেতরে দুজন মানুষের মুখে হাসি নেই। এক রায়েলি, সে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। আর অন্যজন নুক্কুন, সে এক দৃষ্টিতে ছল ছল চোখে তাকিয়ে আছে মাসুমের দিকে। মাসুম তাকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তখনই সামনে থেকে কুক্কার ডাক ভেসে এলো। কুক্কা হলো এক ধরনের নিশাচর পাখি যেটা রাতের বেলা চড়ে বেড়ায় এবং থেকে থেকে বিচিত্র স্বরে ডেকে ওঠে।

'ওরা আসতাছে, বাঙালি,' রায়েলি কঠিন স্বরে বলে উঠল।

'সবাই প্রস্তুত?' বলে ও নিজের দুইপাশে তাকাল। ওর ডানের সবার শেষ প্রান্তে সুলতান সে মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারা করল। বাঁয়ে সবার শেষে বরখা সেও মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারা করল। মাসুম একবার আকাশের দিকে দেখল, রাতের শেষ প্রহর। ভোর হতে আর ঘণ্টাখানেক বাকি, বৃষ্টির বেগ একেবারেই কমে গেছে। ঝড়ো হাওয়া নেই বলতে গেলে। 'আসতে দাও।'

মাসুমের পরিকল্পনা খুব সাধারণ কিন্তু স্বল্প লোক এবং স্বল্প জিনিস নিয়ে কাজে লাগানোর মতো। ওরা চারজন করে তিনটে দলে ভাগ হয়েছে। এখানে আছে মূল যোদ্ধাদের দুটো দল। আরেকজন মেহেরকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে পেছনের জঙ্গলে। মাসুমের পরিকল্পনা হলো ওরা যদি চারটে কোষা নিয়ে অন্তত বিশ জনও আসে, তাও সংখ্যায় প্রায় দ্বিগুণ হবে। কাজেই ওদেরকে কাবু করতে হলে শক্তিতে সেটা কোনোভাবেই সম্ভব না, কাজটা করতে হবে কৌশলে। খুব স্বাভাবিকভাবেই ওরা যখন দ্বীপে আক্রমণ চালাবে ওদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য থাকবে ঝুপড়িগুলো। ওরা জানে মেহেররা এই দ্বীপেই আছে। আর এখানে এই ঝুপড়িগুলো বাদে আর কোনো আশ্রয় নেওয়ার জায়গা নেই। কাজেই ওরা এখানটাতেই আক্রমণ চালাবে। আর ওদের মূল যোদ্ধাদের দুটো দলও আশ্রয় নিয়েছে ঝুপড়িগুলোতেই। ওরা আক্রমণকারীদের সাথে সামান্য নাটক করবে। ওরা ঝুপড়িগুলোতে আক্রমণ চালালে ওরা প্রথমে প্রতিহত করবে যতটা পারে, তারপর এখান থেকে দুটো দলে ভাগ হয়ে দুদিকে চলে যাবে। একটা দল যাবে জঙ্গলের দিকে আর অন্য দলটা যাবে নৌকাটা যেদিকে আছে সেদিকে।

এটাও খুবই সহজাত একটা ব্যাপার। দ্বীপে যারাই আছে বা থাকবে সবাই পালাতে গেলে এই দুটো দিকেই পালাবে, কারণ এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু মূল খেলাটা শুরু হবে এই দুই জায়গাতে যাবার পর।

মাসুম যেই মুহূর্তে ঘোষণা করল সবাই প্রস্তুত কি না, এটা বলার সাথে সাথে দুদিক থেকে আবারও দুজনে শব্দ করে উঠল। মাসুম সামনের দিকে ঝুপড়ির দরজার ফাঁক দিয়ে সামনে তাকিয়ে আছে। বিশার লোকেরা এলে ওদিক দিয়েই আসবে আর সেটা দেখা যাবে পরিষ্কার। মাসুম মনে মনে হিসেব করার চেষ্টা করছে কয়জন হতে পারে এবং কীভাবে ওরা আক্রমণ চালাতে পারে। সে নিজে হলেও নিজের লঠিয়াল আর যোদ্ধা বাহিনীকে পাঠাত, কারণ এতে শত্রুদের কাবু করা সম্ভব হবে এবং সেটা করা যাবে কাউকে আহত না করেই। কারণ তিরন্দাজদেরকে পাঠালে প্রতিপক্ষে মৃত্যুর সম্ভাবনা বেড়ে যাবে, মাসুমের ধারণা যদি ভুল না হয় তবে ওরা অবশ্যই চেষ্টা করবে অন্তত মেহের এবং নারী যোদ্ধাদের দলটাকে না মেরে বন্দি করতে। এর পেছনে কারণ আছে। আর একারণেই মাসুম আশা করছে ওরা তিরন্দাজ নয়, বরং যোদ্ধাদেরকে পাঠাবে।

'ওই যে,' মাসুম কিছু দেখার আগে ওর পাশ থেকে নুক্কুন কথা বলে উঠল। মাসুম ভালোভাবে তাকিয়ে দেখল অন্ধকারের ভেতরে একটা মাথা দেখা যাচ্ছে। কালো কোটে মোড়ানো মানুষটার চেহারা পরিষ্কার না দেখা গেলেও ওর অনুমানকে সঠিক করে দিয়ে লোকটার হাতের চকচকে লাঠিটা চোখে পড়ল পরিষ্কার। মাসুম খুশি হয়ে উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই মুখটা একটু বেজার হয়ে গেল। কারণ দেখতে পাচ্ছে একের-পর-এক আক্রমণকারীরা অন্ধকারের ভেতর থেকে প্রকট হয়েই যাচ্ছে। মাসুম মনে মনে আন্দাজ করল লোকসংখ্যা বিশের বেশি হবেই। কিছু করার নেই, বাঁচতে হলে লড়তে হবে। ড্যাগার আর বর্শার হাতলে ওর হাতের আঙুল শক্ত হয়ে উঠল। বাঁয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেল সুলতান হাতে বিরাট একটা ধনুক নিয়ে তাতে তির জুড়ে দিয়েছে। কিন্তু সেটাকে এখনও ছোড়ার জন্যে টান টান করেনি। মাসুম জানতে চাইল, 'আর কট্টুক আসলে আয়ত্তের মধ্যে আসব ওরা?' সে জানতে চাইছে আর কতটুকু এগোলে শত্রুরা ওদের তিরের আয়ত্বের ভেতরে আসবে।

মাসুম দেখল সুলতান ভ্রু কুঁচকে কিছু একটা হিসেব করছে। 'আর বিশ কদম।'

'কোনোভাবেই যেন না ফসকায়,' বলেই সে রায়েলি আর তার বাহিনীর বাকি তিনজনের দিকে ফিরে ইশারা করল। ওরা ধনুক নিয়ে প্রস্তুত সুলতানের প্রথম তিরটা ছোড়া হতেই ওরা আক্রমণ চালাবে। মাসুম জানে প্রথম দফায় চারটা তির ছুটে গেলেই ওরা সচেতন হয়ে উঠবে। পরে তির দিয়ে অন্তত আর ঘায়েল করা যাবে না। কাজেই এই প্রথম দফায় যতজন কমানো যাবে ততই সুবিধা হবে। নিজের বর্শার হাতলে শক্ত হয়ে উঠছে ওর আঙুলগুলো। মনে মনে ও শত্রুর পদক্ষেপ গুনতে শুরু করেছে। আট দশ বারো . . .' দেখল

সুলতানের দৃষ্টি স্থির সামনের দিকে। তার চোখে পলকও পড়ছে না।

আঠারো বিশ বাইশ

করছে কী ছেলেটা!

ফুসসস করে সাপের ফণা তোলার মতো শব্দ হলো। মাসুম শব্দটা শুনলেও সেদিকে তাকাল না, বরং আরও শক্ত করে চেপে ধরল বর্শার হাতল। মাসুম সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, সুলতান ছেলেটার নিশানা দারুণ, সর্বাগ্রে থাকা মুখ বাঁধা এক ডাকাত, আসতে আসতে কোনো কারণে সে পেছন ফিরে তাকিয়েছিল, সুলতানের তিরটা উড়ে গিয়ে সোজা তার কণ্ঠার হাড়টাকে ছিন্নভিন্ন করে দিলো। লোকটা এমনকি চিৎকারও করতে পারল না, তার পর মাটিতে পড়ে খাবি খেতে শুরু করল। বিশার দলের লোকেরা জানত এমন কিছু হবে। কিন্তু হুট করে ঘটে যাওয়াতে তারা সেভাবে সাবধান হবার আগেই আরও তিনটা তির ছুটে গেল, সেই সাথে সুলতানও আবার তির জুড়ে দিয়েছে। মাসুম জানত এই অন্ধকারের ভেতরে একটা তির লেগেছে জায়গামতো, এটা দক্ষতা এবং ভাগ্য, বাকিসবগুলো এতটা কার্যকর হবে না।

আর হলোও তাই। তিন-চারটা তির ছুটে গেলেও, মারা পড়ল আর মাত্র একজন, বাকিরা ততক্ষণে সাবধান হয়ে গেছে। এগোনোর গতিও ধীর করে ফেলেছে; সেই সাথে আগে যেরকম খোলামেলা এগিয়ে আসছিল, সেটা বদলে গেল পুরোপুরি, এবার আড়াল নিয়ে সাবধানে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। সুলতান আর বাকিরা তির ছুড়েছে কিন্তু এখন তেমন আর কাজ হচ্ছে না। ওরা এগিয়ে আসতে আসতে দেউরির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, মাসুম সবাইকে সাবধান করে দিলো। সেই সাথে নিজের হাতে ধরা বর্শাটা সামনে নিয়ে এল, যেই মুহূর্তে প্রথম ডাকাত দেউরির ওপর পা রাখল, সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল মাসুম, বর্শাটাকে চেপে ধরে ওটাকে কাঁধের পেছনে নিয়ে সর্বশক্তিতে ছুড়ে মারল সামনের দিকে। বর্শাটা তীব্র বেগে ছুটে গিয়ে ডাকাতটাকে শুধু আঘাতই করল না, লোকটা ছিটকে পড়ে গেল নিচে। বর্শাটার পেছন পেছন মাসুম লাফ দিয়েছে। লাফিয়ে দেউরিতে নামতেই পড়ে যাওয়া ডাকাতের লাঠিটা উঠিযে নিলো ও। সাথে সাথে লাঠিটাকে মাথার ওপরে দুই চক্কর দিয়ে আক্রমণ করে বসল আরেকজনকে। মাসুমের আক্রমণটাই ছিল বাকিদের জন্যে ইশারা। সুলতান আর বাকি তিন তিরন্দাজ বাদে বাকিরা চিৎকার করতে করতে আক্রমণ করে বসল ডাকাতদের প্রথম দলটার ওপরে। পুরো আঙিনা হইহই চিৎকার, লাঠির ঠোকাঠুকি আর তরবারির ঝনঝনানির শব্দে ভরে উঠল।

***

দ্বীপের পেছন দিকে যারা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে তারা পরিষ্কার শুনতে পেল: ঝুপড়িগুলোর দিক থেকে চিৎকার আর লড়াইয়ের শব্দ ভেসে আসছে। ওরা বেশিরভাগই আশ্রয় নিয়েছে জঙ্গলের শেষ মাথায় ছোটোবড়ো গাছগুলোর ওপরে। তবে মেহেরের সেই লোহার সিন্দুকটাকে রাখা হয়েছে ভিন্ন জায়গাতে। ওটাকে রাখা হয়েছে মাটির নিচে এমনভাবে যাতে ওটা সহজে কারও চোখেও না পড়ে, আবার খুব চট করে ওটাকে স্থানান্তরিতও করা যায়।

'কি মনে হয়, আমরা পারবো?' অন্ধকারের ভেতরেই একজন বলে উঠল।

'আমরা পারার কথা আর আসে না, তবে বাঙালি পারলেই হয়, তার উপরেই এখন সব নির্ভর,' বলে মেহের বাকিদের দিকে ফিরে তাকাল। 'তবে আমগো সময় কিন্তু আসবো, ওরা পিছায়া এইখানেই আসবো। কাজেই সবাই প্রস্তুত থাক,' বলে সে প্রস্তুতিগুলো দেখে নিলো আরেকবার। জাল, ডালপাতা আর লগি–সবই প্রস্তুত আছে।

***

বিশা ডাকাত আতঙ্ক ছড়াতে পছন্দ করে, নিজের ডাকাত জীবনে সে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে নিজের একমাত্র অস্ত্রভয় দিয়ে। সে মানুষকে ভয় দেখাতে পছন্দ করে, অন্য মানুষের চোখে ভয় দেখতে পেলে তার ভেতরে তীব্র আনন্দ হয়। মানুষকে ভয় দেখালেও সে নিজে ভয় কী জিনিস জানে না, তার ভেতরে কোনো বিষয়ে কোনো দ্বিধা নেই। যেদিন থেকে জ্ঞান হয়েছে দুটো জিনিসের মাধ্যমে সে বেঁচে আছে, যতদিন বেঁচে থাকবে এই দুটো জিনিসকে আশ্রয় করেই সে বেঁচে থাকবে। একটা হলো ভয় আর অন্যটা হলো মৃত্যু। সারাজীবন সে ভয় আর মৃত্যুকে পুঁজি করেই টিকে থাকবে। যেদিন অন্যের মাঝে এই দুটো জিনিস আর ছড়িয়ে দিতে পারবে না, সেদিন তার মৃত্যু হবে। আর তাই সে এই দুটোকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে প্রতিটা ক্ষণে।

কিন্তু আজ রাতে তার ভেতরে কেন জানি অদ্ভুত এক দ্বিধাবোধ কাজ করছে। এই দ্বিধার উৎস কি সে জানে না। আজ রাত তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাত হতে পারে। আর এই দ্বিধার কারণটাও সে বুঝতে পারছে না। একদল নারী আর পুঁচকে পোলাপান আটকে আছে ওই চরের মতো দ্বীপে। তার দলের সবচেয়ে দুর্বলতম লোকটাও ওদের যে-কারও চেয়ে বেশি সবল। তাদের পথ বন্ধ, তার হিসেবে নৌকাও চোট পেয়েছে। এদেরকে কাবু করা তার জন্যে কিছুই না। আর একারণেই সে প্রথমে নিজে না গিয়ে তার দলের সবচেয়ে সেরা বাহিনীটাকে পাঠিয়েছে। তাহলে দ্বিধাটা কীসের?

সে দ্বীপের মতো গ্রামটার দিকে চোখ তুলে তাকাল। ওখানে কী হচ্ছে কে জানে। বিশা সওদাগর কপালের পাশে বহু পুরনো একটা ক্ষত চেপে ধরল, ঝামেলার সময় ওটা ডলতে থাকা তার অভ্যাস। কী হচ্ছে ওখানে জানতে হলে অপেক্ষা ছাড়া উপায় নেই।

***

প্রথম দফা ঝটিকা আক্রমণে খুব একটা ক্ষতি করতে না পারলেও, ডাকাত দলটাকে ওরা এগোতে দেয়নি খুব বেশি। তবে মাসুম জানে এটা বেশিক্ষণ টিকবে না। কাজেই এই ঝটিকা আক্রমণকে ঝটিকার মতোই রাখতে হবে। প্রথম দফা আক্রমণ হতেই মাসুম শিস বাজিয়ে উঠল, সাথে সাথে পেছন থেকে ভেসে এলো শিসের শব্দ যে যার যার জায়গায় মাটিতে শুয়ে পড়ল। আর পেছন থেকে তিরন্দাজ বাহিনী আরেক দফা তির বর্ষণ করল। তিরের আঘাতে দুজন পড়ে গেলেও বাকিরা নিজেদেরকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেই আরও দুদফা তির বর্ষণ করতে লাগল সুলতানের বাহিনী। বাকিরা মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে সরে পড়তে শুরু করল। দেউরিতে উঠতেই মাসুম চিৎকার করে পালাতে বলল সবাইকে। সাথে সাথে দুই দলে ভাগ হয়ে দৌড়াতে শুরু করল ওরা। একদল রওনা দিলো পেছনের জঙ্গলের দিকে, আরেকদল রওনা দিলো নৌকাটার দিকে। সবাই প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। মাসুমের দলে আছে মাসুম, নুক্কুন, ধোবল আর নারী যোদ্ধাদের একজন। আর অন্য দলটাতে আছে রায়েলি, সুলতান, বরখা। মাসুম দৌড়াতে দৌড়াতে দেখতে পেল ওদের একজন মারা পড়েছে। মনে মনে আফসোসের সাথে মাথা নাড়ল ও। রায়েলিদের দলে লোক কমে গেছে, ওরা নৌকার আক্রমণ সামলাতে পারবে কি না, কে জানে। কিছু করার নেই, এখন ওকে এদিকটা সামলাতে হবে। কারণ ও জানে, মূল আক্রমণটা হবে এদিকেই। প্রাণপণে দৌড়াতে দৌড়াতে একবার সামনে দেখে নিলো, তারপর ফিরে তাকাল পেছন দিকে। এখনও ডাকাতদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু মাসুম জানে ওদের ঝটিকা আক্রমণে খানিকটা এলোমেলো হয়ে গেলেও দ্রুতই ওরা পিছু নিতে শুরু করবে। কথাটা ভেবেও সারতে পারল না, তার আগেই দেখতে পেল কালো কোটধারীদের কয়েকজনকে। মাথা ঘুরিয়ে দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিলো ও, সেই সাথে চিৎকার করে সাবধান করে দিতে লাগল বাকিদের।

এবার শুরু হবে আসল খেলা।

অধ্যায় ছাব্বিশ

বর্তমান সময়

মোড়ার পাড়া চৌরাস্তা, নারায়ণগঞ্জ জেলা

বাশার ভেবেছিল পৃথা মেয়েটা ওর বাড়িয়ে দেওয়া রুটি-কলার প্যাকেটটা এক ঝটকা দিয়ে ফেলে দিবে, কিন্তু সেটা করল না দেখে খানিকটা অবাকই হলো ও। তবে মেয়েটা প্যাকেটটা নিলোও না। একবার ওর দিকে দেখে নিয়ে রাগের সাথে ফিরে তাকাল অন্যদিকে। বাশার বাকিদের দিকে তাকিয়ে একবার অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বসে পড়ল পৃথার সামনে, 'বাশার কখন থেকে পৃথাকে তুমি করে বলতে শুরু করেছে টের পায়নি।' পৃথা, আমি সরি,' বাশার তাকিয়ে আছে পৃথার দিকে তার দৃষ্টি নিচের দিকে। 'আমি বুঝতে পারছি লকেটটার সাথে তোমার পারিবারিক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। কিন্তু আমার আসলে কিছু করার ছিল না। পরিস্থিতি এমনভাবে মোড় নিলো। ওই মুহূর্তে সবার প্রাণ বাঁচানোটাই প্রায়োরিটি মনে হচ্ছিল। তাৎক্ষণিকভাবে ওটাই মাথায় এলো। তাই আর কিছু ভাবতেও পারিনি।'

'পারিবারিক স্মৃতি!' পৃথা যখন চোখ তুলল বাশার দেখল মেয়েটার চোখে পানি না থাকলেও তার চোখ একেবারে ছলছল। 'ওটা বলতে গেলে আমার মায়ের শেষ স্মৃতি ছিল। আপনার কাছের কোনো মানুষের শেষ স্মৃতি যদি এভাবে হারিয়ে যায় আপনার কেমন লাগবে?'

পৃথার শেষ কথাটা একেবারে বাশারের বুকের ভেতরে গিয়ে লাগল। আপনাতেই হাতের জিনিসগুলো ও বাঁশের বেঞ্চটার ওপরে রেখে ডান হাত দিয়ে নিজের বাঁহাতের মধ্যমায় পরা আংটিটা চেপে ধরল। কয়েক মুহূর্ত কোনো কথাই বলতে পারল না। ক্ষণিকের জন্যে ওর মনে হতে লাগল নিজেকে সামলাতে পারছে না, ভয় হলো সবার সামনে কোনো সিন ক্রিয়েট করে ফেলে কি না। কিন্তু কিছুক্ষণ পর অনেকটাই স্বাভাবিক বোধ করতে লাগল ও। পৃথার দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখল মেয়েটা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'আপনি ঠিক আছেন?' সে খানিকটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে বাশারের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল।

'আ'ম অল রাইট,' বাশার কয়েকবার ঢোক গিললো। 'আমি আসলে মন থেকে সরি। আর যদি আমার আয়ত্তের মধ্যে বিন্দুমাত্র সুযোগও আমি পাই, জিনিসটা অবশ্যই তোমার কাছে আমি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবো। আই প্রমিজ,' বাশার দেখল পৃথা মেয়েটা এখনও তাকিয়ে আছে ওর দিকে। 'এখন আমাদেরকে কাজে নামতে হবে, কাজেই প্লিজ,' বলে সে হালকা খবারগুলো পৃথার দিকে এগিয়ে দিলো। 'খেয়ে নাও,' জিনিসগুলো মেয়েটার হাতে ধরিয়ে দিয়েই ও পলকের জন্যে সোহেলের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। সোহেলের সাথে ওর কথা আছে। কাল রাতে যা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত যা ঘটলো এবং সামনে ওরা যা করতে যাচ্ছে, সেই বিষয়ে সোহেলের সাথে কথা বলতে হবে ওকে। কিন্তু তার আগে জরুরি আরেকটা কাজ আছে, যেটা সবার সাথে আলোচনা করতে হবে, বিশেষ করে চৌধুরী আর পৃথার সাথে কথা বলতে হবে ওর এটা নিয়ে। বাশার সামনের রাস্তার দিকে তাকাল একবার, কেন জানি কাল রাতে পরপর দুইবার আক্রমণের পর ওর ভেতরেও অদ্ভুত এক ভয় ঢুকে গেছে ওর। যে-কারণে মূল বাজার এলাকায় না থেকে ওরা এখন অবস্থান করছে সোনারগাঁও যাবার পথে মোড়ার পাড়া চৌরাস্তা থেকে খানিকটা ভেতরের দিকে মূল রাস্তার পাশে একটা চায়ের দোকানে। গতকাল রাতে ওই গাড়িটা ওদের পিছু নেওয়ার পর, যখন ওটাকে পেছন থেকে খসাতে পারল আরও অনেকদূর গিয়ে হিসেব করে দেখে ওরা বুড়িগঙ্গার পাড় ধরে অনেকদূরে এগিয়ে এসেছে, তারপর মূল হাইওয়েতে উঠে বেশ অনেকটা সরে এসেছে যেদিক যাবার কথা সেদিক থেকে। কিন্তু ওরা নিজেরা আলোচনা করে আরও বেশ অনেকটা দূরে সরে, তারপর নারায়ণগঞ্জ যাবার জন্যে মূল রাস্তাটা অ্যাভয়েড করে অনেক পথ ঘুরে তারপর সোনারগাঁওয়ের কাছাকাছি পৌঁছেছে। তবে এর মাঝে আরও কিছু কাজ সেরেছে। হাইওয়েতে দূরে সরে রাতের শেষ প্রহরে রাস্তার পাশে একটা ভালো জায়গা দেখে গাড়ি পার্ক করে বিশ্রাম নিয়েছে সবাই মিলে। তারপর ভোরের আলো ফুটে ওঠার পর আবার যাত্রা শুরু করেছে। রাস্তায় একটা ওয়ার্কশপে গাড়ির কিছু মেরামতির কাজও করিয়েছে। বিশেষ করে পেছনের জানালাটা লাগানোসহ বেশ কিছু জরুরি কাজ সেরেছে। গাড়ির কাজ করার সময়ে, ওরা রাস্তার পাশের এক হোটেলে নাশতা করে নিয়েছে ফ্রেশ হয়ে, সাথে মোবাইলও চার্জ করে নিয়েছে সবাই। এরপর আবারও চলতে শুরু করেছে। সবাই বেশ ক্লান্ত আর টেনশনে থাকার কারণে এসব বিষয় নিয়ে আর আলোচনা তেমন আগায়নি। তবে বাশার নিজের ভেতরে অনেক পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেছে। এরপরে ওরা গুগল ম্যাপ ধরে সোনারগাঁওয়ে যাবার পথে মোড়ার পাড়াতে পৌঁছালে বাশার মূল চৌরাস্তা থেকে সরে পাশের একটা হাইওয়েতে রাস্তার পাশের চায়ের দোকানে চা খাবার জন্যে থামতে বলে। এখানে থামার পেছনে দুটো

কারণ। একে তো অনেক আগে নাশতা করার কারণে সামান্য ক্ষুধাও লেগেছে সেই সাথে বাশারের জরুরি কিছু আলোচনা করার আছে বাকিদের সাথে। সেইজন্যেই এখানে থামা।

নিজের চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সেটাকে নামিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরাল বাশার। 'বস, কিছু বলবা নাকি?' ওর পাশ থেকে সোহেল বলে উঠল।

'বলব,' সিগারেটে কষে একটা টান দিয়ে ওটাকে নিচে ফেলে পিষে দিয়ে সোহেলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল বাশার, সোহেলের ক্লান্ত চেহারা দেখে খুব ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পারছে ওর চেহারার কী অবস্থা। সবার ওপর দিয়ে রীতিমতো ঝড় বয়ে গেছে কাল রাতে। তবে বাশার জানে ঝড় সবেমাত্র শুরু হয়েছে। যাত্রা এখনও অনেক বাকি। 'তবে বাকিদের সাথে কিছু আলোচনা আছে সেগুলো সেরে নেই আগে। কথা শেষ করে তোরে ইশারা করলে চইলা আসিস,' বলেই সবার দিকে ফিরে বলে উঠল, 'সবাই একটু শুনবেন, কিছু জরুরি কথা বলার অছে।'

ওরা চায়ের টংয়ে যে বাঁশের বেঞ্চে বসে ছিল সবাই ফিরে তাকাল ওর দিকে, একটা আলগা কাঠের বেঞ্চের মতো টেনে নিয়ে সবার মুখোমুখি বসে পড়ল বাশার। 'প্রথমেই একটা কথা জানতে চাই আমি, এটা খুবই স্বভাবিক যে গতবার রাতে যা ঘটেছে এরপরে ভয় পাওয়া বা দ্বিধা করাটা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার, কিন্তু কেউ কি কেসটা থেকে সরে পড়তে চান?' বাশার সবার দিকে দেখল একে একে, সবাই চুপ। 'গুড, এবার তাহলে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো। কাল রাতে আমাদের ওপরে যে আক্রমণ হলো এটা নিয়ে কারও কোনো প্রশ্ন মন্তব্য বা সাজেশন আছে?'

'আছে,' চৌধুরীর আরেকপাশে বেঞ্চের এক কোনায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল সে ওটাকে ফেলে দিয়ে বলে উঠল, 'আমি জানি না কেউ খেয়াল করেছেন কি না, তবে আমার কাছে মনে হয়েছে কাল রাতে আমাদের ওপরে দুটো আলাদা আলাদা গ্রুপ আক্রমণ করেছে।।'

বাশার খুশি হয়ে মাথা নাড়ল, 'আমারও তাই মনে হয়েছে। আমরা চার্চ থেকে বের হবার পর প্রথম যে-গ্রুপটা আমাদের ওপরে হামলা চালাল মানে গলির ভেতরে–'

'ওটা ছিল মোহাম্মদপুরের সেই গ্রুপ,' চৌধুরী যোগ করল। 'আমি শেষবার গাড়ি দিয়ে আঘাত করার সময়ে ওই কালো কোট লোকটাকে পরিষ্কার দেখেছি গাড়ির ভেতরে। কিন্তু গলি থেকে বের হবার পর আমাদেরকে অনুসরণ করল এবং গুলি করল যারা, ওরা আলাদা গ্রুপ। আমার কাছে অন্তত এরকমই মনে হয়েছে।'

'এরকম মনে হবার কারণ কী?' পৃথা ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইল।

'নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই,' চৌধুরী বলে উঠল। 'প্রথম গ্রুপ যারা আমাদেরকে মোহাম্মদপুরে এবং গলির ভেতরে আটকে ফেলেছিল, ওরা অনেক কম অ্যাগ্রেসিভ ছিল। আমার মনে হয়েছে ওরা স্রেফ আমাদের থেকে আমাদের জিনিসগুলো নিতে চেয়েছে। কিন্তু পরের গ্রুপটা অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ ছিল। ওরা যেভাবে গুলি করেছে তাতে আমার কাছে মনে হয়েছে এরা প্রয়োজনে মেরে ফেলতেও দ্বিধা করবে না,' বলে সে ঠোঁট উলটে বলে উঠল। 'এছাড়া আসলে বিশেষ তেমন কোনো কারণ অমি বলতে পারবো না।'

'এমনকি হতে পারে না, গলিতে আমাদের কাছে ধরা খেয়ে ওরা খেপে গেছিল, বা আমরা ফসকাতে পারি ভেবে অ্যাগ্রেসিভ হয়ে ওদেরই আরও কোনো ব্যাকআপ আমাদের ওপরে অ্যাগ্রেসিভ হয়ে উঠেছিল।'

'পারে, আমরা এখনও আসলে হাওয়ার ওপরেই লড়ছি, আমাদের শত্রুরা জানে আমরা কারা কিন্তু আমরা কিছুই জানি না,' বলে বাশার বড়ো করে দম নিলো। 'আমার দুয়েকটা অভিয়াস প্রশ্ন আছে,' কথাটা বলে পৃথা তিনজনকে দেখল। 'একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না, আমরা ঠিক যেই মুহূর্তে লকেট এবং সোনারগাঁওয়ের ব্যাপারটা আবিষ্কার করলাম ঠিক সেই সময়েই আমাদের ওপরে হামলাটা হলো কীভাবে? এটা আমার কাছে ঠিক পরিষ্কার না,' সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাশারের দিকে। বাশারও তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'তারচেয়েও আরও অভিয়াস একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না,' সোহেল বলে উঠল, 'আমরা এখানে এসেছি কেন? আমাদের কাছে যা ছিল সেটা তো গেছেই, তাহলে এখানে এসে ফায়দাটা হবে কী?'

সে দুই হাত নেড়ে এমনভাবে প্রশ্নটা করল বাশার হেসে উঠল। 'তোর কি মনে হয় না, এই প্রশ্নটা তোর এখানে আসার আগে করা উচিত ছিল?' বলে সে সোহেলের দিকে তাকিয়ে আছে, সোহেল আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই বাশার বলে উঠল, 'এখানে আমরা যে-কাজে অসতাম সেটাই করবো।'

'কিন্তু কীভাবে, লকেটটা তো গেছে–'

বাশার আবারও হেসে উঠল, 'লকেটটা গেছে কিন্তু লকেটের ভেতরে যে-ম্যাপটা ছিল সেটা গেছে, কে বলল,' বলে বাশার সেই পাতলা মসলিন কাপড়ের ম্যাপটা পকেট থেকে বের করে সবার সামনে মেলে ধরল। 'আমি লকেটটা ছুড়ে দিয়েছিলাম যাতে ওরা ডিসট্র্যাকটেড হয় এবং আমরা সরে পড়তে পারি। কিন্তু সেই গলিতে যখন আক্রমণ হলো তখনই আমি দুটোকে আলাদা করে ফেলেছিলাম।'

'তুমি একটা মাল, বস,' খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল সোহেল।

'এখন আমার প্রশ্ন হলো,' বাশার ম্যাপটা দেখিয়ে পৃথা আর চৌধুরীর কাছে প্রশ্ন করল, 'আমরা সোনারগাঁওয়ে হয়তো এসে পড়েছি কিন্তু এখানে এখন কীভাবে কী করব? আমার মনে হয় আপনারা দুজনে এটা নিয়ে বসে আলোচনা করুন, আমি সোহেলের সাথে একটু একান্তে কথা বলবো,' বলে বাশার উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাপটা পৃথা আর চৌধুরীকে দিয়ে সোহেলের দিকে ফিরে ইশারা করল। ওরা রাস্তার পাশে পড়ে থাকা একটা গাছের গুঁড়িতে বসে, বাশার একটা সিগারেট ধরিয়ে সোহেলের কাছ জানতে চাইল, 'তুই কি সিগারেট খাস?'

'না, বস,' সোহেল মৃদু হেসে মানা করল। 'এখন বলো।'

'প্রথম প্রশ্ন তোর কাছে, কেসটা আমি যেভাবে হ্যান্ডেল করছি তাতে তোর কোনো কনফিউশন বা প্রশ্ন নেই?'

'অবশ্যই আছে, প্রথম কথা যেটা হলো তুমি বা আমরা কেন–'

'অথরিটিকে ইনভলভড করছি না?' বাশার টোকা দিয়ে ছাই ফেরলো।

'হ্যাঁ, এটা আমি খানিকটা আন্দাজ করতে পারি, তবে–'

'ট্রাস্ট মি, কারণ আছে এর পেছনে, একটা কথা আপাতত বলি–চৌধুরী। তাকে আমাদের প্রয়োজন, কিন্তু তাকে নিয়ে কাজ করতে গেলে অথরিটিকে জানাতে গেলে তারও আপত্তি, আবার অথরিটিকে এটার জন্যে কনভিন্স করতে অনেক হ্যাপা পোহাতে হবে। আমাদের হাতে সময় নেই। আগে কাজটা করা জরুরি। প্রফেসর ইফতেখারকে বের করা জরুরি। আর না হয় অন্তত তার রেখে যাওয়া ক্লু গুলো বের করতেই হবে, আমাদেরকে জানতে হবে রাজদ্রোহীর রহস্য আসলে কী–'

'বুঝতে পেরেছি, আর দ্বিতীয় ইস্যু?' সোহেলও এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাশারের দিকে।

বাশার কথা না বলে ওর দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানতে লাগল। 'সেইম, ট্রাস্ট ইস্যু। আমি কারও বিরুদ্ধে আঙুল তুলছি না কিন্তু এই মুহূর্তে ফোর্সে আমরা সবে গতকাল জয়েন করেছি, কাজেই এখনও অনেক কিছুই জানি না। তার ওপরে যা ঘটছে যেভাবে ঘটছে ঘটনা ভেতরেও অনেক ঘটনা আছে। এগুলো একেবারেই স্বাভাবিক না।'

'তারমানে আমাদেরকে আরও অপেক্ষা করতে হবে–'

'অপেক্ষা করতে হবে, ভরসা রাখতে হবে পরস্পরের ওপরে এবং,' বলে ও একটু থামল। 'নজর রাখতে হবে, মনে আছে পাটোয়ারি স্যার কী বলেছিল–'

'ট্রাস্ট নো ওয়ান,' সোহেল বলে উঠল।

বাশার উঠে দাঁড়াল। 'ডোন্ট ওরি ব্রো, কেসটা এনজয় কর, দারুণ অ্যাডভেঞ্চারের ভেতরে আছি আমরা,' বলে ঘড়ি দেখল ও। 'তবে আরেকটু বেলা বাড়লেই অফিস আওয়ার শুরু হলে আমি মৌসুমি আপার সাথে কথা বলবো। লেটস গো।'

ওরা দুজনে এগিয়ে এসে দেখল চৌধুরী আর পৃথা মহা মনোযোগের সাথে আলোচনা করছে। 'এনি প্রোগ্রেস?'

'অবশ্যই, ম্যাপটা যে সোনারগাঁওয়ের এটা তো গতকালই মোটামুটি কনফার্ম হয়েছিলাম আজ কনফার্মেশনটা পোক্ত হয়েছে। সব সাইন, লোগো, প্যাটার্ন মিলে যায়।'

'তারমানে কি সোনারগাঁওতে গেলে আমরা সরাসরি কাজ শুরু করতে পারব?' বাশার জানতে চাইল।

'না, এখানে একটা সমস্যা আছে, এই ম্যাপ বহু আগের, এটা ধরতে হলে এই এলাকার ব্যাপারে অভিজ্ঞ কাউকে দেখাতে হবে, এটা করা আমাদের সামর্থ্যের ভেতরের কাজ নয়,' পৃথার কথা শুনে বাশার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই সে যোগ করল, 'এটারও সলুশান বের করা হয়েছে। সোনারগাঁওতে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করেন, এই এলাকা নিয়েই গবেষণা করছেন এবং মাম্মি এবং পাপার সাথেও কাজ করেছেন এরকম একজন আর্কিয়োলজিস্টকে আমি চিনি, চৌধুরীও চেনেন। প্রফেসর হামিদুর রহমান। খুবই মাই ডিয়ার এবং সজ্জন টাইপের মানুষ। এখানকার লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের হর্তাকর্তা। উনার কাছ থেকে হেল্প নিতে পারবো আমরা। আরও একটা কারণে উনাকে প্রয়োজন, এখানে কাজ করতে গেলে পারমিশন ইত্যাদির ঝামেলা হতে পারে, উনি থাকলে আর কোনো হাঙ্গামাই থাকবে না।'

'উনাকে পাবো কোথায়?' বাশার জানতে চাইল।

'মোবাইলে কল দেওয়া যায়,' পৃথার বাক্যটা শেষ হতেই বাশার মানা করল।

'যদি উনি এখানেই থাকেন, তবে তার সাথে সরাসরি কথা বলাই বেটার।

'আচ্ছা আমার একটা কথা ছিল,' পৃথা বলল। সবাই ফিরে তাকিয়েছে তার দিকে। 'গতকাল রাতে লোকগুলো একেবারে সময়মতো আমাদের ওপরে আক্রমণ করল–বিষয়টা আমি মাথা থেকে বের করতে পারছি না। তারা কি কোনোভাবে ট্র্যাক করেছে আমাদের? আমাদের গাড়িটা চেক করা উচিত না একবার?'

বাশার হেসে উঠল, 'তোমার কি মনে হয় না, এই কথাটা আমার মাথায় আরও অনেক আগে আসতে পারে। আমি আজ সকালে গাড়ি সার্ভিসিং করানোর সময়ে মেশিন দিয়ে চেক করিয়েছি। গাড়িতে কিছু নেই। চলো সবাই।'

***

বাশারের উচ্চারণ করা শেষ কথাটা শুনে কফিতে চুমু দিতে থাকা কালো কোট আনমনেই একবার হেসে উঠল। ইন্সপেক্টরের মাথা বুদ্ধি আছে কিন্তু তার মতো বিচিত্র যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা তো আর তার নেই, সে কফি শেষ করে নিজের লোকদেরকে ইশারা করল প্রস্তুত হতে। ওরা সবাই সকালের খাবার খেয়ে নিয়েছে। ওদের খাওয়া শেষ হয়েছে কি না জেনে নিয়ে সে ওয়েটারকে বিল দিতে বলল। যদিও তাড়াহুড়ো নেই, মোড়ার পাড়া চৌরাস্তায় আছে এখন ওরা। ওরা গিয়ে কাজ করুক, তারপর সময়মতো হানা দিবে সে। শুধু একটা ব্যাপারই বুঝতে পারছে না সে, গতকাল এদের ওপরে অন্য কারা আক্রমণ করল?

অধ্যায় সাতাশ

সময়: ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ

জল-জঙ্গল এলাকা

প্রাণপণে দৌড়াতে দৌড়াতে যে মুহূর্তে পেছনে তাকিয়ে মাসুম দেখতে পেল কালো পোশাক পরা অবয়বগুলো দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে সে খুশি হয়ে উঠল, সেই সাথে সে বাড়িয়ে দিলো দৌড়ের গতি। চিৎকার করে বাকিদেরকেও দৌড়ের গতি বৃদ্ধি করতে বলল সে। ঠিক এই সময় এবং এই মুহূর্তটার জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে এবং তার দলের বাকিরা। তাদের সমস্ত প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনাও এই সময়টার জন্যেই, আর এর ওপরে নির্ভর করছে অনেক কিছু। মাসুম দৌড়ের গতি বাড়ানোর জন্যে হাতের বর্শাটা ফেলে দিলো। আপনাতেই সে একবার দেখে নিলো জঙ্গলের দিকে। ওখানে প্রস্তুত থাকার কথা মেহেরের সাথে থাকা বাহিনীটা। মাসুম দৌড়াতে দৌড়াতে একবার ওদের সাথে থাকা নারী যোদ্ধাটার দিকে দেখে নিলো ও। মেয়েটা বলতে গেলে প্রায় ওর সাথে সমান তালে দৌড়াচ্ছে। এর আগে ঝুপড়ির সামনে দেখেছে তার যুদ্ধের দক্ষতাও প্রায় পুরুষদের সমকক্ষ তো বটেই, বলতে গেলে ক্ষেত্রবিশেষে পুরুষদের থেকে খানিকটা বেশিই। মাসুম আরেকটু এগোতেই দেখল প্রায় জঙ্গলের কিনারায় চলে এসেছে, আপনাতেই ওর দৌড়ের গতি কমে এল, কারণ এখন খানিকটা ভুলচুক হলে আর দেখতে হবে না। 'সবাই সাবধান।'

ওর দলের লোকেরা খুব ভালোভাবেই জানে মাসুম কীসের ব্যাপারে সাবধান হতে বলছে। জঙ্গলের থেকে শ'দুয়েক গজ দূরে থাকতে মাসুম বলতে গেলে নিজের দৌড়ের গতি প্রায় জোরে হাঁটার পর্যায়ে নিয়ে এলো। 'সবাই আমার পিছে আসো, ঠিক আমার মতন,' বলে সে চোখ সরু করে ওদের বানানো নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করে এক এক পা করে লাফাতে লাফাতে এগোতে লাগল। শেষ নির্দেশনাটা পার হয়ে জঙ্গলের একেবারে কিনারায় এসে হাঁটুতে ভর দিয়ে ধপ করে বসে পড়ল, পার হয়ে আসতে পেরেছে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাটা। এখন দেখার অপক্ষো বাকিরা ঠিকঠাক পারে কি না।

মাসুম চোখ তুলে তাকাতেই দুটো জিনিস চোখে পড়ল। প্রথমত, ওর ঠিক পেছনেই ছিল সেই নারী যোদ্ধাটা। সে-ও ঠিক ওর মতোই লাফিয়ে লাফিয়ে

নির্দেশনা ধরে পার হয়ে এলো জায়গাটা, তার ঠিক পেছনেই ধোবল আর ধোবলের পেছনে নুক্কুন। এবার ওরা দুজনে ঠিকভাবে পার হলেই আর ঝুঁকি নেই। সাথে সাথে মাসুমের দৃষ্টি চলে গেল ওদের দুজনকে ছাড়িয়ে পেছনের দিকে। কালো অবয়বগুলো আরও প্রকট হতে শুরু করেছে। তবে ওরা ওদের মতো এত দ্রুত এগোচ্ছে না, স্বাভাবিক ওরা খুব ভালোভাবেই জানে মাসুমদের আসলে পালাবার কোনো উপায় নেই। এই ছোটো জঙ্গলে ওরা কতক্ষণ লুকিয়ে থাকবে। অন্ধকারের ভেতরে পরিষ্কার দেখতে না পেলেও ও আন্দাজ করার চেষ্টা করতে লাগল, কতজন হতে পারে। ওর হিসেবে বিশজনের মতো নেমেছে দ্বীপে। এর ভেতরে অন্তত চার বা পাঁচজনকে ওরা কাবু করেছে ঝুপড়ির সামনে। এদের ভেতরে অর্ধেক যদি রায়েলিদের পিছু নিয়েও থাকে তবে অন্তত সাত-আটজন বা দশজনের মতো ওদের পিছু আসছে। আসুক, বর্শা ফেলে দিলেও নিজের প্রিয় ড্যাগারটা আছে, টান দিয়ে সেটাকে বের করে আনতেই ওর পাশে এসে দাঁড়াল জঙ্গলের ভেতরে থাকা আরেক যোদ্ধা, ওর দিকে একটা লাঠি ছুড়ে দিলো সে।

লাঠিটা খপ করে ধরে মাসুম দেখল লাঠিয়ালের পাশে আরও অন্তত দুজন তিরন্দাজ দাঁড়িয়ে গেছে। সামনে তাকিয়ে দেখল ধোবল প্রায় পার হয়ে গেছে জায়গাটা, এবার নুক্কন পার হলেই হয়। এরপর দেখবে ওরা কী করে। মাসুম মনে মনে ভাবতে লাগল ওরা তো এই পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছে, রায়েলিদের কী অবস্থা কে জানে।

***

ঝুপড়িগুলো থেকে বের হতেই রায়েলি প্রাণপণে দৌড়াতে লাগল, তার সাথে পাল্লা দিয়ে দৌড়াচ্ছে সুলতান; কিন্তু ওদের সাথে তাল রাখতে গিয়ে বরখা হিমশিম খাচ্ছে। কারণ একে তো অন্ধকার, তার ওপরে আবার রায়েলি কিংবা সুলতান কিছুটা হলেও দ্বীপটা চেনে, কিন্তু সে একরকম বলতে গেলে প্রায় শূন্য ধারণা নিয়ে স্রেফ ওদের পায়ের দিকে তাকিয়ে দৌড়াচ্ছে।

'আর কটুক?' প্রশ্নটা রায়েলিদের উদ্দেশ্যে করলেও সে আপনাতেই ফিরে তাকাল একবার পেছন দিকে। বিশার কালো কোট বাহিনী পিছু নিতে শুরু করেছে, ওদের উদ্দেশ্য সফল হলেও দুটো সমস্যা হয়ে গেছে। একে তো ওদের একজন ঝুপড়িগুলোর ওখানে মারা পড়াতে ওদের দলের একজন কমে গেছে। তার ওপরে, ওরা ঝুপড়িতে যতজনকে কাবু করতে পারবে বলে ভেবেছিল সংখ্যাটা ততটা হয়নি, কারণ ডাকাতও সংখ্যায় এসেছে বেশি। তবে এতসব ভেবে লাভ নেই, বরখা দৌড়ানোতে মনোযোগ দিলো। পেছন ফিরে দেখতে গিয়ে সে খানিকটা পেছনে পড়ে গেছে, রায়েলি আর সুলতান এগিয়ে গেছে অনেকটাই। ও প্রাণপণে

দৌড়াতে দৌড়াতেই পানির শব্দ পেল সামনে সেই সাথে দেখতে পেল সামনে নৌকাটার অবয়ব, নৌকাটাকে মেরামতির জন্যে বলতে গেলে প্রায় অনেকটাই বালির ওপরে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে। পুরো নৌকাটাকে বেশ কয়েকটা কাঠের লগির ওপরে ভর দিয়ে উঁচু করে রাখা হয়েছে। একদিকে সামান্য হলেও হেলে আছে ওটা।

রায়েলি আর সুলতান পৌঁছে গেছে নৌকার কাছে। ওরা নৌকার কাছে পৌঁছেই বালির ওপরে বসে হাঁপাতে লাগল। বরখাও ওখানে পৌঁছে বসে পড়ল বালির ওপরে। বড়ো বড়ো করে দম নিয়ে সে জানতে চাইল। 'আমগো তো মানুষ একজন কইমা গেছে, আর ওরা–'

রায়েলি এখনও দম নিচ্ছে তবে তার চেহারা পাথরের মতো কঠিন। বড়ো বড়ো করে দম নিতে নিতে সে বলে উঠল, 'কিছু করার নাই। যা আছে তাই দিয়া কাম সারতে অইব। পিছে ফেরার উপায় নাই,' বলে সে বালির ওপরে হাতড়াতে হাতড়াতে একটা ঝোপের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে নারকেল পাতা দিয়ে মোড়ানো একটা বস্তার মতো বের করে আনল। সেটা থেকে, দুটো ধনুক আর তিরের তূণী বের করে ছুড়ে দিলো ওদের দুজনার দিকে, সেই সাথে দুটো তরবারিও। তার কাঁধে ধনুক আগে থেকেই ছিল, সেটাকে সে ঠিকঠাক করে সোজা হয়েই বলে উঠল, 'ওরা চইলা আসছে।' বরখা মেয়েটার গলার শান্ত গলা শুনে খুবই অবাক হলো। এই মেয়ে ঠান্ডা পাথরের চেয়েও ঠান্ডা। মাসুম ঘাড় ফিরিয়ে দেখল অন্তত ছয়-সাতজন হবেই, সে-ও চট করে উঠে দাঁড়াল।

'সুলতান, তুমি এইখানেই থাকো। ওরা আরেকটু আগাইলেই যা করার কথা ছিল সেইটা করবা। মনে আছে তো?' সুলতান মাথা নাড়তেই সে বলে উঠল, 'মনে রাখবা, ওরা যেন তোমারে ঠিকঠাক দেখতে পায়,' বলে সে চট করে বরখার দিকে ফিরে বলে উঠল। 'তুমি আমার সাথে আসো,' ওরা দুজনে দৌড়ে চলে এলো নৌকার পেছন দিকে। তারপর ওকে নিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে মেয়েটা চলে গেল তার নির্দিষ্ট জায়গায়, বরখা দেখল নৌকাটাকে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে যে লগিটা দিয়ে, ওটার একটা প্রান্ত এসে ঢুকেছে ওরা যে ঝোপটায় অবস্থান নিয়েছে সেটার ভেতরে। 'মনে আছে তো, বাঙালি, কী করতে অইব?' কঠিন স্বরে কথাটা জিজ্ঞেস করেই সে চট করে বসে পড়ল আড়াল নিয়ে। এবার সময়ের অপেক্ষা।

***

মাসুম ওর হাতে ধরা লাঠিটাকে দুবার মাথার ওপরে পাক খাইয়ে ওটার একটা প্রান্ত জোরে ঠেলে ঢুকিয়ে দিলো সামনের ভেজা বালু মাটিতে। নরম মাটিতে ঢুকে গিয়ে

লাঠিটা সোজা হয়ে রইল ওর সামনে। মাটি থেকে ভেজা বালু মাটি তুলে নিয়ে নিজের দুহাতের তালুতে ঘষে নিয়ে দুবার তালি মারল মাসুম, বিড়বিড় করে বলে উঠল, *এইবার আসুক*।

ওর পাশেই তরবারি নিয়ে প্রস্তুত আছে আরেকজন। আর ওদের দুপাশে দুজন তিরন্দাজ, সেই নারী যোদ্ধাও এসে দাঁড়িয়ে গেছে, এবার ধোবল আর নুক্কুনও ঠিক ঠাক এসে পৌঁছে গেলেই হয়, ধোবল শেষ নির্দেশনাটা লাফিয়ে পার হয়ে গেল, ওর ঠিক পেছনেই নুক্কুন। সে আর দুটো নির্দেশনা পার হতে পারলেই মুক্ত। মাসুম দেখল ডাকাতদের দলটাও প্রায় চলে এসেছে, আনমনেই সে একপাশে তাকাল, আপনাতেই একবার মাথা ঝাঁকাল সেদিকে তাকিয়ে। ও জানে কাউকে দেখতে না পেলেও অন্তত দুজন প্রস্তুত আছে ওখানে। মাসুম সামনে ফিরে তাকিয়েই দেখতে পেল ধোবল পার হয়ে গেছে জায়গাটা, নুক্কুন শেষ নির্দেশনা পার হচ্ছে মাসুম চিৎকার করে কিছু একটা বলতে যাবে, তার আগেই শেষ নির্দেশনাটা মিস করে গেল নুক্কুন, সাথে সাথে পা পিছলাল সে। মাসুমের মুখ দিয়ে আপনাতেই চিৎকার বেরিয়ে গেল, সে পরিষ্কার দেখতে পেল নুক্কুন পা পিছলে শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ধেয়ে চলেছে ওদের পাতা ফাঁদের দিকে, ধোবল কিছু একটা আন্দাজ করে পেছন ফিরে তাকিয়েছিল। নুক্কুনকে দেখতে পেল, সে-ও ধেয়ে চলেছে ফাঁদের দিকে। যদিও সে পার হয়ে গেছে, কিন্তু তাও চট করে আবারও পেছন ফিরে সে একটা হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল নুক্কুনকে, সাথে সাথে টান লাগল তার নিজের শরীরে। ক্ষণিকের জন্যে মাসুমের মনে হলো ওরা দুজনেই পড়ে যাবে ফাঁদের ভেতরে। আপনাতেই দুই কদম এগিয়ে গেল সেদিকে। কিন্তু বাজে কিছু ঘটার আগেই ধোবল ফিরে পেল তার শরীরের ভারসাম্য এবং চট করে নিজেও সোজা হয়ে গেল সেই সাথে সোজা করে ফেলল নুক্কুনকেও। কিন্তু দুজনেই চট করে পড়ে গেল বালির ওপরে।

মাসুম দেখল বিশার লোকেরাও প্রায় চলে এসেছে ফাঁদের কাছাকাছি। আর বড়োজোর বিশ কদমের মতো পার হলেই ওরা চলে আসবে, ফাঁদের ওপরে। ওদেরকে যদি আটকানো না যায় মাসুম চট করে এগিয়ে গেল ধোবল আর নুক্কুনের দিকে। দুজনেই ততক্ষণে উঠে বসেছে। দুজনকে টানতে টানতে খানকিটা সরিয়ে আনতেই দেখতে পেল লোকগুলো প্রায় চলে এসেছে। দম বন্ধ করে দেখল প্রায় আটজনের মতো হবে, প্রথম জন ফাঁদের কিনারায় পা রাখতেই *ঝপাৎ* করে পড়ে গেল পানিতে। তাকে অনুসরণ করল দ্বিতীয় আরেকজন। বাকিরা নিজেদের গতি কমিয়ে ফেললেও পড়ে গেল দুপাশের পানি ভরতি তিনটে গর্তের ওপরে। সাথে সাথে মাসুম ইশারা করতেই দুপাশ থেকে কড়কড় শব্দ তুলে দুটো লগি জালগুলোকে টেনে তুলে ফেলল শূন্যে। জালগুলোতে জড়িয়ে বন্দি হয়ে গেছে ওদের অর্ধেকের বেশি লোক। মাসুমের ফাঁদের পরিকল্পনাটা ছিল খুবই সাধারণ

আর পুরনো। দ্বীপটা যেহেতু জেলেদের, কাজেই এখানে জেলেদের সামগ্রী আছেই। আর এর ভেতরে দুটো জিনিস খুবই প্রচলিত–একটা হলো মাছ জিইয়ে রাখার জন্যে পানির চৌবাচ্চা, আর অন্যটা হলো মাছ ধরার জন্যে লগি দিয়ে আটকানো জাল। ওরা এরকম দুটো জাল সরিয়ে এনে ওই দুটোকে পানি ভরতি মাছ ধরার চৌবাচ্চার ওপরে জালগুলো নামিয়ে সেগুলোকে নারকেল পাতা দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। ওরা ঝুপড়ি থেকে পালিয়ে জঙ্গল পর্যন্ত আসার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল ওদেরকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসা। ওরা চৌবাচ্চাগুলোর ফাঁক দিয়ে নির্দেশনা দিয়ে রেখেছিল, ওরা সেগুলো এড়িয়ে জঙ্গলের কিনারা পর্যন্ত চলে এসেছে। কিন্তু অন্ধকারের ভেতরে পাতা দিয়ে ঢাকা চৌবাচ্চাগুলোর অবস্থান বোঝা ডাকাতদের জন্যে প্রায় অসম্ভব ছিল। আর তাই দৌড়ে এসে চৌবাচ্চাগুলোতে পড়ে যেতেই ওটাতে বিছানো জালে জড়িয়ে গেছে যারা পড়েছে, সাথে সাথে দুপাশে বসে থাকা দুজন লগ্গিগুলো ঠেলে জালগুলোকে টেনে ওপরে তুলে ফেলেছে, জালের সাথে জড়ানো ডাকাতেরাও উঠে গেছে ওপরে। ঠিক যেভাবে মাছ জালে জড়ানোর পরে টেনে তোলা হয়।

'জীবনে প্রথম, মাটিতে মানুষ ধরলাম তাও মাছের জাল দিয়া, সাবধান,' বলেই মাসুম মাটিতে শুয়ে পড়ল তিরন্দাজদেরকে জায়গা করে দেওয়ার জন্যে। দুই পা এগিয়ে ওরা যারা চৌবাচ্চার ওপাশে এখনও দাঁড়িয়ে ছিল তাদের দিকে তির ছুঁড়তে শুরু করল। এক দফা তির ছোড়া হতেই মাসুম, ওর পাশের যোদ্ধা নুরুন আর ধোবল উঠে দাঁড়িয়ে আক্রমণ চালাল অবশিষ্ট তিন চারজনের ওপরে। সবাই মিলে এদেরকে কাবু করতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগল না। হাতের লাঠিটাকে মাথার ওপরে তুলে এক ডাকাতের খুলি ছাতু করে দিয়ে মুখের রক্ত মুছে বাকিদেরকে নির্দেশ দিলো জালে জড়ানো বন্দিদেরকে বেঁধে ফেলতে। কিছুক্ষণের ভেতরেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মেহেরসহ সবাই জড় হলো ঝুপড়িগুলোর দিকে রওনা দেওয়ার জন্যে।

'এদিকে তো সব সামলানি গেল, ওইদিকে কী অবস্থা কে জানে,' মাসুম বিড়বিড় করে বলে উঠল। সবাই তাকিয়ে আছে যেদিকে নৌকাটা রাখা আছে সেদিকে।

***

সুলতান নৌকাটার ঠিক সামনেই ওঁত পেতে বসে আছে। যেই ডাকাতগুলো কাছাকছি চলে এলো, সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং সেই সাথে উঠতে শুরু করল লগি দিয়ে আটকে রাখা নৌকাটার পাটাতনের ওপরে। ওকে দেখে ডাকাতেরা হই হই করে তেড়ে এলো। সুলতান দেখল ডাকাতরা খুব বেশি সাবধানতার পরোয়া

করছে না, কারণ একে তো সংখ্যায় বেশি তার ওপরে ওদেরকে এমন একটা ভাব দেখান হয়েছে যে ওরা নৌকায় করে পালানোর চেষ্টা করবে, দূর থেকে অন্ধকারের ভেতরে চট করে বোঝাও সম্ভব না যে নৌকাটা পুরোপুরি পানি থেকে ওপরে তোলা। ওরা ভাবছে এরা আধা ঠিক করা নৌকাটাকে তো পানিতে ভাসানোর চেষ্টা করছে যেকোনো বোধ বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের তাই ভাবার কথা। কিন্তু ওরা ফাঁদটা পেতেছে ভিন্নভাবে।

সুলতান নৌকায় উঠেই চলে এলো অন্যপাশে, তারপর নৌকাটা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল ভেজা বালু মাটিতে। নেমেই সে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে চলে এলো রায়েলি আর বরখা লুকিয়ে আছে যে ঝোপটার ভেতরে, সেখানে। ওরা দুজনেই প্রস্তুত হয়ে ছিল। সুলতান ভেতরে ঢুকেই হাঁপাতে লাগল। বাঁধের লগিতে হাত রেখে রায়েলি শান্ত সুরে জানতে চাইল, 'কয়জন, গুনতে পারছস?'

'সাজ্জন, কমপক্ষে,' বলে সে নিজেদের দেখল, মোকাবেলাটা সহজ হবে না। যতই ফাঁদ পাতুক, তিনজনে সাতজনকে কাবু করা কঠিন।

'আমরা কি–'

তাকে প্রশ্নটা শেষ করতে দিলো না রায়েলি, 'দেহা যাক, শশশ,' বলে সে সবাইকে চুপ থাকতে বলল, নৌকার এপাশের পাটাতনে কালো একটা অবয়ব দেখা যাচ্ছে। রায়েলি লগির ওপরে হাত শক্ত করল, বরখা আর সুলতানকেও চেপে ধরেছে ওটা। 'এখন কী–'

'শশশ, আমি তিন গুনলেই–'

ডাকাতেরা একে একে পাটাতনের এপাশে আসছে। সবার হাতেই হয় তরবারি আর না হয় চকচকে বাঁশের লাঠি। সবার পরনে কালো কোট, মাথায় মুখে কালো কাপড় বাঁধা। নৌকার পাটাতনের এপাশে এসে নিজেদের ভেতরে কথা বলাবলি করতে লাগল। 'ওরা বুইঝা গেছে নৌকা পুরাটাই বালুর উপরে–'

'এক,' বলেই রায়েলি শক্ত করে দুই হাতে চেপে ধরল বাঁশের লগির মাথাটা। 'দুই,' ওরা দেখতে পাচ্ছে এক ডাকাত নৌকার পাটাতনের ওপর থেকে মাটিতে নেমে এলো লাফিয়ে, বোঝার চেষ্টা করছে সুলতান পালিয়ে কোনদিকে গেছে, বালুর ওপরে পায়ের ছাপ দেখে সে ফিরে তাকাল ওদের ঝোপটার দিকে, সাথে সাথে রায়েলি চিৎকার করে বলে উঠল, 'তিন।' বলেই তিনজনে প্রাণপণে ঠেলতে শুরু করল লগিটা। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো এটা এক চুলও নড়ছে না জোরে জোরে ঠেলা দিতেই মটমট করে নড়তে শুরু করল। তারপর তীব্র ধাক্কার চোটে অনেকটা যেন পিছলে বেরিয়ে গেল ওদের হাতের ফাঁক দিয়ে, বরখা দেখল লগিটা নৌকার নিচ থেকে ছুটে যেতেই বিস্ফোরণের মতোই নৌকাটাকে ঠেস দিয়ে রাখা

ছোটো ছোটো কাঠ আর বাঁশের টুকরোগুলো ছিটকে সরতে শুরু করল আর নৌকাটা কাত হয়ে গেল একদিকে। যে ডাকাতটা লাফিয়ে নেমে এসেছিল বালুর ওপরে নৌকাটা কাত হয়ে আছড়ে পড়ল তার ওপরে। নৌকার ভেতর থেকেও ভেসে এলো চিৎকার, চেঁচামেচি আর অর্তনাদ।

'এই বার,' বলেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রায়েলি, ওর সাথে বাকি দুজনও। তিনজনেরই হাতে বেরিয়ে এসেছে অস্ত্র।

কিছু ডাকাত নৌকার ওপরে আর কয়েকজন লাফিয়ে নেমে এলো বালুর ওপরে। ওরা সোজা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপরে। প্রথম দফায় কয়েকটা তির ছুঁড়তেই পড়ে গেল কয়েকজন। কিন্তু দ্বিতীয় দফা তির ছুঁড়তেই ডাকাতেরা এমনভাবে ওদের মুখোমুখি হয়ে গেল যে তির ছোড়ার মতো অবস্থা রইল না আর। লড়াই শুরু হয়ে গেল তরবারি আর লাঠি দিয়ে। রায়েলি নিজের ধনুক ফেলে দিয়ে তরবারি বের করে এনে ঝাঁপিয়ে পড়ল একজনের ওপরে। সুলতানও তাই, বরখা এমনকি ধনুক নামানোর সময়ও পেল না তার আগেই লড়াই বেঁধে গেল। সংখ্যায় ডাকাতেরা ওদের চেয়ে বেশি। কিন্তু লড়াই হলো সমানে সমান।

প্রথম যার সাথে টক্কর লেগেছিল লোকটার হাতে ছিল চকচকে বাঁশের লাঠি। রায়েলি ভেবেছিল তরবারির কোপে ওটা দুই টুকরো হয়ে যাবে কিন্তু খুবই অবাক হয়ে সে দেখল লাঠিটা দিয়ে দক্ষ ডাকাত তার সাথে খুব ভালোভাবেই পাল্লা টানছে। কয়েক মিনিটের লড়াইয়ে যদিও একসময় তাকে কাবু করতে পারল রায়েলি, কিন্তু ততক্ষণে জান বেরিয়ে গেছে ওর। একাধিক আঘাতে রীতিমতো আহত। অন্যদিকে প্রাণপণে লড়ছে সুলতান আর বরখা। কিন্তু অসম লড়াইটা অনেকক্ষণ চালিয়ে গেলেও একসময় ওদের তিনজনকেই তিনপাশ থেকে ঘিরে ফেলল ডাকাতদের অবশিষ্ট কয়জন। বরখা নিজের অস্ত্র হারিয়ে ফেলেছে, সুলতানের লাঠি ভেঙে গেছে মাঝখান দিয়ে, একমাত্র রায়েলির হাতের তরবারি টিকে আছে কিন্তু সেটা চালানোর মতো অবস্থায় নেই সে।

'আর মনে হয় না–' হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল বরখা।

'শেষ দম পর্যন্ত লড়বো,' আবারও লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রায়েলি, সাথে সুলতান এবং বরখাও। যদিও ঘিরে ফেলেছে ওদেরকে কিন্তু তিনজনেই আবারও আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে, ডাকাতেরা ওদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল শক্ত লাঠির বাড়িতে রায়েলির হাত থেকে ছুটে গেল ওর তরবারিটা। আবারও ধপ করে বালুতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। এক ডাকাত মাথার ওপরে তুলে নিলো তার লাঠিটা ওটাকে নামিয়ে আনছে রায়েলির মাথা বরাবর, খট করে একটা শব্দের সাথে রায়েলি দেখল খুলিতে গেঁথে থাকা একটা তির নিয়ে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। মুখ থেকে খুলে

গেছে ঢেকে রাখা কাপড়। চোখে অবিশ্বাস। অবাক রায়েলিও কম হয়নি, সে অন্যদিকে তাকিয়ে দেখল মাসুম ওর হাত থেকে ধনুকটা নামিয়ে নিচ্ছে। তার সাথের সঙ্গীরা হই হই করে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাকি দুই ডাকাতের ওপরে। ওদেরকে কাবু করে বন্দি করতে খুব বেশি সময় লাগল না বাকিদের।

'তুমি ঠিক আছ?' বালুতে বসে হাঁপাতে থাকা রায়েলির কাছে জানতে চাইল মাসুম। সে বাকিদের দিকে দেখে নিয়ে নিজের কপাল থেকে ঘাম আর রক্ত মুছল এক হাতে তারপর ফিরে তাকাল খোলা পানির দিকে।

'যা করার ছিল সেইটা করা গেছে, এইবার আক্রমণ চলবো পানিতে–' ওর সাথের সবাই হই হই করে উঠল।

অধ্যায় আটাশ
বর্তমান সময়
লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতেই বিরাট রাজপ্রাসাদের মতো বাড়িটা চোখে পড়ল পুকুরের অন্যপাশে। বাড়িটা দেখে শিস বাজিয়ে বলে উঠল সোহেল, 'আরে এইটা ওই বাড়ি না? ছোটোবেলায় ইতিহাসের বইতে পড়েছিলাম বাড়িটার কথা, এইটা যে এইখানে তা জানতাম না।'

'বেশিরভাগ মানুষই জানে না,' সোহেল পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে পৃথা বলে উঠল। 'আমাদের দেশে ইতিহাসটা ছোটো বাচ্চাদেরকে স্রেফ জোর করে গেলানো হয়, ইতিহাসের আসল অংশটুকুর নির্যাস নিতে দেওয়া হয় না। এই কারণে জ্ঞানটাও ওই পরীক্ষা পর্যন্তই টিকে থাকে, এরপরে আর খুব বেশি সাসটেইন করে না। চলো সবাই,' ওরা সুন্দর আঙিনার ভেতর দিয়ে হেঁটে এগিয়ে যেতে লাগল।

'ওয়াও, এইটাও তো খাতার পেছনের ছবিতে দেখেছি,' ওদের হাতের ডানে সুন্দর সাদা রংয়ের একটা ভাস্কর্য। গরুর গাড়িকে ঠেলতে থাকা একটা কিশোরের অবয়ব ফুটে উঠেছে দারুণভাবে।

'হ্যাঁ, এটার নাম সংগ্রাম ভাস্কর্য, শিল্পী জয়নুল আবেদিনের বানানো,' বলে চৌধুরী ওদেরকে চারপাশে দেখল এই পুরো ফাউন্ডেশনটাই উনার প্রতিষ্ঠা করা। 'ওই যে উনার একটা আবক্ষ মূর্তিও আছে এখানে,' বলল সে, বঙ্গবন্ধুর ভাষণরত মূর্তির পাশেই জয়নুল আবেদীনের আবক্ষ একটা মূর্তি দেখাল।

'ফাউন্ডেশনের অফিসটা কোনোদিকে?' এসব কচকচানি বাশারের ভালো লাগছে না। সে দ্রুত কাজে নামতে চাইছে। প্রতিমুহূর্তে কেমন জানি এক অসহায়ত্ব আর শঙ্কা চেপে ধরছে ওকে। কেন জানি এখানে এসে ওর ময়মনসিংহের শশীলজ আর পুরনো জমিদার বাড়ির স্মৃতিগুলো উসকে উঠতে চাইছে মনের ভেতরে। যদিও কেসটাতে শেষ পর্যন্ত সফলতা এসেছ এবং সবদিক থেকেই সেটা ওর জন্যে ভালো হয়েছে, কিন্তু সেই সময়ের ভয়াবহ কিছু অভিজ্ঞতার কথা মনে হতেই বুকের

ভেতরে কেমন জানি একটা অস্থিরতা তৈরি হয়। 'উনার সাথে কী কথা হয়েছে?' বাশার পৃথার কাছে জানতে চাইল। 'উনি কী আছেন বা হেল্প করবেন আমাদেরকে?'

'ফোনে কথা হয়েছে। উনি কাছাকাছিই থাকেন। এত সকালে অবশ্য উনি অফিসে আসেন না, তবে আমি আমাদের বিষয়টা জানাতেই বেশ এক্সাইটেড হয়ে উঠলেন এবং বললেন তার অফিসে গিয়ে অপেক্ষা করতে, উনি যতটা সম্ভব দ্রুত আসার চেষ্টা করবেন।'

'কাউকে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন মনে হয়,' বাশার এক গার্ডকে ডেকে জিজ্ঞেস করল ফাউন্ডেশনের অফিস কোনোদিকে। সেখানে গিয়ে রিসিপশনে হামিদ সাহেবের গেস্ট পরিচয় দিতেই ওরা জানাল হামিদ সাহের ইতিমধ্যেই তাদেরকে কল করে জানিয়েছেন, ওরা যাবে, তাই বেশ খাতির-যত্ন করেই বসালো ওদেরকে। বাশার মনে মনে খুশি হয়ে উঠল। এসব আর্কিয়োলজিস্ট বা এ-ধরনের লোকের সাথে ওর কাজের অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর না। কিন্তু এই লোকের আচরণে সে খানিকটা অবাকই হয়েছে। ভাব দেখে মনে হলো এ-বাকিদের মতো না, সেন্স আছে।

ওরা অফিসে বসে অপক্ষো করতে লাগল তবে ভদ্রলোক খুব বেশি দেরি করলেন না। ভদ্রলোকের চেহারা বাশারের ভাবনার সাথে বেশ মিলে গেল। পেশায় আর্কিয়োলজিস্ট হলেও, পঞ্চান্ন-ষাটের মাঝামাঝি বয়সের হ্যাংলা-পাতলা হামিদ সাহেব বেশ পরিপাটি এবং সুন্দর পোশাক পরনে। কাঁচাপাকা চুলের মোটা গোঁফওয়ালা মানুষটা রিসিপশনে প্রবেশ করে ওদেরকে দেখে হেসে উঠে পৃথার দিকে এগিয়ে এলো। 'গুড মর্নিং, পৃথা, কতদিন পর দেখা,' বলে সে ওদেরকে দেখল। পৃথা এক একে পরিচয় করিয়ে দিলো সবাইকে। বাশার আর সোহেলের দিকে তাকিয়ে তার ভ্রু কুঁচকালো সামান্য, 'পুলিশ! কোনো সমস্যা কী?' খানিকটা চোখ সরু করেই সে জানতে চাইল।

'স্যার,' পৃথার ঠিক মনে পড়ছিল না ভদ্রলোককে কি ও স্যার ডাকত নাকি আঙ্কেল, তাই একটু দ্বিধা বোধ করছিল, অবশেষে স্যারই ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে বলে উঠল, 'আমাদের একটা বিশেষ বিষয়ে সাহায্য প্রয়োজন, এখানে তো আমরা আর কাউকে চিনিও না, আর আপনি এই এলাকা নিয়েই গবেষণা করছেন বহু বছর ধরে, এ-কারণেই সরাসরি চলে এলাম আপনার কাছে।'

'বিষয়টা কি কোনোভাবে তোমার বাবা বা মার সাথে সংশ্লিষ্ট?' সে এখনও সন্দেহের দৃষ্টিতেই তাকাচ্ছে ওদের দিকে।

'হ্যাঁ, আবার নাও,' পৃথা দ্বিধা করছে দেখে ভদ্রলোক মৃদু হেসে উঠল। 'আচ্ছা আমি বুঝতে পেরেছি। চল আমার অফিসে গিয়ে একান্তে কথা বলি। তোমাদেরকে চা বা অন্য কিছু দিতে বলি?' ভদ্রলোকের আপ্যায়নের জবাবে সবাই মানা করে উঠে জানাল ওরা মাত্র চা খেয়ে এসেছে।

সবাই মিলে প্রফেসর হামিদের অফিসের কামরায় এসে বসল ওরা। সুন্দর অফিসে, বসার টেবিলের পেছনের বড়ো জানালা দিয়ে সবুজে ঘেরা পুরো ইয়ার্ড চোখে পড়ে।

'বলো, পৃথা, ব্যাপার কী?' বলে সে একটু দ্বিধা করল। 'তোমার বাবার কোনো খোঁজ পাওয়া গেছে? এত ব্রিলিয়ান্ট মানুষ অথচ,' বলে সে আফসোসের সাথে মাথা নাড়ল। 'আসলে সত্যি কথা হলো তোমার বাবা-মা দুজনেই এত ব্রিলিয়ান্ট মানুষ অথচ উনাদের ভেতরে মিলটা হলো না, আর সব দিক থেকে সেটার সাফারার হলে তুমি, যাক গে বলো।'

'আসলে, স্যার, আমরা মাম্মি এবং পাপা দুজনের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্যেই এসেছি,' এইটুকু বলে সে একবার বাশারের দিকে দেখল। 'তবে, স্যার, আপনাকে একটা কথা আগেই বলে নেই। যে-বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে এসেছি সেটা নিয়ে কিছু ঝামেলা আছে। যদিও পুলিশের লোক আমাদের সাথে আছে কিন্তু এর সাথে আরও বেশ কিছু মহল জড়িত থাকতে পারে। কাজেই কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। কাজেই আপনি যদি ইনভলভড হতে না চান বা এর সাথে জড়াতে না চান আমাদের কোনো আপত্তি নেই,' বলে সে আবারও বাশারের দিকে তাকাতেই দেখল বাশার কিছু না বললেও চৌধুরী বেশ আপত্তির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, এই ঝুঁকিটা পৃথা নিয়ে নিয়েছে এটা সম্ভবত তার ভালো লাগছে না। কিন্তু পৃথা জানে এইটুকু না বললে ভদ্রলোককে এর ভেতরে ইনভলভ করাটা ইথিক্যাল হবে না। 'তবে এটাও ঠিক, স্যার, আমাদের আসলে আপনি ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না; আর তাছাড়া যেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে এসেছি, সেটা পাপাকে খুঁজে বের করার একটা শেষ উপায় বলতে পারেন।'

যদিও আগের অংশে পৃথা লোকটাকে বিপদের ব্যাপারে আভাস দিয়েছে, কিন্তু পরেরটুকু বলে ও আসলে তাকে কনভিন্স করারই চেষ্টা করছে।

কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল ওর কথা শুনে ভদ্রলোক স্রেফ একটা হাসি দিলো, 'পৃথা, আমি আর্কিয়োলজির জগতে আছি আজ পঁচিশ বছরের ওপরে। অনেকেই জানে না এই জগতে একদিকে ঝুঁকির পরিমাণ যেমন থাকে, ঠিক তেমনি করাপশনের অনেক সুযোগও থাকে। আমি আজ পর্যন্ত ক্লিন ছিলাম তবে তাই বলে নতুন একটা অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাবো আর সেটাতে অংশগ্রহণ করবো না–স্রেফ ঝুঁকির ভয়ে এটা হতেই পারে না,' বলে সে আবারও মৃদ হাসল। 'এছাড়াও আসলে

প্রফেসর ইফতেখারকে আমি পছন্দ করতাম, যদিও তার সাথে সেভাবে মেশার সুযোগ হয়নি আমার। কিন্তু তোমার মাম্মি, মানে ইলা ম্যাডামের সাথে আমি অনেক কাজ করেছি। আমার আর্লি ক্যারিয়ারে উনি অনেক হেল্প করেছেন। ওভারঅল বলতে গেলে তোমাদের পরিবারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আর তাছাড়া তোমার বাবাকে সবাই অপছন্দ করলেও আমি পছন্দ করতাম কারণ স্যার ব্যতিক্রম ছিলেন। এখন বলো, বিষয়টা কী?'

পৃথা আরেকবার বাশারের দিকে দেখে নিয়ে সংক্ষেপে বলে গেল পুরো বিষয়টা কী নিয়ে। বাশার এবং চৌধুরী ওকে আগেই ব্রিফ করেছে কোন জায়গাগুলো বাদ দিতে হবে। সেগুলো বাদে সংক্ষেপে সে বেশ সুন্দর করেই বলে গেল প্রায় প্রতিটা বিষয়। বলা শেষ করে আরেকবার বাশারের দিকে দেখতেই বাশার মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

'আচ্ছা, ম্যাপটা আছে তাহলে তোমাদের কাছে?' প্রশ্নটা করতেই পৃথা ম্যাপটা বের করে দেখাল তাকে। ভদ্রলোক ম্যাপটা নিলেও সেটা খুলল না ওটাকে টেবিলের ওপরে রেখে, সে বলে উঠল। 'একটা কথা বলো তো, এটা দিয়ে আসলে তোমরা ঠিক কী খুঁজে বের করতে চাইছ?'

'স্যার, আমি একটু বলি, অনুমতি দিলে,' বাশার বলে উঠল। 'আসলে আমাদের শুরুর মিশনটা ছিল প্রফেসর ইফতেখারকে খুঁজে বের করা, কেন তাকে খুঁজে বের করতে চাচ্ছি সেটা তো পৃথা বললই। কিন্তু এখন আরও একটা ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে সেটা হলো রাজদ্রোহীর রহস্যটার সমাধান করা। চট্টগ্রাম থেকে আমাদের এজেন্ট যা আবিষ্কার করেছে সেটা স্রেফ দুভাবে বোঝা যেতে পারে, এক প্রফেসর ইফতেখার নিজে সেটার সমাধান করবেন অথবা উনি এমন কিছু রেখে গেছেন যেটা দিয়ে ওটার সমাধান করা সম্ভব হবে। কাজেই আপাতত আমাদের উদ্দেশ্য এটাই।'

'আরও একটা ব্যাপার তোমাদের কথা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি। সেটা হলো, যদিও তোমাদের উদ্দেশ্য এবং বিধেয় দুটোই এ-থেকে আলাদা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই এই পুরো বিষয়টার সাথে তোমার মায়ের বড়ো ধরনের কোনো সংযোগ আছে। এই ব্যাপারটাও মাথায় রাখা জরুরি।'

'সেটা আমিও বলেছি ওদেরকে,' চৌধুরী কথা বলে উঠল অনেকক্ষণ পর।

'লেটস সি, এটাতে কী আছে,' ম্যাপটা সে হাতে নিয়ে ওটার ওজন দেখল প্রথমে, তারপর ওটার কাপড়টা পরখ করল। 'মসলিন, একেবারে পিয়োর মসলিন, সেই আদি যুগে বানানো, ভেজালগুলো নয়।'

'একারণেই এটা সেই লকেটের ছোট্ট পরিসরের ভেতরেও ধরেছিল।'

'মসলিনের ব্যাপারটা আরও একটা কারণে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হলো তোমার মা কিন্তু এটা নিয়েও কাজ করেছেন,' বলে প্রফেসর হামিদ আবারও মাথা নাড়ল। 'সত্যি কথা হলো উনার মতো মহিলা অমি লাইফে দেখিনি। জীবনের বেশিরভাগ সময় দেশের বাইরে থেকেছেন অথচ বেশিরভাগ সময় উনি দেশের কথাই ভাবতেন। দেশের মঙ্গলের কথা ভাবতেন,' এইটুকু বলে সে ম্যাপটা খুলে মনোযোগের সাথে দেখতে লাগল। 'তোমাদের কাছে কেন মনে হলো এটা এই জায়গার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো মানচিত্র?' ম্যাপটা দেখতে দেখতে উনি জানতে চাইলেন।

'স্যার, ওটার কারণে,' বাশার দেওয়ালে ঝোলানো পুরনো একটা ছবির কোণে সেই চিহ্নটা দেখিয়ে বলে উঠল। 'যে-লকেটের ভেতরে ওটা ছিল ওটার গায়ে এই চিহ্নটা ছিল।'

'লকেটটা কোথায়?' প্রফেসর হামিদের প্রশ্নের জবাবে বাশার কিছু বলল না। এই অংশটা ওরা তাকে বলেনি। পৃথা চোখ গরম করে তাকাল আবার বাশারের দিকে। আর সোহেল হাসি সামলে, চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে দেখল সে-ও মৃদু হাসিমুখে তাকিয়ে আছে।

'স্যার ওটা তো মিসিং, বাট ম্যাপটা তো এখানকারই কোনো জায়গার নাকি?'

পৃথার প্রশ্নের জবাবে, সে ম্যাপটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। রুমের একপাশে গিয়ে একটা প্রজেক্টর ওপেন করে, ওটার সংযোগ দিলো পুরনো দিনের একটা ইউএইচপি মেশিনের সাথে। ওটার নিচে, কাগজ বা কিছু ধরলে সেটা প্রজেক্টরে ডিসপ্লে করে। জিনিসটার সংযোগ দিয়ে কাপড়টা ওটার বাতির নিচে ধরতেই ওরা দেওয়ালের প্রজেক্টরে পুরো ম্যাপটা দেখতে পেল।

'তোমরা একটা জিনিস ভুল ধারণা করেছ, ম্যাপটা ঠিক এখানকার নয়,' প্রফেসর এখনও ম্যাপটা মনোযোগ দিয়ে দেখে বোঝার চেষ্টা করছে কিছু একটা।

'তাহলে?' পৃথা বেশ অবাক হয়েই জানতে চাইল। তা মুখ শুকিয়ে গেছে।

'আরে এত অস্থির হবার কিছু নেই,' প্রফেসর হামিদ হেসে উঠল। 'এখানকার নয় বলতে সরাসরি এই জায়গার নয়, কিন্তু এই চৌহদ্দির ভেতরেই কোনো একটা জায়গার। তোমরা জানো কি না জানি না–এইখানে মোট তিনটে এলাকা আছে। বড়ো নগর, খাস নগর আর পানাম নগর। আমরা এখন আছি খাস নগরে, আর আমার যদি ভুল না হয় তবে যে-জায়গাটা ম্যাপে শো করছে ওটা পানাম নগর।'

'যদিও স্যার আপনি এই এলাকার ব্যাপারে এক্সপার্ট তাও যদি জিজ্ঞেস করি, আপনি নিশ্চিত হলেন কীভাবে?' পৃথা প্রশ্ন করল।

'দেখো,' বলে উনি সরে এসে দেওয়ালের ডিসপ্লের সামনে দাঁড়ালেন। এখানে দুটো আর এই পাঁচটে আউটলাইন দেখছ পুরো ম্যাপ জুড়ে?' দাগগুলো উনি হাতে দেখালেন পয়েন্ট করে। 'আমার যদি ভুল না হয় তবে, এগুলো পানামের পানির সাপ্লাইয়ের চিহ্ন। পানাম নগরী যখন সমৃদ্ধ ছিল এটা খুবই আধুনিক এবং স্ট্রাকচারড একটা শহর ছিল। নগরবাসীদের যাতে পানির সমস্যা না হয় সেজন্যে এখান দুটো খাল এবং পাঁচটা বড়ো বড়ো পুকুর কাটা হয়েছিল। সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে এটা খুবই আধুনিক একটা ধারণা এবং খরচসাপেক্ষও বটে,' বলে সে আউটলাইনে আবারও আঙুল রেখে দেখাল। 'কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। এটা কী?' সে আরেকটা লাইন দেখাল। মূল আইটলানের ভেতরে চারকোনা স্ট্রাকচারগুলোর ভেতরে এটা আরেকটা লাইনের মতো কিন্তু এটা প্রবাহিত হয়েছে একেবারে ভিন্নভাবে। 'আর এই বিন্দুগুলোই বা কী?' ম্যাপের মধ্যে চারকোনা আকৃতিগুলোর ভেতরে ছড়ানো বেশ কিছু বিন্দুর দিকে নির্দেশ করল সে।

'এগুলো কী কূপ হতে পারে?' চৌধুরী মন্তব্য করার মতো করে বলে উঠল। 'প্রফেসর হামিদের হয়তো মনে নেই, কিন্তু একসময় আমিও এখানে প্রফেসর ইফতেখারের টিমে কাজ করেছিলাম। তখন দেখেছিলাম এখানে অনেক বাড়িতেই বিশেষ করে বড়ো বাড়িগুলোর বেশিরভাগ গুলোতেই দৈনিক চাহিদার যোগানের জন্যে কুয়া আছে। সেটা কি হতে পারে?'

'ভেরি ওয়েল সেইড,' প্রফেসর হামিদ বেশ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল। 'এগুলো কূপ হবার সম্ভাবনা ফেলে দেওয়া যায় না। কিন্তু সেক্ষেত্রে যে আউটলাইনগুলাকে আমরা পানির ধারা বলে ধরে নিচ্ছি সেগুলোকে বাদ দিলে, এই নিচের লাইনটা কীসের?' সে এখনও আনমনে হাত বুলাচ্ছে ম্যাপের ওপরে। 'এক কাজ করি চলো, পানামে চলে যাই, ওখানে গিয়ে না দেখলে ক্লিয়ার হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'আমার কাছেও সেটাই মনে হচ্ছে সেখানে গিয়ে প্র্যাকটিক্যালি দেখলে হয়তো আরও অনেক বেশি ক্লিয়ার বোঝা যাবে অনেক কিছু,' কথাটা বলে পৃথা উঠে দাঁড়াল। বাকিদেরকে বাইরে অপক্ষো করতে বলে প্রফেসর হামিদ তার ব্যক্তিগত কামরায় গিয়ে ঢুকল। 'ম্যাপটা?' বাশার পৃথার কানে ফিস ফিস করে বলে উঠল। পৃথা একটু অস্বস্তির সাথে ফিরে তাকাল ওটার দিকে। জিনিসটা এখনও সেই ইউএইচপির ওপরেই রাখা। 'আমার মনে হয় ওটা প্রফেসর হামিদই নিয়ে আসবেন। যেহেতু উনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এখানকার পুরো বিষয়ে, কাজেই তাকে ট্রাস্ট করতে হবে এখন। আর নিজে থেকে উইলিংলি উনি আমাদেরকে হেল্প করতে চাইছেন।'

'ঠিক আছে,' বাশার কাঁধ ঝাঁকাল, 'আর ম্যাপটার ছবি তো আছেই এখন আমাদের কাছে। কাজেই, নো প্রবলেম, তুমি,' ওরা বাইরে এসে বসতেই কিছুক্ষণ পরেই বেরিয়ে এলো প্রফেসর হামিদ। বাশার দেখল ম্যাপটা তার হাতে, সেটাকে উনি ভাঁজ করে পকেটে ভরে ফেললেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল বাশার।

'আমরা কি গাড়ি নিব?' বাশার জানতে চাইল, 'আমাদের গাড়ি–'

'প্রয়োজন হবে না,' প্রফেসর হামিদ হাত নেড়ে মানা করল। 'এখান থেকে দশ মিনিট হাঁটলেই হবে।'

ওরা উনার পিছু নিয়ে হেঁটে দশ নয়, পনেরো মিনিটের ভেতরেই চলে এলো পানামের প্রবেশ পথে। প্রবেশ পথের কাছেই একটা কৃত্রিম বইতে নগরীর শুরুর দিককার ইতিহাস লেখা সংক্ষেপে, ওটার কাছেই একটা টিকেট কাটার বুথের মতো আছে। প্রফেসর থাকাতে ওদের টিকেট কাটার প্রয়োজন পড়ল না। ওরা পানামে ঢুকে ওটার মূল রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। সকালবেলা হওয়াতে এখনও তেমন একটা দর্শনার্থী নেই শুধুমাত্র নিয়মিত গ্রামের লোকজন যারা এই পথে চলাচল করে, তারা বাদে বলতে গেলে তেমন কেউই নেই।

'এটা হলো এই নগরীর মূল পথ, একসময় এখানে ঘোড়ার গাড়ি চলত,' এগোতে এগোতে প্রফেসর বলে উঠল। 'এই নগরী একসময় পুরো বঙ্গদেশে তো বটেই এমনকি পুরো এশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ নগরীগুলোর ভেতরে একটা ছিল।' বাশার হাঁটতে হাঁটতে আর দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছে। চারপাশে, ভাঙাচোরা ভগ্নপ্রায় বাড়িগুলো দেখলে হয়তো এর অতীতের জৌলুসের ব্যাপারে খানিকটা ধারণা পাওয়া যায়, কিন্তু একসময় এই জায়গাই পৃথিবীর সেরা সমৃদ্ধ নগরীগুলোর একটা ছিল–সেটা ভাবাটা রীতিমতো কষ্টকর মনে হয়।

'তোমরা কী এর ইতিহাস জানো?' বলে সে চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আপনি হয়তো জানেন, তাও ওদের জানার জন্যে খানিকটা বলছি–'

'শুনেছি এটার সাথে নাকি ঈশা খাঁ আর বারো ভূঁইয়াদের সংযোগ ছিল,' সোহেল বলে উঠল।

'এটা আসলে এই নগরীর ইতিহাসের একটা অংশ,' পৃথা যোগ করল এবার। 'এই নগরীর ইতিহাস অনেক বেশি পুরনো।'

'ঠিক বলেছ এটা আসলে সবসময়ই একটা ব্যাবসায়িক নগরী ছিল,' প্রফেসর যেতে যেতে বলে চলেছেন। 'এক হিন্দু জমিদার এটার গোড়াপত্তন করেছিলেন। মূলত ব্যাবসায়িক কারণেই। এর পেছনে কারণও ছিল। কী কারণ কেউ বলতে পারবে?'

'কমিউনিকেশন,' বাশার বলে উঠল। যদিও ওর আসলে ইতিহাস নিয়ে খুব একটা আগ্রহ নেই। কিন্তু আলোচনা শুনতে শুনতে নিজের মতামত দেওয়ার লোভটা সামলাতে পারল না। 'কারণ এখান থেকে মেঘনা এবং শীতলক্ষ্যা দুটোই খুব কাছে।'

'একদম ঠিক বলেছ তুমি,' প্রফেসর যেতে যেতে পকেট থেকে ম্যাপটা বের করে আবারও কিছু একটা দেখলেন তারপর সন্তুষ্ট হয়ে ওটাকে পকেটে রেখে দিয়ে সে বলে উঠল। 'হ্যাঁ, কমিউনিকেশনই মূল কারণ ছিল। আশপাশে জলপথ কাছাকাছি হওয়াতে প্রথমে হিন্দু জমিদারদের ব্যাবসার কেন্দ্রস্থল ছিল এটা, তারপর মসলিন ব্যবসায়ীদের এবং পরবর্তীতে ইংরেজদের সময়ে নীল ব্যাবসার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল এই নগরী। এই নগরী নিয়ে সবচেয়ে বিখ্যাত এবং প্রচলিত ঘটনাটা হলো পারস্যের কবি হাফিজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তৎকালীন শাসক গিয়ানউদ্দিন আজম শাহ। কিন্তু বয়স বেশি হবার কারণে কবি আসতে পারেননি। কিন্তু উনি এই পানাম নিয়ে এতটাই ফ্যাসিনেটেড ছিলেন যে পরবর্তীতে একটা কবিতা লিখেছিলেন এই নগরীকে নিয়ে। ভাবা যায়?' বলে উনি চারপাশে দেখালেন।

'এটা ধ্বংস হলো কবে?' বাশার জানতে চাইল।

'মূলত এই নগরীর অবক্ষয় শুরু হয় ব্রিটিশ আমল থেকে। তখন ওরা এই অঞ্চলের ব্যাবসায়িক প্রতিপত্তি কমানোর জন্যে ধীরে ধীরে মুসলিম শাসিত অঞ্চলগুলো থেকে অনেককিছু সরিয়ে ফেলতে থাকে। ওই সময়টাতে এই এলাকার শাসনভার মুসলিমদের থেকে সরতে সরতে হিন্দু জমিদারদের ওপরে প্রবর্তিত হয়, সেখানে এখনও যে বাড়িগুলো দেখলে,' রাস্তার দুপাশে দেখাল সে। 'এর অনেকগুলোই আসলে ব্রিটিশ আমলে নির্মিত হিন্দু জমিদারদের আয়ত্তে থাকা অবস্থায় সেই সময় এখান থেকে অনেক পুরনো স্থাপনা ভেঙে ফেলা হয়। সেই সাথে অনেক কিছু আবার একাত্তরের পর মানুষজনকে ইজারা দিতে শুরু করে সরকার। ইজারাও এক সময় কমে গেলে সরকার এটাকে হেরিটেজ ঘোষণা করে। তবে মজার বিষয় কি জানো এই এলাকা এখনও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বেশ কয়েক বছর আগে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এই নগরীকে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীগুলোর একটা ঘোষণা করেছে।'

'তাই নাকি?' সোহেল বলে উঠল। 'তারমানে এখনও এই নগরীর গুরুত্ব একেবারে কম না?'

'তা তো বটেই,' কথাটা বলে সে আবারও পকেট থেকে ম্যাপ বের করল প্রফেসর, কিছু একটা মিলিয়ে নিয়ে বলে উঠল, 'আমি যেখান থেকে শুরু করতে চাচ্ছি আমরা কিন্তু তার কাছাকাছি চলে এসেছি,' বলে সে ডানে মোড় নিলো।

সবাইকে এগোতে দেখলেও বাশার দাঁড়িয়ে আশপাশে তাকাল। যদিও ওরা বেশ নিরাপদ একটা জায়গাতেই আছে। কিন্তু কেন জানি অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে ওর। মনে হচ্ছে ভীষণ বিপদের ভেতরে তো আছেই কেউ হয়তো ওদের ওপরে নজর রাখছে, আনমনেই সে একবার নিজের পিস্তলে হাত বুলাল। তারপর এগিয়ে গেল প্রফেসর হামিদ যেদিকে গেছেন সেদিকে।

***

বাশার থেমে যেতেই ওদের ওপরে নজর রাখতে থাকা লোকটাও থেমে গেছিল। সে আবারও এগিয়ে যেতেই তার পাশ থেকে আরেকবার ইশারা করল এবং তারপর মৃদু স্বরে বলে উঠল, 'লেট দেম ফিনিস দেয়ার ওয়ার্ক,' তারপর মৃদু হেসে যোগ করল, 'আমরা নিজেদেরকে দৃশ্যমান করবো ওরা যদি কিছু খুঁজে পায় তখন, কাজেই রিল্যাক্স।'

অধ্যায় উনত্রিশ

সময় : ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ

জল-জঙ্গল এলাকা

আগুয়ান নৌকাটার দিকে তাকিয়ে মাসুম একবার বড়ো করে দম নিলো। সেই সাথে সে আনমনেই একবার দেখে নিলো ওপরে আকাশের দিকে। রাত এখন শেষ প্রহরে, বলতে গেলে আর কিছুক্ষণের ভেতরেই দিনের আলো ফুটে উঠবে। আর ঘণ্টাখানেকও হয়তো লাগবে না। মাসুম জানে ওরা যা করতে যাচ্ছে, সেই অসম্ভবের স্রেফ অর্ধেকটা সম্ভব হয়েছে; বাকি অর্ধেক অসম্ভবকে এখনও বাস্তব রূপ দেওয়া বাকি। এই বাকি অর্ধেক অসম্ভবকে সম্ভব করতে হলে ওদের অন্ধকার প্রয়োজন। অন্ধকার ছাড়া এই অসম্ভবকে সম্ভব করা কোনোমতেই সম্ভব হবে না। আলোর পরিমাণ হিসেব করে আরেকবার নৌকাটাকে দেখে নিলো মাসুম। বেশ বড়ো একটা সওদাগরি নৌকা। তবে ওটার মাস্তুল থেকে শুরু করে আরও বেশ কিছু জায়গায় সওদাগরি সাধারণ নৌকার সাথে মেলে না। খুব স্বাভাবিকভাবেই একজন ডাকাতের সওদাগরি নৌকার প্রয়োজন হবার কথা নয়। সওদাগরি নৌকা বানানোই হয় আরাম-আয়েশের জন্যে আর মালামাল বহন করার জন্যে। কাজেই বিশা ডাকাত এই নৌকাটাকে যার কাছ থেকেই দখল করে থাকুক না কেন সে এটাকে দখল করার পর ব্যাপক পরিবর্তন করেছে। মাসুম আন্দাজ করতে পারে এটাকে পরিবর্তন করা হয়েছে এটার গতি বৃদ্ধি থেকে শুরু করে আরও কিছু বিষয়ে সুবিধা পাবার জন্যে।

'এই নৌকাই তো?' মাসুম খুব জোরে কথা বলছে না, আবার ধীরেও না। সে কথাটা মূলত জানতে চাইল ওর দলের যে ছেলেটা পাহারায় ছিল তার কাছে। যে-প্রথম ডাকাতদেরকে দ্বীপে আসতে দেখে কুক্কার ডাক ডেকে সবাইকে সাবধান করে দিয়েছিল তার কাছে। কারণ ওই প্রথম দেখতে পেয়েছিল গাছের ওপর থেকে কোন নৌকাটায় করে সবাই রওনা দিয়েছিল সেটা।

'ওস্তাদ, এইটাই,' ছেলেটা নিশ্চিত করতেই মাসুম মাথা নাড়ল। আরেকবার ফিরে তাকাল অন্য নৌকাটার দিকে। ওটা এখান থেকে কমপক্ষে আধা মাইল

দূরে। নৌকাটাকে দেখে নিয়েই নিজের ড্যাগারের হাতলে ওর আঙুলগুলো শক্ত হয়ে উঠলে। 'মনে আছে তো, ওগোরে চমকায়া দিয়া কাম হাসিল করতে অইবে?'

নৌকটার সবাই সায় জানাল।

যে ডাকাতগুলো দ্বীপে আক্রমণ চালিয়েছিল ওদের একটা দলকে জঙ্গলের কাছে আর অন্য দলটাকে নৌকার কাছে কাবু করে কয়েকজনকে হত্যা করে আক্রমণের সময়ে; বাকিরা এখনও বন্দি আছে দ্বীপের ঝুপড়িগুলোতেই। বন্দিদের পোশাক পরিবর্তন করে ওদের পোশাক পরে সমস্ত অস্ত্র প্রস্তুত করে ওরা ডাকাতদের নিয়ে আসা নৌকাগুলোয় এসে ওঠে, মাসুমের পরিকল্পনা সহজ, এখান থেকে পালাতে হলে ওদেরই কোনো একটা বড়ো নৌকা দখল করতে হবে। মাসুম ধারণা করছে ওরা যে সওদাগরি নৌকাটা থেকে এসেছে, মূল পরিকল্লানাকারী বা নেতৃত্ব স্থানীয়রা ওখানে নেই। কারণ বিশা ডাকাতের ওটায় থাকার সম্ভাবনা কম সে সম্ভাবনা আছে পাশের জালিয়াটাকে। তাই ওর পরিকল্পনা আগে সওদাগরিটা দখল করা, তারপর অন্যটার ব্যবস্থা করে পালানো। অসম্ভব এক যাত্রা, কিন্তু এখান থেকে পালাতে হলে এছাড়া আর কোনো উপায় নেই আসলে। নৌকাটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আর মাসুমের ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্নতা বাড়ছে। নৌকাটাকে দখল করতে হলে বেশ কিছু সমস্যা আছে, প্রথম সমস্যা হলোঃ ওরা গেছিল চারটা নৌকায় করে, ওরা ফিরে আসছে দুটো নৌকায় করে, ফলে এতে সন্দেহ বাড়তে পারে ওদের। আর ডাকাতেরা যে পোশাক পরে গেছিল ওরা সেই একই পোশাক পরে ফেরত এলেও অবশ্যই ওদের সাথে এদের আকৃতিগত পার্থক্য অনেক। কাজেই এটাও সন্দেহের একটা কারণ হতে পারে, কারণ ওরাও নিজেদের লোক চিনতে পারার কথা। এরপর সবচেয়ে বড়ো একটা সমস্যা হলো ওদেরকেই নৌকা আক্রমণ করতে দেখল বা টের পেল অন্যপাশের জালিয়া কী করবে। ওই নৌকাটাকে অবশ্যই বেশি লোকবলে এবং অস্ত্রে ভরা থাকার কথা। ওটা আক্রমণ করলে এই সওদাগরি দিয়ে ফেরানো যাবে না। কাজেই বেশ কিছু অনিশ্চয়তা আছে। নৌকার আরেকটু কাছে এগোতেই কেউ একজন সওদাগরি থেকে মশাল নাড়তে নাড়তে চিৎকার করে কিছু একটা বলল। সম্ভবত জানতে চাইছে কিছু একটা।

'কিছু বলার দরকার নাই,' বলে মাসুম পাটাতনের ওপর থেকে লাঠিটা তুলে হাতে নিয়ে নিলো। 'সবাই প্রস্তুত হও,' নৌকাটা আর বিশ-পঁচিশ গজ দূরে। মাসুম দেখতে পেল পাটাতনের ওপরে কয়েকজন এসে দাঁড়িয়েছে। চিৎকার করে একজন জানতে চাইল দ্বীপের কী অবস্থা? মাসুম ভারী স্বরে আগে দড়ি ফেলতে বলল। ওরা প্রায় কোনো সন্দেহ না করেই একটু পরে গিট দেওয়া একটা মোটা দড়ি এসে পড়ল ওদের নৌকার ওপরে। 'এইবার,' যদিও আসলে আক্রমণের ইঙ্গিত দিলো কিন্তু,

সেটা জোরে না বলে মাসুম লাঠিটাকে ফেলে দিলো। আগে ওঠা দরকার। সে দড়িটা বেয়ে তরতর করে উঠে এলো। দেখতে পেল তিনজন আছে পাটাতনের ওপরে। ও পাটাতনের কাছাকাছি পৌঁছে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো ধরার জন্যে। আর অন্যদিকের লোকটা জানতে চাইল ওরা এত কম কেন? মাসুম মুখের আড়াল থেকেই হাসি দিলো একটা। লোকটার হাত চেপে ধরেই ও লাফিয়ে নেমে এলো পাটাতনের ওপরে। একহাতে লোকটার হাত ধরে আছে, অন্য হাতটা দিয়ে টান দিয়েই বের করে আনল দুই দিকে ধারওয়ালা নিজের ড্যাগার।

ড্যাগারটা বের করে আনতে আনতেই সোজা চালিয়ে দিলো লোকটার গলা বরাবর। আরেকটু হলে ফিনকি দিয়ে বের হয়ে আসা রক্ত ওর চোখমুখ ভিজিয়ে দিত, কিন্তু মাসুম ততক্ষণে লাফ দিয়ে সরে গেছে দ্বিতীয় জনের দিকে। লোকটা প্রথমজনকে পড়ে যেতে দেখলেও বুঝতে পারেনি কী হচ্ছে! মাসুম তাকে দেখেই হাতের ছুরিটা ছুড়ে মারল লোকটার কণ্ঠার হাড় বরাবর। চিৎকারটা গলা পর্যন্ত ঘড়ঘড় শব্দে রূপান্তরিত হলো। কিন্তু তৃতীয় জন ততক্ষণে সাবধান হয়ে গেছে। মাসুম ছুরিটা ছুড়ে সোজা হবার আগেই বিশালদেহী লোকটা রাগে গজ গজ করতে করতে ছুটে এসে ওকে ধাক্কা মারল কাঁধ দিয়ে। মাসুম উড়ে গিয়ে বাড়ি খেল নৌকার মাস্তুলের সাথে। পিঠে মাস্তুলের বাড়ি লেগে মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে গেছে, ও দম ফিরে পাবার আগেই লোকটা উঠে এলো ওর বুকের ওপরে, দুইহাতে চেপে ধরল ওর গলা। এমনিতেই দম হারিয়ে ফেলেছিল গলায় লোকটার চাপ খেয়ে ওর মনে হতে লাগল গলার হাড় ভেঙে বসে যাচ্ছে। সাথে আর কোনো অস্ত্র নেই। একহাতে লোকটার হাত চেপে ধরে বুঝতে পারল এই নাগপাশ ছোটোনোর মতো শক্তি ওর নেই।

***

মাসুমদের নৌকা দুটো যখন সওদাগরিটার কাছাকাছি পৌঁছালো, অন্য নৌকাটা থেকে তখন ওটার দিকেই তাকিয়ে আছে বিশা ডাকাত। তার সাথে সেই দুজনে। 'মাত্র দুইটা আসল ক্যান নৌকা?'

'হুজুর, অবশ্যই ওরা চরের উপরে তাগোরে ধরছে; তা না অইলে আইত না,' বিশার প্রধান সহকারী বলে উঠল। বিশা ততক্ষণে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নৌকাটার দিকে। যদিও অন্ধকারের কারণে সেভাবে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না সে। তবে কথায় যুক্তি আছে। হয়তো ওরা দুটো নৌকা নিয়ে একদল ফিরে এসেছে আর বাকিরা দ্বীপের বন্দিদেরকে পাহারায় রেখেছে। এটাই স্বাভাবিক হবার কথা।

'মনে অয়-' সে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ অন্য নৌকাটা থেকে চিৎকারের শব্দ ভেসে এলো।

তাদের নৌকায় একটা থেকে অপরটাতে নির্দেশ বিনিময়ের কারণেও চিৎকার করা হয় অনেক সময়, তবে বেশিরভাগ সময় এটা করা হয় আলোর মাধ্যমে। চিৎকারটা কেন ভেসে এলো ঠিক বুঝতে পারল না ওরা।

'এই এক কাম কর, জিগা অগোরে কী অইছে?'

ভেতরে ভেতরে ভীষণ এক অস্থির তো বোধ করতে শুরু করেছে বিশা ডাকাত, নৌকাটা ফিরে আসাটা ভালো লক্ষণ কিন্তু তবুও কেন জানি তার ভেতরে ভেতরে অস্থিরতা কমছে না।

***

লোকটা ওকে গলা চেপে মেরেই ফেলবে, চোখদুটো মনে হয় ছিটকে বেরিয়ে আসবে, হঠাৎ লোকটার হাত কাদার মতো নরম হয়ে গেল, ধাম করে ওর ওপর থেকে পড়ে গেল লোকটা। মাসুম খাবি খেতে খেতে দম নিতে নিতে উঠে বসল। দেখল পাটাতনের ওপরে উঠে এসেছে ওর দলের আরও দুজন, বরখার হাতে একটা বৈঠা, ওটার কোনায় রক্ত লেগে আছে। ওই বাড়ি মেরেছে লোকটাকে। 'আমি ঠিক আছি। জলদি জলদি,' ওরা বাকিরাও তরতর করে উঠে এলো। সবার সামনে লাঠি হাতে এগোল মাসুম, বেশি এগোতে হলো, প্রথমেই চোখে পড়ে গেল লাঠি হাতে এগিয়ে আসতে থাকা এক ডাকাতের, ওদেরকে দেখেই তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। সেই সাথে দৌড়ে গেল ভেতরের দিকে।

'জলদি চলো, ওরা ঠিক হবার আগে আমরাই আক্রমণ চালাবো; আর লুকায়ে লাভ নাই,' ওরা দৌড় দিলো নৌকার মূল কাঠামোর দিকে। প্রথমেই মাসুমের সাথে মোলাকাত হলো ছুটে আসতে থাকা দুই ডাকাতের। দুজনেরই হাতে তলোয়ার, মাসুমের লাঠির সামনে দুটোই টিকতেই পারল না। দুজনের একজন আগে এগিয়ে আসতেই সে তলোয়ার বাগিয়ে ধরতেই মাসুম মাথার ওপরে লাঠি ঘুরিয়ে এত জোরে কনুইতে বাড়ি মারল যে লোকটার হাড় ভাঙার শব্দ শুনতে পেল পরিষ্কার। লোকটা নিজের হাত চেপে ধরার আগেই কপালের ওপরে লাঠির গোড়ার গুঁতো খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল পাটাতনের ওপরে। দ্বিতীয় জন তার মতো ভুল করল না। সে মাসুমের দিকে চোখ রেখে এগিয়ে এলো সাবধানে। সামনে বাগিয়ে ধরে আছে তলোয়ার, মাসুম ওর আশপাশে চিৎকার চেঁচামেচি আর মারামারি টের পাচ্ছে কিন্তু সে সম্পূর্ণ মনোযোগ ধরে রাখল প্রতিপক্ষের ওপরে, লোকটার তলোয়ার ধরার

ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারছে সে দক্ষ যোদ্ধা। লোকটা একটা পা বাড়িয়েই আক্রমণ চালাল মাসুমের ওপরে। লাঠির মারামারিতে প্রধান একটা পন্থা হলো আগে আক্রমণ চালানো কিন্তু লোকটা আগে আক্রমণ করাতে মাসুম সেই সুবিধা পেল না। বরং আগে তার তলোয়ারের আঘাতটা ঠেকাতে হলো, সেটাকে ঠেকাতে গিয়েই সোজা দু-টুকরো হয়ে গেল হাতের লাঠিটা। মাসুম একটা টুকরো ফেলে দিয়ে পিছিয়ে গেল দুইপা, লোকটা এগিয়ে সেটা সে পাটাতনের ওপরে গড়ান দিয়ে লোকটার তলোয়ার ধরা হাতটা চেপে ধরে ভাঙা লাঠির চোখা অংশটা বসিয়ে দিলো লোকটার মুখের ওপরে। প্রণপণে চেঁচিয়ে উঠতেই তাকে ধরে সোজা পানিতে ফেলে দিলো মাসুম। ঘুরে দাঁড়িয়েই দেখল নৌকার পাটাতনের ওপরে রীতিমতো খণ্ড যুদ্ধ চলছে। মাসুম সেখান থেকে রওনা দিলো নৌকার ভেতরের দিকে। আগে নৌকার মূল অংশ দখল করতে হবে, ভেতরে দিকে যেতে যেতে দুবার দুজনের সাথে মোলাকাত হলে তাদেরকে শুইয়ে দিয়ে মাসুম পৌঁছে গেল মূল নিয়ন্ত্রণের ওখানে। মাঝি আর সাথে এক পাহারাদার হাতে মশাল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মাসুমকে দেখেই মশাল ছুড়ে মারল লোকটা। মাসুম সেটাকে তলোয়ারের ডগা দিয়ে সরিয়ে দিলো একপাশে। মশালটা টুপ করে পাটাতন টপকে পনিতে পড়ে গেল। মাসুম এগিয়ে গিয়ে লোকটাকে আক্রমণ চালাল।

লোকটা ছুরি হাতে তেড়ে এলো মাসুমের দিকে, তলোয়ার দিয়ে তার পেট ফাঁসিয়ে দিলো। লোকটা পাটাতনে পড়ে যেতেই মাঝি লোকটা হাউমাউ করে উঠল। তাকে নির্ভয়ে নৌকা চালাতে বলে সে ফিরে এলো পাটাতনের ওপরে বেশিরভাগ ডাকাতই হয় ধরা পড়েছে আর না হয় মারা পড়েছে। ওরা পুরা নৌকা চষে ফেলল। ওদের ঝটিকা আক্রমণ সফল হয়েছে, হঠাৎ আক্রমণ চালানোতে সওদাগরিটা দখল করতে বেশি বেগ পেতে হয়নি।

‘ওস্তাদ, সব বন্দি অইছে,’ সুলতান এসে বলল। ‘আমগো আরও একজন মারা পড়ছে।’ আছে আর সাত জন মাসুম মনে মনে হিসেব করল।

‘ঠিক আছে, সবাইরে ডাকো,’ বলে মাসুম। ‘আমগো দ্বিতীয় ধাপ হইছে কিন্তু আরও একটা কাম এহনো বাকি,’ বলে সে জালিয়াটা দেখাল। ‘আমরা যেই সরতে শুরু করব ওইটা পিছে লাগব, কাজেই পলানির আগে ওইটার কিছু করতে অইব।’

‘কিন্তু সেইটা ক্যামনে করবা, বাঙালি?’ রায়েলি জানতে চাইল। মাসুম দেখল এই প্রথম মেয়েটাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। যতই শক্তিশালী আর শক্ত হোক সবাই ক্লান্তি আর উত্তেজনার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে।

‘উপায় আছে, আমি যা বলি মন দিয়া শোনো। প্রথমে মেহের আর তার জিনিসপত্র ভিতরে নিয়া যাও। তার সাথে একজন থাকবা। সেরা তিরন্দাজ আর

বর্শা ছুঁড়তে পারে এমন দুইজনরে নিয়া সুলতান থাকবা নৌকার সামনে। আমার সাথে একজন আসো।' এরপরে সে বুঝিয়ে দিলো কী করতে হবে। 'ওরা এখনও নৌকা নিয়া আগায় নাই, তবে সন্দেহ অবশ্যই করছে। এখনও সুযোগ আছে আমগো। চলো জলদি।'

***

'ঘটনা কী? আমরা ইশারা করলাম ওরা কোনো উত্তর দিলো না। তার উপরে আবার চিৎকারের শব্দ শুনলাম, হইতাছেডা কি অই নৌকায়?' বিশা ডাকাত গোঁফে মোচড় দিতে দিতে একবার আকাশের দিকে দেখল। বেলা শুরু হতে আর দেরি নাই যেকোনো সময় আকাশ পরিষ্কার হতে শুর করবে।

'হুজুর, আমরা কি ওইদিকে আগাবো?'

বিশা ডাকাত আসলে বুঝতে পারছে না ঠিক কী করা উচিত, কারণ তার পরিকল্পনা ছিল দ্বীপে যা হবে সেখান থেকে লোকেরা চলে এলে ওরা সোজা দ্বীপে যাবে; কিন্তু সেখানে প্রথমে লোক এলো কম, তার ওপরে এই নৌকা থেকে কোনো পরিষ্কার জবাব দিচ্ছে না। এখন আবার বিশা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কী করতে হবে।

'চল, আমরাই আগাব ওইদিকে–'

কিন্তু সে কথা শেষ করতে পারল না, আবছা ধূসর অলোতে দেখতে পেল ওই নৌকাটাই এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

'হুজুর, ওরাই আগাইয়া আসতেছে আমগো দিকে।'

কেউ একজন কথাটা বলার সাথে সাথে স্বস্তির একটা পরশ বয়ে গেল তার শরীরে। যাক অবশেষে ওরা আসছে।

***

'সব প্রস্তুত?' প্রশ্নটা করল মাসুম বরখাকে উদ্দেশ্য করে, বরখা সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর সে নিজে এসেছে মাসুমের কাছে সব জানাতে। বরখা সব প্রস্তুতি জানানোর সাথে সাথে সে ইশারা করল মাঝির দিকে। সামনের নৌকাটাকে দেখাল, 'সমস্ত গতি দিয়া ওইটার দিকে আগাবা,' বলে সে বরখার দিকে ইশারা করতেই বরখা তলোয়ার বের করে ঠেকাল মাঝির গলার কাছে, 'একটু উলটাপালটা করলেই কল্লা নামায়া দেওয়া অইবে। কাজেই সাবধান। অন্যের কারণে নিজের জীবন

হারাইয়ো না। কী করবা মনে আছে তো?' লোকটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাথা নেড়ে জানাল সব পরিষ্কার মনে আছে তার।

'সাবাস, এইবার গতি বাড়াও,' মাসুমের পরিকল্পনা পরিষ্কার প্রথমে ধীরে এগোতে থাকবে তারপর গতি বাড়বে, সবশেষে, দেওয়া হবে সবচেয়ে বড়ো ধামাকা। মাসুম দেখল নৌকার গতি বাড়তে শুরু করেছে। 'যারা বৈঠা চালাইতাছে তাগোরে জোরে চালাইতে কও।'

জালিয়াটা আর দুইশো গজ দূরে, মাসুম দেখল ওই নৌকার পাটাতনের ওপরে লোকজন ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি করছে। ওরা টের পেয়ে গেল নাকি! কিছু করার নেই, ওদের নৌকার গতি বাড়তে শুরু করেছে। একশো, নব্বই, আশি, সত্তর...

'এইবার,' মাসুম চিৎকার করে উঠল।

নৌকার পাটাতনে মাস্তুলের কাছে একটা কাঠের ভারে বিচিত্র শব্দ করে উঠল, ধুপধাপ মাস্তুল থেকে নেমে এলো মোটা কাপড়ের বান্ডিলের মতো। ওটা শূন্যে মেলে ধরতেই বেলুনের মতো ফুলে উঠল ওটার একটা পাশ, সাথে সাথে নৌকা জ্যা মুক্ত তিরের মতো ছুটতে শুরু করল। আর শ'খানেক গজ দূরত্ব। বিশার নৌকাটা চাইলেও আর ফেরাতে পারবে না। আঘাত লাগবেই।

বিশার জালিয়ার পাটাতনে থাকা লোকেরা দেখতে পেল সওদাগরিটা এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। হঠাৎই গতি বাড়তে শুরু করল ওটার। তারপর হুট করেই গতি আরও বেড়ে গেল ওটার, বাড়তেই থাকল, কেউ একজন চেঁচিয়ে থামতে বলল ওটাকে। কিন্তু সওদাগরিটা থামল তো না-ই বরং হঠাৎ করেই খুলে গেল ওটার পাল, ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে নৌকাটা, জালিয়ার মাঝি পাশ কাটানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করল ওটাকে একপাশে ঘুরিয়ে এড়িয়ে যাবার কিন্তু তাতে ফল হলো আরও উলটো। সওদাগরিটার সামনের চোখা গলুইটা এসে ওটার একপাশে তীব্র আঘাত করতেই মড়মড় শব্দ করে একপাশে কাত হয়ে গেল বিশা ডাকাতের জালিয়া।

মাসুম নিজের লোকদের চিৎকার করে নির্দেশ দিলো কাউকে দেখতে পেলেই আঘাত করতে। সাথে সাথে সুলতানের নেতৃত্বে থাকা তিনজন তির আর বর্শা ছুড়েই শুয়ে পড়ল পাটাতনের ওপরে।

আঘাত করে নৌকাটা একপাশে কাত হয়ে যেতেই উলটো দাঁড় বাইতে শুরু করল ওরা। খানিকটা পিছিয়ে এসে একপাশে এগিয়ে সোজা করে ফেলল ওরা সওদাগরিটাকে। মাসুমের নৌকাটাকে একপাশ দিয়ে এগিয়ে কাত হতে থাকা জালিয়াকে ছাড়িয়ে এলো ওরা বেশ অনেকটা। মাসুমের নৌকা থেকে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল সবাই, খুশির চিৎকার। অসম্ভবকে সম্ভব করার চিৎকার।

আরও খানিক দূরে সরে আসার পর মাসুম নৌকার গলুইয়ের ওপরে এসে দাঁড়াল। নিজের দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে দেখতে পেল জালিয়াটা ডুবে না গেলেও একপাশে আঘাত পেয়ে কাত হয়ে আছে, নৌকার পাটাতনের ওপরে দাঁড়িয়ে ফুঁসতে থাকা একজন লোককে সে দেখতে পেল না। লোকটাকে দেখতে পেলে সে হয়তো খানিকটা শঙ্কিত হতো। কিন্তু মনে মনে অল্প সময়ের জন্যে হলেও খুশি হয়ে উঠল মাসুম। একাধিক অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছে ওরা একরাতে। এবার পালাতে হবে।

কিন্তু সে জানে না, পালানো তার কপালে নেই।

অধ্যায় ত্রিশ

বর্তমান সময়

পানাম নগর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

'তুমি ঠিকই বলেছিলে–এই পয়েন্টগুলো আসলে কূপই, কিন্তু এই লাইনআপটা কীসের ঠিক বুঝতে পারছি না,' বলে প্রফেসর হামিদ একবার বাকিদের দিকে দেখে নিয়ে ফিরে তাকাল সামনের দিকে। ওরা পানাম নগরের এক পুরনো ভবনের আঙিনাতে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে বেশিরভাগ ভবনগুলোর আকৃতি প্রায় কাছাকাছি। অন্তত যেসব ভবন একই সময়ে কাজ করেছে সেগুলোর আকৃতিও মোটামুটি একই ধরনের। বেশিরভাগ বাড়িগুলোই বাহির বাড়ি সেটাকে ঘিরে ভেতরে আঙিনা, আর আঙিনার অন্যপাশে ভেতরের বাড়ি। এরকম একটা বাড়ির আঙিনাতে দাঁড়িয়ে ওটার কূপের সামনে প্রফেসর ম্যাপটা মেলে বোঝার চেষ্টা করছে কিছু একটা।

'একটা বিষয় কি খেয়াল করেছেন–'

চৌধুরী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই হঠাৎ প্রফেসর হামিদ প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'সর্বনাশ!' সে এতটাই জোরে চিৎকার করেছে যে সবাই চমকে উঠেছে। 'কী ব্যাপার, কোনো সমস্যা? কেউ একজন প্রশ্ন করল। ওরা নিজেদের মতো কাজ করছে বাশার বাড়ির বাইরের দিকে তাকিয়ে বলতে গেলে এক ধরনের পাহারায় রেখেছে বাকিদেরকে। সেও চমকে উঠেছে প্রফেসরের চিৎকার শুনে। 'প্রফেসর, আপনি ঠিক আছেন?' সে চেঁচিয়ে জানতে চাইল।

'আমি ঠিক আছি, ওহহ সরি! আমি আসলে সবাইকে চমকে দিতে চাইনি,' বলে সে সামান্য লজ্জার হাসি দিলো।

'কী বুঝতে পেরেছেন আপনি বলেন তো?' পৃথা জানতে চাইল।

'সেটাই, বিয়ষটা এমনভাবে মাথায় এলো আমি আসলে নিজেকে সামলাতে পারিনি। এই পানাম নগরীকে ঘিরে একটা মিথ প্রচলিত আছে,' বলে সে কাঁধ ঝাঁকাল। 'আসলে শুধু এই পানামকে ঘিরে নয় বরং বলতে গেলে যে-তিনটে নগরের কথা বলেছিলাম সেগুলো নিয়ে একটা মিথ প্রচলিত আছে। কেন জানি ম্যাপটা দেখে মনে হলো সেই মিথটা সত্যি হলে হতেও পারে।

'মিথটা কী সুড়ঙ্গ নিয়ে?' চৌধুরী ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইল।

'এক্স্যাক্টলি,' তালি দিয়ে উঠল প্রফেসর। 'আগেই বলেছি এই নগরগুলো ছিল ব্যবসায়ীদের কেন্দ্র কিংবা রাজনৈতিক নেতাদের প্রধান বাণিজ্য অথবা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। আর আগের দিনে এসব জায়গাগুলাতে যা হতো প্রায়ই শত্রুর আক্রমণ হতো, ওদেরকে লুকিয়ে পালাতে হতো কিংবা এরকম আরও অনেক ব্যাপার ছিল। প্রচলিত অছে এই তিনটে নগরের কাছাকাছি অবস্থানের পেছনে অন্যতম একটা কারণ হলো এই তিনটে নগরই নাকি মাটির নিচ দিয়ে কানেক্টেড।'

'মানে এইখানে পাতালের সুড়ঙ্গ আছে?' পৃথা প্রশ্ন করল।

'হুম, এই দেখ,' বলে সে ম্যাপটা চোখের সামনে তুলে ধরল। 'এই দেখ এই ডটগুলোকে যদি আমরা কূপ ধরে নেই এবং দেখ এই ডটগুলোকে কানেক্ট করেছে নিচে আউটলাইনটা,' বলে সে আবারও জোরে একটা তালি মারল। 'এতদিন ধরে এই এলাকাতে আছি এই মিথটা স্রেফ শুনেই আসছি, কাজেই এটা দেখার সাথে সাথে আমার বোঝা উচিত ছিল। আচ্ছা যাকগে, এখন তো ধরতে পেরেছি । আমি প্রায় সেন্ট পারসেন্ট নিশ্চিত এগুলো পাতালেরই সুড়ঙ্গ। যদি তাই হয়–' বলে সে ওদের দিকে তাকাল, '–এটা দারুণ একটা অবিষ্কার হবে। এখন পর্যন্ত এটা কেউ বের করতে পারেনি।'

'আপনার কি ধারণা প্রফেসর ইফতেখার বা ইলা ম্যাডাম এটাকে বের করতে পেরেছিলেন?'

'সে তো আমি জানি না, তবে কেউ একজন তো পেরেছিল সেই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই,' বলে সে কাঁধ ঝাঁকাল। কিন্তু প্রশ্ন হলো সুড়ঙ্গটা বের করব কীভাবে? এই নগরে শত শত কূপ আছে, কোনোটা ধরে কীভাবে কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না ম্যাপটা থেকে।'

'দেখি,' বলে ম্যাপটা নিজের হাতে নিয়ে নিলো চৌধুরী। 'আমরা এখন কোন জায়গায় আছি?'

'আমরা আছি কাশীনাথ বাড়ি মানে এই এলাকার সবচেয়ে বড়ো বাড়িগুলোর একটার কাছাকাছি।'

'এখানে আছি আমরা,' চৌধুরী মনোযোগ দিয়ে দেখে বোঝার চেষ্টা করছে।

'আচ্ছা মিথটা কী নিয়ে বলেন তো?'

'মানে এরকম প্রচলিত আছে যে এখানে যে সুড়ঙ্গ আছে সেটা দিয়ে তিনটা নগরীই একটা আরেকটার সাথে সংযুক্তে এবং–'

'এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে, যদি পালানোই উদ্দেশ্য থাকে তবে দুটো ব্যাপারের সাথে সুড়ঙ্গের সংযোগ থাকবে। একটা হলো সম্পদ বা অর্থ, আরেকটা

হলো পালানোর ব্যবস্থা। আর এটা যেহেতু পাতালের সুড়ঙ্গ, জোরদার সম্ভাবনা আছে এটা কোনো-না-কোনোভাবে ওয়াটার বডির সাথে কানেকটেড থাকবে আর এখানে তো বেশ কিছু ওয়াটার বডি আছে।'

'তোমার পয়েন্ট ঠিক আছে,' প্রফেসর হামিদ বলে উঠল। 'এমনও হতে পারে ওরা কোনোভাবে কাছের মেঘনার সাথে সংযুক্ত কিংবা খালগুলোর কোনো একটা সে-সময় হয়তো কানেক্টেড ছিল। কিন্তু ওতে আমাদের খুব একটা লাভ হবে না। আর কূপ ধরে বের করতে গেলে এই নগরে কতগুলো কূপ আছে কে জানে,' সে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

'আর পৃথার দ্বিতীয় পয়েন্টটা?' চৌধুরী বলে উঠল। 'এমনকি হতে পারে শহরের কেন্দ্র বা মূল কোনো গুদাম বা সব টাকা পয়সা বা সম্পদ রাখা থাকত এমন কোনো পয়েন্ট আছে, হয়তো সেটার সাথে কানেক্টেড থাকতে পারে।'

প্রফেসর হামিদ চিন্তা করছে। 'ঠিক সেরকম কিছুর কথা তো জানি না,' বলে সে মুখ উজ্জ্বল করে ওদের দিকে তাকাল। 'তবে একটা ব্যাপার আছে। এখানে একসময় একটা টাকশাল ছিল, মানে যেখানে টাকা বানানো হতো,' বলে সে আবারও তালি দিলো উত্তেজনায়। 'ওটা হবার একটা সম্ভাবনা আছে,' বলে সে ম্যাপটা আবারও তুলে ধরল।

'হিসেবও মিলে যায়, টাকা সম্পদ এবং–' বলে নিজের কাঁধ ঝাঁকাল পৃথা। 'ওটা এখান থেকে কতদূরে?'

'খুব বেশি দূরে না, চল দেখি,' বলে প্রফেসর হামিদ বাকিদেরকে নিয়ে রাস্তায় চলে এলো। পৃথা, চৌধুরী আর প্রফেসর আলোচনা করতে করতে এগোচ্ছে, সোহেলকে শিস দিয়ে ওর দিকে ডাক দিলো বাশার, 'শোনো,, ওরা ওদের কাজ করুক আমাদেরকে সাবধানে থাকতে হবে।'

সোহেল চোখ তুলে তাকাল বাশারের দিকে। 'বস, তুমি কী কোনো বিপদের আশঙ্কা করছ?'

'অবশ্যই করছি, সাবধানে থাকিস। তুই সামনে চলে যা আমি পেছন থেকে নজরে রাখছি।'

'ওকে, বস,' বলে সোহেল এগিয়ে যেতেই বাশার একটা সিগারেট ধরিয়ে পেছনে হাঁটতে লাগল। বাকিরা অনেক দূরে এগিয়ে গেছে বাশার সিগারেট ধরিয়ে বেশ ধীর গতিতে হাঁটতে লাগল। সরাসরি সে কোনোদিকে তাকাচ্ছে না। আসলে তার নজর পুরোপুরি রাস্তার ওপরে। শুধুমাত্র চোখ দিয়ে দেখছেই না, সিগারেট টানতে টানতে বাশার কিছু ব্যাপার অনুধাবন করার চেষ্টা করছে। ঠোঁট থেকে সিগারেটটা নামিয়ে হাতে নিয়ে বাঁহাতে মোবাইলটা বের করে আনল, এখনও সে রাস্তায় এমনভাবে হাঁটছে যেন কোনো টুরিস্ট বেড়াতে এসে মুগ্ধ হয়ে চারপাশের

পুরনো ভবনগুলো অবলোকন করছে। বাশার মোবাইলে একটা বিশেষ নম্বরে কল দিয়ে কথা বলতে শুরু করল। কথা বলার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সানগ্লাসের ভেতর থেকে নজর রাখছে সে চারপাশে, সেই সাথে এগিয়ে চলেছে ওরা যেদিকে গেছে সেদিকে। দুটো ভবন পরেই সামনে বাঁক নিয়েছে রাস্তাটা। বাশার খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলতে বলতে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাঁকটার কাছাকাছি পৌঁছে সে দাঁড়িয়ে গেল। মোবাইলে কথা বলতে বলতে খুব সাবধানে নজর বুলাচ্ছে চারপাশে। মোবাইলে কথা শেষ করে বাশার এমনভাবে হাত নাড়তে লাগল যেন মোড়ের ওপাশ থেকে কেউ তাকে ডাকছে এবং তার ডাকে সাড়া দিয়ে সে হাত নাড়ছে। বাশার চট করেই মোড়ের ওপাশে চলে গেল। কেউ তার ওপরে নজর রাখছে কি না সে জানে না, কিন্তু যদি নজর রাখতই কিংবা তাকে অনুসরণ করত তবে বাঁকের ওপাশে গেলে দেখতে পেত মানুষটা খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চট করে ওপাশে গিয়েই যেন গায়েব হয়ে গেছে।

***

'এইটা!' সামনের ভবনটার দিকে তাকিয়ে পৃথা মোটামুটি হতাশার সুরে বলে উঠল। কারণ আগের যে-ভবনগুলো ওরা দেখেছে কিংবা কাশীনাথ ভবন নামে যে-বাড়িটার ভেতরটা ওরা পরখ করছিল সেটার অবস্থাই অনেক ভালো ছিল, বলতে গেলে মানুষ বসবাস করার মতোই প্রায় কিন্তু টাকশাল বলে প্রফেসর হামিদ ওদেরকে যেখানে নিয়ে এসেছে সেটার অবস্থা বেশ কাহিল। এটাতে মানুষ থাকার মতো অবস্থা তো নেই, বলতে গেলে প্রায় ভেঙেই পড়েছে, এমনকি দরজা জানালাও নেই। 'এখানে কি আদৌ কিছু পাবার আশা করা যেতে পারে?' পৃথা নিচের ঠোঁটটা টান দিয়ে ছেড়ে দিলো হতাশ ভঙ্গিতে।

'আমি বুঝতে পারছি তোমরা এখানে এসে হতাশ বোধ করছ,' প্রফেসর হামিদ খানিকটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে উঠল। 'কিন্তু এখানে একটা আশার ব্যাপারও আছে,' বলে সে আবারও ম্যাপটা তুলে ধরল চোখের সামনে। 'এখানে দেখো,' বলে সে ম্যাপের একটা জায়গায় নির্দেশ করল। 'এই যে খাল আর পুকুরগুলো দেখছ, ভালোভাবে খেয়াল করে দেখো। এগুলো অনেকটা আউটলাইনের মতো করে সাজানো এবং এগুলোর সাথে নিচের আউটলাইনের একটা সংযোগ আছে, যদি ডটগুলোকে মিডিয়াম ধরি তাহলে এটা শহরের যে-অংশের দিকে নির্দেশ করে, সেটা কিন্তু এদিকেই,' বলে সে চৌধুরী আর পৃথার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। 'এই বাড়িটার ভগ্নদশা কিন্তু আরও একদিক থেকে আমাদের কাজের জন্যে পজিটিভ একটা ইঙ্গিত দেয়,' সে তাকিয়ে আছে চৌধুরী আর পৃথার দিকে।

'কী সেটা?' প্রফেসর যত কথাই বলুক না কেন, পৃথাকে দেখে খুব বেশি আশাবাদী মনে হচ্ছে না বাড়িটার দিকে তাকিয়ে।

'দেখো, এই বাড়িটার এই ভগ্নদশার কারণ কী হতে পারে?' সে প্রশ্ন ছুড়ে দিলো দুজনার দিকে।

'টেইক কেয়ার করা হয়নি ঠিকমতো,' চৌধুরী বলে উঠল, সে প্রফেসরের পয়েন্ট ঠিক ধরতে পারছে না।

'আর কী কারণ হতে পারে?' প্রফেসর তার সন্তুষ্টিমূলক জবাব পায়নি।

পৃথা মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছে বাড়িটার দিকে। সে প্রফেসরের পয়েন্ট বোঝার চেষ্টা করছে। 'বাড়িটা অনেক বেশি পুরনো, অন্য বাড়িগুলোর তুলনায়, এটাও বাড়িটার ভগ্নদশার একটা কারণ।'

'তুমি অনেকটাই কাছাকাছি যেতে পেরেছ আমার লজিকের,' বলে প্রফেসর হামিদ তালি দিয়ে উঠল। উত্তেজিত হলেই বাচ্চাদের মতো তালি দিয়ে ওঠা লোকটার অভ্যাস মনে হয়। প্রফেসর তালি দিয়ে ম্যাপটায় একটা টোকা দিয়ে যোগ করল। 'এই ম্যাপটায় যা যা নির্দেশ করা আছে সেগুলোও আসলে অনেক পুরনো নির্দেশনা এবং জোরদার সম্ভাবনা আছে ম্যাপটা এই নগরীর একেবারে পুরনো স্থাপনাগুলোর সাথে সংযুক্ত কোনোকিছুই নির্দেশ করছে। কাজেই–' বলে সে আবারও কাঁধ ঝাঁকাল।

'চলুন, খোঁজা শুরু করি,' চৌধুরী বলে উঠল। 'সারাদিন আলোচনা করেও কোনো লাভ হবে না যদি কাজে লাগানোর মতো কিছু পাওয়া না যায়।'

'কী ব্যাপার, কী হচ্ছে?' ওদের পেছন থেকে সোহেল বলে উঠল। সে বাশারের সাথে কথা বলতে গিয়ে আলোচনার আগের অংশ মিস করেছে।

'আমরা খোঁজ শুরু করতে যাচ্ছি,' পৃথা বলল। 'আপনিও আমাদের সাথে হাত লাগানো।'

'পারটিকুলারলি কী খুঁজতে হবে?' সোহেল একে একে তিনজনের দিকে দেখল। তার প্রশ্ন শুনে পৃথা আর চৌধুরীও ফিরে তাকাল প্রফেসর হামিদের দিকে। একই প্রশ্ন ওদের মনেও।

প্রফেসর ভ্রু কুঁচকে জবাব দিলো। 'প্রথমত যদি বাড়িতে কোনো কূপ থাকে, সেগুলোকে ভালোভাবে খুঁজে দেখবে। আর বাড়ির মূল অংশসহ আশপাশেও ভালোভাবে নজর রাখবে যাতে করে যদি নিচের দিকে কোনো সংযোগ থাকে তবে সেটা যেন খুঁজে বের করা যায়। বুঝেছো?' বলে সে সবার দিকে তাকাল। 'ও আচ্ছা, সবাই পরস্পরের দিকে নজর রাখবে এবং চলাচল করবে সাবধানে। এসব পুরনো জায়গায় অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়। আর যদিও এখন শীতের সময়, সাপখোপের ভয় অবশ্য তেমন নেই, তবুও সবাই খুব সাবধান। চলো,' বলে সে

বাড়িটার দিকেই এগোতে বাকিরাও তার সাথে সাথে এগোল। সবাই মিলে ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে শুরু করল। প্রথমেই ওরা চলে এলো বাড়িটার ভেতরে ঢুকতেই প্রথম যে কূপটা চোখে পড়ল ওটার সামনে, ওরা কূপটাকে ঘিরে দাড়িয়ে নিচে তাকিয়ে বুঝতে পারল এটা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ পুরো কূপটাই মাটিতে ভরে আছে। 'এইটাতে নাই, আর থাকলেও লাভ নাই,' চৌধুরী বলে উঠল। কেউ জবাব দিলো না কারণ, যদি সুড়ঙ্গ থাকেও এবং এটার সাথে সেটার সংযোগ থাকে তবে তাতে কোনো লাভ নেই, এটা থেকে মাটি সরিয়ে সেটা বের করতে আর্মি লাগবে। ওরা বাড়িটার আঙিনায় ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে শুরু করল। এই বাড়িটা অন্য বাড়িগুলোর মতো নয়। দেখলেই মোটামুটি বোঝা যায় এটা বসতবাড়ি ছিল না। যদিও অনেককিছুই ভেঙে পড়েছে তাও বাড়িটার আকৃতি দেখলে বোঝা যায় বাড়িটা অনেকটা ব্যারাকের মতো ছিল। 'এটা মূল কার্যক্রম কেন্দ্র,' প্রফেসর সামনের মূল আকৃতিটা দেখাল। 'আর এগুলোতে মনে হয় শ্রমিকেরা থাকত, মানে যারা কাজ করত আরকি টাকশালে।' আর বাসস্থানগুলোকে দুপাশে রেখে মাঝে কূপটা। যখন সব চালু ছিল তখন এটা থেকে শ্রমিকেরা পানিপানসহ দৈনন্দিন কাজকর্ম করত। ওরা পুরো আঙিনাটা চষে কিছুই পেল না, সবাই মিলে এসে দাঁড়াল টাকশালের মূল কার্যকেন্দ্রের সামনে। 'দেখা যাক এখানে কিছু পাওয়া যায় কি না,' ওরা খানিকটা ক্লান্ত বোধ করলেও প্রফেসরের গলায় কেন ক্লান্তি নেই। তাকে ছোটো বাচ্চাদের মতো উৎফুল্ল মনে হচ্ছে, ছোটো লাফ দিয়ে সে ভাঙা সিঁড়ির ধাপগুলো পার হয়ে বারান্দার মতো জায়গাটায় উঠে চট করে ঢুকে পড়ল টাকশালের মূল ভবনটার ভেতরে। পৃথার দিকে তাকিয়ে চৌধুরী একবার কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর সে নিজেও ঢুকে পড়ল ভেতরে। কিন্তু ভেতরের চিত্র মোটেই আশা জাগানোর মতো কিছু নয়। ভেতরে বলতে গেলে প্রায় কিছুই নেই, শুধুমাত্র ভেতরের বিরাট আকৃতিটা বাদে। দেখলেই বোঝা যায় একসময় এখানে বিরাট কর্মযজ্ঞ চলত। বিরাট বিরাট আকারের কামরা কিন্তু এখন বলতে গেলে কিছুই নেই। কামরার ভেতরে দেওয়াল থেকে খসে পড়া ইটের টুকরো আর ময়লা ছাড়া বলতে গেলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হলো মেঝেতে জায়গায় জায়গায় চারকোনা আকৃতি, সেগুলো খুব মনোযোগের সাথে দেখছিল চৌধুরী। পৃথা তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই সে বলে উঠল, 'এসব জায়গাগুলোতে মনে হয়–'

'টাকশাল চালুর সময়ে টাকা বানানোর মেশিনপত্র ছিল,' পৃথা আশপাশে দেখতে দেখতে চৌধুরীর বাক্যটা সমাপ্ত করে দিলো। 'কিন্তু এখন তো এখানে কিছুই নেই, প্রফেসর–' এবার সে তার কথা শেষ করতে পারল না, তার আগেই টাকশালের ভেতর থেকে প্রফেসরের উত্তেজিত চিৎকার শোনা গেল। চৌধুরী আর

পৃথা দুজনেই সেদিকে দ্রুত এগোল। দুটো একইরকম দেখতে কামরা পার হয়ে ওরা চলে এলো ভেতরের কামরার দিকে। সেখানে প্রফেসর মেঝের কাছে দাঁড়িয়ে কিছু একটা দেখছে।

'কী ব্যাপার কী হয়েছে? কিছু পেয়েছেন?' চৌধুরী উত্তেজিত ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল তার দিকে। সে তাকিয়ে আছে প্রফেসর যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে। মেঝেতে একটা ভাঙা চারকোনা আকৃতির পাশেই গোল গর্তের মতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে, সেটার দিকে বেশ উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্রফেসর। পৃথা এগিয়ে গেল সেটার দিকে।

'আচ্ছা, বলো তো এটা কী?' গোল গর্তের মতো জিনিসটার দিকে দেখিয়ে প্রফেসর হামিদ জানতে চাইল। পৃথা এবং চৌধুরী দুজনেই তাকিয়ে আছে ওটার দিকে কিন্তু দুজনার কেউই আসলে বুঝতে পারছে না জিনিসটা কী। পৃথা মুখ খুলতে যাবে তার আগেই পাশের কামরায় পদশব্দ শোনা গেল। দরজায় উঁকি দিলো সোহেল, 'কী ব্যাপার, কিছু হয়েছে নাকি?' বলে সে প্রফেসরের দিকে দেখল। 'চিৎকার শুনলাম বলে মনে হলো তাই দেখতে এলাম,' সে ওদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকাল সেই গর্তের মতো জিনিসটার দিকে। 'কী ওটা?' কৌতূহলের সাথে জানতে চাইল সে-ও।

'তুমি আসার আগে ঠিক এই প্রশ্নটাই করেছিলাম আমি ওদেরকে,' ভ্রু নাচিয়ে বলে উঠল প্রফেসর। 'বলো দেখি কী ওটা?'

'আমার কাছে তো একটা ভাঙা-চোরা গর্ত ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না,' সোহেলের সরল স্বীকারোক্তি।

'পুরনো কোনো কূপ হতে পারে,' চৌধুরী বুকের ওপরে দুই হাত ভাঁজ করে বলে উঠল। সে বোঝা চেষ্টা করছে প্রফেসর আসলে কী বলতে চাইছে। 'কিন্তু ঘরের ভেতরে কূপ আসবে কোথা থেকে?'

'এটা মূল সমস্যা না,' বলে প্রফেসর হমিদ বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে মাটিতে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে, 'একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো। এই বাড়ি, মানে পুরনো টাকশালটার আমরা যত ভেতরের দিকে এসেছি এটা তত নিচের দিকে নেমে গেছে। মানে বাইরের কামরার তুলনায় এই ভেতরের কামরাটা অনেক বেশি নিচু।'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা পুরোপুরি ধরতে না পারলেও, আমার কাছেও এমনটা মনে হচ্ছিল,' পৃথা বলল।

'এক্স্যাক্টলি,' প্রফেসর তুড়ি বাজিয়ে বলে উঠল। 'কেন এমনটা হবে? আমার জ্ঞান যা বলে তা হলো এসব টাকশালগুলো যখন চালু ছিল সেগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুব শক্ত ছিল এবং ভেতরের কামরাগুলোর সাথে অনেক সময় মাটির নিচের কামরা থাকত।'

'অনেকটা ব্যাংকের ভল্টের মতো?' সোহেল জানতে চাইল।

'একদম ঠিক, এই কামরাটাও অনেকটা সেরকমই ছিল, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সব ক্ষয় হয়ে সেসব আকৃতির আর কিছুই নেই শুধুমাত্র নিচু ব্যাপারটা রয়ে গেছে। এখন আমার প্রথম প্রশ্নে ফিরে আসি,' বলে সে চৌধুরীর দিকে ফিরে তাকাল। 'তুমি বলেছিলে কামরার ভেতরে পানির কূপ কেন থাকবে, আমারও একই জিজ্ঞাসা। এরকম একটা জায়গায় পানির কূপ থাকার কোনো কারণই নেই। টাকশালে যদি পানির প্রয়োজনই হয়, বলে সে বাইরের দিকে দেখাল, এখানে খুবই কাছে পুকুর ছিল, ওটার সাথে টাকশালের সংযোগ করে ছোটো একটা নালা কেটে দিলেই পানির জোগান চলে আসবে। কূপ কেন লাগবে, তাও বাড়ির ভেতরে?'

'তারমানে আপনি বলছেন এটা কূপ না?' পৃথা চিন্তিত ভঙ্গিতে জানতে চাইল।

'একদম ঠিক,' বলে প্রফেসর হামিদ ওটার ভেতরের দিকে উঁকি দিলো, 'আমার বিশ্বাস ম্যাপের লোকেশন অনুযায়ী যদি এখানে কিছু থেকেই থাকে তবে সেটার সাথে সংযোগের একটা পথ হতে বাধ্য এই কূপ।'

প্রফেসরের কথা শেষ হবার আগেই সোহেল গর্তটার দিকে এগিয়ে গেল। ওটার ভেতরে উঁকি দিয়ে বলে উঠল, 'খুব বেশি গভীর তো মনে হচ্ছে না, নেমে দেখব নাকি?' বলে সে কারও জবাবের অপেক্ষা না করে লাফ দিয়ে নেমে গেল গর্তটার ভেতরে। নেমে ওটার ওপরে ছোটো ছোটো দুটো লাফ দিয়ে বলে উঠল। 'আজব তো, ওপর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল গর্তটা ভরাট অথচ মাটি বেশ ঝুরঝুরে,' বলে সে নিজের পোশাক কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে নিয়ে, দুই হাতে মাটি জড় করে তুলতে শুরু করল। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল চৌধুরী। সোহেল মাটি তুলে তুলে দিতে লাগল, আর সেগুলোতে তুলে এনে ওপরে রাখতে সাহায্য করতে লাগল চৌধুরী। প্রায় আধা ঘণ্টা টানা কাজ করার পর প্রফেসর জানতে চাইল, 'শুধু কি মাটিই উঠছে নাকি অন্য কিছু–' সে কথা শেষ করার অগেই সোহেল চিৎকার করে উঠল, 'নিচে ঢাকনার মতো কিছু একটা লাগছে,' সোহেলের চিৎকার শুনে সবাই উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু জায়গাটা খুব বেশি চওড়া না, সোহেল কোনোমতে ওটার ওপরে দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে কিছু একটা দেখছে গর্তের ভেতরে। ওরা চারপাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করতেই সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। লালচে মাটি আর বালুতে তার হাত আর কাপড় মাখামাখি। 'নিচে ছোটো একটা ঢাকনার মতো পেয়েছি, কিন্তু জিনিসটা খুব বেশি পুরনো বলে মনে হলো না আমার কাছে,' সে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

'তাই নাকি?' প্রফেসর উত্তেজিত ভঙ্গিতে নিচে দেখার চেষ্টা করছে। 'কেমন ঢাকনা?'

'আচ্ছা, অকারণে কথা বলে লাভ নেই, যা আছে তো আছেই, তুমি কি ওটা খুলতে পারবে?' চৌধুরীও উত্তেজিত ভঙ্গিতে নিচের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইছে।

'পারবো,' বলে সোহেল নিচের হাতাটাকে আরও ভালোভাবে গুটিয়ে নিয়ে পকেট থেকে মোবাইল বের করে চৌধুরীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে ওটার চর্ট জ্বালাতে বলল, সেই সাথে সে পকেট থেকে একটা সুইস নাইফ বের করে আবারও নিচু হয়ে গেল। জায়গাটা এতটাই সরু, সোহেল কাজ করছে চৌধুরী খানিকটা ঝুঁকে চার্টটা ধরে আছে, প্রফেসর আর পৃথা দুজনেই উত্তেজিত হলেও পাশেই দাঁড়িয়ে রইল। কারণ সেভাবে চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই, সেই সরু জায়গাতে কিছুই দেখতে পাবে না ওরা। সোহেল তো নিচে নেমেই গেছে, চৌধুরীও খানিকটা নেমে দুজনে মিলে নিচের থেকে কিছু একটা সরানোর চেষ্টা করছে, ওপর থেকে ওরা দেখতে না পেলেও স্ট্রাগলটা পরিষ্কার বুঝতে পারছে। একটু পরেই নিচ থেকে *কড়াত* মতো একটা শব্দ হলো এবং দুজনেই উল্লাসের সাথে চিৎকার করে উঠল। একটু পরেই চৌধুরী নিচ থেকে একটা গোল ঢাকনার মতো কিছু একটা তুলে আনল ওপরের দিকে। জিনিসটা অনেকটা ম্যানহোলের ঢাকনার চেয়ে আরেকটু বড়ো ভার্সন এবং আকৃততিতেও খানিকটা ভিন্ন যেন। চৌধুরী কাদা ও বালু মাখা হাতে ভারী জিনিসটা তুলে এনে মেঝেতে ফেলে দিলো *ধাম* করে। সাথে সাথে প্রফেসর হামিদ এগিয়ে গেল ওটার দিকে। জিনিসটার ওপর থেকে বালু মাটির মতো আস্তরণটা সরিয়ে সে জিনিসটাকে দেখতে লাগল, পৃথাও ঝুঁকে পড়ল ওটার ওপরে। জিনিসটা ওপর থেকে বালু কাদা সরানোর সাথে সাথে প্রফেসর বলে উঠল, 'এটা তো ধাতব ঢাকনার মতো,' প্রফেসরের পাশ থেকে পৃথা যোগ করল, 'এটা অবশ্যই সে-সময়ের নয়, যে-ধরনের ধাতু এতে ব্যবহার করা হয়েছে সেই সময়ে এগুলো ব্যবহার করা হতো না,' পৃথাও হাত লাগিয়ে ঢাকনাটার ওপর থেকে বালুময় কাদা পরিষ্কার করতে করতে বলে উঠল।

'একদম ঠিক এবং–' প্রফেসর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তাকে কথা শেষ করতে দিলো না পৃথা।

'এক মিনিট প্রফেসর, এটা কী?' বলে সে ধাতব ঢাকনাটার ওপর থেকে ধুলো-বালু পরিষ্কার করতে করতে ওটার ওপরে খোদাই করা একটা সিম্বল দেখতে দেখতে অস্ফুটে বলে উঠল।

'কী?' প্রফেসর বোঝার চেষ্টা করছের পৃথা আসলে কি দেখে চমকে উঠল।

'এই সিম্বলটা–' এবার পৃথা কথা শেষ করার আগেই কূপের ওদিক থেকে চিৎকার ভেসে এলো। প্রফেসর আর পৃথা দুজনেই ফিরে তাকাল সেদিকে।

'আমাদের মনে হয় ওদিকে যাওয়া উচিত,' প্রফেসর উঠে দাঁড়িয়ে সেদিকে এগোল। পৃথাও পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। কূপের নিচের অংশ থেকে বালু, কাদা মাখা চৌধুরী মাথা বের করল। 'জলদি আসুন আপনারা, দারুণ জিনিস আবিষ্কার হয়েছে।'

***

রাস্তা থেকে চট করে সে ঢুকে পড়েছে পুরনো দিনের বাড়িটার ভেতরে। ভেতরে ঢুকে অন্ধকার এক কোনার দিকে সরে গেল বাশার, জায়গাটা ইচ্ছে করেই এমন এমনভাবে বেছে নিলো যাতে করে সে অন্ধকারের ভেতরেও থাকতে পারে আবার সহজে বাইরের রাস্তার দিকেও নজর রাখতে পারে। অন্ধকার কোনের দিকে সরে গিয়ে বাইরের দিকে নজর রেখে সে সাবধানে একটা সিগারেট ধরাল। আনমনেই একবার ঘড়ি দেখল সে। সোহেল এতক্ষণে পৃথা, চৌধুরী আর প্রফেসর হামিদের কাছে পৌঁছে যাবার কথা। তারমানে তারা যা করছে সেটা করার জন্যে যথেষ্ট সুযোগ ওরা পাবে এবং সাথে সোহেল থাকাতে ওরা নিরাপত্তাও পাবে। আর এর ভেতরে তাকে অন্য একটা বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। আর এই বিষয়টার ওপরে ওদের পুরো অপারেশন এবং নিরাপত্তা দুটোই নির্ভর করছে।

সিগারেট টানতে টানতে বাশার বাড়িটার চারপাশে একবার দেখল। এরকম পুরনো বাড়িতে কিংবা জমিদার বাড়িতে এলে ওর খুব অদ্ভুত এক অনুভূতি হয়। এসব বাড়িতে আগে কত ভিন্ন ধরনের মানুষ বসবাস করত। সেই সময়য়ের জীবন-যাত্রা, সেই পুরনো জীবন-যাপন, ভিন্ন পোশাক, ভিন্ন খাবার, ভিন্ন আয়োজন ভিন্ন যাপিত জীবন। ওদের মতো তাদেরও জীবনে ছিল হাজারো সমস্যা, হাজারো সম্ভাবনা, হাজারো উচ্ছ্বাস, ভালোলাগা, মন্দলাগা। অথচ সময়ের ফেরে আজ সব হারিয়ে গেছে। কারও কোনো খোঁজ নেই। সবচেয়ে বেশি অবাক লাগে ভাবতে যে, একদিন ওর সাথেও এমনটাই হবে। এই যাপিত জীবন, হাজারো সমস্যা, সম্ভাবনা কিছুই আর রবে না। যত যাই অর্জন করুক জীবনে, কালের অতলে হারিয়ে যাবে একদিন সব। যদি কিছু টিকে থাকে তবে সেটা হবে একমাত্র সময়। সময় বদলায়, প্রযুক্তি বদলায়; কিন্তু হাজারো বছরের আগে আর পরে, যাপিত জীবনের টানাপোড়েনগুলো সব একই রয়ে যায়, আবেগ আর ভালোবাসাগুলোও এক রয়ে যায়, এটাই হয়তো সময়ের উপাখ্যান।

নিজের ভাবনার অতলে হারিয়ে গিয়ে খানিকটা উদাস হয়ে গেছিল বাশার। হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল ও। যা ভেবেছিল সেটা নিয়ে খানিকটা

সন্দেহ থাকলেও এখন মনে হচ্ছে নিজের মনের গহীনে থাকা ভয়ঙ্কর আর কুৎসিত সন্দেহগুলো সঠিক হতে যাচ্ছে।

***

আধো অন্ধকার গর্তটার ভেতরে উঁকি দিয়ে পৃথা খানিকটা ভয় পেল না সেটা বলা যাবে না। কিন্তু নিচ থেকে আবছা একটা আলো ভেসে আসছে একদিকে, অন্যদিকে আবার বুড়ো প্রফেসর হামিদ তরতরিয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে দেখে সে বেশ খানিকটা সাহস পেল। পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে সে আবার ফিরে তাকাল ঢাকনাটার দিকে। ওটার কাছে ফিরে এসে সেটার ওপরে থাকা সিম্বলটার ছবি তুলে নিলো টপাটপ বেশ কয়েকটা। তারপর ফিরে এসে কূপের ওপরের অংশ টপকে নেমে এলো ওটার নিচের দিকে এবং বেশ অবাক হয়ে লক্ষ করল কূপের অপরের অংশটা যতটা সরু, যত নিচের দিকে নেমে গেছে ওটা তত চওড়া হয়েছে। খানিকটা নেমেই আড়াআড়িভাবে গোল একটা মুখের মতো দেখা গেল। ওটার ওপাশ থেকে হালকা আলো আসছে। পৃথা অনুমান করল এই গর্তটার মুখেই ওই ধাতব ঢাকনাটা লাগানো ছিল। ও গর্তটার মুখের অন্যপাশে তাকাতেই দেখতে পেল ওটার ওপাশে ধাপের মতো কিছু একটা ধরে প্রফেসর হামিদ নেমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, আর তাকে সাহায্য করছে চৌধুরী। প্রফেসর নেমে যেতেই নিচ থেকে সোহেল চিৎকার করে ওকে এগিয়ে যেতে বলল।

গর্তের ভেতরেও নিজের শরীরটাকে কোনোমতে গলিয়ে দিয়ে নিচের দিকে পা বাড়াতেই ওর পা গিয়ে ঠেকল একটা ধাপের মতো কিছুতে।

'আরেকটু নিচে নামলেই পা রাখতে পারবে,' নিচ থেকে চৌধুরী বলে উঠল।

পৃথা নিজের পা'টাকে আরেকটু বাড়িয়ে দিতেই দেখল ওর পা'টা বেশ সুন্দরভাবেই খোপের মতো সেট হয়ে গেলে ধাপের ওপরে। চাপ দিয়ে দেখল বেশ শক্ত, খুব সহজেই ওর শরীরের ভার রাখতে পারবে। অবশ্য সন্দেহের কোনো কারণই ছিল না, একটু আগেই এই ধাপগুলো দিয়ে তিন তিনজন সমর্থ পুরুষ নেমে গেছে নিচের দিকে। পৃথা প্রথম পা'টাকে সাবধানে রেখে পরের পা'টাও বাড়িয়ে দিলো সেদিকে। খুব সহজেই দ্বিতীয় পা'টা ওখানে সেট হয়ে যেতেই শরীরের ভার পুরোটাই চাপিয়ে দিয়ে নিজের শরীরটাকে নামিয়ে দিলো নিচের দিকে। আরও তিন-চারটা ধাপ নিচে নামতেই নিচ থেকে চৌধুরীর বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা ধরে ফেলল ও, চৌধুরীর হাতটা ধরেই নিচে লাফিয়ে নামল মেঝেতে। শরীরটাকে সোজা করে সামনে তাকাতেই খুব অবাক হয়ে দেখল ও সরু করিডোরের মতো একটা জায়গায় নেমে এসেছে ওরা। সবাই বেশ বিস্ময়ের সাথে দেখছে চারপাশ।

'এটাই তবে–' ওর কথাটা শেষ করতে দিলো না সোহেল।

'সোনারগাঁও-পানাম নগরের হারানো পাতাল পথ,' আনমনেই বলে উঠল সে।

'এখনও অবশ্য সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। কারণ এটা স্রেফ বাড়ির নিচে একটা পাতাল কামরাও হতে পারে,' প্রফেসর নিজের মোবাইলের টর্চ লাইট জ্বেলে চারপাশে দেখতে শুরু করেছে।

'এটা বানানো হয়েছিল খুব সাবধানে এবং যত্নের সাথে। কারণ একে তো লোকচক্ষুর আড়ালে ছিলই, সেই সাথে এত পুরনো হবার পরও ওপরের চেয়ে নিচের অবস্থা এখনও অনেক বেটার।'

'কিন্তু ওগুলো কী?'

সোহেলই ব্যাপারটা প্রথম খেয়াল করল। দেওয়ালের জায়গায় জায়গায় ছোটো তির-চিহ্নের মতো এঁকে রাখা হয়েছে। 'এগুলো তো মনে হচ্ছে আমাদেরকে সামনে কোনোদিকে এগিয়ে যাবার জন্যে নির্দেশ করছে,' সোহেলও নিজের মোবাইলের টর্চ জ্বেলে সামনে দেখার চেষ্টা করছে।

'এ তো লুমিনাস পেইন্ট মনে হচ্ছে,' পৃথা চিহ্নগুলোর দিকে আলো ফেলে দেখল, আলো পড়তেই ওগুলো চক চক করছে। 'সেই সময়ের লোকে লুমিনাস পেইন্ট আবিষ্কার করেছিল বলে তো মনে হয় না,' সাথে সাথে ওর মাথার ভেতরে খেলে গেল ধাতব ঢাকনাটার কথা এবং ওটার গায়ের ওপরে থাকা সেই সিম্বলটার কথাও। 'এগুলো অবশ্যই পরে কেউ বসিয়েছে এবং,' বলে সে ফিরে তাকাল দলের বাকি সবার দিকে। 'আমার ধারণা ওপরের ওই ঢাকনাটাও তাদেরই বসানো। এগুলো এখানকার প্রাচীন বাসিন্দারা বসায়নি।'

'যাই হোক আর যারাই যাই করে থাকুক না কেন,' প্রফেসর হামিদ ছোটো ছোটো তির চিহ্নগুলো যেদিকে এগিয়ে গেছে সেদিকে দেখাতে দেখাতে বলে উঠল। 'আমাদেরকে এখন এগোতে হবে, তবে সবাই খুব সাবধান।'

***

গাড়ির ভেতরে সে এমনভাবে বসেছিল যেন চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু আসলে সে ঘুমায়নি। কিন্তু তার অধীনে কাজ করতে থাকা ছেলেটা সামনে এসে খানিকটা দ্বিধায় পড়ে গেল। চোখ বন্ধ করে থাকা মানুষটাকে ডাকবে কী ডাকবে না–ঠিক বুঝতে পারছে না।

'বিষয়টা জরুরি, তাই না?' নিজের ক্যালক্যাশিয়ান টানে কথাটা বলে ওঠাতে খানিকটা চমকে উঠল ছেলেটা। আরেকটু হলে তার হাত থেকে ল্যাপটপটা পড়েই যাচ্ছিল। 'জি স্যার, মানে–'

তাকে কথাটা শেষ করতে দিলো না মানুষটা। চোখ বন্ধ অবস্থাতেই সে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিলো ছেলেটার দিকে। ছেলেটা ল্যাপটপটা নিজের হাতে রেখেই হেডফোনটা ধরিয়ে দিলো মানুষটার হাতে। অভ্যস্ত এবং দ্রুত হাতে সেটাকে পরে নিতেই ছেলেটা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিজের ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে চুপ থাকতে বলল সে। মনোযোগের সাথে হেডফোনের ওপাশ থেকে ভেসে আসা কথাগুলো শুনতে শুনতে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। নিজের চোখে খুলে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল সে। 'কী ব্যাপার, কোনো সমস্যা?' বিষয়টা সে ধরতে পারছে না। হেডফোনের ওপাশ থেকে যা শুনেছে তাতে তার খুশি হওয়া উচিত, সেই সাথে বাকিদেরও। কারণ এতদিন ধরে তারা যা খুঁজে আসছিল সেটার নাগালে পাবার একটা পথ আবিষ্কার হতে যাচ্ছে সম্ভবত, এমন অবস্থায় সবার খুশি হওয়া উচিত কিন্তু সবাই এমন মুখ গোমড়া করে আছে কেন ঠিক ধরতে পারছে না সে।

'স্যার, অন্য একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে,' মুখ অন্ধকার করেই কালো কোটের গার্ডদের একজন বলে উঠল। কালো কোট এখনও তাকিয়ে আছে কিছু বলছে না। অপেক্ষায় আছে গার্ড লোকটা তাকে আরও কিছু জানাবে। কিন্তু গার্ড লোকটা অন্যপাশে দেখে নিয়ে আরও সময় চুপ করে রইল। এবার বিরক্ত হয়ে কালো কোট কথা বলতে যাবে, তার আগেই অন্য আরেক গার্ড মুখ খুলল, 'স্যার, তৃতীয় পক্ষ দেখা দিয়েছে, কোনো-না-কোনোভাবে আমাদেরকে অনুসরণ করে ওরাও চলে এসেছে এখানে।

সাথে সাথে ভ্রু কুঁচকে উঠল কালো কোটের।

অধ্যায় একত্রিশ

সময়: ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ

এগারো সিন্ধু এলাকা, কিশোরগঞ্জ

ঈশা খাঁ বেশ চিন্তিত ভঙ্গিতে নিজের যৌথ বাহিনীর প্রধানদের দিকে ফিরে তাকাল। সাধারণত এতটা চিন্তিত ভঙ্গি তার স্বভাব-বিরুদ্ধ, কিন্তু পরিস্থিতি এমনকি সে নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। নিজের এলাকা থেকে রওনা দিয়ে সে এগারো সিন্ধু পৌঁছেছে খুব বেশি সময় হয়নি। এগারো সিন্ধুতে তার বাহিনী এবং মানসিংহের বাহিনীর ভেতরে রীতিমতো তীব্র যুদ্ধ চলছে বিগত বেশ কয়েকদিন। একাধিকবার মানসিংহ তার বাহিনী নিয়ে দুর্গ দখল করেছে কিন্তু আবার তাদের যৌথ বাহিনীর চাপে পিছিয়ে যেতেও বাধ্য হয়েছে। একদিকে ঈশা খাঁ যেমন সমগ্র বাংলা থেকে সমস্ত শক্তি এনে এক করেছে এখানে, ঠিক তেমনি সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে থাকা সেনানায়কদেরকে এক করে এই জায়গায় নিয়ে এসেছে মানসিংহ। ঈশা খাঁ এবং মানসিংহ দুজনেই জানে–এতদিন ধরে বাঙাল মুল্লুকে তাদের দুজনার ভেতরে যা চলছিল সেটা ছিল স্রেফ ইঁদুর-বিড়াল খেলার মতো। প্রকৃত মোকাবেলা হবে এখন। এই যুদ্ধই প্রমাণ করে দিবে বাঙাল মুল্লুকে কার কিংবা কাদের আধিপত্য বজায় থাকবে।

যদিও সে সবই জানে, তবুও নিজের বাহিনীর প্রধানের দিকে সে পরিস্থিতি বয়ান করার ঘোষণা দিলো। যুদ্ধ পরিস্থিতি বিস্তারিত বয়ান করা শেষ করে সে ফিরে তাকাল নিজের সভাসদদের দিকে। আর ঈশা খাঁ ফিরে তাকাল নিজের সভার সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ লতিফ শেঠের দিকে।

'হুজুর, পরিস্থিতির বয়ানে আমরা তো বুঝতেই পারতেছি, এগারো সিন্ধুতে যা চলছে দুই বাহিনী মুখোমুখি হওয়া এখন স্রেফ সময়ের বিষয়,' লতিফ শেঠ এইটুকু বলেই সে ফিরে তাকাল সেনাপ্রধানের দিকে। সেনাপ্রধান দুই বাহিনীর সমগ্র শক্তি এবং সামর্থ্যের একটা চিত্র বিবরণ করল।

তার বয়ান শেষ হতেই লতিফ খাঁ ফিরে তাকাল ঈশা খাঁর দিকে। 'বুঝতেই পারছেন, হুজুর, আমরা কোনোদিক থেকেই তাদের সমকক্ষ নই।'

'তারমানে সরাসরি যুদ্ধ যদি লাগে তবে পরিস্থিতি কোনোভাবেই আমাদের অনুকূলে থাকার কোনো সম্ভাবনাই নাই,' ঈশা খাঁ যেন অনেকটা বিড়বিড় করেই বলে উঠল।

'হুজুর, বেয়াদবি না নিলে আরও একটা বিষয় আপনার আজ্ঞাবহ করার প্রয়োজন অনুভব করছি,' লতিফ শেঠের পাশ থেকে সরফরাজ বলে উঠল। 'বিগত কয়েকদিনের যুদ্ধে আপনার অনুপস্থিতি নিয়ে মোঘলার কুৎসা রটাতে শুরু করছে,' এইটুকু বলে সে খানিকটা যেন দ্বিধার সাথেই তাকিয়ে রইল ঈশা খাঁর দিকে। কিন্তু ঈশা খাঁর কুঁচকানো ভ্রুতে আরও দুয়েকটা ভাঁজ যোগ হওয়া ছাড়া আর কিছু হলো না দেখে সে আবারও বলতে লাগল, 'হুজুর, খোদ মোঘল দরবারে নাকি এরকম কথা উঠেছে, আপনি মানসিংহের ভয়ে যুদ্ধের ময়দানে যাবার সাহস করছেন না। এরকম একটা কথা তারা সবখানে ছড়িয় দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে,' এইটুকু বলে সরফরাজ খানিকটা ভয় এবং দ্বিধার সাথেই চুপ হয়ে গেল।

দরবারের পরিস্থিতি হঠাৎই যেন শুনশান হয়ে গেছে। সবাই চুপ। কিন্তু সবাই যা ভেবেছিল হলো তার উলটোটা, সবাই চুপচাপ ঈশা খাঁর দিকে তাকিয়েছিল ভাবছিল সে রেগে উঠবে, ধমকে উঠবে, বা অন্য কিছু করবে, কিন্তু তার বদলে ধীরে ধীরে তার মুখে মৃদু একটা হাসি ফুটে উঠল।

সবাই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে হঠাৎই ঈশা খাঁ বলে উঠল, 'ওরা যা বলেছে সেটা থেকেই আমরা সমাধান বের করবো,' বলে সে ফিরে তাকাল লতিফ শেঠের দিকে। 'আমরা বারবার বলছিলাম না, ভিন্ন শক্তি দরকার আমাদের, সেটা ছাড়াই পরিস্থিতি উৎরানোর উপায় বের করেছি,' বলে তার মৃদু হাসি আরও চওড়া হলো। 'একজন পত্রকারকে ডাকো, আমি মোঘল সেনাপতি মানসিংহকে একটা পত্র পাঠাতে চাই।'

***

বৃহত্তর জল-জঙ্গল এলাকা

ভোরের আলো একেবারে তীর্যকভাবে পানিতে পড়ে সেটা প্রতিপলিত হয়ে এসে লাগছে তার নির্ঘুম লাল চোখে। রণক্লান্ত রাত জাগার পর চোখের ওপরে পানির প্রতিফলন লাগাতে রীতিমতো জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে তাকে। কিন্তু মনের গহীন কোনে অপরিসীম প্রশান্তি তার। নৌকার পাটাতনের ওপরে দাঁড়িয়ে তামাক চিবুতে চিবুতে আনমনেই নিজের দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে উঠল মাসুমের।

'কী, বাঙালি, অনেক খুশি মনে অইতাছে?' বিচিত্র উচ্চারণে বাংলা শুনেই মাসুম বুঝতে পেরেছিল মানুষটা কে হতে পারে, তাও সে সামান্য হাসি মুখে ফিরে তাকাল রায়েলির দিকে।

'তা কইতে পারো,' মাসুম দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে এই প্রথমবারের মতো মেয়েটাকে ভালোভাবে খেয়াল করল। কাল রাত থেকে এতকিছু ঘটে গেছে অথচ মানুষটার দিকে একবারও খুব ভালোভাবে তাকানোর সুযোগ পর্যন্ত পায়নি সে। মেয়েটার দিকে তাকালেই সবার প্রথম চোখে পড়ে কঠিন চোয়াল আর রোদে পোড়া বাদামি চামড়া। মাসুম অনুমান করল মেয়েটা একসময় অনেক বেশি দুধে আলতা চামড়ার অধিকারী ছিল; কিন্তু বঙ্গদেশের রোদে তার চামড়া পুড়ে বেশ একটা বাদামি ভাব নিয়ে এসেছে, কঠিন চোয়াল, শক্তিশালী হাড়ের গড়ন আর অনেকটা পুরুষদের মতো পোশাক মেয়েটার অবয়বে মেয়েলি ভাবের চেয়ে পুরুষালি একটা ভাব নিয়ে এসেছে। কিন্তু তার ভেতরে কোথাও যেন অদ্ভুত এক কমনীয়তা আর রহস্যের ঘেরাটোপের বন্দিদশা অনুভব হয় চোখের দিকে তাকালে। ক্ষণিকের জন্যে সেই রহস্যের ঘেরাটোপে ধরা পড়ে গেলেও সাথে সাথে নিজেকে সামলে মেয়েটার চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে পানির দিকে ফিরে তাকাল মাসুম। 'তুমরা বিশ্রাম নিতাছ না?'

রায়েলি ওর পাশে এসে পাটাতনের ওপরে রাখা পিপের ওপরে বসে পড়ল। 'বিশ্রাম নেওয়ার আসলে উপায় নাই,' মেয়েটার কথা মাসুম বেশ ভালোভাবেই অনুভব করতে পারছে। 'তা ঠিক,' বলে সে আবার ফিরে তাকাল মেয়েটার দিকে। 'তুমি কইতাছিলা না, আমি খুশি কি না,' বলে সে কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমি আসলে খুশি। কারণ খাঁ সাহেব আমার জন্যে বিরাট কিছু। তার বলা কথা আমার লাইগা সবচেয়ে বড়ো নির্দেশ; কিন্তু প্রত্যেকবার আমার লাইগা তার অনেক ঝামেলায় পড়তে হইছে। আর তাই এইবার যখন সে তুমগোরে এইখান থেইকা উদ্ধার করতে কইল, আমি আসলে সত্যি ভাবতে পারি নাই শত্রু দিয়া ঘিরা এই ভয়ঙ্কর জল-জঙ্গল থেইকা তুমগোরে সত্যি সত্যি উদ্ধার করতে পারবো,' আবারও কাঁধ ঝাঁকাল মাসুম। 'কিন্তু এখন মনে অইতাছে বিষয়টা সম্ভব অইলে অইতেও পারে।'

'বাঙালি, একটা কথা কই,' বলে রায়েলি চোখ তুলে তাকাল মাসুমের দিকে। 'আমি জানি না তুমি কতখানি জানো আমগোর বিষয়ে, কিন্তু আমরা অন্য হিসাবে চলা মানুষ। মাইয়া হইয়া জন্ম নিলেও আমরা পুরষগোর লগেই লড়াই কইরা টিক্কা আছি, কিন্তু কাইল রাইতে তুমি যা খেল দেহাইছ–' রায়েলি বাক্য শেষ না করে মাসুমের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে পানির দিকে তাকাল। 'আমি আসলেই ভাবি নাই, ওই দ্বীপ থেইকা বাইর হইতে পারবো আমরা। কিন্তু সেইটা সম্ভব হইছে, এখন আমার মনে অইতাছে হয়তো এই ধাক্কা টিক্কা যাওয়া সম্ভব।'

'একটা কথা জিগাই,' মাসুম মনে মনে খানিকটা দ্বিধা করছে প্রশ্নটা করবে কি না ভেবে। 'তুমগো লগে কী এমন আছে যে সবাই–'

'বাঙালি, আমি তোমার ওপরে কৃতজ্ঞ কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব এমনকি আমিও দিতে পারবো না,' রায়েলি তাকিয়ে আছে মাসুমের দিকে, মাসুমও চোখ সরু করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। 'কিছু জিনিস না জানাই ভালো–' বলে সে মৃদু হেসে উঠল। 'এইখান থেইকা আমরা আসলে যাইতাছি কোনোদিকে?'

মাসুম এখনও রায়েলির দিকেই তাকিয়ে ছিল। 'আমি এহনো পুরাপুরি জানি না। আমগোর প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ওগো কাছ থেইকা দূরে সরা। গত কয়েক ঘণ্টায় আশা করি যথেষ্ট দূরে সরা অইছে,' বলে মাসুম আবারও পানির দিকে ফিরে তাকাল। 'আমার সাথে ওই যে পাতলা-পুতলা কইরা লোকটারে দেখছ না, ওর নাম নুক্কুন, ও এই এলাকা খুব ভালো চিনে। ও সারেংয়ের সাথে আছে, সেই নির্দেশনা দিবে কোনোদিক দিয়া যাইতে হবে, একটা নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারলে আমরা তারপর নিরাপদ,' এইটুকু বলে মাসুম থেমে গেল।

রায়েলি, তাকিয়ে আছে। 'এরপরে?'

'হিসাব অনুযায়ী একবার রসুল খাঁর পাহারাদারির এলাকার ভিতরে যাইতে পারলে আর চিন্তা নাই, পরে ওরাই আমগোরে নিরাপদে নিয়া যাবো,' বলে মাসুম হঠাৎই একেবারে চট করে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে জানতে চাইল, 'তোমগো দলের বাকিরা কেমন আছে, বিশেষ কইরা বেগম সাহেবা মেহের, হের উপরে দিয়া তো সবচেয়ে বেশি ধকল গেছে,' মাসুম চোখ সরু করে রায়েলির প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে। 'বিশেষ কইরা প্রথমে জঙ্গলমহালে আক্রমণ, তারপরে সুবাদার আসলামের মৃত্যু। এরপরে–'

মাসুম দেখল রায়েলির চোখ দুটো অন্ধকার হয়ে গেছে। 'বাদ দাও, বাঙালি, যা গেছে তো গেছেই সবারই নতুন কইরা বাঁচার অধিকার আছে। তবে তার চায়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ অইল–'

হঠাৎ করেই পাটাতনের ওপরে শব্দ হতেই দেখতে পেল ওদের সাথের ছেলেটা এসেছে। 'আপনেরে ডাকতেছে বেগম সাহেবা,' মাসুম খুব ভালো করে দুজনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে করতে উঠে দাঁড়াল। 'চলো, আমারও নুক্কুনের লগে কথা বলা দরকার।' ওরা সবাই মিলে মূল অংশের দিকে এগোল। নিজের লোকদের একজনকে মাসুম বলে উঠল, 'জাহাজের পাহারাদারদের বাদে বাকি সবাইকে সারেংয়ের ঘরে আসতে বলো,' কথাটা বলেই সে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল সারেংয়ের ঘরের দিকে। ভেতরে প্রবেশ করে দেখল বরখা আর ধোবল দাঁড়িয়ে আছে দুপাশে। আর নুক্কুন কথা বলছে সারেংয়ের সাথে। সারেং লোকটাকে এখন অনেকটাই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে, যদিও তার মুখে ভয়ের ছাপ পুরোপুরিই বিদ্যমান।

'কাম আগাইল?' মাসুম ভেতরে প্রবেশ করেই জানতে চাইল।

'এরা দুইজনে খালি ফুসুরফাসুরই করতাছে,' ধোবল দুজনের দিকে ইশারা করে বলে উঠল।

মাসুম ওদের দুজনার দিকে ইশারা করে এগিয়ে গেল সারেংয়ের দিকে। ওকে দেখেই লোকটা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই মাসুম তাকে থামিয়ে দিলো। 'অপেক্ষা করবো, ওরা আসলে সবাই একলগে আলোচনা করবো। এর আগে আমারে বুঝাও আমরা কই আছি আর এইখান থেইকা কোনোদিকে যাইতে হবে? আর মোঘল পাহারা এড়াবো কেমনে?'

'আমরা বেশি দূরে নাই,' নুক্কুন তড়বড়িয়ে বলে উঠল। 'আর খুব বেশি সময় লাগবো না।'

মাসুম তাকে থামিয়ে দিয়ে পুরনো তেল চিটচিটে একটা মানচিত্র দেখিয়ে ওকে সব বোঝানোর জন্যে ইশারা করল। ওরা আলোচনা করতে করতেই রায়েলি সুলতান আর ওদের দলের আরেকজনসহ ভেতরে প্রবেশ করল।

'বলো, তুমগো পরিকল্পনা কী?'

'বলো, নুক্কুন,' মাসুম ফিরে তাকাল নুক্কুনের দিকে। তাকে দেখে একদিকে ভীষণ উত্তেজিতও মনে হচ্ছে আবার সবাই তার দিকে ফিরে তাকাতেই ভীষণ সংকুচিতও হয়ে উঠল যেন সে। সবাই তাকিয়ে আছে, সে দুবার কথা বলতে গিয়েও থেমে গেল। 'নুক্কুন, এইহানে আমরা সবাই নিজের মানুষ, বলো। কোনো সমস্যা নাই।'

'ইয়ে, হুজুর, আমরা এহন রসুল খাঁর এলাকা থেইকা বিশ ক্রোশ দূরে আছি, হেগো পাহারা এলাকার ভিতরে পৌঁছাতেই অইলে,' বলে সে একে একে ব্যাখ্যা করে গেল কীভাবে কোনো জায়গায় মোঘলদের পাহারা থাকতে পারে এবং কোনোদিক দিয়ে ওখানে যেতে হবে।

'আমরা কি সরাসরি যাইতে পারবো?' মাসুম পুরো যাত্রাপথটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছে। 'মোঘলগোর পাহারা, আর তাছাড়া বলে সে রায়েলির দিকে ফিরে তাকাল। 'বিশার বাহিনীর লগে মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা কী আছে?' শেষ প্রশ্নটা মাসুম করেছে সারেংয়ের দিকে তাকিয়ে। লোকটা ওর প্রশ্ন শুনে আরও ভয়ে কাবু হয়ে গেল।

'হুজুর, আমি জানি না, আমি বড়োজোর কইতে পারি কই কই হের ডেরা আছে, আর হেইগুলা বাদ দিয়া আপনেগো ক্যামনে রসুল খাঁর এলাকা পর্যন্ত লইয়া যাইতে পারবো। তয়–'

তাকে কথা শেষ করতে দিলো না নুক্কুন, তার আগেই সে মাসুমের দিকে ফিরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু মাসুম তার আগেই কথা বলে উঠল। 'সবাই মন দিয়া শোনো, আমগোর এখন তিনটা উদ্দেশ্য। যতটুকু বুঝছি এই নাও নিয়া

আমরা রসুল খাঁর এলাকা পর্যন্ত যাইতে পারবো, মানে এইটার অবস্থা যাবার মতনই আছে। কিন্তু তার আগে কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে অইব। কথাগুলা কইতাছি কারণ আমি, বরখা কিংবা ধোবল, আমরা এই এলাকা সেইভাবে চিনি না। কাজেই তুমি,' সে সারেংকে দেখাল। 'নুক্কুন আর সুলতান, তুমরা তিনজনে মিলা এমন একটা ব্যবস্থা বাইর করো যাতে, আমরা মোঘলগোর পাহারা এড়ায়া, বিশার বাহিনীর সামনে না পইড়া যেমনেই হোক রসুল খাঁর এলাকায় পৌঁছাইতে পারি।'

বলে সে নির্দিষ্টভাবে নুক্কুনের দিকে ফিরে তাকাল। 'তবে আমগোর নিরাপদে পৌঁছানির আগে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে, যা আমগোর নিরাপদে পৌঁছানির চাইয়াও বেশি গুরুত্বপূর্ণ,' বলে সে থেমে গেল। সবাই তাকিয়ে আছে মাসুমের দিকে, আর মাসুম তাকিয়ে আছে নুক্কুনের দিকে। 'আমার হিসাবে এই যাত্রার পথেই পড়ার কথা এমন এক জায়গা যেইখানে আটকা পইড়া আছে নুক্কুনের পরিবার। যেকোনো মূল্যে আমগোর ওর পরিবাররে উদ্ধার করতে হবে। ওয়াদা ওয়াদাই, আমগোর শত বিপদ অইলেও, এমনকি মরতে অইলেও নুক্কুনের পরিবাররে উদ্ধার না কইরা আমরা এই এলাকা ছাড়ব না,' মাসুম এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নুক্কুনের দিকে। এই কথাটা ওকে বলতেই হতো, কারণ ও জানে নুক্কুনের মতো পাগল নিজে থেকে জীবনেও সরাসরি কিছু বলবে না।

সুলতান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু মেহের তাকে একটা হাত তুলে থামিয়ে দিলো। 'বাঙালি ঠিকই বলছে।'

মাসুম মেহেরের দিকে তাকিয়ে একটা ধন্যবাদসুলভ হাসি দিয়ে ফিরে তাকাল ওদের তিনজনের দিকে। 'কাজে নামো, আমি জলদি ফল চাই,' বলে সে ইশারায় ধোবল আর বরখাকে ডাক দিলো। ওদের সাথে জরুরি কিছু আলোচনা সারতে হবে। একবার ভাবল রায়েলিকেও ওদের সাথে যোগ দিতে বলবে কি না কিন্তু পরে সেটা বাদ দিয়ে ওরা তিনজনে আলোচনা চালিয়ে গেল। খাবার থেকে শুরু করে অস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে নিজেদের পরিকল্পনা প্রায় শেষ করে এসেছে এমন সময় নুক্কুন ওদের কাছে এসে ডাক দিলো ওকে।

'হুজুর,' সে সরাসরি তাকাচ্ছে না মাসুমের চোখের দিকে। 'হুজুর,' আবারও খানিকটা দ্বিধার সাথে বলে উঠল সে।

'বলো নুক্কুন, এত দ্বিধার কিছু নাই,' মাসুম বুঝতে পারছে লোকটা কেন দ্বিধা বোধ করছে। 'আমি যে দায়িত্ব নিয়া এইখানে আসছি সেইটা পূরণ করা যেমন আমার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি তোমার পরিবাররে উদ্ধার করাও গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই ওইটা নিয়া কিছু বলার প্রয়োজন নাই।'

'হুজুর,' আবারও একই শব্দ উচ্চারণ করে সে এবার চোখ তুলে তাকাল মাসুমের দিকে। 'হুজুর,' বলে সে এবার মাসুমের হাত ধরে ফেলল। 'আমার যদি কোনো ভুল হয়া থাকে–'

'নুক্কুন,' পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্যে মাসুম তাকে মৃদু স্বরে ধমকে উঠল। 'তোমার ভুল হইছে,' মাসুম এই কথাটা বলতেই লোকটা চোখ তুলে তাকাল ওর দিকে, মাসুম দেখল, মানুষটার চোখে পানি। 'ভুলটা হইল এখন তুমি কাজের কথা বলবা, সেইটা না বইলা আজাইরা ভেজাল করতাছ। কাজের কী অইল সেইটা বয়ান করো।'

মাসুমের ঝাড়ি খেয়ে মৃদু হেসে উঠল নুক্কুন, নিজের লম্বা এলোমেলো চুল নেড়ে সে বলে উঠল, 'হুজুর, মোটামুটি বাইর করন গেছে একটা রাস্তা। আমরা এহন যেখানে আছি এর চাইরপাশেই মোঘল পাহারা আর বিশার চরেরা আর তার বাহিনী ছড়ায় ছিটায় আছে,' বলে সে থেমে গেল। মাসুম তাকিয়ে আছে তার দিকে। 'তাইলে উপায়?' ওর সাথের বাকিদের চোখেও কৌতূহল।

'উপায় আছে, হুজুর,' বলে নুক্কুন আবারও তকালো সরাসরি মাসুমের চোখের দিকে। 'এইখান থেইকা আমরা জঙ্গলবাড়ি যাবো। একদিকে জঙ্গলমহালের পতনের পরে আবার অন্যদিকে রসুল খাঁর এলাকার মাঝামাঝি হওয়াতে আবার অন্যদিকে মানসিংহের বাহিনী এগারো সিন্দুর অবস্থানের পরে এখন জঙ্গলবাড়ি খালিই পইড়া থাকার কথা। এইখান থেইকা জঙ্গলবাড়ি পৌঁছানোই সবদিক থেইকা উত্তম অইব। আর জায়গাটা এইখান থেইকা কাছেও আবার এইখান থেইকা হাওড়-খাল-বিলের ভিতর দিয়া ওইখানে পৌঁছানিও সম্ভব আধাবেলার ভিতরে।'

'আর তারপর?' মাসুম সরাসরি তাকিয়ে আছে নুক্কুনের চোখের দিকে। লোকটার চোখের এত দ্বিধার কারণটা ও ঠিক ধরতে পারছে না।

'হুজুর, ওইখান থেইকা আমরা রসুল খাঁর এলাকাতে খবর পাঠাইতেও পারবো, যাতে হেরা আইসা আমগোরে উদ্ধার করতে পারে, কিংবা সুযোগ বুইঝা আমারার সইরা পড়তে পারি। কারণ আমরা এখন যেইখানে আছি এইখান থেইকা সরার আর কোনো উপায় নাই, অন্তত মোঘলগোর চোখে ধুলা দিয়া,' বলে লোকটা থেমে গেল। আবারও তার চোখে মুখে পৃথিবীর সব দ্বিধা এসে যেন ভর করেছে।

'নুক্কুন, আর কোনো কারণ আছে কী জঙ্গল-বাড়ি পৌঁছানোর?'

'হুজুর, ওইখানেই আমার পরিবারের থাকার কথা। চাইরপাশে সব ভাইঙা পড়ার পর খালি হেরা না আরও বেশ কিছু পরিবার ওইখানে আশ্রয় নেওয়ার কথা, যদি–'

নুক্কুনকে কথা শেষ করতে দিলো না মাসুম। 'পাল খাটাও, নাওয়ের মুখ ঠিক করো, আমরা জঙ্গলবাড়ি যাইতেছি। আগে ওইখানে যাই, এরপরে যা হইবার হবে, সেইটা দেখা যাবে–'

অধ্যায় বত্রিশ

বর্তমান সময়

পিবিআই হেডকোয়ার্টার, ধানমন্ডি ঢাকা

‘খবর বলো, মৌসুমি?’ হাবিব আনোয়ার পাশা মৌসুমির বাড়িয়ে দেওয়া কফির কাপটা নিতে নিতে মৌসুমির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। মৌসুমি দেখল সদা শান্ত মানুষটার ডান চোখের পাশের রগটা বেশ দপদপ করছে। তারমানে সে ওপরে ওপরে যত শান্তই থাকুক না কেন, ভেতরে ভেতরে তীব্র উত্তেজনা কাজ করছে তার। সেই সাথে তার দুই চোখের মণির পাশের সাদা অংশে খানিকটা লালচে ভাব প্রমাণ করে রাতে সে ঠিকমতো ঘুমায়ওনি। হাবিব আনোয়ার পাশার মতো লোক যখন রাত জাগে সেটা যে নেটফ্লিক্সে সময় কাটানোর জন্যে জেগে থাকেনি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

‘স্যার, ইন্সপেক্টর বাশার আর সোহেলের সাথে কাল রাতের একটা পর্যায়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে,’ বলে মৌসুমি ডেস্কের সামনের চেয়ারে বসে পড়ল। হাবিব আনোয়ার পাশা কফির কাপটা ঠোঁটে লাগাতে গিয়েও থেমে গেল মুহূর্তের জন্যে, চোখ তুলে সে বুঝতে পারল মৌসুমির আরও কিছু ব্যাপারে বলার আছে, তাই সে কিছু না বলে অপেক্ষা করতে লাগল। মৌসুমি একে একে বলে গেল গতকাল কী কী ঘটেছে এবং ওদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আগ পর্যন্ত সে কী কী জানতে পেরেছে।

মৌসুমির কথা শেষ হবার পরও হাবিব আনোয়ার পাশা কিছু বলছে না দেখে মৌসুমি আবারও মুখ খুলতে যাচ্ছিল কিন্তু আনোয়ার পাশা কিছু একটা বলতে যাবে দেখে সে থেমে গেল।

‘তুমি কি জানো আমি গতকাল সন্ধ্যায় এবং রাতে কোথায় ছিলাম?’ হাবিব আনোয়ার পাশা জানতে চাইল।

‘স্যার, আপনি গতকাল গভীর রাত পর্যন্ত অফিস করেছেন,’ মৌসুমি নিরাবেগী গলায় বলে উঠল। তার জবাব শুনে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে উঠল আনোয়ার পাশার। এই প্রথমবার কফির কাপে চুমুক দিলো সে। ‘সিলেট এবং চট্টগ্রামে তানভীর এবং শারিয়ার যে উদ্দেশ্যে রয়ে গেছিল সেই কাজের শেষ ধাপে চলে

এসেছে ওরা। তোমাকে বলতে দ্বিধা নেই, ওরা দুজনেই একটা গোপন মিশনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, সেটার প্রস্তুতির জন্যেই আমার এই রাত অব্দি জাগরণ,' বলে সে নিজের একটা আঙুল তুলল। 'ওরা যে অপারেশনের প্রস্তুতি নিচ্ছে সেটার সাথে রেলিক এবং নেক্রপলিসের সরাসরি সংঘর্ষ হতে যাচ্ছে। আর ওদের অপারেশনের সাফল্যের একটা বড়ো অংশ নির্ভর করছে বাশারের প্রফেসর ইফতেখারকে খুঁজে বের করার ওপরে এবং নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে রাজদ্রোহীর রহস্য সমাধান করার ওপরে। এমতাবস্থায় বাশারের পুরো টিম নিয়ে হারিয়ে যাওয়া–'

আনোয়ার পাশা কথা শেষ করতে পারল না, হঠাৎই কামরার টেলিফোনটা ঝন ঝন করে বেজে উঠল। দুজনেই আলোচনায় এতটাই মগ্ন হয়ে গেছিল যে হঠাৎ ফোন বেজে ওঠাতে চমকে গেছে দুজনেই। আনোয়ার পাশা কল রিসিভ করে কথা বলতে লাগল। কথা শেষ করে সে মৌসুমির দিকে তাকাল, চেহারা আগের চেয়ে গম্ভীর হয়ে গেছে। কফির কাপটা তুলে ঠোঁটে ঠেকাল।

'কী ব্যাপার, স্যার?' মৌসুমি জানতে চাইল।

আনোয়ার পাশা তার কথার কোনো জবাব দিলো না। চুপচাপ কিছুক্ষণ কফির কাপে চুমুক দিয়ে গেল সে। 'ময়মনসিংহের টুইন কালীর মন্দিরে একটা ঘটনা ঘটেছে,' বলে সে চোখ তুলে তাকাল মৌসুমির দিকে।

'টুইন কালী মানে, সেই কেস না যেটাতে বাশার কাজ করছিল?'

'হুম, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, বাশারের টুইন কালীর সেই কেস, তানভীরের সিলেট কেস আর শারিয়ারের কেস সব একসূত্রে গাঁথা,' আনোয়ার পাশা কফির কাপে আর চুমুক দিচ্ছে না।

'স্যার, এটা তো আমরা জানিই, একরকম বলতে গেলে–'

'উহু, আমরা স্রেফ ধারণা করছিলাম এতদিন, এখন প্রমাণ মিলতে শুরু করেছে এবং,' বলে সে উঠে দাঁড়াল, টেবিলের একপাশের কেস থেকে সিগার বের করে জানালার ধারে চলে গেল। 'আমরা যা ধারণা করছি ঘটনা তারচেয়েও অনেক বড়ো এবং অনেক গভীর,' জানালাটা সামান্য খুলে দিতে দিতে সে বলে উঠল। 'আমার ইনটুইশন যদি ভুল না হয়, ময়মনসিংহের পর অবশ্যই অবশ্যই সিলেট এবং চট্টগ্রামেও কিছু-না-কিছু ঘটবেই,' বলে সে মৌসুমির দিকে ফিরে তাকাল। 'তানভীর এবং শারিয়ারকে অ্যালার্ট করে দাও,' মৌসুমি মাথা নেড়ে চলে যেতেই আনোয়ার পাশা সিগার টানতে টানতে ভাবতে লাগল, চারপাশে একের-পর-এক ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। বাশারের সফল হওয়াটা এখন খুবই জরুরি।

***

পানাম নগরের পাতাল ঘর

পাতালের জায়গাটা সরু হলেও শুরুতে বেশ বড়োই মনে হচ্ছিল। কিন্তু আসলে জায়গাটা ঠিক ততটা বড়োও নয় তবে পাতালের জায়গা হিসেবে একেবারে ছোটোও নয়। আর এটা প্রমাণ করে যে এই জায়গাটা স্রেফ মাটির নিচের কোনো ঘর নয়। এটা পাতালের একটা সুড়ঙ্গের মতোই। ওদের দলের সবার সামনে সোহেল, তার ঠিক পেছনে চৌধুরী, দুজনারই হাতে টর্চ লাইট সোহেলের হাতে সত্যিকারের টর্চ আর চৌধুরীর হাতে মোবাইল টর্চ।

'তোমরা কি এখনও নিশ্চিত যে আমি ফাউন্ডেশনের কাউকে ডাকবো না? এত বড়ো একটা বিষয়–' প্রফেসর হামিদ আবারও বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে থামিয়ে দিলো চৌধুরী।

'স্যার, আপনাকে তো বলেছি এখানে এমন অনেক বিষয় আছে যা পৃথিবীকে জানানো অনেক বিপজ্জনক। কাজেই এই মুহূর্তে এই বিষয়ে যত কম লোকে জানে ততই বেটার,' বলে সে পেছন ফিরে দাঁড়াল। 'এই পাতালের জায়গাটা নিয়ে কাজ করার সুযোগ তো আপনার রইলই। আমরা আমাদের কাজ শেষ করে চলে গেলে আপনি আপনার টিম নিয়ে কাজ শুরু করতে পারবেন। পত্র-পত্রিকা এমনকি ইলেকট্রনিক মিডিয়া ডেকে সংবাদ সম্মেলন করে ঘোষণা দিবেন যে পানাম নগরে একটা পাতাল সুড়ঙ্গ পাওয়া গেছে। আরও একটা বিষয় আছে স্যার, আমরা আসলে কী নিয়ে ডিল করছি সেটা এমনকি আমরা নিজেরাও জানি না, কাজেই এখন চুপ থাকাই বেটার,' বলে সে প্রফেসরকে সামনে এগোনোর জন্যে ইশারা করল।

ওরা সবাই মিলে সাবধানে সেই পাতালের করিডর ধরে এগিয়ে চলেছে দেওয়ালে আঁকা লুমিনাস পেইন্টের নির্দেশনা ধরে। 'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছেন?' এগোতে এগোতে দেওয়ালের দিকে সামান্য এগিয়ে হাত বুলিয়ে পৃথা বলে উঠল, 'এদিককার দেওয়ালটা বেশ ঠান্ডা আর,' বলে আবার অন্যদিকের দেওয়ালে হাত রাখল, 'এদিককার দেওয়ালটা অনেকটাই শুষ্ক,' বলে সে থামতেই প্রফেসর হামিদ কথা বলে উঠল।

'সম্ভবত ওদিকটা পানির সাথে সংযুক্ত কিংবা ওয়াটার বডির কাছাকাছি, মেঘনা কিন্তু খুব দূরে নয়,' বলে সে আরও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সামনে থেকে সোহেল চিৎকার করে উঠল।

'প্রফেসর, সামনে দেখুন,' সোহেলের চিৎকার শুনে সবাই সেদিকে ফিরে তাকাতেই দেখতে পেল সামনে পাতালের পথটা দুদিকে ভাগ হয়ে চলে গেছে, একটা দিক অনেকটা অন্ধকার পথের দিকে এগিয়ে গেছে। আর অন্যদিকটা এগিয়ে

গেছে একটা কামরা আর গুহার মাঝামাঝি জায়গার দিকে। লুমিনাস পেইন্টের একটা তির ওটার দিকেই নির্দেশ করছে।

'মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কী?' প্রফেসর এগিয়ে গেল সামনের দিকে। 'চলো, সবাই।'

প্রফেসর এগিয়ে যেতেই সোহেলও এগোল তার পাশাপাশি। বাকিরা অনুসরণ করতে লাগল ওদের দুজনকে। ওরা বাঁয়ে বাঁক নিতেই দেখতে পেল করিডরের শেষ প্রান্তে ছোটো একটা কামরার মতো। ঠিক কামরা বলা যাবে না আবার গুহাও বলা যাবে না। অনেকটা গোলমতো কমরাটার ভেতরে মাঝামাঝি একটা জায়গাতে ছোটো একটা পাথরের বেদি। আর সেটার একপাশে হেলে পড়ে অছে প্রায় ক্ষয়ে যাওয়া একটা মূর্তি।

'এটা কোনো উপাসনার কামরা মনে হচ্ছে,' পৃথা অস্ফুটে বলে উঠল। 'টাকশালের নিচে গোপন উপাসনার কামরা কেন থাকবে?' অনেকটা যেন আনমনেই বলে উঠল পৃথা।

প্রফেসর কোনো কথা না বলে এগিয়ে গেল বেদি আর ওটার একপাশে হেলে থাকা আধ ভাঙা মূর্তিটার দিকে। মূর্তিটাকে পরীক্ষা করতে করতে সে মন্তব্য করার মতো বলে উঠল, 'মধ্যযুগীয় দেবী মূর্তি। আমি একেবারে সঠিকভাবে বলতে না পারলেও ধারণা করছি কোনো বিশেষ গোত্র এই ধরনের দেবীর উপাসনা করত,' বলে সে পৃথার দিকে চোখ তুলে তাকাল। 'লিলিথ, ওহ গড,' বলে সে তালি দিয়ে উঠল। 'হতে পারে এটা লিলিথ বা লিলিথের সমধর্মী কোনো দেবীর মূর্তি।'

'কিন্তু টাকশালের নিচে কেন?' পৃথাও মনোযোগের সাথে ভেঙে থাকা মূর্তিটার দিকে এগিয়ে গেল।

'এর একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে,' প্রফেসর হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। 'আর যদি সেটা হয়, তবে এটা হবে সময়ের অন্যতম একটা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার। ওরা টাকশালের বানানো অর্থের লট বাইরে নেওয়ার আগে এখানে টাকশালের গোপন কামরায় মানুষ বলি দিত, দেবীর উদ্দেশ্যে।'

আনমনেই মাথা নাড়তে নাড়তে পৃথা বলে উঠল, 'জোরদার সম্ভাবনা আছে এটা হবার। কারণ বাঙাল মুল্লুক থেকে শুরু করে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতে এই কালচার নতুন কিছু নয়, বরং বহু প্রচলিত একটা মিথ। কিন্তু প্রশ্ন হলো,' সে বেদির পাশের মূর্তিটা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বেদিটাকে পরখ করতে শুরু করল। 'এই মূর্তি এবং এই জায়গা পুরোটাই পরিত্যক্ত এবং সম্ভবত একাধিকবার এটা লুট হয়েছে। যারাই এখানে এসেছিল তারা কিছুই রাখেনি। যাদের নির্দেশনাতেই আমরা এখানে এসেছি তারা এখানে আনল কেন আমাদেরকে?' পৃথা তাকিয়ে আছে বাকিদের দিকে। সবাই চুপ।

প্রফেসরই তাড়া দিয় উঠল প্রথম, 'তারমানে এখানে অবশ্যই কিছু না কিছু আছে। সবাই ছড়িয়ে পড়ো, খুঁজতে হবে, কামরার প্রতিটা ইঞ্চি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। জলদি শুরু করো।'

ওরা সবাই ছড়িয়ে পড়ে কামরার প্রতিটা জায়গা দেখতে শুরু করল। কিন্তু খুব বেশি সময় লাগল না ছোটো কামরাটা পরীক্ষা করতে। দশ-পনের মিনিটের ভেতরেই সবাই হতোদ্যম হয়ে ফিরে এলো আবারও বেদিটার সামনে।

'কিছুই তো নেই,' সোহেল হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল। সবার ছোটো হওয়াতে তার ওপর দিয়েই সবচেয়ে বেশি ধকল গেছে। ঠান্ডার ভেতরেও কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে তার। 'এখন?'

'একটা জায়গা বাকি আছে,' পৃথা তাকিয়ে আছে মূর্তিটার দিকে।

'এটার তো আর কিছুই অবশিষ্ট নেই,' চৌধুরী অনেকক্ষণ পর বলে উঠল। 'এটার দিকে দেখে লাভ কী–'

'ওটা না,' পৃথা ভ্রু নাচিয়ে বলে উঠল। 'বেদিটা? ওটাই একমাত্র পরীক্ষা করার বাকি আছে।'

'কিন্তু–'

'কথা নাই, কাজে লাগো,' প্রফেসর কাপড়ের হাতা গুটিয়ে কাজে লেগে গেল। তার সাথে হাত লাগালো বাকিরা।

বেদিটা পরীক্ষা করতে করতে পৃথা হঠাৎই প্রায় চিৎকার করে উঠল। ব্যাপারটা সে আগেও খেয়াল করেছিল বেদির ওপরের অংশের একপাশে সামান্য ফাটলের মতো দেখা যাচ্ছে। 'এই এদিকে আসুন তো দেখি এটা কী?'

'কিন্তু–' সোহেল এগিয়ে এসে বেদির ওপরের অংশের ফাটলটা দেখে মন্তব্য করার মতো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই বাইরে একটা শব্দ শোনা গেল।

সবাই সচকিত হয়ে ফিরে তাকাল সেদিকে। কারও পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, এদিকেই এগিয়ে আসার।

'এখানে কে আসবে?' বলতে বলতেই সোহেল নিজের হাতের টর্চটা পৃথার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বের করে আনল নিজের পিস্তল। সেটাকে তাক করতে করতেই দরজার মতো ফোকরের বাইরের অংশে পায়ের আওয়াজ আরও বেড়ে গেল। কেউ একজন দৌড়ে আসছে এদিকেই। সবাই বিস্ময় এবং খানিকটা শঙ্কার সাথে তাকিয়ে রইল, পায়ের আওয়াজ এগিয়েই আসছে।

***

লম্বা চুলের ছেলেটা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তাকিয়ে আছে কালো কোটের দিকে। মানুষটা যত্নের সাথে শোনার চেষ্টা করছে কিছু একটা এবং তার সাথে সাথে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে তার চেহারার ভাব। লম্বা চুলের ছেলেটা কালো কোটের সাথে কাজ করছে খুব বেশিদিন হয়নি। কিন্তু লোকটার প্রতি তার কৌতূহলের কোনো শেষ নেই। বিশেষ করে এই শান্তশিষ্ট লোকটাকে কেন সে বা তার আশপাশের লোকজন এতটা ভয় পায় এই ব্যাপারটা সে আজ অব্দি আবিষ্কার করতে পারেনি। আরও একটা বিশেষ কারণে লোকটাকে সে মনোযোগের সাথে অবজার্ভ করে, কারণ সে লোকটাকে কখনও রেগে যেতে কিংবা অবাক হতে, কিংবা বিচলিত হতেও দেখেনি। কিন্তু এহেন লোকটা নিজের গার্ডদের কাছ থেকে রিপোর্ট শোনার পর থেকে এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করার প্রেক্ষিতে তাকে এই মুহূর্তে যেন খানিকটা বিচলিতই মনে হচ্ছে।

'স্যার, ভিন্ন পার্টি মাঠে ইতিমধ্যেই প্রবেশ করে ফেলেছে। হয়তো–' কালো কোটের এক গার্ড বলতে গিয়েও নিজের কথা শেষ করল না,বরং সে অসমাপ্ত বাক্যটা ছুড়ে দিলো নিজের সঙ্গীদের দিকে।

'জি, স্যার, আমরা যে পদ্ধতিতে কাজ করছিলাম, সেটাতে আদৌ কতটা কাজ হবে এখন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না,' দ্বিতীয় গার্ড কথা শেষ করে তাকিয়ে রইল নিজের বসের দিকে।

কালো কোট কিছুক্ষণ কিছুই বলল না। সে চোখ বন্ধ করে নিজের ভাবনার জগতে যেন হারিয়ে রইল বেশ অনেকটা সময়, তারপর চট করেই চোখ খুলে বলে উঠল, 'আমাদেরকে সেটাপ পরিবর্তন করতে হবে,' বলে সে নিজের সবাইকে সামনে আসতে বলল। 'তুমি,' বলে সে লম্বা চুলের দিকে ইশারা করতেই সে চমকে উঠে মাথা নেড়ে সায় জানাল। 'তুমি, যা করছিলে তাই করো, একটা শব্দও যেন মিস না হয়। নরজদারি আরও কড়া করো, প্রয়োজনে আরেকজনকে সঙ্গে নাও,' বলেই সে ফিরে তাকাল নিজের বাহিনীর লোকজনের দিকে। 'সবাই মন দিয়ে শোনো আমি কী বলি,' নিজের বিচিত্র ক্যালক্যাশিয়ান টানে নির্দেশনা দিয়ে চলল সে।

***

পায়ের আওয়াজ আরেকটু এগিয়ে আসতেই সোহেল হাতের পিস্তলটাকে আরেকটু উপরে তুলল। আরেকটু হলেই গুলি করে দিতে যাচ্ছিল কিন্তু মানুষটা দরজার মতো ফোকরে উদয় হতেই চট করে নিজেকে সামলে নিলো সে। অপর দিকের মানুষটাও নিজের পিস্তল ধরা হাতটা নামিয়ে নিলো।

'তোমরা এখানে!' ওদের দিকে এগিয়ে আসতে বাশার বলে উঠল, রীতিমতো হাঁপাচ্ছে সে। 'আর আমি খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গেছি। তোমরা এখানে কীভাবে এলে, পেয়েছ কিছু?' কৌতূহলের সাথে সবাইকে দেখছে বাশার।

'আপনি এখানে এলেন কীভাবে?' পৃথা জানতে চাইল। 'আর ছিলেনই বা কোথায়?'

'আমি পেছনে রয়ে গেছিলাম,' বাশার ওদের দিকে এগিয়ে এলো। 'একটা ব্যাপার নিশ্চিত করতে চেয়েছিলাম,' বলে সে একে একে সবাইকে দেখতে লাগল। 'আমরা ভয়াবহ বিপদের ভেতরে আছি। আমাদের পেছনে আবারও লোক লেগেছে। আমি পানামের একটা পুরনো বাড়ির ভেতরে লুকিয়ে চোখ রাখছিলাম তখন দেখতে পাই এবং–' বলে কাঁধ ঝাঁকাল একবার। 'ওরা টের পেয়ে যায়। তারপর কোনোমতে আমি এখান পর্যন্ত এসেছি, ওরাও খুব বেশি দূরে নেই।'

'এই লোকগুলো বারবার আমাদেরকে এভাবে অনুসরণ করে জায়গামতো পৌঁছে যাচ্ছে কীভাবে?' বেশ অবাক এবং বেশ খানিকটা হতাশার সাথে বলে উঠল সোহেল।

'হয় আমাদের ভেতরে কোনো বেঈমান আছে, আর না হয়–'

'আমাদের সবার নিজেদেরকে চেক করা উচিত,' চৌধুরী অনেকটা মন্তব্য করার মতো করে বলে উঠল। 'এক্ষুণি, ওরা কোনো-না-কোনোভাবে আমাদেরকে ট্র্যাক করছে। সবাই।'

'কিন্তু কীভাবে–'

'এক্ষুণি,' এবার বাশার ধমকে উঠল। 'আমি চৌধুরীর সাথে সম্পূর্ণ একমত। আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজেদেরকে চেক করা এবং সম্ভব হলে একে-অপরের তল্লাশী নেওয়া এবং সেটা এক্ষুণি করতে হবে,' বলে সে ওরা দ্রুত গতিতে একে-অপরের তল্লাশী নিতে শুরু করল। প্রফেসরকে চেক করার কোনো কারণ নেই, বাশার প্রথমে সোহেল তারপর চৌধুরীর তল্লাশী নিলো, তারপর সোহেল ওর সব পকেট থেকে শুরু করে সব চেক করল। 'বস, আমাদের ভেতরে তো মনে হচ্ছে–'

'মিস্টার বাশার,' পৃথার আতঙ্কিত গলা শুনে সেদিকে ফিরে তাকিয়ে সবাই দেখল সে ডান হাতের তর্জনী আর বৃদ্ধার মাঝে চেপে ধরে অছে চ্যাপ্টা ঘড়ির ব্যাটারির মতো প্রায় কয়েন সাইজের কিছু একটা। 'এটা কী? এটা আমার ট্রাউজারের পেছনের পকেটে ছিল।'

বাশার চট করে এগিয়ে জিনিসটা হাতে নিয়ে নিলো। এক পলক দেখেই সে বলে উঠল, 'ট্র্যাকিং ডিভাইস, সম্ভবত লিসেনিংও,' বলেই সে চট করে সোহেলের

দিকে তাকাল। ‘শিট, মোহাম্মদপুরে পৃথাকে অপহরণের চেষ্টাটা তাহলে অপহরণের চেষ্টা ছিল না। বরং ওর কাছে ডিভাইসটা প্ল্যান্ট করে ওকে দিয়ে শিট শিট,’ জিনিসটাকে মাটিতে ফেলে নিজের জুতো দিয়ে চ্যাপ্টা করে দিলো বাশার। ‘আমার আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল। জলদি পালাতে হবে এখন। এক্ষুণি। যেই মুহূর্তে শত্রুরা টের পাবে ওদের ডিভাইস–’

‘আমি এতদূরে এসে এখানে কী আছে না দেখে যাব না,’ পৃথা গোঁয়ারের মতো বলে উঠল।

‘আমিও অ্যাগ্রি করি,’ প্রফেসরও গলা মেলাল। কিন্তু বাশার বা সোহেল কিছু বলে ওঠার অগেই ওপাশ থেকে দুম দুম একটা শব্দ ভেসে আসতে লাগল।

‘ওরা টের পেয়ে গেছে,’ বাশার চট করে নিজের পিস্তলটা বের করে আনল। ‘এবং টের পেয়েই সরাসরি আক্রমণে চালাতে যাচ্ছে।’

‘শব্দ কীসের?’ সোহেল জানতে চাইল।

‘তোমরা যে ধাতব ঢাকনাটা পার হয়ে এসেছিলে আমি এখানে আসার সময় ওটা নিচ থেকে আটকে দিয়ে এসেছিলাম। ওরা নিশ্চিত ওটা ভেঙে নামার চেষ্টা করছে। আমাদেরকে পালাতে হবে জলদি–’

‘আগে দেখে নেই, ওখানে কী আছে,’ পৃথা এগিয়ে গেল বেদিটার দিকে। প্রফেসরও সাহায্য করতে লাগল ওকে।

‘ওরা ওদের কাজ করুক তুই আমার সাথে চল,’ বলে ও সোহেলকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। ‘আমাদেরকে পথ খুঁজে বের করতে হবে।’

‘স্যার, আমাদেরকে এটা সরাতে হবে,’ বেদির ওপরে রাখা চ্যাপ্টা পাথরের মতো অংশটা ফাটলের ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে ওপরে ওঠানোর চেষ্টা করতে লাগল।

‘দাঁড়াও, আমি হেল্প করছি,’ হাতের মোবাইলের টর্চটা বেদির একপাশে রেখে দুজনে মিলে পাথরটা টেনে ওঠানোর চেষ্টা করতে লাগল।

একাধিকবার চেষ্টা করেও খুব বেশি সুবিধা করতে না পেরে দুজনে মিলে হাঁপাতে লাগল। অন্যদিক থেকে দুম দুম আওয়াজ বেড়েই চলেছে।

‘স্যার, এখন কী করবো?’ পৃথা অস্থির হয়ে উঠেছে। ‘আমি কোনো অবস্থাতেই এখান থেকে যাবো না।’

প্রফেসর একবার বেদিটার দিকে তাকাচ্ছে আরেকবার বাইরের দিকে দেখছে। বাশার আর সোহেলেরও কোনো খবর নেই। বাইরের দিকে দুম দুম শব্দ বেড়েই চলেছে। ‘জলদি জলদি,’ বলে প্রফেসর আর পৃথা আবারও হাত লাগিয়ে ঠেলতে লাগল। ফাটলের কাছটা সামান্য নড়ে উঠল।

‘জোরে জোরে,’ এবার পৃথা চিৎকার করে উঠল। ‘কিন্তু জোরে ঠেলাতেও কোনো কাজ হলো না। ‘কী করছ তোমরা?’ আমাদেরকে পালাতে হবে,’ বাশার দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেই চিৎকার করে উঠল।

‘এখানে কী আছে না দেখে আমি যাবো না, পারলে আমাদেরকে সাহায্য করো,’ বলে পৃথা পাথরটা দেখাল।

বাশারকে এক মুহূর্তের জন্যে অস্থির দেখাল, যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। ‘ঠিক আছে,’ বলেই সে সোহেল আর চৌধুরীকে হাত লাগাতে বলল। সবাই মিলে পাথরটা ঠেলতে ঠেলতেই পাথরটা আরেকটু সরাতেই বেদির একপাশে হেলে পড়ে থাকা মূর্তির অংশবিশেষটা ভেঙে পড়ল মেঝের ওপরে বিকট শব্দের সাথে। সেই সাথে তীব্র শব্দের সাথে বাইরে ধাতব কিছু একটা ভেঙে পড়ার শব্দ শোনা গেল।

‘ওরা ঢুকে পড়েছে, জলদি জলদি,’ বলে বাশার উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পিস্তল বের করে আনল। ওর দেখাদেখি সোহেলও তাই করল।

পৃথা বেদির ভেতরের অংশে চোখ বুলিয়ে পিতলের চাকতির মতো কিছু একটা দেখতে পেল। ‘কী এটা?’ বলে চামড়ায় মোড়ানো জিনিসটা তুলে নিতেই চৌধুরী টান দিয়ে ওদেরকে এগোতে বলল।

‘কী এটা দেখার সময় নেই। জলদি জলদি,’ বাশার চিৎকার করে উঠল।

পৃথা এগোতে এগোতেই দেখল পিতলের জিনিসটা আসলে পুরোটা চাকতির মতো নয়, বরং অনেকটা দিক নির্দেশক যন্ত্র আর কাটা কম্পাসের মাঝামাঝি কিছু একটা। জিনিসটাকে অবারও চামড়ায় মুড়িয়ে ওটাকে রেখে দিলো সে নিজের হুডির ভেতরের পকেটে, রেখেই সামনে তাকাতেই দেখতে পেল সবার সামনে দরজার বাইরে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে বাশার, আর ওদেরকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করছে সোহেল।

‘আমরা কোনদিকে–’

‘যেদিক দিয়ে ঢুকেছি ওদিকে শত্রু ’ ওরা কথা বলা শেষ করার আগেই ফোকরের মতো অংশটা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল, ওখান দিয়ে বাইরে বেরোতেই গুলির শব্দ হলো। সাথে সাথে উলটোদিকে দৌড়াতে শুরু করল ওরা।

পেছনে গুলির শব্দ হচ্ছে, ওদেরকে নিয়ে সোহেল উলটোদিকের সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে।

‘আপনারা আমার সাথে আসুন,’ বলে সে ওদেরকে পথ দেখাতে লাগল।

‘আমরা যাচ্ছি কোথায়?’ কে চিৎকার করে জানতে চাইল পৃথা।

‘আমরা কিছুদূরে এগোলেই একটা গুহমুখ নদীর পাড়ের দিক দিয়ে বেরোতে পারবো। আমি আর বাশার স্যার দেখে গেছি একটু আগে।’

'কিন্তু বাশার?' পৃথা চিৎকার করে জানতে চাইল।

'উনি এসে পড়বেন, এই সাবধান,' সামনে একটা গর্তের মতো দেখে সবাইকে সাবধান করে দিলো সোহেল। ওরা আরেকটু এগোতেই দেখতে পেল সামনে অন্ধকার গুহা ও ভেতরে আলোর মতো দেখা যাচ্ছে। 'জলদি জলদি এদিকে,' সোহেলের দেখান পথে আলোর রেখা ধরে এগোতে লাগল ওরা। পেছনে ধুমধাম শব্দ হচ্ছে কিন্তু কারও সেদিকে নজর দেওয়ার উপায় নেই। সবাই অন্ধের মতো এগিয়ে চলেছে।

আরও আধ মাইলের মতো এগোতেই পরিষ্কার আলোর রেখা দেখা গেল, সেই সাথে পথটাও সরু হয়ে আর দাড়ানোর মতো রইল না। ওরা হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল। 'এইদিকে,' পৃথা প্রফেসর হামিদ আর চৌধুরী তিনজনেই সোহেলকে অনুসরণ করে নদীর ভেজা বালির চরের অংশে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

বাইরে বেরিয়ে জোরে জোরে দম নিতে লাগল। কিন্তু ওরা স্থির হবার আগেই ঝোপঝাড়ের কাছে শব্দ শোনা গেল, ওরা সচেতন হবার আগেই ঝোপঝাড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলো পিস্তল হাতে বাশার।

বাইরে বেরিয়েই সে সোহেলকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে উঠল। 'সোহেল গুহামুখটা ঢাকতে হবে,' বলেই সে কাছেই পড়ে থাকা বড়ো একটা পাথরের দিকে নির্দেশ করল। দুজনে মিলে ওটা বহন করে এনে ঢেকে দিলো গুহামুখটা।

দম নিতে নিতে সেদিকে তাকিয়ে বাশার বলে উঠল, 'এটা দিয়ে বেশিক্ষণ আটকানো যাবে না, আমাদেরকে পালাতে হবে,' বলে সে নদী তীরের দিকে দেখাল। সবাই মিলে দৌড়াতে শুরু করল নদীর তির ধরে। কিছুদূর এগোতেই দেখল সামনে রাস্তা বন্ধ হয়ে নদীর পানিতে মিলে গেছে। আর ওরা যেখানে আছে সেখান থেকে কিছুদূরেই লঞ্চের মতো জলযান ভেসে আছে।

বাশার একবার পেছনে দেখল, যেকোনো সময় ওই পলকা পাথরের বাধা পেরিয়ে পিছু নেওয়া লোকগুলো বেরিয়ে আসবে, আর সামনে রাস্তা বন্ধ, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও।

'সবাই পানিতে লাফিয়ে পড়ো, ওই ট্রলারে উঠতে হবে আমাদেরকে পালাতে হলে,' কে সাঁতার জানে বা না-জানে, সেটা ভাবা কিংবা বোঝার সময় নেই, একে একে সবাইকে লাফিয়ে পানিতে নামতে দেখেই সবার শেষে লাফ দিলো ও। বরফ ঠান্ডা কাঁদাটে পানিতে নেমেই সাঁতরাতে লাগল ট্রলারটার দিকে। খানিক সাঁতরে ওটার কাছাকাছি যেতেই ওটা থেকে পানিতে ভেসে থাকার গোল টায়ার ছুড়ে

দেওয়া হলো ওকে উদ্দেশ্য করে। সেগুলো ধরে কোনোমতে ট্রলারের কাছকাছি আসতেই একাধিক হাত টেনে নিলো ওদেরকে। ওটাতে উঠে পাটাতনে শুয়ে বড়ো বড়ো করে দম নিতে নিতে বাশার ভাবতে লাগল, এবারের যাত্রায় মনে হচ্ছে বেঁচে গেল। একটু দম ফিরে পেয়ে প্রথমেই বাশার দেখে নিলো সবাই উঠতে পেরেছে কি না। দেখে নিয়ে স্বস্তির সাথে সামনে তাকাল সে এবং সাথে সাথে মুখের হাসি বন্ধ হয়ে গেল।

কালো কোট নিজের সঙ্গীদের দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে শান্ত ভঙ্গিতে হাসিমুখে বলে উঠল, 'হ্যালো ইন্সপেক্টর, আবার দেখা হয়ে গেল।'

অধ্যায় তেত্রিশ

অতীত

টাঙ্গা গ্রাম, ব্রহ্মপুত্র ও শীতলক্ষ্যা নদীর সঙ্গমস্থল

চারপাশে যুদ্ধ বাহিনীর মাঝখানে পত পত করে উড়তে থাকা যুদ্ধ পতাকাটা যেন পুরো মানবতাকে উপহাস করছে। কারণ আক্ষরিক অর্থেই বলতে গেলে মোঘল এবং বারো ভূঁইয়ারা মুখোমুখি। জায়গাটা ব্রহ্মপুত্র ও শীতলক্ষ্যা নদীর সঙ্গমস্থলের একেবারে কেন্দ্রে টাঙ্গা নামক এক গ্রামে। অবস্থানগত কারণে এই জায়গাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর একারণেই দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়েছে এখানে।

জায়গাটা একদিকে শীতলক্ষ্যা আর ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থল, তার ওপরে শীতলক্ষ্যার অন্যদিকেই মানসিংহের টোক নগরী, ওটা আবার ফজল গাজীদের এলাকার সাথে সংশ্লিষ্ট। আবার ব্রহ্মপুত্রের অপর পাড়ে এগারো সিন্ধু যেটা এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। মানসিংহের মূল আক্রমণটা ওখানে হলেও প্রথম কয়েকদিনে এগারো সিন্ধুর যুদ্ধে ঈশা খাঁর অনুপস্থিতিতে অনেক প্রশ্নের উৎপত্তি হয়েছে, আবার ইচ্ছাকৃত উপায়ে ছড়ানো হয়েছে অনেক গুজব। সব সামলানোর জন্যেই ঈশা খাঁ এক পত্র প্রেরণ করে মানসিংহের দরবারে এরপরেই ঝড়ের বেগে সব বাহিনী মিলে এসে উপস্থিত হয়েছে টাঙ্গাতে। দুই বাহিনী একেবারে মুখোমুখি, আর সেই বিষয়েই জরুরি আলোচনা চলছে ঈশা খাঁর শিবিরে। আলোচনার বিষয়, ঈশা খাঁর পাঠানো পত্র এবং মানসিংহের শিবির থেকে সম্ভাব্য উত্তর।

ঈশা খাঁ তার সভাসদদের দিকে ফিরে তাকাল। একে একে সবাইকে দেখে নিয়ে তার দৃষ্টি স্থির হলো লতিফ খাঁর ওপরে। সেই তার দরবারে। সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং স্থির বুদ্ধির মানুষ। 'কী মনে হয়, করণীয় কী?' ঈশা খাঁর বক্তব্যের পেছনে অনেকগুলো বিষয় আছে যা একমাত্র তার কাছের মানুষেরাই জানে। বিশেষ করে সরফরাজ, লতিফ খাঁ। কারণ তারা জানে আসলাম শেঠের বিবিকে উদ্ধার করার জন্যে মাসুম কাবুলির অবস্থানের কোনো খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি। ঈশা খাঁর এই প্রশ্নের পেছনে সেই বিষয়ে অবগতিরর খোঁজও ছিল খানিকটা।

যুদ্ধের সাজে সজ্জিত সভাসদদের দিকে দেখে নিয়ে লতিফ খাঁ ফিরে তাকাল ঈশা খাঁর দিকে। 'আমার মনে হয় বাইরের কোনো সাহায্যের ওপরে আর নির্ভর

করার কোনো উপায় নাই। এখানে আমরা সব মিত্ররা এক হইছি, কাজেই যা হইবে তাই করতে হইবে। যা আছে কপালে সেইটা দেখা যাইবে। চেষ্টায় কোনো কমতি থাকা চলবে না,' বলে সে থেমে গেল। বাকিদের দিকে হালকাভাবে দেখে নিয়ে ঈশা খাঁর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'গোস্তাকি নিয়েন না, হুজুর। কিন্তু আপনি যেইভাবে পুরা বিষয়টা চাইতেছেন সেইটাও আমার ঠিক মনমতো হইতেছে না,' বলে সে আবারও বাকিদের দিকে দেখল। 'আমার বিশ্বাস অনেকেই আমার লগে সহমত হইবে।'

লতিফ খাঁ কথা শেষ করার প্রায় সাথে সাথে সম্মতির গুঞ্জন শোনা গেল সভাসদদের ভেতর থেকে। 'আমরা কোনো মূল্যেই আপনার জীবনের ওপরে ঝুঁকি আইতে দিতে পারি না,' কেউ একজন বলে উঠল। ঈশা খাঁ যে পত্র পাঠিয়েছিল মানসিংহের দরবারে সেই পত্রে সে একটা বিশেষ প্রস্তাবনা দিয়েছে মানসিংহকে। মূল টক্কর যেহেতু তাদের দুজনার ভিতরে কাজেই অকারণে প্রাণক্ষয় না করে বরং সে নিজে মানসিংহের সাথে দ্বৈতযুদ্ধে মুখোমুখি হতে চায়। যদি তাতে মানসিংহ জিতে যায় তবে বাংলা তার, আর ঈশা খাঁ জিতে গেলে মানসিংহকে বাঙাল প্রদেশ ছেড়ে যেতে হবে। যদিও এতে অনেকেরই আপত্তি ছিল কিন্তু ঈশা খাঁ এটাই করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এই প্রস্তাবনাই পাঠায় সে শত্রু শিবিরে।

'এখনও তো ওদের তরফ থেকে কোনো জবাব এলো না,' ঈশা খাঁ গম্ভীর মুখে বলে উঠল। বলেই সে নিজের সভাসদদের দিকে ফিরে তাকাল। প্রত্যেকের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে তার এই প্রস্তাবনাকে কেউ মেনে নিতে পারছে না। 'আমি বুঝতে পারছি তোমরা অনেকেই আমার সাথে এই প্রস্তাবনার বিষয়ে একমত নও, কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে। আমি শুরু থেকেই বলছি মানসিংহ তথা মোঘলদের সাথে লড়াইয়ের জন্যে আমরা প্রস্তুত নই, আমাদের সম্মান ইচ্ছা কিংবা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু বাস্তবতাও বুঝতে হবে। ওদের সাথে লড়াইয়ের জন্যে আমাদের সামর্থ্য যথেষ্ট নয়। কাজেই আমি শুরু থেকেই ভিন্ন কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম কিন্তু তা তো,' বলে সে থেমে গেল তারপর সবার দিকে মুখ তুলে বলে উঠল, 'খোদা চাহেন তো–'

বাইরে পদশব্দের সাথে ভেতরে প্রবেশ করল পাহারাদারদের একজন। 'হুজুর, অপরপক্ষ থেকে ফরমান এসেছে,' বলে সে দূতকে দেখাল। ঈশা খাঁ ফরমান পড়তে বলল। সেটা পড়া শেষ হতে হতে তার মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি। তার সভাসদেরা অনেকেই আপত্তির সাথে মাথা নাড়ল। কিন্তু সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল, 'যুদ্ধের ফরমান এসে গেছে, 'সবাই চল।'

বর্তমান

হাবিব আনোয়ার পাশার টেবিলের চারপাশে বসে আছে পিবিআইয়ের স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ পলিসি গ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টারা। হাবিব আনোয়ার পাশা সবাইকে দেখে নিয়ে বলে উঠল, 'এই হলো পরিস্থিতি,' বলে সে মাথা নাড়ল তরফদারের দিকে তাকিয়ে। তরফদারের মতামতের ওপরে তার ভরসা অপরিসীম। 'আমার একটা কথা আপনাদের সবাইকে জানাতে কোনো দ্বিধা নেই যে আমি যখন এই স্পেশাল ব্রাঞ্চের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমার একটা ভয় ছিল, সত্যিকার অর্থেই স্পেশাল,' বলে সে নিজের দুই তর্জনী নেড়ে বলে উঠল। 'কাজ করার মতো কেস পাব কি না। সেসব ক্ষেত্রেও আমার চুজ করা অফিসারেরা আসলে কতটা দক্ষতা দেখাতে পারবে কিংবা আদৌ পারবে কি না। কিন্তু আদতে ব্যাপারটা ঘটে গেছে উলটো। আমার অফিসারেরা তাদের কাজে সর্বোচ্চ দক্ষতা তো দেখিয়েছেই কিন্তু এতটা দ্রুততম সময় এমন কিছু ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করা গেছে যে এখন আমাদের হাতে থাকা রিসোর্স আসলে এইসব পরিস্থিতি সামলানোর মতো নয়। এই মুহূর্তে আমি আপনাদের মতামত আশা করছি এবং সেই সাথে আপনাদের সিদ্ধান্ত সহায়তাও,' বলে সে মৌসুমির দিকে তাকাল। মৌসুমি একে একে বয়ান করে গেল ময়মনসিংহের বিষয়টা, সেই সাথে সিলেট এবং চট্টগ্রামে কী ঘটেছে এবং সবশেষে ইন্সেপেক্টর বাশারের কেস এবং তার সাথে চট্টগ্রামের কেসের সংশ্লিষ্টতা।

তার বয়ান শেষ হতেই বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে এলো আলোচকদের ভেতর থেকে। একে একে দুজনেই সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেল। তাদের প্রশ্ন শেষ হতে পাটোয়ারি জানতে চাইল, 'সিলেট আর চিটাগাংয়ে তানভীর আর শারিয়ারের এখন কিরহম সাহাইয্য দরকার?'

হাবিব আনোয়ার পাশা বয়ান করে গেল ওরা কী করতে যাচ্ছে এবং ওদের কী ধরনের রিসোর্স প্রয়োজন হতে পারে। তার জবাব শুনে উপদেষ্টা কমিটির লোকজন নিজেদের ভেতরে আলোচনা করল কিছুক্ষণ।

'মিস্টার পাশা, আপনাদের কেসগুলো যথেষ্ট সিরিয়াস বলেই মনে হচ্ছে। আমরা যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে সিলেট এবং চট্টগ্রামে আপনার এজেন্টদের রিসোর্সের ব্যবস্থা করে দিতে পারবো।'

'আর ময়মনসিংহের বিষয়ে আপনারা যা ধারণা করেছেন সেটার ব্যাপারেও ব্যাকআপ দেওয়া সম্ভব কিন্তু আপনাদের কংক্রিট কিছু রেজাল্ট দেখাতে হবে-'

আগের আলোচক কথা শেষ করার আগেই পরের আলোচক বলে উঠল, 'বিশেষ করে চট্টগ্রামের কেসটা কিন্তু অসম্পূর্ণ এবং ওটার কোনো সঠিক সমাধান আপনারা এখনও করতে পারেননি,' উপদেষ্টা তাকিয়ে আছে আনোয়ার পাশার দিকে।

'আমি তো আপনাদেরকে বলেছিই ওটার সমাধান করতে হলে একজন মানুষকে খুঁজে বার করতে হবে আর সেটার জন্যে কাজ করছে আমার আরেক এজেন্ট, আশা করছি ওরা জলদিই বিষয়টার কোনো একটা সমাধান বের করতে পারবে। কাজেই–'

'ইউ বেটার হারি, মিস্টার পাশা,' আরেক উপদেষ্টা বলে উঠল। 'আমার দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতায় একটা ব্যাপার আমি জানি আপনাদের যাদের সাথে টক্কর লাগছে তারা অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিপক্ষ, তাদের সাথে লড়তে হলে আপনার অনেক কংক্রিট কিছুর প্রয়োজন হবে। আপনার এজেন্টরা এখন পর্যন্ত অনেক সফল হলেও সেই কংক্রিট কিছু আপনারা এখনও বের করতে পারেননি। কাজেই আপনার এজেন্টকে বলুন যা করার জলদি করতে।'

'আই কমপ্লিটলি অ্যাগ্রি উইথ ইউ,' আনোয়ার পাশা মনে মনে বলে উঠল, *বাশার তুমি আছ কোথায়, করছটা কী?*

সে ফিরে তাকাল মৌসুমির দিকে, তারও মনে একই প্রশ্ন।

অতীত

'এইটাই কি সেই জলপথ?' মাসুম খানিকটা সন্দিহান দৃষ্টিতে সরু জলপথটার দিকে তাকিয়ে আছে।

'জি, হুজুর,' নুক্কুন ভালোভাবে সামনে দেখে মাথা নাড়ল। 'আমি নিশ্চিত এইটাই সেই জলপথ, এইটা ধইরা গেলেই সেই দুর্গে পৌঁছাইতে পারবো আমরা। নুক্কুন নিশ্চিত করতেই মাসুম একজনের দিকে ফিরে ইশারা করল। লোকটা সারেংকে জানিয়ে দিবে ওদের নির্দেশনা। মাসুম ফিরে তাকাল নিজের লোকদের দিকে।

'সবাই মন দিয়া শোনো; আমরা কেউই কাল রাইতে, খাই নাই, বিশ্রাম করি নাই, তুমগো সবার অবস্থা খারাপ। আমি বুঝতে পারছি, এই অবস্থায় আমরা আগাইতে থাকলে সবাই অসুস্থ হয়া পড়বা। আমরা এই জঙ্গলবাড়ি দুর্গে গিয়া, প্রথমে নুক্কুনের পরিবাররে উদ্ধার করব তারপর, তারপর কোনোভাবে রসুল খাঁর কাছে খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করবো। তারপর আমরা খায়া বিশ্রাম নিবো। যদি

বিকাল নাগাদ রসুল খাঁর তরফ থেইকা কোনো খবর না আসে, তবে আমরাই কাইল ভোরে সওদাগরিতে কইরা রওনা দিবো রসুল খাঁর এলাকার উদ্দেশ্যে। বোঝা গেছে?' সবাই মাথা নেড়ে সায় জানাল।

'ও, আরেকটা কথা,' মাসুম দেখল ওদের নৌকাটা খাল ধরে খাড়িতে ঢুকতে শুরু করেছে। ওটার ওপাশে দুর্গের আকৃতি চোখে পড়ছে। 'আমরা দুর্গে নামতাছি আর কিছুক্ষণের ভিতরেই। সবাই যার যার জিনিসপত্র সামলায়া প্রস্তুত হয়া যাও,' শেষ কথাটা সে বলল রায়েলিকে উদ্দেশ্য করে। রায়েলি সামান্য মাথা নেড়ে সায় জানাল।

আর কিছুক্ষণের ভেতরেই খালের মতো জলধারাটা দিয়ে ওদের নৌকাটা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দুর্গটার দিকে। বিরাট আকারের দুর্গটার একপাশে পরিখার মতো অংশের সাথে গিয়ে মিশেছে খালটা। মাসুম খেয়াল করে দেখল দুর্গের চারপাশে বেশ গভীর করে খোঁড়া হয়েছে পরিখা আর সেটা দুর্গের দুদিক থেকে দুপাশে গিয়ে মিশেছে একপাশের খালের সাথে। অন্যপাশে একটা বিরাট আকারের দিঘির মতো জলধারার সাথে দুর্গের ঠিক সম্মুখভাগেই বিরাট দিঘিটার পাশেই বিরাট আকারের একটা ময়দান।

পরিখার কাছে নৌকাটা গিয়ে ভিড়তেই ওরা একে একে নেমে এলো সবাই। দলে এখন আর খুব বেশি মানুষ অবশিষ্ট নেই। একজনকে সারেংয়ের সাথে নৌকার পাহারায় রেখে ওরা পরিখার ওপরে নামানো কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে দুর্গের মূল সিঁড়ির মতো অংশের দিকে এগোলে। সবার অগে নুক্কুন।

'কী ব্যাপার কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না,' মাসুম কিছু বলার আগেই ওর পাশ থেকে ধোবল বলে উঠল। মাসুমও চারপাশে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে দুর্গটাকে এতটা নির্জন লাগছে কেন। 'নুক্কুন?'

মাসুম নুক্কুনের নাম ধরে ডাক দিলেও সে দেখতে পেল নুক্কুনের কোনো হুঁশ নেই, সে প্রায় দৌড়ে দৌড়ে লাফাতে লাফাতে দুর্গের সিঁড়ি বেয়ে ওপরের দিকে উঠে চলেছে। মনে মনে আফসোসের সাথে একবার মাথা নাড়ল, নুক্কুন বেচারা নিশ্চয়ই পরিবারে সাথে দেখা করার জন্য একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছে।

'নুক্কুন?' আবারও তাকে ডাক দিলো কিন্তু তার কোনোদিকে হুঁশ নেই। মাসুম বাকিদেরকে ইশারা করল ওপরে ওঠার জন্যে। ওরা ধাপগুলো পার হয়ে চারপাশে দেখতে দেখতে চলে এলো দুর্গের মূল প্রাঙ্গণে। সেখানে প্রবেশ করে আশপাশে তাকাতেই দেখল নুক্কুন প্রাঙ্গণের একপাশে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

মাসুম অবাক হয়ে একবার তাকে দেখল একবার নিজের লোকদের দিকে দেখল। 'কী ব্যাপার, নুক্কুন, তোমার পরিবার–'

মাসুম প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না। তার আগেই দেখতে পেল ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার চারপাশে উদয় হয়েছে ধুতি আর লালচে ফতুয়ার মতো পোশাক পরা একদল মানুষ। ওরা অস্ত্র বের করে প্রস্তুত হবার আগেই মানুষগুলো ঘিরে ফেলল ওদেরকে। লোকগুলো মোটেই অচেনা নয় ওদের কাছে।

মাসুম কিছু বলার আগেই, প্রাঙ্গণের আরেকপাশ থেকে ভরাট গলায় কথা বলে উঠল, লম্বা শক্তিশালী চেহারার একজন মানুষ। তার পরনে বাকিদের মতোই ধুতি, আর ফতুয়া, মাথায় লাল কাপড় বাঁধা, কপালে বিরাট তিলক। মানুষটা হাসিমুখে মাসুমের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'হুজুর, কিসমতের খেল, আবারও দেখা হয়েই গেল আপনের লগে।'

গেড়ুয়ার দিকে তাকিয়ে রাগে দাঁত কিড়মিড় করে উঠল মাসুম। আবারও বোকার মতো পাঙ্গু গেড়ুয়ার দলের হাতে ধরা পড়েছে ওরা।

আলতো করে নিজের ঘাড় ফেরালো নুক্কুনের দিকে। অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে সে। তবে কি নুক্কুনই ওদেরকে ফাঁসিয়েছে? কথাটা ভাবতেই রাগের হলকা বয়ে গেল মাসুমের শরীরে। ওই নৌকায় করে ওদেরকে পাঙ্গুদের হাত থেকে উদ্ধার করার ঘটনা তবে স্রেফ নাটক ছিল। ওদের সাথে ভিড়ে গিয়ে ওদেরকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করিয়ে তারপর পাঙ্গুদের হাতে ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে। স্রেফ ধোঁকা দেওয়া হয়েছে ওদেরকে।

***

'হ্যাঁ, মোহাম্মদপুরের ঘটনাটা স্রেফ ধোঁকা ছিল, আইওয়াশ,' খুবই শান্ত ক্যালকেশিয়ান টানে বলে উঠল কালো কোট।

ভেজা চুপচুপে শরীরে ট্রলারটার একপাশে একটা বেঞ্চের মতো দেখতে বসার জায়গার ওপরে বসে আছে সবাই। রাগে ক্ষোভে বাশারের নিজের হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আসলে কিছু করার নেই। ওদের বিশেষ করে ওর নিজের প্রচুর বোকামি ছিল এইসব ঘটার পেছনে।

'নিন, এভাবে ঠান্ডার ভেতরে ভেজা বসে থাকার কোনো মানে হয় না,' ওদের ট্রলার এখন মাঝ-নদীতে। আর ওদের ঠিক সামনে বসে আছে সেই কালো কোট। ওদের সামনে একটা চেয়ার নিয়ে বসে আছে সে। তার থেকে খানিক দূরে ওদের দুপাশে দুজন করে চারজন। 'আপাতত মাথা মুছে কফি খান, আমাদের বেশ কিছু কথা আছে এরপর আপনাদের পোশাক পালটানোর ব্যবস্থা করা হবে। আপাতত আপনাদের সুস্থ থাকাটা জরুরি।'

লোকটার কথা শুনে পৃথা রাগের সাথে ঝটকা মারলেও বাশার শান্ত থাকল, সে হাত বাড়িয়ে টাওয়ালটা নিয়ে মাথা আর শরীরের ভেজা অংশ যতটা পারল মুছে নিলো। যে লোকটা টাওয়ালটা দিয়েছিল তাকে ধন্যবাদ জানাতেও ভুলল না। তারপর কালো কোটের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'আপনি কিন্তু আপনার পরিচয় দেননি। হতে পারি আমরা আপনার বন্দি, কিন্তু বন্দিদের সাথেও তো ম্যানারস বজায় রাখা যায়, নাকি?' ওদেরকে পানি থেকে ওঠানোর পরই অস্ত্রধারীরা ওদের থেকে সব কিছু নিয়ে নিয়েছে। পিস্তল থেকে শুরু করে মোবাইল, এমনকি পৃথা সেই গুহার ভেতরে বেদি থেকে যে জিনিসটা উদ্ধার করে এসেছে সেটাও। ওরা এই মুহূর্তে পুরোপুরি অসহায়ভাবে বন্দি, কাজেই অকারণ জোর জবরদস্তি করে কোনো লাভ নেই। তাই শান্তস্বরে শান্তভাবেই সে জানতে চাইল সামনের মানুষটার পরিচয়।

কিন্তু ওর প্রশ্নের জবাবে সামান্য হেসে উঠল লোকটা। 'মিস্টার বাশার, আপনি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোক ঠিক আছে, কিন্তু মনে রাখবেন কিছু বিষয় আছে যা আপনার কিংবা আপনাদেরও আয়ত্তের বাইরে,' বলে সে নিজের মুখটাকে সামান্য এগিয়ে নিয়ে এলো। 'কাজেই কিছু জিনিস না জানাই ভালো,' বলে সে চেয়ারে হেলান দিলো। বাশার এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মানুষটার দিকে। খুব শান্তশিষ্ট মানুষটার অবয়ব থেকে যেন শক্তি সামর্থ্য সাহস আর স্থিরতা ঠিকরে বেরোচ্ছে। বাশার এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। লোকটা কে হয়তো ও সেটা জানে না। কিন্তু অনুধাবন করতে পারে খুব সহজেই। আর এই লোকটা যে ওদেরকে ঘোল খাইয়েছে খুব সহজেই, সেটা অনুধাবন করাও খুব মুশকিল কোনো বিষয় না।

বাশার আনমনেই মাথা নাড়ল। 'ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি আপনি আপনার পরিচয় বলতে চাইছেন না, কিন্তু এটা বলতে তো দ্বিধা নেই যে মোহাম্মদপুরের ঘটনাটা আপনি ইচ্ছে করেই ঘটিয়েছেন, আমাদের–'

'জি, তা বলতে পারেন,' বলে লোকটা তার এক অনুচরের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল। সাথে সাথে লোকটা ওদের সবাইকে কাপে করে একেবারে গরম কফি সার্ভ করল। 'বলছি, আগে কফি নিন, আপনারা এমনিতেই এই ঠান্ডার ভেতরে ভিজেছেন, তার ওপরে আবার ভেজা কাপড়ে আছেন, ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। এখুনি আপনাদের পোশাক বদলাবার ব্যবস্থা করতে পারছি না কারণ আপনাদের সাথে আমার কথা আছে, কাজ আছে, সেগুলো সারতে হবে আগে। কিন্তু তাই বলে অসুস্থ হতেও দিতে পারি না। কাজেই কফি নিন,' কফি সার্ভ করা হতেই সে বাশারের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, মোহাম্মদপুরের ঘটনাটা ইচ্ছে করেই ঘটানো হয়েছে। প্রথমে চট্টগ্রামে প্রফেসর আবদেলের মৃত্যুর পর আমি বাংলাদেশে

আসি আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় সেখান থেকে,' বলে সে নিজের গ্রীবা উঁচু করল। একেবারেই দ্বিধা ছাড়াই সে বলে চলেছে, বাশার আরও একবার অনুধাবন করার চেষ্টা করল লোকটার শক্তি আর ক্ষমতার উৎস। 'আমি প্রফেসর ইফতেখারের পেছনে লাগার পর বুঝতে পারি ব্যাপারটা কঠিন হবে। আমার পরিকল্পনা ছিল এদের দুজনকেই অপহরণ করা যেকোনো মূল্যে,' বলে সে পৃথা আর চৌধুরীকে দেখাল। 'কিন্তু মিস্টার চৌধুরী হাত ফসকে গেল, এরপর মিস পৃথার ওপরে নজর রাখতে গিয়ে প্রথমে আবিষ্কার করলাম–চৌধুরীও তার ওপরে নজর রাখছে, আবার সেই সাথে উপলব্ধি করলাম জোর করে মিস পৃথাকে দিয়ে কিছু বের করানোটা কঠিন হবে। এমন সময় আপনি, মিস্টার বাশার, দারুণ একটা কাজ করলেন, আপনি কেন করেছিলেন কাজটা আমি জানি না। কিন্তু আমি একটা দারুণ সুযোগ পেয়ে যাই ওতে। যে-দুজনকে আমি এক করে জোর করে কেসটা সলভ করানোর পরিকল্পনা করছিলাম সেই দুজনকে টেকনিক্যালি এক করে স্রেফ ছোটো একটা জিনিস প্ল্যান্ট করে দেই, বাকিটা আপনারাই চালিয়ে যান।'

'তাহলে বারবার আমাদের ওপরে আক্রমণ করছিলেন কেন?' পৃথা রাগের সাথে বলে উঠল।

'প্রথমে আমার নিজের পরিকল্পনাই আসলে স্থির করতে পারছিলাম না, আর পরে–' লোকটা থেমে গেল। বাশার তার দিকে তাকিয়ে আছে সরাসরি। লোকটার কথার এই পর্যায়ে কিছু একটা অনুধাবন করার চেষ্টা করছে ও। কালো কোটও তাকিয়ে আছে, বাশার আপনাতেই বলে উঠল, 'আপনাদের একটা অ্যান্টি পার্টি আছে, তাই না?' বলে বাশার মৃদু হাসল।

কালো কোট হেসে উঠে প্রফেসর হামিদের দিকে তাকালো। 'কংগ্রাচুলেশন্স, আপনারা পানামের লেজেন্ডারি পাতাল পথ খুঁজে পেয়েছেন।'

প্রফেসরকে বিদ্ধস্ত লাগছে। 'আরও আগেই পাওয়া উচিত ছিলো, আমি বুঝলাম না, যেদিক দিয়ে আমরা বেরুলাম সেদিকে কারও সুড়ঙ্গমুখটা এতোদিন কারও চোখে পড়েনি কেন?'

'আপনারা তো দৌড়ের ওপরে ছিলেন, তাই খেয়াল করেননি, আমি এখান থেকে দেখেছি, ওটা একেবারেই বিচ্ছিন্ন একটা চর এলাকা, আমার ধারণা ওদিকে তেমন কেউ যায় না দেখেই হয়তো–'

কালো কোট আবারও মাথা নেড়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই তার একজন লোক এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে কিছু একটা বলল। লোকটার কথা শেষ হতেই কালো কোট ওদের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল, 'আপনাদের জন্যে সুখবর আছে, যেজন্য এত কষ্ট করেছেন মরতে ধরেছিলেন, সেটার সমাধান পাওয়া

গেছে,' বলেই সে হাতের ইশারায় নিজের একজনকে ডাকল। একটু পরেই লম্বা চুলের একটা ছেলে ল্যাপটপ নিয়ে এসে সেটাকে ওদের সামনে একটা রাখল, তার পেছনে এলো খানিক বয়স্ক করে চাইনিজ চেহারার একজন, তার হাতে পানাম নগরের পাতালঘর থেকে উদ্ধার করে আনা সেই পিতলের চাকতির মতো জিনিসটা। 'মিস্টার লি,' লোকটাকে দেখেই প্রফেসর হামিদ অস্ফুটে বলে উঠল।

'ওহ, প্রফেসর আপনি জন লি'কে চেনেন; অবশ্য আপনারা দুজনেই বলতে গেলে একই ফিল্ডে আছেন, কাজেই,' বলে কালো কোট কাঁধ ঝাঁকাল। 'বাকিরা যারা তাকে চেনেন নাঃ ও জন লি, একসময় ইউনির্ভাসিটির প্রফেসর ছিল আর্কিয়োলজির। এরপর গোপনে আর্কিয়োলজিক্যাল সাইটের জিনিসপত্র চোরা বাজারে বিক্রি করতে শুরু করলে থাই সরকার তার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করে। লি এখন আমাদের জন্যে কাজ করে।'

'তারপর লির দিকে ফিরে ইংরেজিতে বলে উঠল, 'লি, বলো উনাদেরকে, কী পেয়েছ?' এর পরিবর্তে 'কালো কোট লির দিকে ফিরে ইংরেজিতে বলে উঠল, 'লি, বলো উনাদেরকে, কী পেয়েছ?'

বলার সাথে সাথে লি সেই পেতলের চাকতির মতো জিনিসটা তুলে ধরল ওদের সামনে, তারপর ইংরেজিতে বলতে শুরু করল। 'আপনারা কি কেউ এই জিনিসটা চেনেন?' ওরা সবাই চুপ দেখে আবারও সে নিজেই বলতে শুরু করল। 'আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, ইউরোপ কিংবা বিশ্বের অন্যান্য অংশের আগেই বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য নৌবিদ্যায় অনেক বেশি পারদর্শী ছিল। বর্তমান বিশ্বে নেভিগেশনের অনেককিছুই একেবারে ডিজিটালি করা হয় কিন্তু আগে এমনটা ছিল না। যেমন, সেক্সট্যান্টের মাধ্যমে নেভিগেশনের জন্যে কোনো জায়গার অবস্থান নির্ণয় করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আপনারা চোখের সামনে যে-জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে সেক্সট্যান্টের পূর্বপুরুষ বলতে পারেন। পার্সিয়ান এক ধরনের নেভিগেশনের কাজে লাগানোর যন্ত্র। এটা দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট–'

'অবস্থান বোঝানো হয় এবং আমরা যে যন্ত্রটা বের করে এনেছি ওটাতে একটা অবস্থানে লক করা ছিল, তাই না?' পৃথা বলে উঠল।

'এক্স্যাক্টলি ইয়াং লেডি,' খুশি হয়ে উঠল লি।

'আর ওটাতে যে অবস্থান লক ছিল সেটাকে আমরা ডিজিটালি জিপিএসে বসাতেই এই লোকেশনটা পেয়েছি,' সেই লম্বা চুলের ছেলেটা বলে উঠে ল্যাপটপটা প্রথমে কালো কোটের দিকে ঘুরিয়ে দেখাল তারপর কালো কোট ইশারা করতেই

সে ওটাকে ঘুরিয়ে দিলো ওদের দিকে। পৃথা ভ্রু কুঁচকে দেখার এবং বোঝার চেষ্টা করছে, সে অস্ফুটে বলে উঠল, 'এটা তো কিশোরগঞ্জের একটা লোকেশন দেখাচ্ছে। ওখানে–'

'ঈশা খাঁর জঙ্গলবাড়ি দুর্গ,' ওর পাশ থেকে প্রফেসর হামিদ বলে উঠল।

'ভেরি গুড,' কালো কোট খুশিতে তালি দিয়ে উঠল, 'সারেংকে লঞ্চ ঘোরাতে বলো, আমরা কিশোরগঞ্জে যাচ্ছি। এই সমস্ত কাহিনির সমাপ্তি হবে ওখানেই,' বলে সে ওদের দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিয়ে উঠল।

অধ্যায় চৌত্রিশ

অতীত

জঙ্গলবাড়ি দুর্গ

যদিও বন্দি এবং ওদেরকে আটকে রাখা হয়েছে দুর্গ প্রাঙ্গণের একপাশে, তবুও কোনো ধরনের অপমান করা হয়নি কিংবা তাদেরকে কোনো ধরনের আঘাত করা কিংবা যন্ত্রণা দেওয়া হয়নি। মাসুম রাগের সাথে শুধু নুক্কুনের দিকেই তাকাচ্ছে বারবার। গেড়ুয়া কিংবা তার বাহিনীর ওপরে ওর কোনো রাগ নেই। ওরা ওদের কাজ করেছে এবং গেড়ুয়ার মতো একটা ছেলে ওকে বুদ্ধির খেলায় হারিয়ে দিয়েছে এটা নিয়েও ওর কোনো রাগ নেই, কিন্তু ওর রাগ হচ্ছে নুক্কুনের ওপরে। বিগত কয়েকদিনের অভিজ্ঞতায় ও যাকে ভাই ভেবেছিল, যে-লোকটা একাধিকবার ওকে প্রাণে বাঁচিয়েছে। যার পরিবারের নিরাপত্তার কথা ও নিজের দলের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছিল, সেই লোকটা কি না ওকে এভাবে ধোঁকা দিলো!

ওদেরকে বন্দি করার সাথে সাথে যখন ওরা বুঝতে পারল যে পুরো ব্যাপারটাই নুক্কুন ইচ্ছে করে ঘটিয়েছে, ধোবল চিৎকার করে ওকে গালি দিয়েছে, সুলতান একবার ওকে মারার জন্যে তেড়ে গিয়েছিল কিন্তু পুরোপুরি শান্ত ছিল স্রেফ তিনজন মানুষ।

ওদের দলের সাথে থাকা সুবাদারের স্ত্রী মেহের। মেহের প্রথম থেকেই বেশি কথা বলেনি, এইবার আরও বলেনি। ধরা পড়ার আগে থেকেই বলতে গেলে চুপ, ধরা পড়ার থেকে বলতে গেলে আরও চুপ হয়ে গেছে সে। কিন্তু রায়েলি আর মাসুম একেবারেই কিছু বলেনি ধরা পড়ার পর থেকে। রায়েলি শুধু দুবার মাসুমের দিকে দেখেছে, সে এমনকি নুক্কুন কিংবা গেড়ুয়াদের দিকে দেখেওনি। কিন্তু মাসুম বারবার রাগের সাথে তাকাচ্ছে নুক্কুনের দিকে। কিন্তু যতবার সে মানুষটার দিকে তাকাচ্ছে ততবারই দ্বিধার একটা পর্দা বারবার ভারী হয়ে জড়িয়ে ধরছে ওকে। ওরা ধরা পড়ার পর থেকে নুক্কুন দুর্গের প্রাঙ্গণের এক কোণে এমনভাবে জবুথুবু হয়ে মাথা নিচু করে বসেছে যে একবারের জন্যেও সে নিজের মাথা কিংবা মুখ ওপরে তোলেনি। মাসুম যতবার লোকটার দিকে তাকাচ্ছে একটাই প্রশ্ন ওর মনের ভেতর থেকে দানা বেঁধে উঠেছে, কেন লোকটা এরকম করল। 'কেন, নুক্কুন?' আর

থাকতে না পেরে প্রশ্নটা মাসুমের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কোনোরকমের রাগ নয়, ঘৃণা নয়, একেবারেই শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করা নিখাদ কৌতূহলে জর্জরিত একটা প্রশ্ন। মাসুম কথাটা জিজ্ঞেস করার সাথে সাথে নুক্কুন এই প্রথমবারের মতো মুখ তুলে তাকাল ওর দিকে। মাসুম দেখল আধ পাগল শুকনো লোকটার লাল চোখ দুটো অশ্রুতে ভরে আছে। কোনো ধরনের প্রতিউত্তর নয়, কোনো ধরনের ব্যাখ্যা নয়, স্রেফ একটা চাহনি। মাসুম খুব অবাক হয়ে অনুভব করল নুক্কুনের চোখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে কোনো রাগ বা ঘৃণাবোধ নয়, বরং এক ধরনের সহানুভূতি অনুভব করতে লাগল। কিন্তু ওকে জানতে হবে নুক্কুন কেন এমনটা করল।

'কারণডা কী, নুক্কুন?'

'হুজুর, আমি বলতাছি কারণডা কী,' হঠাৎই আসরের মাঝখান থেকে উঠে দাঁড়াল গেড়ুয়া। ওদেরকে বন্দি করে রেখে ওরা গোল হয়ে বসেছে প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে। গোল বৃত্তটার মাঝে একজন পুরোহিত গোছের মানুষ মন্ত্র পড়ে কিছু একটার যজ্ঞ করছে, আর বাকিরা গোল হয়ে বসতেই হাতে হাতে ঘুরতে শুরু করেছে ধোঁয়া ভরা বাঁশি। বাঁশিতে কড়া একটা টান দিয়ে কথাগুলো বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল গেড়ুয়া। মাসুম দেখতে পেল লোকটার চোখে মুখে খুশি যেন উপচে পড়ছে। 'হুজুর, তুমি যোদ্ধা,' বলে সে মাসুমদের সামনে এসে একেবারে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। 'তোমার আবেগ, তোমার শক্তি চলে একটা নির্দিষ্ট রাস্তায়,' মাসুম আগেও খেয়াল করেছে সাধারণ এক ডাকাত কিংবা পাঙ্গু হিসেবে গেড়ুয়ার কথাবার্তা অনেক চমৎকার এবং খুব শান্ত। 'কিন্তু সবার তো সেইটা না, আমার কোনোদিনই সেরকম কোনো পরিবার ছিল না,' বলে সে নিজের লোকদের দিকে দেখাল। 'এইহানে যাগো দেখতাছ এরাই আমার পরিবার। আর আমার দেবীই হইল আমার পিতা-মাতা ঈশ্বর,' বলে সে ভক্তিতে নিজের মাথা নিচু করে দুই হাত তুলল নিজের মুখের সামনে। তারপর নিজের টকটকে লাল দুই চোখ তুলে মাসুমের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আর এই কারণেই আমার মানুষগুলা বাদে আমার আর কোনো দুর্বলতা নাই। কিন্তু আমি দেখছি, মানুষ তার পরিবারের জন্যে কী করতে পারে। তুমি বিশ্বাস করতে পারবা না হুজুর, পরিবারের দোহাই দিয়া মানুষরে দিয়া কী করানি সম্ভব,' বলে সে নিজের মতো হেসে উঠল।

'আমার এই পাঙ্গু দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেইকা আমার একটাই নিয়ত ছিল আমার এই দল আর দেবীর জন্যে বড়ো কিছু করা। অনেক বিরাট কিছু। তারপর নিজের দলরে থিতু কইরা আরও বড়ো আরও বিরাট এক পাঙ্গু দল গইড়া তোলা। আর আমি জানতাম এইটা ছোটো ছোটো ব্যবসায়ী আর সাধারণ মানুষ মাইরা সম্ভব না। আর এই কারণেই এই বাঙাল মুল্লুকে পা রাখছিলাম আমি। আর যেই সুযোগটা খুঁজতেছিলাম সেইটা আমার হাতের নাগালে চইলা আসল যখন

জানতে পারলাম মোঘলগোর লগে যুদ্ধে এই এলাকার সবচেয়ে বড়ো সুবাদারের স্ত্রী অনেক ধনসম্পদ নিয়া পলাইছে। আমি জানতাম আমি যা করতে চাইতেছি এইটা এহনি করতে হবে। কিন্তু আমার মতো ছোটো একটা মানুষ কিছু করার আগেই সব গুলায়া গেল। মোঘল, বিশা ডাকাইত থেইকা শুরু কইরা সবাই হেগো পিছে লাগল, যেইখানে আমার মতো মানুষের কোনো পাত্তাই ছিল না। আমি যখন দিশাহারা, ঠিক তখনই আমার সামনে সেই উত্তরটা চইলা আসল, জানতে পারলাম মসনদে আলা ঈশা খাঁ নিজের খাস লোক পাঠাইতাছে সুবাদারের স্ত্রীরে খুঁইজা বাইর করার লাইগা, আমি, জানতাম যেইটা আমি করতে পারবো না, এইটা তোমার মতো লোকেই করতে পারবো। কিন্তু তোমার সাথে–'

'আমার সাথে তোমার নিজের ভিড়া সম্ভব ছিল না, কারণ আমি বুইঝা ফালাইতাম, আর এই কারণেই ছোটো একটা নাটক কইরা তুমি নুক্কুনরে ভিড়ায়া দিলো। ও কি তুমগো দলের লোক?'

হা-হা করে জোরে জোরে হেসে উঠল গেড়ুয়া। 'হাসাইলা হুজুর, ও সাধারণ এক পাগল, যে-পাগলের মতো বন্দর বাজারে নিজের পরিবাররে খুঁইজা বেড়াইতেছিল। আমি খোঁজ নিয়া জানতে পারি হের পরিবার যুদ্ধ এলাকায় হারায়া গেছে বহু আগে। আর হেয় তাগোরে খুঁইজা বেড়াইতাছে। যে-মানুষটারে কেউই মানুষ মনে করে না। তারে কাছে ডাকলাম, তার পরিবারের দোহাই দিলাম এবং বললাম তার পরিবারের খোঁজ আমার কাছে আছে।'

এবং তার পরিবারের দোহাই দিয়া তুমি তারে,' মাসুম ফিরে তাকাল নুক্কুনের দিকে। লোকটা অবিশ্বাসের সাথে তাকিয়ে আছে গেড়ুয়ার দিকে। 'তুমি নুক্কুনের মতো একটা মানুষের সাথে ধোঁকাবাজি করলা?' মাসুম নিখাদ অবিশ্বাসের সাথে বলে উঠল।

'হুজুর, আমি, তার সাথে ধোকাবাজি করি নাই, আমি তার দুর্বলতারে পুঁজি করছি স্রেফ,' গেড়ুয়া খুব গম্ভীর ভঙ্গিতে বলে উঠল। 'আমি তার সব হারানো জীবনটারে একটা গতি দিছি, আশা দিছি। হ এইটা স্বীকার করতে দ্বিধা নাই যে তারে আমি ব্যবহার করছি। কিন্তু প্রতিদিন যেখানেই তোমার মতো মানুষেরা আমগোর মতো মানুষগো নিত্যপ্রয়োজনে পশুর মতো ব্যবহার করো, সেইহানে আমি স্রেফ পথ হারা একটা মানুষরে পথের দিশা দেখায়া ব্যবহার করছি তাও দেবীর জন্যে।'

মাসুম নুক্কুনের দিকে দেখছে। গেড়ুয়ার কথা শুনতে শুনতে মানুষটা উন্মাদের মতো ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাসের সাথে মাথা নাড়ছে, তার দুই চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু।

'আর এখন, এই মানুষটা যখন নিজের শেষ আশাটুকুও হারাইল এখন তুমি কী করবা?' মাসুম গম্ভীর ভঙ্গিতে বলে উঠল। ও আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই নুক্কুন চিৎকার করে দৌড়ে আসতে শুরু করল গেড়ুয়ার দিকে। 'আমার পরিবার, আমার বাচ্চারা–'

গেড়ুয়া নিজের দেহটা নিয়ে অস্বাভাবিক দ্রুততার সাথে উঠে দাঁড়াল। আগুয়ান নুক্কুনের গলা চেপে ধরে তার হালকা-পাতলা দেহটা স্রেফ পাটখড়ির মতো শূন্যে তুলে ফেলল। 'তোর পরিবার বহুত আগেই শেষ হয়া গেছে। এইটা তোর পাগল মাথার ভিতরে ঢুকায় নে, তোর কপাল যে তোর মতো একটা মানুষ দেবীর কামে সহায়তা করছস,' ক্ষণিকের জন্যে মাসুমের মনে হলো গেড়ুয়া হাত দিয়ে চেপে নুক্কুনকে মেরেই ফেলবে। কিন্তু তার আগেই রাগের সাথে ধমকে উঠল মাসুম। 'ছাড় ওরে, ছাড় বলতাছি।'

গেড়ুয়া তাও ছাড়ল না নুক্কুনকে,' তার টকটকে লাল চোখ দেখে মনে হচ্ছে আগুনের হলকা বেরোচ্ছে। আর নুক্কুনের চোখ দুটো মনে হচ্ছে টপ টপ করে খসে পড়বে গলার তীব্র চাপে। তাও সে নিজের পাটকাঠির মতো হাত দুটো দিয়ে গেড়ুয়াকে আঘাত করার চেষ্টা করছে। 'ছাড় ওরে, আবারও সাবধান করতাছি।'

গেড়ুয়া নুক্কুনের গলার চাপ কমিয়ে তাকে ছেড়ে দিতেই মাটিতে পড়ে গেল নুক্কুন। গড়িয়ে দেওয়ালের একপাশে সরে গিয়ে জুবুথুবু হয়ে পড়ে রইল মাটিতে। কান্নার দমকের সাথে সাথে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল তার পিঠ।

'যথেষ্ট নাটক হইছে। এইবার বলো, আমগোরে বন্দি কইরা রাখছ কেন?' অনেকক্ষণ পর ঝাঁঝাল রাগের সাথে বলে উঠল রায়েলি। 'কী চাও তুমি?'

নিজেকে সামলে নিয়ে পোশাক টেনেটুনে ঠিক করে নিলো গেড়ুয়া, দুঃখিত হুজুর, বেগম সাহেবা,' বলে সে রায়েলি আর সুবাদারের স্ত্রীর দিকে ফিরে সামান্য মাথা ঝাঁকাল। 'হঠাৎ রাইগা গেছিলাম, দুঃখিত আমি।'

'গেড়ুয়া, নাটক বাদ দিয়া কথা বলো–' মাসুমও শান্ত সুরে বলে উঠল।

'আমি সরাসরিই কথা কই, প্রথমে আমি ওইটা খুলব,' বলে সেই বড়ো সিন্দুকটা দেখাল। 'বহুত কষ্ট আর ঝামেলার পর এইটা আমগোর লাইগা দেবীর আশীর্বাদ,' বলে সে আবারও নিজের দুই হাত জড় করল। 'দেবী যেহেতু আমগো পরিশ্রমরে স্বীকার কইরা নিছে, কাজেই তুমগো জিনিস আমগো ভেট আর তুমরা দেবীর ভোগে যাবা। এতগুলা মানুষ, তাও যোদ্ধা, এতগুলা ভেট দেবীর সন্তুষ্টির জন্যে যথেষ্ট,' বলে সে শোরগোল শোরগোল তুলতেই তার দলের লোকেরাও শোরগোল তুলল।

'তার মানে তুমি সবাইরে হত্যা করবা?' মাসুম বলে উঠল।

'তোমার কোনো ধারণাই নাই তুমি কত বড়ো ভুল করতে যাইতেছ,' রায়েলি আবারও শান্ত স্বরে বলে উঠল। 'আসলে করতে যাইতেছ না, কইরা ফালাইছ,' রায়েলির শান্ত স্বর শুনে সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'মেয়েমানুষের আব্রুর ভিতরে থাকা উচিত, অমি সম্মান করি তাই বইলা–'

'তুমি আমগোরে ধইরা নিজের আর দলের বাকি সবার মৃত্যু ডাইকা আনছ, যেই মুহূর্তে তুমি ওই সিন্দুক খুলবা, তুমি শেষ।'

গেড়ুয়া আগেরবার রাগের সাথে ওদের দিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু এবার যেন খানিকটা দ্বিধার সাথে ওদের দিকে দেখল। একবার সে মুখ খুলে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল; তার আগেই তার দলের একজন যে প্রাঙ্গণের ওপর প্রান্তে পাহারা দিচ্ছিল চিৎকার করে উঠল। তার চিৎকার শুনে সেদিকে ফিরে তাকাল সবাই। দৌড়ে সেদিকে এগিয়ে গেল গেড়ুয়া। তার দলের লোকেরাও শোরগোল করতে শুরু করেছে।

মাসুম চিৎকার করে জানতে চাইল হচ্ছেটা কী। গেড়ুয়ার দলেরই একজন উত্তেজনা আর ভয়ের সাথে বলে উঠল, 'মোঘল আর ডাকাইতেরা পুরা খণ্ডর ঘিরা ফালাইছে।'

মাসুম কিছু বলার আগেই ওর পাশ থেকে ফিক করে হেসে উঠল রায়েলি। 'বলছিলাম না, ওরা আমগোরে ধইরা নিজেগোর ধ্বংস ডাইকা আনছে,' বলে সে ফিরে তাকাল মাসুমের দিকে। 'সেই সাথে আমগোরও।'

বর্তমান

করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ

প্রথম গাড়িটা নরসুন্দা নদীর ব্রিজ পার হয়ে ছোটো একটা বাজারের মতো এলাকায় প্রবেশ করতেই পাশের সিটে বসা লম্বা চুলের ছেলেটা ড্রাইভারের কাছে জানতে চাইল, 'আমাদের কি একবার কাউকে জিজ্ঞেস করা উচিত ঠিক পথে যাচ্ছি কি না?'

ড্রাইভার লোকটা গাড়ির গতি কমালেও পুরোপুরি থামিয়ে দিলো না। বরং সে ছেলেটার দিকে একবার তাকিয়ে জানতে চাইল, 'আপনের কম্পিউটার কি কয়, ঠিক পথে আছি নাকি?' প্রশ্নটার ভেতরে এমন একটা সহজাত টিটকারির ভঙ্গি ছিল পেছনের সিটে বাশারের পাশে বসা কালো পোশাক ফিক করে হেসে ফেলল।

'না, মানে ইয়ে,' ছেলেটা আমতা আমতা করছে দেখে ড্রাইভার লোকটা বলে উঠল, 'জিগানির দরকার নাই, আমরা ঠিক রাস্তাতেই আছি।'

বাশার বাইরের দিকে তাকাল। বিকেলের লালিমা পার হয়ে সন্ধের অন্ধকার নেমে আসছে। সকাল বেলা লঞ্চে করে রওনা দেওয়ার পর ওদেরকে আলাদা কেবিন দেওয়া হয়, সেই সাথে পরিচ্ছন্ন হয়ে পোশাক বদলাবার ব্যবস্থা এমনকি ভালো খাবার এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়। কিন্তু সেই সাথে প্রহরা ছিল সেরকম টাইট। তবে বাশার ওই সময়টা বিশ্রাম নেওয়ার পাশাপাশি চিন্তা-ভাবনার সময় পেয়েছে এবং সেই সময়টাতে সে বেশ কিছু ব্যাপার অনুধাবনও করতে পেরেছে। তবে শুরু থেকে সে চুপ করেই ছিল। ওদের লঞ্চ নদী পথে এগিয়েছে যতটা সম্ভব। এরপরে কিশোরগঞ্জে এসে ওরা একটা নাম না জানা খুবই ছোটো এবং নির্জন ঘাটে নামে দুপুরের পর দিয়ে। সেখানে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল ওদের জন্যে। দুটো গাড়িতে করে ওরা সোজা কিশোরগঞ্জ শহর থেকে পুরাতন থানা মোড় হয়ে হয়ে চলে আসে করিমগঞ্জের পথে। সেখান থেকে হাইওয়ে ধরে পাঁচ কিলো মতো এসে রাস্তা মোড় নেয় ডানে। ওখানে জঙ্গলবাড়ি দুর্গের সাইনবোর্ড লাগানো ছিল। ওরা দুটো গাড়িতে করে এসেছে। কিন্তু ওই মোড় পার হবার পরই রাস্তার পাশে নির্জন হাইওয়েতে আরও নির্জনতম স্থান দেখে গাড়ি দুটো অপেক্ষা করতে থাকে। বাশার কালো কোটকে জিজ্ঞেস করেও তেমন কোনো সদুত্তর পায়নি। তবে সে ঠিকই অনুধাবন করতে পেরেছে কেন ওরা অপেক্ষায় ছিল। ওরা আসলে সন্ধে নামার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

ঠিকই দিনের আলো বিকেল পার হতেই গাড়ি উঠে পড়ে নরসুন্দা নদীর ব্রিজের ওপরে। ওটা পার হতেই ছোটো একটা বাজারে আছে এখন ওরা।

বাশার গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখতে পেল গ্রামের বাজারে সন্ধের আলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। লোকজন গঞ্জের চায়ের দোকানে বসে অলস আড্ডা দিচ্ছে। কিন্তু বেশিক্ষণ দেখার সুযোগ হলো না। বাজারটা পার হতেই কয়েক মিনিটের ভেতরেই ওরা একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেল, চালানোর ধরন দেখে বাশার পরিষ্কার অনুধাবন করতে পারল এই লোক এখানে আগেও এসেছে বহুবার। সাইনবোর্ডটাকে দেখেই বাঁয়ে মোড় নিতেই ওরা দেখতে পেল সামনে একটা বিরাট দিঘি, দিঘিটার বিপরীতে একটা মসজিদ। আর মসজিদের পরেই শুরু হয়েছে পুরনো একটা আকৃতি। আধো অন্ধকারের ভেতরেও দেখলে বোঝা যায় আকৃতিটার আসলে খুব বেশি অবশিষ্ট নেই।

প্রথম গাড়িটা গিয়ে বিরাট দিঘি আর মসজিদের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল। ওটার ঠিক পেছনেই ওদের সাথে আসা দ্বিতীয় মাইক্রোটাও এসে দাঁড়িয়ে গেল।

'মিস্টার বাশার,' ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু ইশারা করল কালো কোট। 'ইটস টাইম টু দ্য গ্লোরি।'

'আপনি কি নিশ্চিত যা খুঁজছেন তা এখানে পাবেনই। শতভাগ নিশ্চিত?' বাশার ওর পাশে বসা গার্ড লোকটাকে একবার দেখে নিয়ে আবার কালো কোটের দিকে ফিরে তাকাল।

'মিস্টার বাশার আপনাকে একটা কথা বলি,' বলে সে মৃদু হেসে উঠল। 'ট্রাস্ট মি, এখানে কী ঘটছে আপনি এখনও তার কিছুই জানেন না। আপনি কল্পনাও করতে পারছেন না আসলে কীসের ভেতরে আছেন, বিষয়টা কতটা গভীর।'

'তাই নাকি, খানিকটা আলোকিত করেন প্লিজ,' বাশারও কালো কোটের মতোই একই ভঙ্গিতে হেসে বলে উঠল।

'এখন কাজের সময় মিস্টার বাশার, আর যদি আপনি লাকি হোন তবে শুধু বোঝা নয়, একেবারে দেখেই আলোকিত হতে পারবেন। চলুন।'

ওরা গাড়ি থেকে নেমে দেখতে পেল পেছনের মাইক্রোটা থেকে বাকিরা সবাই নেমে এসেছে।

কালো কোট নিজের পোশাক টেনে ঠিক করে সবার দিকে ফিরে বলে উঠল, 'আমরা এখানে থাকা প্রতিটা স্ট্রাকচার পরীক্ষা করব। আমার গার্ডরা প্রস্তুত থাকবে। কাজেই কোনো ধরনের চালাকি বা কিছু করার চেষ্টা করে লাভ হবে না। আমার ধারণা এখানে অথরিটি বা এরকম কেউই নেই। কিন্তু যদি থাকেও বা স্থানীয়রা কেউ কোনো প্রশ্ন করে তবে আমরা যথাযথ আইডি দেখাব। কাজেই সবাই আমাদেরকেই ট্রাস্ট করবে, কাজেই উলটাপালটা কিছু না করে বরং সহায়তা করুন। প্রাণে বাঁচবেন এবং সবকিছু দ্রুত শেষ হবে। লেটস গো।'

ওরা সবাই ফিরে তাকাল ঐতিহাসিক জঙ্গলবাড়ি দুর্গের প্রায় ধ্বংস হওয়া আকৃতির দিকে।

***

অতীত

জঙ্গলবাড়ি দুর্গ

দুর্গের প্রাঙ্গণের বিরাট আকৃতিটার সীমানার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা সবাই। সেই সাথে দুর্গের সামনের প্রাঙ্গণে পরিখার ওপাশে বিরাট বাহিনী দাঁড়িয়ে আছে। পোশাক দেখলেই বোঝা যায়, মোঘল বাহিনী, তবে ওরা অবাক হয়ে দেখল শুধু মোঘল বাহিনীই নয়, তাদের সাথে কালো কোট আর লাল পাগড়ি পরিহিত আরেকদলও অছে, এই পোশাকও অপরিচিত নয়।

'সর্বনাশ! এইটা তো পুরা বাহিনী চইলা আসছে,' গেড়ুয়া আনমনেই বলে উঠল। এই প্রথমবারের মতো মাসুম তার গলায় দ্বিধা এবং যেন খানিকটা ভয়েরও ছাপ টের পেল।

'এইবার কী মনে হয়?' মাসুম কিছু বলার আগে ওদের পাশ থেকে রায়েলি বলে উঠল। 'তোমারে বলছিলাম না, আমগোরে ধইরা কত বড়ো ভুল করছ, টেরও পাও নাই। এইবার টের পাইতাছ?'

গেড়ুয়া কিছু বলল না। সে শুধুই সামনে তাকিয়ে আছে, আর যেন খানিকটা বিহ্বলও বটে। মোঘল বাহিনী দুর্গটা ঘিরে ফেলার সাথে সাথে পাঙ্গুদের দলটা এমনভাবে চমকে গেছে যে ওদেরকে আর পাহারা রাখারও প্রয়োজন বোধ করছে না। সবাই এসে দাঁড়িয়ে প্রাঙ্গণের কিনারার দিকে, সেই সাথে মাসুমেরাও।

'কিন্তু ওরা টের পাইল ক্যামনে আমরা এইহানে আসছি?' গেড়ুয়ার দলের অন্য একজন বলে উঠল।

'ওই যে,' মাসুম পুরো বাহিনীর সম্মুখভাগের একপাশে দেখাল যেখানে কালো পোশাক আর লাল পাগড়িদের দলের একাংশ দাঁড়িয়ে আছে। 'ওইটা বিশা ডাকাইতের বাহিনী,' মাসুমের কথা শুনে গেড়ুয়া থেকে শুরু করে সবাই চমকে উঠল এবং সাথে সাথে এটাও অনুধাবন করতে পারল মোঘল বাহিনী এখানে কীভাবে পৌঁছেছে।

'আমরা ওগোরে চরের ওইখানে ধাক্কা দেওয়ার পরে বিশা ডাকাইত বুঝতে পারে আমরা দলে যত ছোটোই হই আমগোরে চট কইরা ওরা কাবু করতে পারবো না। কাজেই সে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়া মোঘলগোর লগে যোগাযোগ করে। মোঘলগোর লগে ওর কী চুক্তি অইছে জানি না। তবে এইটা বুঝতে পারছি যে বিশা এই এলাকার সব জায়গায় থাকা তার নিজের লোক ব্যবহার করছে আমগোরে খুঁইজা বাইর করতে, আর এরপরে সে মোঘলগোর লগে আইসা উপস্থিত হইছে। আর মোঘলগোর বাহিনীর আকৃতি দেইখা আমি অভিজ্ঞতা থেইকা কইতে পারি, এইটার নেতৃত্বে আছে বড়ো কোনো নেতা,' বলে সে ফিরে তাকাল গেড়ুয়ার দিকে। 'খালি তুমি মর নাই, গেড়ুয়া, তোমার দলের সব লোক, তোমার দেবী আর আমরাসহ মরছি।'

সবাই নিশ্চুপ ভঙ্গিতে তাকিয়ে মাসুমের দিকে। উপস্থিত প্রতিটা লোক বুঝতে পারছে। মাসুম যা বলেছে তার প্রতিটা অক্ষর সত্যি।

'এখন তাইলে করণীয় কী?' কেউ একজন বলে উঠল।

মাসুম সামনের দিকেই তাকিয়ে ছিল সে হঠাৎই সামনে দেখিয়ে বলে উঠল, 'করণীয় কী সেইটা নির্ভর করতাছে ওইখান থেইকা যা আসতাছে সেইটার ওপরে।'

সবাই তাকিয়ে দেখতে পেল, মোঘলদের বিরাট বাহিনীর সামনে থেকে একটা ঘোড়া এগিয়ে আসছে ওদের পরিখার দিকে। তাতে সাদা পতাকা হাতে বসে আছে একজন লোক। ঘোড়াটা পরিখার সামনে এসে থেমে গেল।

'ফরমান আসছে,' যাও গিয়া দেখ কী বলে ওরা।

গেড়ুয়া তার নিজের তিন সঙ্গীকে নিয়ে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। ওরা অপেক্ষা করতে লাগল প্রাঙ্গণে। খুব বেশি সময় নিলো না। ওরা দেখতে পেল ঘোড়াটা ফিরে যাচ্ছে আর গেড়ুয়ারাও উঠে আসছে।

মাসুম, ওকে দেখে মৃদু হেসে উঠল, 'বাহরাম খাঁ আর বিশা ডাকাইত, দলে আছে তাই না? ওরা আমগোরে ওগো হাতে তুইলা দিতে কইছে, ওই জিনিসটাসহ। বিনা শর্তে, কোনো ঝামেলা ছাড়াই, তাই না?'

মাসুম কথাগুলো বলতে বলতে অনুভব করল ওর ঠোঁট কাঁপছে। জীবনে সম্ভবত প্রথমবারের মতো একই কথা বলার সময়ে তিনবার সে তাই না শব্দটা উচ্চারণ করল।

গেড়ুয়ার মাথা নাড়ানো দেখেই বুঝতে পারল ও ভুল বলেনি।

'তোমার লাইগা একটা উপহারও পাঠাইছে মোঘলগোর সেনাপতি,' বলে সে ভেজা থলের মতো কিছু একটা এগিয়ে দিলো মাসুমের দিকে। জিনিসটা দেখেই বুকটা ধক করে উঠল মাসুমের। থলেটা খুলতেই ওটার ভেতর থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল মোঘল বাহিনীতে ওর বন্ধু বরকতের খণ্ডিত মস্তক।

আনমনেই মাথা নাড়ল ও। *কোথায় সে নিজের বীর মসনদে আলার জন্যে একটা কাজ উদ্ধার করতে আসছিল, আর এখন কি না সেই জিনিস তুলে দিতে যাচ্ছে শত্রুর হাতে। ওর কারণেই মৃত্যু হলো ওর বন্ধুর। ঈশা খাঁর বাহিনীর কী অবস্থা কে জানে। যে-সহায়তা পাবার কথা ছিল তার, তা তো পাইলোই না উলটো এখন ওরাও সব হারাইব।*

***

অতীত

ব্রহ্মপুত্র আর শীতলক্ষ্যার সঙ্গমস্থল

জঙ্গলবাড়ির দুর্গে মাসুম যখন সময়ের অপেক্ষা করছে ঠিক সেই সময়ে মসনদে আলা ঈশা খাঁ হতবিহ্বল ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে তার সামনের মাটিতে পড়ে থাকা শত্রুর রক্তাক্ত মৃত শরীরের দিকে। ক্ষণিক আগেও যেখানে বিজয় আর স্বস্তির আনন্দ তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত হয়ে চলছিল, পলকের জন্যে তার মনে হয়েছিল যে-কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের জন্যে সে দীর্ঘদিন অপেক্ষায় ছিল সেই বিজয় অবশেষে ধরা দিয়েছে, যে-বিজয়ের জন্যে পুরো বাঙাল মুলুক, পুরো বারো ভূঁইয়া সমাজ অপেক্ষায় ছিল সেই বিজয় অবশেষে অধরা হতে হতেও ধরা দিয়েছে। ঈশা খাঁ যতটা হতবিহ্বল ভঙ্গিতে ছিল তারচেয়ে বেশি হতবাক নিজের রক্তাক্ত তরবারি

খাপে ঢুকিয়ে মাথা থেকে শিরস্ত্রাণটা খুলে আনল। যা ঘটেছে সেটা বিপর্যয় না কমিয়ে বরং আরও বেড়ে গিয়েছে। কারণ ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে একটা ভয়াবহ।

এগারো সিন্ধুর যুদ্ধে প্রথম কয়েকদিন যুদ্ধের ময়দানে ঈশা খাঁর অনুপস্থিতির পর যখন ছড়িয়ে পড়ল যে ঈশা খাঁ মানসিংহের ভয়ে ময়দানে আসছে না ঠিক সেই সময়ে ঈশা খাঁ নিজেদের শক্তি সামর্থ্য এবং সম্মান সবকিছু বিবেচনা করে এক চাল চালে। সে মানসিংহকে পত্র পাঠিয়ে দ্বৈতযুদ্ধের জন্যে আহ্বান করে। তার পত্রে সে জানায়: অযথা রক্তপাত না করে বরং পুরনো কায়দায় এর সমাধান করতে চায় সে। দুই দলের নেতার ভেতরে যুদ্ধ হোক, যে শক্তিশালী সেই টিকে থাকবে। যে হেরে যাবে সে সার্বিকভাবে পরাজিত ঘোষিত হবে। মানসিংহের তরফ থেকে প্রথমে কোনো জবাব আসছিল না। তারপর সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে সমরসাজে সজ্জিত হয়ে উপস্থিত হয় সে। ঈশা খাঁও কোনোরকম দ্বিধা না করেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপরে। প্রথমভাগে কিছুক্ষণ সমানে সমানে লড়াই হলেও কিছুক্ষণের ভেতরেই অপরপক্ষ ধীরে ধীরে দুর্বল প্রমাণিত হতে থাকে এবং কিছুক্ষণের ভেতরেই ঈশা খাঁর প্রবল আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে প্রতিপক্ষ বধ হতে শুরু করে এবং সুযোগ বুঝে ঈশা খাঁর তরবারির তীব্র আঘাতে লুটিয়ে পড়ে সে।

শত্রুকে পরাজিত করার আনন্দে পুরোপুরি উদ্বেলিত হবার আগেই মাটিতে লুটিয়ে পড়া মৃত শত্রুর চেহারা উন্মোচিত হতেই সবাই চমকে ওঠে।

এত মানসিংহ নয়।

সত্যি কথা হলো ঈশা খাঁর পত্র পেয়ে মানসিংহ সত্যিকার অর্থে ভাবতেই পারেনি কোনো বাঙালি তার সাথে যুদ্ধের যোগ্য এবং সে ঈশা খাঁর শক্তি-সামর্থ্য পরীক্ষা করার জন্যে তার জামাতা দুর্জন সিংকে লড়াই করার জন্যে পাঠায়। সে ভেবেছিল কোনো বাঙালির শরীরে এত শক্তি থাকতে পারে কিংবা কোনো বাঙালির এতটা সাহস থাকতে পারে যে, তার সাথে লড়াই করবে। তাই সে দুর্জন সিংকেই লড়াই করতে পাঠায়। কিন্তু এভাবে যুদ্ধ এমনকি পুরোপুরি শুরু হবার অগেই ঈশা খাঁর আঘাতে দুর্জন সিং মৃত্যু বরণ করবে ভাবতেও পারেনি কেউই।

যে মুহূর্তে দুর্জন সিংহের কর্তিত মস্তক মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, মানসিংহ ক্রোধে চিৎকার করে উঠল। তার সেই চিৎকার প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করল যুদ্ধের প্রান্তরে। হতবিহ্বল ঈশা খাঁর কর্ণকুহরেও সেই চিৎকার প্রবেশ করতে বেশি সময় লাগল না।

ময়দানের অপরপ্রান্ত থেকে ছুটে আসা ঘোড়সওয়ারিকে দেখে ঈশা খাঁ দ্রুত নিজের শিরস্ত্রাণটা পরে নিয়ে মনে মনে বলে উঠল, *আসল যুদ্ধ এবার শুরু হবে।*

বর্তমান

করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ

ঈশা খাঁর জঙ্গল বাড়ি দুর্গের কথা আগে শুনলেও বাশার কখনও এখানে আসেনি। ওরা সবাই মিলে দুর্গের সামনের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াতে বাশার অনুভব করল শুধু ও না বলতে গেলে প্রায় সবাই বেশ হতাশ। কালো কোটের লোকজন শক্তিশালী সার্চ লাইটের মতো দুটো লাইট জ্বালাতেই প্রাঙ্গণের অন্ধকার বলতে গেলে দূর হয়ে গেল। এখন বাশার বুঝতে পারল কেন ওরা রাত হলেও ভয় পাচ্ছিল না। কারণ রাত হলে ওদের কাজ করার মতো যথেষ্ট রিসোর্স আছে। ওরা এসে পৌঁছাতেই স্থানীয় কিছু লোকজন জানতে চেয়েছিল ওরা কারা, কী দরকারে এখানে এসেছে? কালো কোটের লোকেরা কী আইডি দেখিয়ে ওদেরকে দূরে থাকতে বলেছে? এমনিতেও খুব বেশি মানুষ এখানে নেই। তার ওপরে ওরা কড়াকড়ি করতেই বাকি যারা ছিল তারাও চলে গেছে। অতি উৎসাহী কিছু ছোটো বাচ্চাকাচা ছাড়া আর কেউই নেই।

তবে বাশার এসব কিছু নিয়েই ভাবছে না। ও স্রেফ ভাবছে এখানে দুর্গের যে অবস্থা তাতে এখানে কী খুঁজে পাবে সেটাই বুঝে উঠতে পারছে না। কেউ একজন ওর মনের কথা বলেই ফেলল। 'এখানে অবস্থা যে কাহিল তাতে আর কিছু আছে বলে তো মনে হয় না।

'প্রফেসর, লি আর আপনি, মিস পৃথা আপনারা আগে বাড়ুন, আপনাদেরই এখন খেল দেখানোর সুযোগ।

শুধু ওরা না, জন লিও বেশ অবাক হয়েছে দুর্গের অবস্থা দেখে। দুর্গটাকে কোনোভাবেই আর দুর্গ বলার উপায় নেই। কিছু ভাঙা চোরা বাড়ির আকৃতি আর সেগুলোর ভেতরে মোটা মোটা থামের অস্তিত্ব আর বাড়ির মাঝখানের পিলার দেখলে বোঝা যায় একসময় এখানে দারুণ এক দুর্গ ছিল কিন্তু এখন বলতে গেলে প্রায় আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

'খুব বেশি কিছু অবশিষ্ট না থাকলেও, যা আছে সেগুলো আমাদেরকে খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, আমি সবাইকে টিমে ভাগ করে দিচ্ছি এবং কীভাবে কী করতে হবে সেটাও বলে দিচ্ছি। তিনটা টিম থাকবে। প্রথমটায় আমি আর মিস পৃথা, অন্যটাতে আমাদের লোক আর প্রফেসর হামিদ। সম্ভাব্য কী কী ধরনের জিনিস খুঁজে দেখতে হবে সেটাও বলে দিচ্ছি,' বলে সে সবাইকে গোল করে দাঁড় করিয়ে কাজ বুঝিয়ে দিলো। বাশার বুঝতে পারল লি কেন টিমটা এভাবে ভাগ করছে। কারণ যাতে ওরা কিছু পেলেও লুকাতে না পারে বা ইচ্ছে করেই খুঁজে দেখতে না পারে।

কিছুক্ষণের ভেতরেই ওরা ছড়িয়ে চারপাশে দেখতে শুরু করল। প্রথমেই একটা মূল দালানের মতো, ওটার বাইরে প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তর জায়গাটা কীসের এবং এটার গুরুত্ব কী–সেই বিষয়ক একটা সাইনবোর্ড লাগিয়েই দায় সেরেছে। দালানটার ভেতরে ঢুকে ওরা দেখতে পেল ভেতরের অবস্থা বেশ জরাজীর্ণ। বাশার, কালো কোট তার আর গার্ডরা দাঁড়িয়ে রইল। লি, পৃথা আর প্রফেসর কাজ শুরু করল। ওদেরকে হেল্প করল লম্বা চুলের সেই ছেলেটা। ওরা নিজেদের ভেতরে কথা বলতে বলতে প্রথম পুরো দালানটা পরখ করে চলল। বাশার সার্চ লাইটের আলোতে দেখতে পেল ভেতরের দেওয়ালগুলোতে টেরাকোটার কাজ আর পিলারগুলোতে সুন্দর লাল রঙ বাদে জায়গাটার অতীত জৌলুসের বলতে গেলে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তবে অবশিষ্ট অংশগুলোর হারিয়ে যাওয়া জৌলুসের জেল্লার ছাপ দেখলে অনুধাবন করা যায় অতীতের ঝলমলে রূপটা।

'আমি জানি আপনি কী ভাবছেন?' হঠাৎই বাশারের পাশ থেকে কালো কোট কথা বলে উঠল। বাশার তার দিকে ফিরে তাকাতেই সে আবারও বলতে লাগল। 'আপনি হয়তো জায়গাটার এরকম ধ্বংসস্তূপ দেখে ভাবছেন এরকম দুর্গ নিয়ে এত গাল-গল্প এত কাহিনি। কিন্তু সত্যি কথা হলো যা দেখছেন এটা সত্যিকরের দুর্গের মৃহদেহের ছায়া মাত্র। যখন এই জায়গা তার সত্যিকারের রূপে ছিল তখন এর জৌলুস ছিল একেবারেই ভিন্ন। ওই দেখ,' বলে সে ভেতরের দিকে দেখাল। পৃথারা নিজেদের মতো কাজ করছে দেখে বাশারকে নিয়ে কালো কোট চলে এলো ভেতরের কামরায়, 'দেখুন লেখা 'ঈশা খাঁ স্মৃতি জাদুঘর ও পাঠশালা' অথচ কিছুই নেই এখানে,' বলে সে মাটিতে পড়ে থাকা একটা পাথরের টুকরোতে লাথি মারল। 'আমরা জাতিগত ভাবে আজও নিজেদের ইতিহাস আর ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিতে শিখলাম না,' বলে সে আফসোসের সাথে মাথা নাড়ল।

'এই দুর্গ ঈশা খাঁর জঙ্গলবাড়ি দুর্গ নামে পরিচিত হলেও দুর্গটা কিন্তু ঈশা খাঁ নির্মাণ করেননি। তারও আগে আরেকজন অধিপতি ছিল এই দুর্গের। আবার সেই ব্যক্তির আগেও এই দুর্গ আরেকজনের দখলে ছিল। তবে ঈশা খাঁ ব্যাপক সংস্কার করেছিলেন এর।'

'কিছু মনে না করলে একটা জিজ্ঞেস করি,' বাশার বলে উঠল কালো কোটের দিকে তাকিয়ে। 'আপনি এতকিছু জানেন কীভাবে? আপনি কি–'

'না না, আপনি ভুল ভাবছেন, মিস্টার বাশার,' কালো কোট হেসে উঠল। 'আমি আর্কিয়োলজিস্ট বা অ্যাকাডেমিক জগতের কেউ না। আমি পিয়োর ক্রিমিনাল,' কালো কোট সরাসরি তাকিয়ে আছে বাশারের চোখের দিকে। 'আমার ধ্যানজ্ঞান এবং নেশা সবই অপরাধের জগৎকে ঘিরে।'

বাশারও সরাসরি তাকিয়ে আছে তার চোখে। 'আর আমার নেশা পুলিশি জীবনকে ঘিরে।'

দুজনেই দুজনার দিকে তাকিয়ে আছে। কারও চোখের পলক পড়ছে না। দুই শক্তিশালী পুরুষের এই দৃষ্টির লড়াই কতক্ষণ চলত, কে জানে কিন্তু হঠাৎই গার্ডদের একজন দরজার বাইরে থেকে বলে উঠল। ওরা কাজ সেরে বেরিয়ে এসেছে। কথাটা শুনে নিজের লোকের দিকে ফিরে হাত নাড়ল কালো কোট। 'যাও আসছি,' আবার বাশারের দিকে ফিরে সে গম্ভীর ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'চলুন, দেখি কী পেল ওরা।'

বাশার খেয়াল করল, এই প্রথমবারের মতো লোকটা তার বিখ্যাত ঠান্ডা হাসিটা হাসেনি।

অতীত

জঙ্গলবাড়ি দুর্গ

মাসুম সামনের দৃশ্য এবং পরিস্থিতির চাপে যতটা না অবাক হচ্ছে তার চেয়ে বেশি অবাক হচ্ছে গেড়ুয়ার অস্থিরতা দেখে। শান্ত এবং শক্তিশালী পুরুষ মানুষ যখন ভেঙে পড়ে ব্যাপারটা তখন খুব একটা সুখকর হয় না। এই মুহূর্তে মাসুমের ঠিক সেই একই অনুভূতি হচ্ছে গেড়ুয়াকে দেখে। এরকম শান্তশিষ্ট পর্বতের মতো স্থির মানুষটা হটাৎই কেমন জানি অস্থির হয়ে উঠেছে। বারবার এদিক-সেদিক দেখছে নিজের পোশাক টানাটানি করছে কী থেকে কী করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। তার অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে তার দলের লোকজনের ভেতরেও, এমনকি রায়েলির দলের ভেতরেও অস্থিরতা কাজ করছে। কিন্তু অদ্ভুত বিষয় হলো যাদের ঝুঁকি এবং বিপদ সবচেয়ে বেশি তারাই একেবারে শান্ত রয়েছে। মাসুম, ওর সঙ্গীরা, রায়েলি আর মেহের। অথচ বিপদের খাড়া ওদের ওপরেই ঝুলছে সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়ে। 'আমি একটা জিনিস বুঝলাম না, তুমি এত অস্থির হইতাছ ক্যান?' মাসুম শান্ত স্বরে বলে উঠল। যদিও সে কথাটা বলেছে গেড়ুয়ার দিকে তাকিয়ে কিন্তু একবার রায়েলির দিকেও ফিরে তাকাল ও। যদিও মেয়েটার চোখদুটো জ্বল জ্বল করছে কিন্তু সেও একেবারেই শান্ত আছে। ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রতিটা মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখে মাসুম আরেকবার নিশ্চিত হলো আসলে অভিজ্ঞতা মানুষকে অনেক কিছুই মূল্যায়ন করতে শেখায়। মাসুম নিজে এবং ওর দুই সঙ্গী জীবনে এতবার বিচিত্র আর ভয়ঙ্কর সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে যে ওরা সবচেয়ে মারাত্মক অবস্থাতেও শান্ত থাকতে পারে। অন্যদিকে বিচিত্র আর ঝুঁকিপূর্ণ জীবন কাটালেও এ-ধরনের যুদ্ধাবস্থার মুখোমুখি কখনও হয়নি গেড়ুয়া। তার প্রতিক্রিয়া অন্তত তাই বলে।

একটু আগে দুর্গটাকে ঘিরে ফেলার পর বাহরাম খাঁ আর বিশার বাহিনী যখন দূত পাঠায় সেখানে একটাই বার্তা ছিল, সুবাদারের স্ত্রী এবং তার সঙ্গীদেরকে বিনা

শর্তে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। সেই সাথে দুর্গে যারাই আছে সবাইকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আর সেটা করার জন্যে ওরা সময় বেঁধে দিয়েছে স্রেফ ঘণ্টাখানেক। এর ভেতরে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ না করলে ওরা দুর্গ আক্রমণ করবে এবং সেক্ষেত্রে একজনকেও জীবিত ছাড়া হবে না। আর যদি ওরা যথা সময়ে এবং বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করে তবে ওদের জন্যে কিছু সুবিধা থাকবে। কী সুবিধা থাকবে এবং ওরা কী করবে সেই ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি। ওরা জানতে চেয়েও কোনো কাজ হয়নি। ওরা নেতৃস্থানীয় কারও সাথে কথা বলার কথা বলা হলে পাঠানো দূত সরাসরি মানা করে দিয়েছে। মোট কথা ওদের কোনো কথাই শোনা হবে না। দূত চলে যাবার পরই গেড়ুয়া নিজের দলের লোকদের সাথে কথা বলেছে তারপরও ওরা একসাথে হয়ে আলোচনা করছে এখন।

'কী হইল, গেড়ুয়া, কথা বলো না ক্যান? মূল বিপদ তো আমগো তুমি এত অস্থির হইতাছ ক্যান?' মাসুম প্রশ্ন করলেও সবাই তাকিয়ে আছে গেড়ুয়ার দিকে। আর গেড়ুয়া তাকিয়ে আছে মাসুমের দিকে। 'হুজুর, তুমি বুঝবা না। যা ঘটতাছে এইটা পরিষ্কার দেবী মাতার ক্রোধের নিদর্শন, তা না হইলে সব ঠিক আছিল। দেবীর সব নির্দেশ আমি ঠিক ঠাক পালন করছিলাম, সব ঠিক আছিল। খালি খালি,' বলে সে একবার নিজের লোকদের দিকে দেখে নিলো। তারপর মাসুমের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। 'তারচেয়ে বড়ো বিপদ কী জানো? একবার দেবীর উদ্দেশ্যে ভোগের নিয়ত করলে সেইটা করতে না পারলে এইকাল পরকাল কোনোটাতেই মুক্তি নাই,' বলে সে এমন এক কাজ করে বসল মাসুম কল্পনাও করতে পারেনি গেড়ুয়ার মতো লোক করে বসবে।

সে চট করে এগিয়ে এসে মাসুমের হাত জোর করে ধরে বলে ফেলল, 'হুজুর, তুমিই এখানে সবচেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা, একমাত্র তুমিই পারবা কিছু করতে।'

মাসুম অনেকক্ষণ পর রাগের সাথে তাকাল গেড়ুয়ার দিকে। 'তুমি আমার কাছে সাহায্য চাইতেছ?' বলে সে নিজের লোকদেরকে দেখাল। 'তোমার মানুষেরা তোমার জন্যে ঠিক যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তোমার দেবী তোমার জন্যে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, আমার মানুষেরা আমার জন্যে অতটাই, তোমার দেবী যদি তোমার সব হয় আমার মসনদে আলা আর তার নির্দেশ আমার জন্যে সব। আর তুমি এইসব ধ্বংস করতে যাইতেছিলা, একটু আগে। সবাইরে ধোঁকা দিয়া, তুমি বন্দি করছিলা, দেবীর ভোগের জন্যে উৎসর্গ করতেছিলা আরেকটু হইলে। আর সেই তুমি আমার কাছে সাহায্য চাও?' বলে মাসুম নিজের মুখটাকে গেড়ুয়ার দিকে বাড়িয়ে দিলো। 'তুমি আমগোরে মোঘলগোর হাতে উঠায়া দাও, তোমার লাইগা আমার কাছে কোনো সমাধান নাই,' মাসুমের কথা শেষ হতেই গেড়ুয়া যেন ডুকরে উঠল।

সে রায়েলির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'তুমগো তো জীবনের ভয় আছে, হুজুররে বলো কিছু একটা করতে।' রায়েলি রাগের সাথে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই পেছন থেকে কেউ একজন যেন প্রায় গর্জন করে উঠল।

'তুমরা কেউই এই বিপদ থেইকা উৎরানির সমাধান করতে পারবা না। সমাধান আমার কাছে আছে,' সবাই হঠাৎ ভারী গলা শুনে সেদিকে ফিরে তাকাল এবং খুবই অবাক হয়ে দেখল দুর্গের প্রাঙ্গণের মাঝামাঝি কোমরে দুই হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নুক্কুন। একটু আগের ভঙ্গুর মানুষটা যেন হঠাৎই বদলে গেছে, তার সমস্ত অবয়ব থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে শক্তি আর মনোবল।

'সমাধান একটা আমার কাছে আছে, কিন্তু তার জন্যে কিছু মানুষরে মরতে হবে,' বলে সে মাসুম গেড়ুয়া আর রায়েলির দিকে তাকিয়ে নিজের ভ্রু নাচালো। 'কে কে মরতে রাজি আছ?'

অতীত

ব্রহ্মপুত্র আর শীতলক্ষ্যার সঙ্গমস্থল

মৃত্যুভয় ঈশা খাঁ করে না। যে মানুষটা ছোটোবেলাতেই নিজের বাবার মৃত্যু দেখেছে, দেখেছে পরিবারের ধ্বংস, বিক্রি হয়ে গেছে ক্রীতদাস হয়ে, সেই যে-মানুষটা কোনোদিন ভাবেনি যে সে নিজ ভূমিতে পা রাখতে পারবে, সেই মানুষটা আজ পুরো বাংলার প্রতিনিধি। পুরো বাঙাল মুল্লুকের অবিসংবাদিত নেতা, যার কাছে নিজের প্রাণের চেয়ে নিজের মাতৃভূমির মুক্তি এবং স্বাধীনতা অনেক বেশি মূল্যবান। যে-মানুষটার কাছে তার নিজের বাহিনী কিংবা সাম্রাজ্যের চাইতে তার নিজের মানুষদের কল্যাণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সেই মানুষটা যে মৃত্যুভয় করবে না সেটাই স্বাভাবিক। আর সেই কারণেই সে জানে যে মোঘলদের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে তার বাহিনীর কোনো সুযোগই নেই। ঠিক তাই সে চেষ্টা করেছিল ভিন্ন এক শক্তির আশ্রয় নেওয়ার। আর সেটা যখন হলো না, তখন একমাত্র পথ এবং উপায় ছিল দ্বৈত যুদ্ধের আহ্বান। প্রথমত, সে ভাবেনি মানসিংহ এতে সাড়া দিবে। এরপর যখন দিলো এবং যুদ্ধের প্রথম ধাপেই তাকে হারিয়ে দিয়ে সে খুশি হয়ে উঠতে গিয়েও আবিষ্কার করল এ তো মানসিংহ নয়, বরং তার জামাতা দুর্জন সিং। আর দুর্জন সিংয়ের মৃত্যুর পরই মানসিংহ সরাসরি অবতীর্ণ হয়েছে তার সামনে বিগত আধাঘণ্টা ধরে সমানে সমানে চলছে লড়াই।

পুরো যুদ্ধের ময়দানে এমন একটা প্রাণিও নেই যে কি না দম বন্ধ না-করে দেখছে দুই মহারথীর এই লড়াই।

বাঙালিদের বীর ঈশা খাঁ আর মোঘলদের সেরা সেনাপতির লড়াই যে এতটা ভয়ঙ্কর আর সমানে সমান হবে কেউই ভাবতে পারেনি। মোঘলরা তো ভেবেই বসেছিল যে বাঙালির দেহ মনে এতটা শক্তি থাকতেই পারে না যে, সে মোঘল সেনাপতির সাথে লড়াই করতে সক্ষম হবে। কিন্তু দুই যোদ্ধা যখন ময়দানে মুখোমুখি হলো তখই সবাই অনুধাবন করতে পারল দুজনেই সমানে সমান।

টানা লম্বা লড়াইয়ের পর দুই যোদ্ধাই কাউকে বিন্দুমাত্র পিছু হঠাতে না পেরে নিজেরাই পরস্পর থেকে দূরে সরে গেল দম নেওয়ার জন্যে। নিজের ঘোড়ার ওপরে আসীন ঈশা খাঁ দম নিতে নিতে দেখতে পেল খানিকটা দম ফিরে পেতেই আবারও নিজের ঘোড়া নিয়ে তার দিকে ছুটে আসছে মানসিংহ। সাথে সাথে নিজের ঘোড়াটাকে আগে বাড়াল সে-ও। দুই কুলের দুই যোদ্ধা আবারও পরস্পরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল বীর বিক্রমে।

***

বর্তমান সময়
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ

'এর মানে কি কিছুই পাওয়া যায়নি?' এই প্রথমবারের মতো কালো কোটকে খানিকটা উত্তেজিত মনে হলো বাশারের কাছে, গলার স্বরও উঁচু হয়ে গেছে, যেটা একেবারেই তার স্বভাববিরুদ্ধ। একে একে সে দেখে নিলো পৃথা আর প্রফেসর হামিদকে। কিন্তু তার নজর এসে থামল জন লির ওপরে। 'আর ইউ শিয়োর?'

লিকেও খানিকটা নার্ভাস দেখাচ্ছে। সে তার স্বভাবসুলভ বিচিত্র টানের ইংরেজিতে বলে উঠল, 'স্যার, এখানে যা আছে প্রতিটা স্ট্রাকচার পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, এখানে বলতে গেলে তেমন কিছুই নেই।'

'পেছনের ওই বাড়িগুলোতে, ওগুলো দেখে মনে হলো ওখানে মানুষ থাকে,' মূল দুর্গ ভবনের পেছনের মোটামুটি বসবাসের আকৃতিগুলোর দিকে নির্দেশ করল সে।

'ওগুলোতে ঈশা খাঁর বংশধরেরা থাকে,' পৃথা বলে উঠল এবার। 'ওগুলোতেও আসলে খুব বেশি কিছু দেখার ছিল না, তাও আমরা স্কিপ করিনি, উনাদেরকে আপনার লোকেদের আইডি দেখিয়ে প্রতিটা বাড়ি চেক করা হয়েছে,' বলে সে কালো কোটের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'তাও কিছু পাওয়া যায়নি।'

'এক মিনিট,' কালো কোটের গলার স্বর উঁচু হয়ে গেছিল সে নিজেকে কন্ট্রোল করল। 'এখানে যদি আমরা কিছু না পাই তাহলে এর পরিণতি কী হবে জানেন তো

আপনারা, বিশেষ করে তুমি। তোমাকে আনাই হয়েছে এই জন্যে,' কালো কোটের গলার স্বর নিচে নামছে কিন্তু সেই সাথে তাতে একটা হিংস্রভাব ফুটে উঠছে। হঠাৎই সে থেমে গেল। 'আচ্ছা আমি যতটা জানি এই দুর্গের একটা বড়ো অংশ এখানে মাটির নিচে দেবে গেছে। সেগুলোতে কি কিছু খুঁজে দেখা সম্ভব? আমাদের সাথে তো স্ক্যানার আছে মাটির নিচে স্ক্যান করে দেখার মতো।'

'স্যার,' লির গলা কেঁপে উঠছে। 'ওগুলোও স্ক্যান করা হয়েছে। কিন্তু চেক করে দেখার মতো কিছুই পাওয়া যায়নি। একমাত্র উপায় যদি ওগুলো খুঁড়ে দেখা হয়। কিন্তু সেটা তো–'

'সেটা করতে হলে রীতিমতো আর্মি নামাতে হবে সেটা সম্ভব না। আর সেটা যুক্তিযুক্তও না। কারণ এখানে যাই থাকুক না কেন সেটা এতটাও গভীরে থাকা সম্ভব নয়।'

'তাহলে–'

'তাহলে আমি কী জানি?' রীতিমতো গর্জন করে উঠল। কালো কোট মাটি থেকে একটা ঢেলা তুলি নিয়ে সামনের পুকুরে ছুড়ে মারল।

'এক মিনিট। আমরা সব পরীক্ষা করেছি কিন্তু একটা জায়গা বাকি আছে,' কথাটা বলেই পৃথা ফিরে তাকাল বাকিদের দিকে। সবাই কৌতূহলের সাথে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মেয়েটা কী বলছে কেউই বুঝতে পারছে না।

'মিস–'

'এই পুকুর, মানে দিঘিটা, এটা নিশ্চয়ই পরীক্ষা করে দেখা হয়নি–'

'কিন্তু এটা কীভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব?' প্রফেসর হামিদ বলে উঠল।

তার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল কালো কোট। 'প্রফেসর, এটা করার মতো প্রযুক্তি আমাদের কাছে আছে,' বলেই সে লম্বা চুলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'যাও, অ্যাকুয়া স্ক্যানারটা নিয়ে আসো।'

***

অতীত

জঙ্গলবাড়ি দুর্গ

মানুষের ভেতরে নাকি বিশেষ অবস্থায় বিশেষ শক্তির জাগরণ ঘটে। মানুষ তার নিজের শক্তি-সামর্থ্য আর চিন্তার সীমাকে অতিক্রম করে যেতে পারলে নাকি এমন সব কাজ করে বসে যা তার দ্বারা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব হতো না। নুক্কনকে দেখে এই মুহূর্তে তাই মনে হচ্ছে মাসুমের কাছে। তার চেহারা আগের মতোই

এলোমেলো। চোখজোড়া টকটকে লাল আর হ্যাংলা-পাতলা পাটকাঠির মতো শরীর। কিন্তু তার চোখ মুখ শরীর থেকে যেন একটা দ্যুতি ঠিকরে বেরোচ্ছে। সে এইমাত্র তার নিজের পরিকল্পনা পরিষ্কার করে খুলে বলেছে ওদেরকে। তার পরিকল্পনা খুব পরিষ্কার এবং সহজ।

এই দুর্গের সম্মুখভাগ থেকে শুরু করে পেছনের জলাধার এবং প্রায় চর্তুদিক দিয়েই এই দুর্গটাকে ঘিরে ফেলেছে মোঘল বাহিনী। কিন্তু এই দুর্গের একপাশ দিয়ে একটা গোপন পথ আছে যেটার সন্ধান সে জানে। কিন্তু সেখান দিয়ে খুব বেশি মানুষ পালানো সম্ভব নয়। খুব কম মানুষই সেখান দিয়ে যেতে পারবে এবং ওখান দিয়ে পালাতে হলে কিছুটা সময়ও লাগবে। যেহেতু মোঘলরা ওদেরকে সময় বেঁধে দিয়েছে কাজেই ওই পথে পালাতে হলে একটাই উপায় আছে ওরা যারা এখানে আছে তাদের একটা অংশ মোঘলদেরকে আটকে রাখতে হবে বেশ লম্বা একটা। আর বাকি যারা পালাতে চায় তারা ওই সময়ের ভেতরে পালাতে পারবে সেই পথ দিয়ে। এই ক্ষেত্রেও ওদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কারা সামনে রয়ে যাবে এবং কারা পালাবে। যদি ওদের দলের একটা অংশ নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে রাজি থাকে তবেই এই পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব। ওরা সেটা পারবে কি না।

সে নিজের প্রস্তাবনা শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে উঠল, 'আমি ওই গোপন পথ দেখাইতে পারি তয় গেড়ুয়ার মরতে হবে, আমার লগে যেই ধোঁকা সে করছে তার শাস্তি পাইতে হবে ওর,' সে অগ্নিচোখে তাকিয়ে আছে গেড়ুয়ার দিকে।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে মাসুমও ফিরে তাকাল গেড়ুয়ার দিকে। সে ভেবেছিল গেড়ুয়া রেগে যাবে কিংবা রাজি হবে না। কিন্তু খুবই অবাক হয়ে দেখল গেড়ুয়া নুক্কুনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই তার মুখে ফুটে উঠল এক অদ্ভুত হাসি।

'শাস্তি না, এইটা হবে আমার জীবনের লাইগা পরম পাওয়া,' বলে সে ভক্তি ভরে নিজের দুই হাত জড় করল মুখের সামনে। 'এইটাই এইটাই দেবীর ইশারা। আমি নিজেরে দেবীর লাইগা উৎসর্গ করব। নিজের মানুষগো লাইগা উৎসর্গ করব। তয় আমার শর্ত আছে। আমার দলটাকে বাঁচাইতে অইব। সবাইরে না পারলে অন্তত কয়েকজনরে। তবেই আমি নিজেরে উৎসর্গ করব।'

মাসুম একটা হাত তুলল। নুক্কুন যা বলছে সেইটাই সই, এইখানে হিসাব খুব পরিষ্কার। 'গেড়ুয়া, তুমি কাগোরে পাঠাইবা নির্দিষ্ট করো। আমার লাইগা হিসাব পরিষ্কার। আমি তোমার লগে থাকব সামনে। আমার দুই বন্ধু আর বেগম সাহেবা–'

'কোনোদিনই না,' মাসুম কথা ভলার আগেই প্রায় ধমকে উঠল ধোবল। 'তুই আমগো লাইগা নিজের দায়িত্বের লাইগা জীবন দিবি এইটা হইতেই পারে না। আমরাও তোর লগে থাকবো। এইটা নিয়া কোনো কথাই অইব না।'

মাসুম অসহায়ভাবে ফিরে তাকাচ্ছিল বরখার দিকে, বরখাও মাথা নেড়ে সাফ জানিয়ে দিলো এটা নিয়ে আর কোনো কথাই চলবে না।

'ঠিক আছে আর বেগম সাহেবা মেহের–'

'আমি সামনে রয়া যাবো, আমি ধারণা করতাছি তোমরা একটা ফাঁদ পাততে যাইতেছ, তাতে টোপ অইব আমি,' নিজের বিচিত্র টানে বাংলায় কথা বলে উঠল সুবাদারের স্ত্রী মেহের। নিজের ঘোমটার আড়ালও ফেলে দিয়েছে সে।

সবাই অবাক হয়ে ফিরে তাকিয়েছে তার দিকে। 'কিন্তু–' কেউ একজন বলে উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে রায়েলি বলে উঠল, 'তা হয় না, মেহের। তুমি জানো এই ক্ষেত্রে সমাধানটা কী?' রায়েলি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেহেরের দিকে। 'তুমি তো আমার কর্ত্রীই না, আমার বান্ধবীও, আমার বোনও, তোমার ওপরে অনেক বড়ো দায়িত্ব, তুমি বাকিগো নিয়া পালাও, আমি রয়া যাবো।' রায়েলির চোখের দিকে তাকিয়ে মেহের কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রায়েলি তাকে থামিয়ে দিয়ে মাসুমের দিকে ফিরে জানতে চাইল। 'বাঙালি, বলো তোমার পরিকল্পনা কী?'

মাসুম সবার দিকে তাকিয়ে একে একে মাথা ঝাঁকাল। তারপর বলে উঠল, 'নুক্কন, কয়জন যাইতে পারবো আর বাকিরা কই কই থাকবো, এইটা হিসাব কইরা সব ঠিক কইরা ফেলতে অইবে। আমার একটা পরিকল্পনা আছে। তবে সবার আগে মোঘলগরে ফরমান পাঠাও আমরা আত্মসমর্পণ করতে রাজি অইছি।'

***

বর্তমান সময়
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ

এরকম কোনো কিছু এর আগে বাশার কখনও দেখেনি। ছোটো একটা যন্ত্র দিয়ে এত বড়ো একটা কাজ সমাধা করা সম্ভব এটা সে নিজ চোখে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করত না। মূলত পুরো কাজটা করছে সেই লম্বা চুলের ছেলেটা এবং জন লি, আর ওদেরকে হেল্প করছে পৃথা এবং প্রফেসর হামিদ। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে পৃথা কিংবা প্রফেসর হামিদ নিজেরাও আর্কিয়োলজিস্ট হলেও এর আগে তারা এমন কিছু করেনি বা এরকম কোনো স্ক্যানার দেখেনি।

'এটা কাজ করবে তো ঠিক ঠাক নাকি?' প্রফেসর হামিদ ওদের পেছন থেকে জানতে চাইল।

'অব্যশ্যই প্রফেসর, হান্ড্রেড পারসেন্ট। এটা একধরনের ওয়েভ সিগন্যাল প্রেরণ করবে পানির নিচে, সেটা পানির নিচের প্রতিটা সলিড জিনিসকে তরঙ্গের আকারে স্ট্রাকচার ঠিক করে আমাদেরকে দেখাবে। আমরা যা আশা করছি সেটা তো বটেই এমনকি ছোটো ছোটো মাছ পর্যন্ত আমরা টের পাব পানির নিচে।'

'এটার একটা ছোটো ভার্সন আমি দেখেছি বিদেশে বন্ধুরা লেকে মাছ ধরতে গেলে ব্যবহার করে,' অনেকক্ষণ পর সোহেল কথা বলে উঠল।

ওরা ওদের কাজ করছে, চারপাশে বলতে গেলে একরকম গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালো কোটের গার্ডরা। আর অন্যদিকে, দুজন গার্ড ভিন্ন এক প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। এই সুযোগে সোহেলের হাতে মৃদু চিমটি দিলো বাশার। সোহেল ওর দিকে ফিরতেই সামান্য মাথা নেড়ে ইশারা বিনিময় করল ওরা দুজনে। বাশার হয়তো ওকে আরও কিছু বোঝানোর চেষ্টা করত কিন্তু এমন সময়ে সামনে থেকে উত্তেজনাময় চিৎকার শুনে সবাই সেদিকে ফিরে তাকাল। এমনকি বাশার আর সোহেলও এগিয়ে গেল সেদিকে।

'কী ব্যাপার, কিছু পাওয়া গেছে নাকি? বাশার নিজের অজান্তেই আগ্রহের সাথে জানতে চাইল।

'এখনও পুরোপরি নিশ্চিত না, কিন্তু দিঘিটার মাঝামাঝি এক জায়গায় একটা অদ্ভুত আকৃতি চোখে পড়ছে। ওখানে একটা গাছের নিচে সম্ভাব্য স্কয়ার আকৃতির কিছু একটা আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।'

'আসলে কাদার কারণে সম্ভবত আকৃতিটা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না,' এই শীতের রাতে ঠান্ডার ভেতরেও লির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে আছে। 'আসলে আমরা—'

'আমি নিশ্চিত,' এই দেখুন,' বলে ওদের দিকে স্ক্যানারটা এগিয়ে দেখাল। 'দেখুন এই স্পটে যে স্ট্রাকচারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ওটার ভেতরেও স্ক্যান করে একটা চারকোনা আকৃতি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এবং ওটার ভেতরে মেটালের অস্তিত্বও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এই দেখুন,' ওরা সবাই স্ক্যানারটাতে চোখ বুলাতেই দেখতে পেল আকৃতিটা তো দেখা যাচ্ছেই সেই সাথে ওটার একপাশে সম্ভাব্য ম্যাটেরিয়ালের একটা আকৃতি থ্রিডি প্রিন্টের আকারে ভেসে উঠছে।

'কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো এই রাতের বেলা দিঘির ভেতর থেকে এই জিনিস তুলে আনবেন কীভাবে? আমাদেরকে কি সকাল পর্যন্ত—'

বাশারকে ওর কথা শেষ করতে দিলো না কালো কোট। মৃদু হেসে সে বলে উঠল, 'মিস্টার বাশার, আপনার কোনো ধারণাই নেই আমাদের রিসোর্সের বিষয়ে,' বলে সে হাতের ইশারা করতেই ওরা দেখতে পেল একপাশে দুজন গার্ড কীসের প্রিপারেশন নিচ্ছিল এখন দেখতে পেল। দুজনেই পুরোপুরি স্কুবা ডাইভিংয়ের প্রস্তুতি

নিচ্ছিল। কালো কোট ইশারা করতেই নিজেদের মাস্ক পরে নিয়ে কাপালের ওপরে ডাইভিং টর্চ লাগিয়ে ধীরে ধীরে পুকুরে নেমে গেল। 'এই ঘটনার সমাধান হবে আজ রাতেই।'

'অব্যশ্যই অবশ্যই,' তার সাথে সাথে বিড়বিড় করে বলে উঠল বাশার। 'তা তো হতেই হবে।'

***

অতীত

জঙ্গলবাড়ি দুর্গ

শেষবারের মতো সমস্ত প্রস্তুতি দেখে নিলো মাসুম। হাতে একেবারে নির্দিষ্ট সময় ঠিক কতখানি আছে সে জানে না। তবে সেটা শেষ দিকেই হবে কারণ ওরা নিজেদের সমর্পণের ফরমান পাঠানোর পরও দুর্গ ঘিরে থাকা বাহিনী আক্রমণের পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।

প্রস্তুতি নিতে নিতে একবার প্রাঙ্গণের কিনারায় এসে সামনের বাহিনীর প্রস্তুতি দেখে নিয়ে সবার দিকে ফিরে মাসুম বলে উঠল, 'সময় নেই, সময় নেই একেবারে। সবাই জলদি করো,' ও কথা শেষ করে নিজের কাজ সেরে সামনের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল আর্দ্র চোখে নুক্কুন তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'হুজুর, আমার বেঈমানির ক্ষমা কি আমি পাইমু কোনোদিন?' নুক্কুনের ভেজা চোখের দিকে তাকিয়ে আবারও কেমন জানি অদ্ভুত এক মায়া অনুভব করল মাসুম। সে নুক্কুনের এক কাঁধে একটা হাত রাখলো। 'ক্ষমার প্রশ্নই আসে না। তুমি যা করছ তোমার পরিবারের লাইগা করছ। আর এখন যা করতছ সেইটার ঋণ আমি কীভাবে শোধ করবো। যদি তোমার পরিবাররে কোনো সাহায্য করতে পারতাম!'

'হুজুর, আমি আমার নিজের ভবনার জগৎ থেইকা যে-বাইর হইয়া আসছি। আমার পরিবার অনেক আগেই মারা পড়ছে এইটা আমি এখন অনুধাবন করতে পারছি। হেগোরে আমি বাঁচাইতে পারি নাই। কিন্তু অন্য কারও পরিবারের ক্ষতি যাতে না হয় সেইটা আমি দেখব এহন থেইকা,' বলে সে মাসুমের হাত শক্ত করে ধরে ফেলল। 'যদি কোনো উপায় থাকত তয় আমি আপনেরে–'

'তুম ওগো লগে থাক, ওগোরে নিরাপদে রসুল খাঁর এলাকায় পৌঁছানির দায়িত্ব এহন তোমার। যদি এইটা করতে পারো, এইটাই আমার জন্যে অইব সবচেয়ে বড়ো পাওয়া,' বলে সে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল নুক্কুনকে।

'হুজুর, আমরা প্রস্তুত,' গেড়ুয়া বলে উঠল ওর পাশ থেকে। 'আপনে যা যা বলছেন যেইভাবে বলছেন সব সেইভাবেই করা অইছে।'

মাসুম তার দিকে ফিরে মাথা নেড়ে ফিরে তাকাল রায়েলি আর তার পাশে থাকা সুবাদারের স্ত্রীর দিকে। 'বেগম সাহেবা, আপনেরা নিরপদে পৌঁছায়া যান, আর একবার মসনদে আলার কাছে পৌঁছাইতে পারলে আর কোনো ঝামেলা নাই। আর তার কাছে পৌঁছাইলে আমার একটা বার্তা দিবেন তারে,' বলে মাসুম তাকে জানিয়ে দিলো ঈশা খাঁকে কী বলতে হবে। সব শেষ করে ওদের বিদায় জানিয়ে মাসুম ফিরে তাকাল নিজের দুই বন্ধু ধোবল আর বরখার দিকে। ওদের দুজনকে একসাথে চেপে ধরল বুকের সাথে।

'আরে ছাড় ছাড় কী করতাছোস?' ধোবল স্বভাবসুলভ খুশির ভঙ্গিতে বলে উঠল।

'তোগো দুইজনের কী করতে হবে মনে আছে তো, এইটার উপরে কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করতাছে,' বলে মাসুম ফিরে তাকাল দুজনার দিকে। দুজনেই মাথা নেড়ে সায় জানাল।

'চলো,' বলে রায়েলি আর গেড়ুয়ার দিকে দেখল। দুজনেই প্রস্তুত। ওরা এগোতেই ধীরে ধীরে পরিখার ওপরের সেতুটা নামতে শুরু করল। ওটা নেমে পরিখার ওপরে স্থির হতেই সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল মাসুম, গেড়ুয়া আর রায়েলি। গেড়ুয়া আর মাসুম শক্ত হাতে ধরে আছে বিরাট সিন্দুকটা।

যদিও সরাসরি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে তাও মাসুমের মনে একটাই ভাবনা, মসনদে আলা কি করছে এখন, ওরা কি তার কাছে সময়মতো পৌঁছাতে পারবে। *আদৌ কি তার যুদ্ধে কোনো সাহায্য হবে?*

অতীত

ব্রহ্মপুত্র আর শীতলক্ষ্যার সঙ্গমস্থল

মাসুমরা যখন বাহরাম খাঁ আর বিশা ডাকাতের বাহিনীর দিকে এগিয়ে চলেছে ঠিক সেই সময়ে টাঙ্গা গ্রামের যুদ্ধের ময়দানে মনসদে আলা ঈশা খাঁ আর মোঘল সেনাপতি মানসিংহের ভেতরে যুদ্ধ চরমে উঠেছে। মানসিংহ প্রথমে ঈশা খাঁকে তার নিজের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতেই পারেনি। আর সেই বোকামির ফসল গুনতে হয়েছে তার জামাতা দুর্জন সিংয়ের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। দুর্জনের মৃত্যুর পরই ক্রোধে অন্ধ মানসিংহ ঈশা খাঁ কে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু আক্রমণ আর প্রতি আক্রমণের ধাক্কা পালটা ধাক্কা কয়েক দফা কেটে

যেতেই সে অনুধাবন করতে পারে এই বাঙালিকে চট করে হারিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা স্রেফ বাতুলতা। কিন্তু তাই বলে আক্রমণ প্রতিআক্রমণে কোনো বিরতি না দিয়েই পরস্পরকে ঘায়েল করার জন্যে একের পর আঘাত চলতেই থাকে। প্রথম দফা কেউই কাউকে বিরতি না দিয়ে টানা আক্রমণের পর পরস্পর থেকে খানিকটা দূরে সরে যায় তারা দম নেওয়ার জন্যে। এরপরে মানসিংহই আবারও আক্রমণ চালায় ঈশা খাঁর ওপরে এখনও সেই আক্রমণের ধারাই অব্যাহত রয়েছে।

দুই দুইজন বলশালী পুরুষ, সেরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যোদ্ধা একের পর আঘাত প্রতিঘাত আর প্রতিহত করে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে পরস্পরের দুর্বলতা, আবার কখনও কখনও চেষ্টা করছে পরস্পরের জন্যে ফাঁদ সৃষ্টি করে তাতে প্রতিপক্ষকে ফাঁদে ফেলতে। ঈশা খাঁ একেবারেই শান্তভাবে লড়াই করে চলেছে, বলতে গেলে প্রায় বিনা উত্তেজনায় দারুণ কৌশলের সাথে। কিন্তু যতই সময় প্রবাহিত হচ্ছে ততই বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠছে মানসিংহ। প্রতিটা আঘাত এবং প্রতিঘাত যেন তার শরীরের কিংবা তরবারিতে নয় বরং তার ব্যক্তিত্বে গিয়ে আঘাত হানছে। যে-বাঙালিদেরকে সে চিরদিন দুর্বল ভীরু আর কাপুরুষ ভেবে এসেছে সেই বাঙালিদের একজন তার মতো মোঘল বাহিনীর সেরা সেনাপতির সাথে সমানে সমানে লড়াই করে চলেছে এই বিষয়টা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। মানসিংহ যতই উত্তেজিত হয়ে উঠছে ঈশা খাঁ যেন ঠিক ততটাই শান্ত ভঙ্গিতে লড়ে চলেছে। আর এটা আরও বেশি আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে মানসিংহের মাথার ভেতরে।

লড়াই চালাতে চালাতে মানসিংহ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল এভাবে আর নয়। এই লড়াই এখন আর দুই যোদ্ধার লড়াই নয়, বাঙালি বনাম মোঘলদের লড়াই নয় এই লড়াই এখন সম্মান বনাম প্রতিপত্তির লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানসিংহ চট করেই নিজের কৌশল পরিবর্তন করে সরাসরি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। ঈশা খাঁ দেখতে পেল তার প্রতিপক্ষ নিজের প্রতিরক্ষা ভেঙে তার প্রতিরক্ষা ভেদ করে চূড়ান্ত আক্রমণ চালানোর জন্যে ধেয়ে এগোতে শুরু করেছে তার দিকে।

বর্তমান

জঙ্গলবাড়ি দূর্গ, কিশোরগঞ্জ

পুকুর পাড়ের প্রতিটা প্রাণি একবার পানির দিকে দেখছে আবার স্ক্যানারের দিকে তাকাচ্ছে। ডুবুরিরা পানিতে নেমেছে আধা ঘণ্টার ওপরে হয়ে গেছে। আর অন্যদিকে ওদের প্রায় প্রতিটা মুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে স্ক্যানারে। বাশার আনমনেই একবার স্ক্যানারের দিকে তাকিয়ে দেখল, ডুবুরি দুজন ভারী চারকোনা বক্সের মতো কিছু একটা উঠিয়ে নিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ পরেই দুই ডুবুরির একজন পানি থেকে

ওপরে মাথা তুলল। তার ঠিক পর দিয়েই আরেকজন মাথা তুলল। প্রথম জন ওপরে মাথা তুলে হাতের ইশারা করতেই পাড়ে দাঁড়ানো দুই গার্ড কিছু একটা ধরে উঠিয়ে আনতে শুরু করল। বাশার মনে মনে এদের কাজের ধরনের প্রশংসা না করে পারল না, এরা প্রায় প্রতিটা কাজ এত প্রফেশনালি করছে যে তা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখার মতোই। সবকিছু এরা আগে থেকে ভেবে রেখেছে এবং সম্ভাব্য সব ধরনের পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে তো রেখেছেই সবচেয়ে বড়ো কথা যেকোনো কাজের জন্যে এদের আগে থেকেই রিসোর্স এবং প্রয়োজনীয় সব ধরনের উপাদান ঠিক করে রাখাই আছে।

পাড়ের গার্ড দুজন চারকোনা জিনিসটার সাথে আটকানো কর্ডটা ধরে টানতে শুরু করতেই ডুবুরিরা সেটা ছেড়ে দিয়ে ওরা উঠে এলো পাড়ে। আর গার্ডেরা জিনিসটাকে টেনে আনতে আনতেই বাশার আরেকবার ফিরে তাকাল সোহেলের দিকে এবং অবাক হয়ে লক্ষ করল কালো কোট মোটেই জিনিসটা ওঠানোর উত্তেজনায় পাহারা ভুলে যায়নি বা সে উত্তেজনার চোটে সব গুলিয়ে বসে থাকেনি। বরং ওরা জিনিসটাকে উঠিয়ে আনতে আনতেই কালো কোট তার বাকি গার্ডদেরকে দুইপাশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যাতে প্রতিটা লোক নজরের ভেতরে তো থাকেই সেই সাথে বাইরের উটকো কেউ যেন এখানে কোনো ঝামেলাও সৃষ্টি করতে না পারে।

জিনিসটা উঠিয়ে আনতেই বাশার প্রথমবারের মতো ওটার দিকে তাকিয়ে নিজের ভেতরে এক ধরনের গুজবাম্পস টের পেল এবং অবাক হয়ে খেয়াল করল পুরো জিনিসটা এক ধরনের স্বচ্ছ প্লাস্টিকের মতো কিছু দিয়ে মোড়ানো। ওটা কাদার নিচে থাকলেও জিনিসটাকে টেনে পানি থেকে আনতে আনতে ওপরের কাদা পরিষ্কার হয়ে তো গেছেই সেই সাথে, ওটার ওপরের আবরণও বের হয়ে গেছে ওটাকে টেনে পাড়ে উঠিয়ে আনতেই পরিষ্কার দেখা গেল জিনিসটাকে যে বা যারাই ওখানে রেখে থাকুক ওটা একেবারে ইনটেক আছে এমনভাবে মোড়ানো।

'একেবারে এয়ারটাইট করে মোড়ানো হয়েছে,' প্রফেসর হামিদ জিনিসটার দিকে ঝুঁকে ওটাকে পরখ করতে করতে বলে উঠল।

'এটা সেই পনেরো শতকের জিনিস নয়, কেউ এটাকে পরে ট্রান্সপ্লান্ট করেছে। সেই সময়ে নিশ্চিই এই প্লাস্টিক ছিল না,' অন্য কেউ একজন মতামত দিলো।

'কুইক কুইক, হোয়াটএভার এটাকে সোজা গাড়িতে তোল,' কালো কোটের গলায় উত্তেজনা। সে নিরাবেগ গলায় ওটাকে গাড়িতে তুলে ফেলার নির্দেশ দিলো।

'এক মিনিট,' তার গার্ডরা এগিয়ে যাচ্ছিল ওটার দিকে হঠাৎ বাশার চিৎকার করে উঠল, 'ওটা কোথাও যাচ্ছে না। ওটাকে আগে খোলা হবে তারপর অন্য

আলাপ হবে,' বাশারের বজ্রকণ্ঠ শুনে সবাই থেমে গেল এবং সবাই অবাক হয়ে দেখল। বাশারের হাতে একটা কালো পিস্তল সার্চ লাইটের আলোয় চকচক করছে, আর সেটা সোজা তাক করা কালো কোটের দিকে।

'ওটা ভেতরে যাই আছে আগে খোলা হোক, তারপর অন্য আলাপ, আমি দেখতে চাই ওটার ভেতরে কী আছে।'

***

অতীত

জঙ্গলবাড়ি দুর্গের সম্মুখভাগ

গেন্ডুয়া আর রায়েলিকে নিয়ে মাসুম নিচে নেমে আসতেই মোঘল সৈনিকেরা ওদেরকে ঘিরে ফেলল এবং বলতে গেলে জন্তু জানয়ারের মতোই টেনে নিয়ে চলল ওদেরকে। ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো বড়, ভারী সিন্দুকটা।

মাসুমকে পিছমোড়া করে বেঁধে চড় চাপড় মারতে মারতে বাহিনীর সামনে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দেওয়া হলো। মাসুম সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল ঘোড়ার ওপর থেকে নেমে আসছে একেবারে পুরোদস্তুর মোঘল পোশাকে সজ্জিত একজন মানুষ। মানুষটা কে হতে পারে সেটা খুব ভালোভাবেই আন্দাজ করতে পারলেও সে একেবারে পরিষ্কার দেখতে পেল আরেকটু কাছে আসার পর। তার এক সময়ের সতীর্থ মোঘল সেনাপতি, বাহরাম খাঁ।

বাহরাম খাঁ ওর দিকে এগিয়ে এসে, প্রথমে মাটিতে থুতু ফেলল তারপর ভাঙা বাংলা আর নিজের ভাষা মিলিয়ে বলে উঠল, 'মাসুম খাঁ কাবুলি, শালা ভিতু বাঙালি, তোকে জিন্দা পেয়ে খুব খুশি লাগছে। তবে আমার চেয়ে খুশি হবে আরেকজন,' বলে সে ইশারা করতেই মাসুম চোখ তুলে দেখতে পেল ওদের ঠিক পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে পাহাড়ের মতো বিরাটাকায় একজন মানুষ। গায়ে কালো পোশাক আর মাথায় লাল পাগড়ি। 'বিশা সওদাগর, ওরফে ডাকাইত,' মুখ থেকে রক্তাক্ত থুতু ফেলে বলে উঠল সে। 'তোমার সাথে মোলাকাত হয়ে ভালোই লাগল। যদিও আগের মোলাকাতটাই বেশি ভালো আছিল,' বলে মাসুম খিক খিক করে হেসে উঠল। সাথে সাথে বিশা ডাকাত তার বিরাট বপু নিয়ে ওর সামনে এসে সর্বশক্তিতে ওর বুকে লাথি মারল। মাসুম মাটিতে পড়ে যেতেই সে নিজের একটা পা তুলে দিলো মাসুমের বুকের ওপরে। মাসুমের মনে হতে লাগল ওর দম বন্ধ হয়ে

আসছে। কিন্তু কেউ একজন বিশাকে টেনে সরিয়ে নিলো ওর বুকের ওপর থেকে। আবছাভাবে মাসুম শুনতে পেল বিশাকে মানা করা হচ্ছে ওকে এখনি মেরে না ফেলার জন্যে।

মাসুম কোনোমতে উঠে বসতে বসতে অনুভব করল ওর নাক মুখ ভেসে যাচ্ছে রক্তের ধারায়। কোনোমতে ও গেড়ুয়া আর রায়েলির দিকে তাকাল। ওদের দুজনার অবস্থাও খারাপ কিন্তু ওর মতো এতটা মারধর করা হয়নি। ওদের দিকে তাকিয়ে একবার মৃদু হাসি দিয়ে মাসুম একবার দুর্গের দিকে তাকাল, তারপর ফিরে তাকাল বাহরাম খাঁ আর বিশার দিকে। ওদের নিয়ে আসা সিন্দুকটাকে বাহিনীর একেবারে সম্মুখভাগে এনে রাখা হয়েছে। ওটাকে খোলার জন্যে আয়োজন চলছে। মাসুম মনে মনে খুশি হয়ে উঠল, ঠিক এমনটাই তো ও চেয়েছিল। আবারও একবার রায়েলি আর গেড়ুয়ার দিকে তাকাল তারপর দুর্গের দিকে তাকিয়ে ফিরে তাকাল সামনে। মঞ্চ প্রস্তুত, এবার নাটক শুরু হবে।

মোঘলদের একজন সিন্দুকটার আটকানো কবজার ওপরে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতেই ওটা দু-টুকরো হয়ে গেল। সবাই ঝুঁকে আছে সিন্দুকটার দিকে। মোঘল বাহিনীর সৈনিক সিন্দুকটার ডালা মেলে ধরল ওপরের দিকে।

***

বর্তমান সময়
জঙ্গলবাড়ি দূর্গ, কিশোরগঞ্জ

কালো কোট বেশ তীব্র চাহনির সাথে তাকিয়ে আছে বাশারের দিকে। 'মিস্টার বাশার, আপনার করিৎকর্মতা দেখে আমি আপনার প্রশংসা না করে পারছি না। কখন আপনি গার্ডদের কারও থেকে পিস্তল চুরি করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন এত লম্বা সময় ধরে, ব্রিলিয়ান্ট। কিন্তু আপনাকে দেখে তো আমার বোকা মনে হয় না, তাহলে বোকামি করছেন কেন?' বলে সে বাকিদের দিকে দেখল। গার্ডরা এতক্ষণ নিজেদের অস্ত্র লুকিয়ে রাখলেও এবার তারা প্রকাশ্যে বের করে এনেছে সব। আর সেগুলা তাক করা সোহেল, পৃথা, চৌধুরী আর প্রফেসর হামিদের দিকে। 'আপনার কি মনে হয় আপনি একা একটা পিস্তল দিয়ে কী করতে পারবেন? আপনি এমনকি ট্রিগার টেপার আগেই আপনার নিরীহ সাথীরা তো মরবেই সেই সাথে আপনারও–'

'আমি সত্যিই হতাশ হলাম আপনার ওপরে,' বাশার আফসোসের সাথে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে উঠল। 'আপনার কি আমাকে এতটাই বোকা মনে হয় যে, আমি এই একটা পিস্তলের ওপরে ভরসা করে আপনাকে জিম্মি করব?'

কালো কোটকে বেশ বিহ্বল দেখাচ্ছে। 'তাহলে?'

বাশার মৃদু হেসে উঠল তার কথা শুনে। 'সেরের ওপরে সোয়া সের কথাটা শুনেছেন? আপনার ওপরেও যে আরেক পার্টি আমাদের পিছু নিয়েছিল সেটা কি ভুলে গেছেন? নাকি–' বাশার কথা শেষ করার আগেই সোহেলের দিকে তাকিয়ে ইশারা করতেই সোহেল কোনোরকম জানান না দিয়েই লাফ দিলো পৃথার দিকে। সে ঠিক পৃথার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। পৃথাকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল। আর বাশার নিজের হাতের পিস্তলটা ছুড়ে দিলো হতভম্ভ কালো কোটের দিকে। কালো কোট ওটা ধরার আগেই ও প্রফেসর হামিদকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল। আর চৌধুরী আগেই শুয়ে পড়েছে। ওরা লাফ দিতেই একসাথে গর্জে উঠল একাধিক অস্ত্র। আর কালো কোটের গার্ডদের প্রায় সবাই গড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে। শুধু মাঝখানে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে রইল কালো কোট।

লি আর লম্বা চুলের ছেলেটাও দাঁড়িয়ে আছে হতভম্বের মতো। ওদের চারপাশ থেকে হঠাৎই উদয় হলো একদল অস্ত্রধারী। সংখ্যায় প্রায় হাফ ডজন এবং প্রত্যেকের কাছে আধুনিক অস্ত্র তো বটেই মুখেও মুখোশ।

কালো কোট এখনও নিজের বিহ্বল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সে শুধু বলে উঠল, 'ইমপসিবল।'

'এরা কারা?' পৃথা কাঁপতে কাঁপতে জানতে চাইল।

বাশার মৃদু হেসে এগিয়ে গেল পানির নিচ থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসা জিনিসটার দিকে। ওটার ওপরের আবরণটা সরাতেই কাঠের একটা আকৃতি দেখা গেল ওটার ওপরে সেই প্রতীক চিহ্নটা আঁকা যেটা ওরা পৃথার মায়ের কবরের ওপরে দেখেছিল।

প্রতীক চিহ্নটার দিকে দেখিয়ে বাশার বলে উঠল, 'এরা হলো একটা কাল্টের প্রতিনিধি। আর এটা হলো এদের প্রতীক।' পৃথার দিকে ফিরে বলে উঠল, 'তোমার মাও এই কাল্টের একজন ছিল। কি, ঠিক বলেছি?' মুখোশধারীদের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল বাশার।

মুখোশধারীদের একজন পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো বাশারের দিকে। 'ঠিকই বলেছেন ইন্সপেক্টর কিন্তু সবই বুঝতে পেরেছেন একটু সময় নিয়ে ফেললেন আরকি,' বলে সে নিজের লোকদের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'এদেরকে একপাশে করো। এরপর সিন্দুকটা খোলো। আমাদেরকে চেক করে দেখতে হবে সব ঠিক আছে কি না,' বলে সে ওদের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'ইতিহাসের একটা টুকরো দেখতে পাবেন,' বলে সিন্দুকটার দিকে ইশারা করতেই ওদের একজন ওপরের আবরণ সরিয়ে ওটার ডালাটা মেলে ধরল।

***

জঙ্গলবাড়ি দুর্গের সম্মুখভাগ

একের-পর-এক আঘাতের চোটে অবস্থা কাহিল হলেও সামনের দিকে তাকিয়ে মাসুমের তাদের গ্রামদেশে প্রচলিত একটা পুরনো প্রবাদ মনে পড়ে গেল। নেতা থেকে খেতা সবারই কাঁদতে হয়। কথাটার মর্মার্থ হলো মানুষ সমাজ কিংবা অর্থনৈতিক আবরণের যে যে-স্তরেই বাস করুক না কেন, একটা পর্যায়ে সবাই সমান। সামনের দিকে তাকিয়ে মাসুমের এই কথাটা মনে হবার একমাত্র কারণ হলো চাকর-মনিব সবাই এক কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে ওদের নিয়ে আসা সিন্দুকটা দেখার জন্যে। কৌতূহলের সামনে সবাই সমান, মনে মনে ভাবল মাসুম।

মাসুম, গেড়ুয়া, রায়েলিকে বন্দি অবস্থাতেই একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে। আর পুরো বাহিনীর সম্মুখভাগে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সিন্দুকটা খোলার জন্যে। আর ওটার ভেতরে কী আছে দেখার জন্যে ভিড় করেছে মোঘল বাহিনীর প্রতিটা প্রাণী। মাসুম মনে মনে ভাবল ক্ষমতার দম্ভ শক্তি-সম্পদের লোভ মানুষকে অন্ধ করে ফেলে। আর বাহরাম খাঁর ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে। আর তাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেছে বিশা ডাকাত। দুজনেই নিজেদের শক্তি, ক্ষমতা আর লোভের মোহে এতটাই অন্ধ হয়ে গেছে যে একদিকে ওদের কাউকে বাঁধার প্রয়োজন বোধ করেনি, অন্যদিকে নিজেরা নিজেদেরই বাহিনীরই প্রতিরক্ষার দিকে নজর না রেখে সোজা সিন্দুক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাহরাম খাঁ আর বিশা তো বটেই তার বাহিনীর সম্মুখভাবে থাকা লোকরাও সবাই ঘিরে ধরেছে সিন্দুকটাকে, এমনকি ওদের পাহারায় যারা আছে ওদেরও নজর ওদিকেই। নিজের হাতটাকে শক্ত করে ধরে শেষবারের মতো গেড়ুয়া আর রায়েলির দিকে দেখে নিলো মাসুম, সেই মুহূর্তেই বাহরাম খাঁর বাহিনী প্রধানের কোপে সিন্দুকের ডালাটা খুলে গেল, আর একসাথে ঘটে গেল বেশ কয়েকটা ঘটনা।

***

বর্তমান
জঙ্গলবাড়ি দূর্গ, কিশোরগঞ্জ

মুখোশধারীদের একজন ডালাটা মেলে ধরার চেষ্টা করল প্রথম ধাপে সে সফল হলো না। ডালাটার নিচে সেভাবে কোনো তালা না থাকলেও বারবার ওটাতে চাপ দিয়ে কিংবা ধাক্কা দিয়েও কেউই খুলতে পারল না। মুখোশধারীদের একজন প্রথম নিজের

কোমর থেকে পিস্তল বের করতেই সবার সামনে থাকা মুখোশধারী ধমকে উঠল। তারপর সে কিছু একটা বলতেই লোকটা পিস্তলটা কোমরে ঢুকিয়ে কিছু একটা আনতে গেল।

'ব্যাপার কী? এখানে হচ্ছেটা কী?' প্রফেসর হামিদ অনেকক্ষণ পর চেঁচিয়ে উঠল। 'কেউ কি আমাকে বলবে আসলে এখানে হচ্ছেটা কী?'

'সব জানতে পারবেন, প্রফেসর। আর খানিক সময় অপেক্ষা করুন,' বাশার বেশ খুশি খুশি স্বরে বলে উঠল।

'আমরা শুরু থেকে সবকিছু করে এখন সব হারাতে বসেছি আর আপনি কি না হাসছেন?' পৃথা বলে উঠল। বাশার তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে উঠল। 'আসলেই কী?' সে আরও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মুখোশধারীদের একজন ধমকে উঠল। চৌধুরী এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাশারের দিকে। বাশারও মৃদু হাসিমুখে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

কিন্তু অল্প সময় পরেই দৃষ্টি ফিরিয়ে চোখ তুলে তাকাল সামনের দিকে। কারণ সেই মুখোশধারী লোকটা আবার ফিরে এসেছে এবার তার হাতে ক্রোবারের মতো একটা জিনিস। সেটাকে সিন্দুকের পাল্লার সাথে ঠেকিয়ে জোরে চাড় দিতেই *ফুসসস* করে শব্দ হয়ে খুলে গেল। বাশার অনুমান করল, কোনো-না-কোনোভাবে ওটাকে এয়ারটাইট করে রাখা হয়েছিল, যে কারণে এই শব্দ হয়েছে।

ডালাটা খুলে গেলেও ভেতরে সরাসরি কিছুই দেখা গেল না। কারণ ভেতরে আরেকটা স্টিলের পাতের মতো কিছু দিয়ে আটকানো। সেটাকে খুলতে খুব বেশি সময় নিলো না। আর ওটাকে উঠিয়ে আনতেই সবার চোখ গোল হয়ে গেল বিস্ময়ে।

সত্যিকার অর্থেই ভেতরে দামি জিনিসে ভরপুর। রাশি রাশি সোনার মোহর, ভারী গহনা, বিভিন্ন রকম মুর্তি আর দামি পাথরে ভরা। বাশার অবশ্য খুব বেশি অবাক হলো না। ও এরকম কিছুই আশা করেছিল। ও বরং মনোযোগের সাথে আশপাশে দেখতে দেখতে খানিক অবাক হয়ে আবিষ্কার করল ওর মতো ঠিক পৃথাও মোটেই অবাক হয়নি।

বাশার সামনের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখল, সেই প্রথম মুখোশধারী সামনে এগিয়ে গিয়ে অন্য লোকটা যে-ডালাটা খুলেছে তাকে কিছু একটা নির্দেশ দিলো। সেই লোকটা এবং তার সাথের আরেকজন মিলে সিন্দুকের ভেতর থেকে দামি দামি জিনিসপত্র সরিয়ে বাইরে একরকম বলতে গেলে অবহেলার সাথে ফেলে দিয়ে আরও ভেতরে দেখতে লাগল।

'এরা করছেটা কী?' বাশার অনুভব করল ওর পাশ থেকে সোহেল বলে উঠল। এবারও নিজের সামনের দিকে না দেখে বাশার মনোযোগের সাথে আশপাশে

দেখতে লাগল এবং পরিষ্কার দেখতে পেল বন্দি থাকার পরও অত্যন্ত আগ্রহের সাথে কালো কোট সামনের দিকে দেখছে। সাথে সাথে সামনের দিকে তাকিয়ে বাশার আবিষ্কার করল, ওরা যা খুঁজছে সেটা সম্ভবত পেয়ে গেছে।

সেই প্রথম মুখোশধারী সিন্দুকের ভেতর থেকে দুই হাতে ধরে খুবই বিচিত্র দেখতে জ্বলজ্বলে পাথর খণ্ডের মতো কিছু একটা বের করে আনল। জিনিসটা বের করে আনতেই মুখোশধারীরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

বাশার অনুভব করল ওর পাশ থেকে পৃথা কিছু একটা বলে উঠল কিন্তু সেটা না শুনে বাশার ওদেরকে বন্দি করে রাখা পাহারাদারদেরকে উপক্ষো করে সবাইকে ঠেলে ধাক্কা দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে লাগল। ওরা কেউ বাধা দেবার আগেই বাশার পৌঁছে গেল সিন্দুক আর সেই প্রথম মুখোশধারীর সামনে। ওকে দেখার সাথে সাথে একজন এগিয়ে এসে বন্দুক চেপে ধরল ওর মাথার পাশে।

কিন্তু বাশার হাসিমুখে জানতে চাইল, 'যা খুঁজছিলে তা তো পেলে, তবে এখন কী?'

সেই প্রথম মুখোশধারী কিছু একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল তার আগেই বাশার হাসিমুখে বলে উঠল, 'তোমাদের জন্যে অনেকগুলো কঠিন সিদ্ধান্ত আমি একটু সাহায্য করছি কী করতে হবে,' বলে সে নিজের একটা হাত তুলে ইশারা করল অদৃশ্য কারও উদ্দেশ্যে। সাথে সাথে *ধুপ* করে একটা গুলির শব্দের সাথে সাথে ওর মাথার পাশে পিস্তল চেপে ধরে রাখা গার্ডটার খুলি উড়ে গেল।

বাশার এক কদম প্রথম মুখোশধারীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে উঠল, 'তোমরা প্রফেশনালি কাজ করো, কাজেই আমি যা বলছি সেটা তোমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারবে। যদি এক বিন্দু নড়ো কেউ তবে প্রত্যেককে মরতে হবে। এই মুহূর্তে চারপাশ থেকে তোমাদেরকে অন্তত আধা ডজন স্নাইপার ঘিরে রেখেছে। বলে সে মুখোশধারীর বুকের দিকে দেখাল। ওখানে স্নাইপিং রাইফেলের একাধিক লেজার পয়েন্টার লাফালাফি করছে।

'অসম্ভব,' শব্দটা দুজন মানুষের মুখ থেকে একসাথে বেরিয়ে এলো। এখন সেই মুখোশধারী আর অন্যজন সেই কালো কোট।

'অসম্ভব কি না এখনই দেখতে পাবে,' বাশার কথা শেষ করার কিছুক্ষণের ভেতরেই ওদের মাথার ওপরে চক্কর মারতে শুরু করল অন্তত তিন তিনটা হেলিকপ্টার।

'এটা কীভাবে সম্ভব? আমি নিজে তোমাকে নিরস্ত্র করে চেক করেছিলাম,' কালো কোট অবাক ভঙ্গিতে বলে উঠল। 'এতবার এত ভাবে চেক করা হয়েছে, তবুও!'

বাশার মুখোশধারীর থেকে পেছন ফিরে তার দিকে এগিয়ে গেল খানিকটা তারপর মৃদু হেসে বলে উঠল, 'দেওয়ার আর মোর থিংস বিটুইন হ্যাভেন অ্যান্ড আর্থ। তুমি বুঝবে না, মাস্টার জেড,' বলে সে চোখ তুলে তাকাল কালো কোটের দিকে। 'ওটাই তো তোমার কোড নেম, তাই না?'

লোকটা এখনও চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে আছে বাশারের দিকে।

***

বর্তমান
পিবিআই, ধানমন্ডি

যত সন্ধে নেমে আসছে পিবিআই স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসের ব্যস্ততা যেন ততই বেড়ে চলেছে। অন্যান্য দিন যখন এই সময়ে সবাই সারাদিন অফিস করে অলস ভঙ্গিতে চা-কফি খেতে খেতে আড্ডা মারে, আজ সেখানে অফিস আওয়ার পার হয়ে গেলেও সময়ের সাথে সাথে ব্যস্ততা যেন বেড়েই চলেছে। কারণ একসাথে একাধিক জায়গায় একাধিক অপারেশন চলছে।

হাবিব আনোয়ার পাশাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কারও সাথে ঝগড়া করতে যাচ্ছে। তার টাইয়ের নট খোলা, দুই শার্টের হাতা গোটানো। মোবাইলে কথা বলতে বলতে সে অপারেশন রুমে ঢুকল। ওখানে আগে থেকেই পাটোয়ারি, লম্বা চুলের সেই ডেস্ক অফিসার ছেলেটা, মৌসুমি এবং একজন অপারেটর অপেক্ষায় ছিল। তাকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়াতেই খানিক বিরক্তির সাথে সে বলে উঠল, 'তোমাদেরকে না মানা করেছি, আমাকে দেখে এভাবে সবসময় ওঠা-বসা করার প্রয়োজন নেই। এখন কাজের অগ্রগতি কী, বলো।'

'স্যার, ভালোমন্দ দুটো খবরই আছে,' মৌসুমি বলে উঠল।

'আগে ভালোটা বলো,' আনোয়ার পাশা তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। সে অনুমতি দিতেই মৌসুমি অপারেটরের দিকে ফিরে ইশারা করল।

'একাধিক ভালো খবর আছে, স্যার। ওইদিন যে-রিসোর্সের জন্যে আমরা মিটিং করেছিলাম সেগুলো তো পেয়েছিই এবং সেই স্পেশাল সাপোর্ট এবং রিসোর্স টিমের বদৌলতে ইন্সপেক্টর বাশার কেস অনেকটাই সলভ করে ফেলেছে। এইমাত্র কথা হয়েছে তার সাথে।'

'সলভ মানে,' আনোয়ার পাশার গলার স্বর শুনলে যে কেউ ভাববে সে ধমকে উঠেছে। আসলে কাজের সময়ে সে এভাবেই কথা বলে। 'সে প্রফেসর ইফতেখারকে খুঁজে পেয়েছে?'

'না, স্যার,' আনোয়ার পাশার ভ্রু কুঁচকে উঠছে দেখে সে জলদি যোগ করল। 'তা সে পায়নি কিন্তু বলতে গেলে সে বিরাট এক গুপ্তধন আবিষ্কার করে বসেছে কিশোরগঞ্জে। পাশাপাশি নেক্রপলিসের বিরাট এক মহারথী, যে মাস্টার জেড নামে পরিচিত তাকে এবং আরেকটা কি এক কাল্টের মেম্বাররাও ধরা পড়েছে।'

'এই মাস্টার জেড কি সিলেটে ধরা পড়া মাস্টার ডি আর চট্টগ্রামের মাস্টার ইউ এর সাথে কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট নাকি?'

'অবশ্যই স্যার, আমরা ধারণা করছি এ আসলে ওদের চেয়েও বড়ো। এ আসলে ওদের বস হতে পারে।'

'আচ্ছা, আর অন্য কাল্টটা?'

'ওদের ব্যাপারে এখনও বিশদ জানা যায়নি তবে, ইন্সপেক্টর বাশার আরও দুটো কথা বলেছে, সে রাজদ্রোহীর ক্লু খুঁজে পেয়েছে এবং প্রফেসর ইফতেখারের বিষয়েও কিছু নির্দেশনা দিয়েছে আমাদেরকে।'

'ফলো করো, সে যাই বলেছে সেই কাজ করো, এর আগেও সে যা বলেছে সেটা করাতেই ফল পাওয়া গেছে,' বলে সে ভ্রু নাচিয়ে জানতে চাইল, 'এবার খারাপ খবর বলো।'

'স্যার, সিলেট আর চট্টগ্রাম অপারেশন নিয়ে কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছে,' এবার মৌসুমি মুখ ভার করে বলে উঠল।

***

অতীত
জঙ্গলবাড়ি দূর্গের সম্মুখভাগ

শেষবারের মতো মাসুম যেই মুহূর্তে অনুভব করল তাদের সময় সন্নিকটে, একবার সে গেড়ুয়া আরেকবার রায়েলির দিকে ফিরে তাকাল। দুজনেই সায় জানালো, সেই সাথে সিন্দুক খোলার শব্দ ভেসে এলো।

মোঘল আর বিশার বাহিনীর প্রতিটা লোক এগিয়ে এলো সিন্দুকের ভেতরে কী আছে দেখার জন্যে। বিশেষ করে বাহরাম খাঁ আর বিশা, সাথে যে লোকটা ডালাটা খুলেছে সে। তিনজনেই বলতে গেলে একেবারে ঝুঁকে পড়েছে ডালাটার ওপরে। যেই মুহূর্তে ওটা খুলে গেল ওরা কে কী আশা করেছিল মাসুম জানে না, কিন্তু ভেতর থেকে সটান সোজা হয়ে বসল দুটো মনুষ্য মূর্তি। ধোবল আর বরখা তাদের দুজনারই হাতে ধরা একটা করে লম্বা ছুরি। ওরা সোজা হয়ে বসেই হাতে ধরা ছুরি দুটো ঢুকিয়ে দিলো দুই মোঘল সৈনিকের পেটে। সেই সাথে লাফিয়ে সোজা হয়ে

দাঁড়িয়ে দুজনেই হাতে ধরা গোল মতো একটা জিনিস মাথার ওপরে তুলে ধরল যতটা সম্ভব উঁচু করে। আর অন্যদিকে সেটা দেখামাত্রই মাটিতে শুয়ে পড়ল মাসুম গেড়ুয়া আর রায়েলি।

মোঘল বাহিনী প্রথমত এমন কিছ আশাই করেনি। তাই সৈনিক লোকটা পেটে আঘাত পেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেলেও ওরা এমন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল, মুহূর্তের জন্যে বুঝতেই পারল না আসলে কে কী করবে, নিজেদের করণীয় ঠিক করার আগেই ধোবল আর বরখার উঁচু করে ধরা জিনিস দুটোর দিকে উড়ে এলো একাধিক জ্বলন্ত তির। তিরগুলো এসে খট করে গেঁথে গিয়ে মূহূর্তের জন্যে জ্বলতে থাকল, তারপর আগুন ধরে গেল দুর্গে পাওয়া জ্বালানি দিয়ে বানানো বিস্ফোরকের পোঁটলাটাতে, এরপর তীব্র শব্দে গোলার মতো বিস্ফোরিত হলো। তীব্র বিস্ফোরণের ধাক্কায় সাথে সাথে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ওটা ধরে থাকা ধোবল বরখা আর আশপাশের কয়েকজন। বিস্ফোরণের ধাক্কায় অস্ত্রসস্ত্র, জিনিসপত্র আর ঘোড়াসহ এদিক-সেদিক ছিটকে পড়ল মোঘল বাহিনীর পুরো সম্মুখভাগ।

বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে পড়লেও সবাই যখন হতচকিত হয়ে গেছে সাথে সাথে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল মাসুম। হাতের কাছে থাকা এক সৈনিকের বর্শাটা একটানে তুলে নিয়ে ওটা সোজা বসিয়ে দিলো তার গলাতেই। অর্ধমৃত সৈনিকের কোমর থেকে টান দিয়ে বের করে নিলো তলোয়ারটা। ওটা হাতে নিয়েই দেখল উঠে দাঁড়িয়েছে রায়েলি আর গেড়ুয়া। তলোয়ারটা গেড়ুয়ার দিকে ছুড়ে দিয়ে বর্শাটা ছুঁড়ে দিলো রায়েলির দিকে। নিজে মাটি থেকে তুলে নিলো একটা ঢাল আর কুঠার।

খানিক এগিয়েই দেখতে পেল মাটিতে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়ে আছে বাহরাম খাঁ, লোকটা মারা গেছে দেখে আফসোসের সাথে মাথা নাড়ল মাসুম। সেই সাথে অল্প দূরেই দেখতে পেল মাটি থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে বিশা ডাকাত। কুঠারটা মাথার ওপরে তুলে এক চিৎকারের সাথে বিশার মুণ্ডুটা ধড় থেকে আলাদা করে মাসুম ফিরে তাকাল রায়েলি আর গেড়ুয়ার দিকে।

আহত বিধ্বস্ত মোঘল বাহিনীর সম্মুখভাবে দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়ে গেল তিনজনে।

মুহূর্তের জন্যে দুর্গের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল ওটার সামনের অংশ দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে। মনে মনে আশা করল আগুন ধরিয়ে দিয়ে ওরা হয়তো পালাতে পেরেছে।

গেড়ুয়া নিজের রক্ত দিয়ে কপালে তিলক এঁকে মুহূর্তের জন্যে দুই হাত জড় করে রাখল ভক্তি ভরে, তারপর চোখ তুলে তাকাল মাসুমের দিকে। রায়েলি আগে

থেকেই তাকিয়ে ছিল ওর দিকে। তিনজনেই তিনজনের দিকে তাকিয়ে হাসল, তারপর ফিরে তাকাল সামনের শত শত সৈনিকের দিকে। বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে ওরা।

'মাতৃভূমির জন্যে,' বিড়বিড় করে বলে উঠল মাসুম। 'মানবতার জন্যে,' রায়েলি ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। 'দেবীর লাইগা,' গেডুয়ার মুখ দিয়ে শব্দগুলো বেরিয়ে আসতেই তিনজনে ঝাঁপিয়ে পড়ল হাজারো সৈনিকের বাহিনীর ওপরে।

***

মাসুমের পরিকল্পনা ঠিক করে গেডুয়ার বাহিনীর লোকদেরকে আর সুবাদারের স্ত্রী আর তার সাথের মানুষদেরকে তার আর সুলতানের নেতৃত্বে বুঝিয়ে দিতেই সিন্দুকের ভেতরে যা ছিল সেগুলো দুর্গে থাকা একটা কাঠের পিপাতে ভরে ওরা রওনা দেয় দুর্গের নিচের পাতাল পথ ধরে। প্রথমে সেটা দিয়ে এগিয়ে এসে ওরা বের হয় দুর্গের পেছনের জঙ্গলে। তারপর সেখান থেকে পায়ে হেঁটে মাইলখানেক এগিয়ে পৌঁছায় একটা খালের কিনারায়। সেখানে বেশ কয়েকটা নৌকা আগে থেকেই ছিল। সেগুলোর একটাতে চড়ে ওরা বেশ কিছুক্ষণ পর যখন মূল নদীতে পড়ল। সেখান থেকে জঙ্গলবাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল পুরো দুর্গ দাউ দাউ করে জ্বলছে। জলন্ত দুর্গের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে নুক্কুন একবার মাসুমের নাম নিলো, তারপর সে হাতে ধরা ছোটো একটা জিনিস চেপে ধরল। এই জিনিসটা মাসুমের দেওয়া শেষ বার্তা তার মসনদে আলার কাছে। যেভাবেই হোক এটা আর ওই জিনিসগুলো পৌঁছাতে হবে তার কাছে।

নুক্কুন মনে মনে ভাবল, *মসনদে আলা কি যুদ্ধে জিততে পারল?*

***

অতীত

ব্রহ্মপুত্র আর শীতলক্ষ্যার সঙ্গমস্থল

মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক। মানুষ নিজ থেকে যত চেষ্টাই করুক, ভবিতব্য কখনও কখনও মানুষের নিয়তি নিজ থেকেই নির্ধারণ করে দেয়। মানসিংহ ঈশা খাঁকে কাবু করতে না পেরে একের-পর-এক আক্রমণে বিপর্যস্ত করে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু সেইদিকেও বেশি সুবিধা না হওয়াতে উলটো বরং সে নিজের ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠতে শুরু করে। ক্রোধের কারণ যতটা না যুদ্ধ কৌশল ছিল তারচেয়ে অনেক বেশি ছিল নিজের মোঘল অহমিকা, যে কি না কোনো অবস্থাতেই এক বাঙালিকে কাবু করতে না পেরে আরও অস্থির হয়ে উঠছিল।

ঈশা খাঁ দেখল মানসিংহকে কাবু করতে হলে এটাই সুযোগ, কারণ ক্রোধে অস্থির হয়ে সে নিজের প্রতিরক্ষা ভেঙে বসে আছে। ঈশা খাঁ কৌশলে একের-পর-এক আঘাত ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে নিজ থেকে আক্রমণে যাবার জন্যে উলটো আঘাতের পরিমাণ বাড়াতে শুরু করার কৌশলে আশ্রয় নিতে শুরু করল। কিন্তু সে যা করতে চেয়েছিল তা করার আগেই ঘটে গেল আরও বিচিত্র আর অদ্ভুত এক ঘটনা।

ক্রোধের বশে মানসিংহের করা তীব্র আক্রমণ প্রতিরোধ করে ঈশা খাঁ নিজ থেকে পূর্ণ শক্তিতে আঘাত করতেই হঠাৎ দু-টুকরো হয়ে গেল মানসিংহের তলোয়ার। মানসিংহ তো বটেই এমনকি ঈশা খাঁও তাজ্জব হয়ে প্রত্যক্ষ করল তার প্রতিপক্ষের তরবারি দু-টুকরো হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। শুধু দুই যোদ্ধাই নয় এই ঘটনায় নাভিঃশ্বাস উঠে গেছে দুইপাড়ের দুই বাহিনীর হাজারো সৈনিক আর সেনাপতির ভেতরে। কী হয় কী হয় উত্তেজনায় উদগ্রীব হয়ে উঠেছে সবাই।

ক্ষণিকের জন্যে মানসিংহ ফিরে তাকাল ঈশা খাঁর দিকে। চোখের সামনে সে তার পুরো জীবন দেখতে পাচ্ছে। হতবিহ্বল হয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করল তার প্রতিপক্ষ ঠিক কীভাবে আঘাত করতে পারে তাকে। ঠিক কতটা সময়ের ভেতরে হত্যা করবে তাকে, নিজের জীবনের পরোয়া মানসিংহও করে না; কিন্তু নিজের আত্মসম্মান হারানোর ভয়ে চোখে পানি চলে এলো তার। আপনাতেই নিচু হয়ে এলো নিজের মাথাটা। অপেক্ষা করতে লাগল গ্লানিময় পরাজিত মৃত্যুর।

কিন্তু খানিক সময় ব্যয় হবার পরও যখন কিছু হলো না, সে অবাক হয়ে দেখল তার থেকে খানিক দূরেই তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে আছে তার প্রতিপক্ষ, সে চোখ তুলে তাকাতেই তাকে তলোয়ারের পরিবর্তে শরীরিক শক্তিতে জয়-পরাজয় নির্ধারণ করার মল্লযুদ্ধের জন্যে আহ্বান করতে লাগল সে। কিন্তু একজন মোঘল হিসেবে এটাও তার জন্যে অপমানের। আবারও নিজের মাথা নিচু করে ফেলল মানসিংহ।

মাথা নিচু করে রইলেও পরিষ্কার অনুভব করতে পারল তার শক্তিশালী প্রতিপক্ষ এগিয়ে আসছে তার দিকে। মানুষটার প্রতিটা পদক্ষেপ সে পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে, সেই সাথে সে শুনতে পাচ্ছে নিজের আসন্ন মৃত্যুধ্বনি। পরিষ্কার অনুভব করতে পারছে দিল্লির দরবারে তার গ্লানিময় পরাজয়ের গুঞ্জন। মানসিংহ অনুভব করতে পারল তার প্রতিপক্ষ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এবার নিশ্চিত তাকে আঘাত করবে সে। শেষ মুহূর্তে সব ভয়, সব শঙ্কা আর অসহায়ত্ব বিসর্জন দিয়ে মাথা সোজা করে দাঁড়াল সে নিজের প্রতিপক্ষের দিকে। যদি মরতেই হয়, তবে মাথা উঁচু করে বীরের মতো মরবে সে।

মাথা সোজা করে সামনে তাকাতেই সে দেখতে পেল সামনে সিনা টান করে দাঁড়িয়ে আছে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত মানুষটা। হাতে ধরা ভারী একটা তরবারি। এবার

সেটা নিশ্চয়ই নেমে আসবে তার মস্তক বরাবর। মৃত্যুকে সে ভয় করে না, আর সেটা এই বাঙালিকে বুঝিয়ে দিতে হবে তার। শেষ মুহূর্তে সে মাথা উঁচু করে মুখ খুলে কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু অবাক হয়ে দেখলো তার দিকে নিজের তরবারিটা এগিয়ে দিয়েছে তার প্রতিপক্ষ, আর সেটাকে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে ঈশা খাঁ বলে উঠল, 'আপনি আমার তরবারি নিন। আমি আরেকটা তরবারি আনানোর নির্দেশনা দিচ্ছি।'

পলকের জন্যে মানসিংহের পৃথিবী যেন টলে উঠল, চোখের সামনে তার আবারও ভেসে উঠল পুরো জীবন আর টুকরো টুকরো স্মৃতি। পলকের ভেতরে তার মোঘল অহমিকা থেকে শুরু করে পাহাড় সমান আত্মসম্মানবোধ সমুদ্রের তীব্র স্রোতের মতো ভেসে গেল এক বাঙালি বীরের প্রস্তাবে। নিজের সামনে থাকা তরবারিটাকে এক হাতে সরিয়ে দিয়ে সে বন্ধুত্বের বন্ধনে জড়িয়ে ধরল ঈশা খাঁকে।

***

'অস্থির হবার কোনো কারণ নেই,' বাশার হাতে ধরা সিগারেটটা সামান্য উঁচু করে বাকিদের দিকে সামান্য ইশারা করে বলে উঠল। 'সবকিছুই আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। এখানে এবং ঢাকাতেও,' পুরো কথাটা সে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেও শেষ কথাটা সে বলেছে একবার চৌধুরী আরেকবার পৃথার দিকে তাকিয়ে। বলেই সে স্পেশাল ফোর্সের প্রস্তুতির দিকে একবার দেখে নিলো। 'ওদের আরেকটু সময় লাগবে সব গোছাতে। বিশেষ করে এতগুলো লোককে অ্যারেস্ট করে, যা উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলো গুছিয়ে পুরো এলাকা সিল করে পাহারা বসিয়ে সব কাজ সারা তো মুখের কথা না।

'আমি অনেকটাই জানি, কিন্তু তুমি এমনকি পুরোটা আমাকেও বলোনি,' সোহেল কথাটা খানিকটা অভিমানের সুরেই বলল।

'বলোনি কারণ, আমি জানতাম আমার গ্রুপের ভেতরে প্রবলেম আছে। আর তোকে না বলার পেছনে বড়ো কারণ ছিল, মিশন শুরু করার পর একটা বড়ো সময় আমি ভেবেছিলাম বেঈমান আসলে তুই,' বাশারের কথা শুনে সোহেলের চোখ কপালে উঠল। কিন্তু সে কিছু বলার আগে মাথা নাড়ল বাশার। 'তোর কি মনে হয় না যে এটাই স্বাভাবিক? তোর সাথে অল্প সময়ে আমি যতই ক্লোজ হই না কেন, তোর সাথে আমার পরিচয় গতকাল সকালে এটা তো অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

'আমি পুরো বিষয়টা খুলে বলছি,' সে সবার দিকে এক পলক দেখে নিলো। ওরা সেই পুকুরের ঘাটে বসে আছে। 'প্রথমে যখন আমাকে মিশনটা দেওয়া হলো

তখন আমি আসলে এর গভীরতা বুঝতে পারিনি। কিন্তু মিশনটা পাবার সাথে সাথেই যখন জানতে পারলাম জেল থেকে চৌধুরী মিসিং হয়েছে, তখন একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম বটে। কিন্তু তখনও আমি পুরো বিষয়টা বুঝতে পারিনি। প্রথম আমি বিষয়টা খানিকটা অনুধাবন করতে পারলাম যখন দিনের বেলা পৃথার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে বারবার কেস ফাইলটা পড়ছিলাম। একটা বিষয় পরিষ্কার যে এই কেসটাকে ওপর থেকে সাধারণ একজন মিসিং পারসনের কেস বলে মনে হলেও আসলে বিষয়টা তা নয়। কারণ একে তো প্রফেসর ইফতেখারের সাথে প্রফেসর আবদেলের একটা সম্পর্ক আছে। তার ওপরে তাদের আবার বিস্তারিত ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, আবার সেই ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে অতীতের যোগাযোগ আছে, এসবের সাথে আবার জড়িয়ে আছে অন্তর্জাতিকভাবে কুখ্যাত একাধিক মহল। কাজেই এই কেসে এমন সব বিষয় আছে যা আমার পক্ষে পুরোপুরি অনুধাবন করাই সম্ভব নয়। আর তাই আমি সেই চেষ্টাও করিনি। বরং আমি যেটা করেছি সেটা হলো অনেকটা স্রোতের সাথে গা ভাসিয়ে দেওয়া আর একটু একটু করে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টা ধীরে ধীরে বুঝে ওঠার চেষ্টা করা। তবে এক্ষেত্রে আমাকে আগে স্রোতটা সৃষ্টি করতে হয়েছে।'

'তাহলে মোহাম্মদপুরের সেই ঘটনাটা–' পৃথা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে থামিয়ে দিলো বাশার। 'সেই ফাঁদটা? ওটাই ছিল আসলে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার আগে স্রোতটা সৃষ্টি করা। অমি জানতাম এই পুরো জটিলতার একেবারে কেন্দ্রে যে মানুষটা অবস্থান করছে, সে হলে তুমি। সবার নজর তোমার ওপরে। কাজেই তুমি ছিলে টোপ। টোপটা আসলে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেরকম নয়। টোপটা ছিল আসলে আমার নিজেকে অন্যদের কাছে টোপ হিসেবে তুলে দেওয়া। আর সেটা কাজে লেগেছে।'

'মাস্টার জেড, মানে কালো কোট যেমন পৃথার হুডির পকেটে মাইক্রোফোন বসিয়েছিল,' সোহেল বলে উঠল।

'হ্যাঁ, আমি ফাঁদটা পাতার পর অনেকেই এর সাথে জড়িয়ে যায়। এর মধ্যে অন্যতম ছিল কালো কোট মানে নেক্রপলিসের এজেন্ট। সে এমন একটা ভাব দেখিয়েছিল যাতে আমরা মনে করি সে পৃথাকে অপহরণ করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আসলে সে ওটার মাধ্যমে তার গায়ে ডিভাইসটা প্ল্যান্ট করতে চেয়েছিল। কারণ সে আসলে ওদেরকে দিয়ে কাজটা উদ্ধার করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার পরিকল্পনা ভেস্তে যায় দুটো কারণে প্রথমত, সে যেভাবে করতে চেয়েছিল বিষয়টা সেটা সে করতে পারেনি কারণ হঠাৎ সেখানে চৌধুরী চলে আসে। সে বলেছে, সে চৌধুরীকে পৃথাকে অনুসরণ করতে দেখেছে, এটা আমি বিশ্বাস করিনি। এর পাশাপাশি আবার

অন্য আরেকটা গ্রুপ আমাদের পিছু নেয়। আর এইজন্যেই নার্ভাস হয়ে কবরস্থানের বাইরে আমাদের আক্রমণ করে বসে। আর ওখান থেকে যে-গাড়িটা আমাদের অনুসরণ করতে শুরু করে ওটা ছিল এই দ্বিতীয় গ্রুপ, যারা এখানে কালো মুখোশ পরে এসেছিল।'

'আমার এখানে একটা প্রশ্ন আছে,' সোহেল জানতে চাইল। 'বুঝলাম কালো কোটেরা আমাদেরকে কীভাবে অনুসরণ করছিল। কিন্তু এরা প্রতি পদে পদে আমাদেরকে কীভাবে অনুসরণ করছিল? আর এরা কারা?'

'এর জবাব সবচেয়ে ভালো দিতে পারবে চৌধুরী,' বাশারের কথাটা শুনেই সবাই চমকে উঠল। চৌধুরী খুবই অবাক হয়েছে এমনভাবে রিঅ্যাক্ট করে উঠল। কিন্তু বাশার ইশারা করতেই একজন স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডো এসে তাকে ধরে ফেলল। 'মানে কী এসবের?'

'মানে হলো তুমি একটা কীট। অবশ্য আমি তোমার ইমোশনটা বুঝি। নিজের ক্যারিয়ার-পরিবার সব নষ্ট হয়ে গেছে। আর যে-মানুষটা নষ্ট করেছেন তাকে বের করে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে তুমি অস্থির হয়ে উঠেছিলে। আর তাই জেলখানায় ওরা তোমার কাছে একটা দারুণ প্রপোজাল নিয়ে আসে। যদি তুমি ওদেরকে হেল্প করো তবে, প্রতিশোধ তো পাবেই সেই সাথে শতাব্দির সেরা আর্কিয়োলজিক্যাল আবিষ্কারের ভাগিদারও হবে।'

'কিন্তু এরা কারা?' পৃথা বেশ জোরের সাথে জানতে চাইল।

'বলছি,' তার আগে চৌধুরীর বিষয়টা বলে নেই। চৌধুরীকে জেল থেকে বের করে এই বিশেষ গ্রুপটা। চৌধুরী জেল থেকে ছাড়া পাবার যে গল্পটা বলেছিল, সেটা ভেরিফাই করানোর পরেই তার ওপরে প্রথম সন্দেহ জাগে আমার। যে গ্রুপের সাথে সে কাজ করছিল ওরা তাকে রেখছিল নিজেদের রিসোর্স হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে। আর পৃথার মাধ্যমে আমি যখন ফাঁদটা পাতলাম তখন এই গ্রুপটা সুযোগ পেয়ে গেল নিজেদের রিসোর্সটাকে কাজে লাগানোর জন্যে। ঠিক যেভাবে, কালো কোট পৃথার সাথে নিজেদের ডিভাইস আটকে দেয়, ঠিক তেমনি ওরা চৌধুরীকে আমাদের সাথে অ্যাটাচ করে দেয়,' বলে সে খানিকটা থেমে আবারও বলতে লাগল। 'চৌধুরী প্রতি পদে পদে তাদেরকে আপডটে জানিয়েছে কোনো-না-কোনোভাবে কীভাবে করেছে এখনও আমি জানি না কিন্তু করেছে।'

'তাহলে কবরস্থান থেকে বেরোতেই ওরা আবার পিছু নিয়ে আক্রমণ চালাল কেন?'

'ঠিক যে-কারণে কালো কোটেরা আক্রমণ চালিয়েছিল। ওরা আসলে ভয় পেয়ে গেছিল যে আমরা হাতছাড়া হয়ে যাবো কিংবা কালো কোটেরা ওদের আগে আমাদের নাগাল পেয়ে যাবে। পানামে পাতালে আক্রমণের বিষয়টাও তাই হতে

পারে, আবার এমনও হতে পারে ওরা আসলে চৌধুরীর ওপরে ভরসা রাখতে পারছিল না,' বলে বাশার কাঁধ ঝাঁকাল। 'ওরাও ধরা পড়েছে এবং চৌধুরীও আমাদের নাগালে, এটা বের করা খুব কষ্ট হবে না,' বলে সে কমান্ডোদেরকে ইশারা করল চৌধুরীকে নিয়ে যাবার জন্যে। 'দুঃখিত চৌধুরী, প্রফেসর ইফতেখারকে জেরা করার স্বপ্ন আর পূরণ হচ্ছে না বরং এবার তুমি আরও বাজেভাবে ফেঁসেছ।'

চৌধুরী চিৎকার করে কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল কিন্তু তাকে কমান্ডোরা নিয়ে গেল।

'তাহলে প্রশ্ন জাগে, তুমি তাহলে কীভাবে কী করলে?' আবারও সোহেল প্রশ্ন করল। 'আর অফিসের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন করার নাটকটাই বা করলে কেন?'

'আচ্ছা, আমি যখন বুঝতে পারলাম এখানে অনেক কিছুই ঘটছে যা আমার সাধ্যের বাইরে, তখন আমি পরোক্ষ স্ট্র্যাটেজিতে চলে যাই। আর আমাকে এই সাজেশনটা দেয় পিবিআইয়ের মৌসুমি আপা। নারায়ণগঞ্জে ঢোকার আগে, সবাই যখন রেস্টে আমি তখন তার সাথে দীর্ঘ সময় আলাপ করি। উনি যদিও এখন ডেস্কে কাজ করেন কিন্তু ক্রিমিনোলজিতে তার ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। উনিই পুরো সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস করে আমাকে সাজেস্ট করেন, যেহেতু আমি পরিস্থিতি এবং লোকজন ফ্যাদম করতে পারছি না, কাজেই আমি যাতে তোদের সবাইকে বোঝাই যে অফিসের ওপরে আমি ট্রাস্ট করতে পারছি না, তাই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। এতে করে আমি ভালনারেবল হয়ে যাব এবং শত্রুরা নিজেদের চেহারা প্রকাশ করবে। আর হয়েছেও তাই। কালো কোটেরা আমাদেরকে ধরে সব ধরনের কমিউনিকেশন ডিভাইস নিয়ে নিলেও আমার আর সোহেলের ব্ল্যাড স্ট্রিমে প্রবেশ করানো স্মার্ট ব্লাড টেকনোলজির মাধ্যমে অফিস আমাদেরকে ঠিকই ট্র্যাক করছিল। আর যোগাযোগ হারানোর আগেই আমি মৌসুমিকে বলেছিলাম আমাদেরকে যাতে সব ধরনের ব্যাকআপ দেয়, কাজেই যেখানেই আমরা গেছি, পানির ওপর লঞ্চ জার্নিটা বাদ দিলে, বাকি পুরোটা সময় আমরা রোড ও এয়ারের মাধ্যমে ব্যাক আপ টিমের নজরদারিতেই ছিলাম। ওরা অপেক্ষা করছিল আমার সিগনালের। কিন্তু আমি চাইছিলাম আগে কাজটা উদ্ধার হোক। আর সত্যি কথা কালো কোটের দলের হেল্প না হলে জিনিসটা উদ্ধার হতো না।'

'তারমানে ওরা ভাবছিল ওরা আমাদেরকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করাচ্ছে। আসলে তুমিই ওদেরকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করাচ্ছিলে। কিন্তু এখনও দুটো প্রশ্ন রয়ে যায়,' পৃথা বাশারের দিকে তাকিয়ে আছে। 'এক, মুখোশধারীরা কারা? দুই পুরো ব্যাপারটা আসলে কী নিয়ে। এই বাক্সের ভেতরে এত এত সম্পদ এলো কোথা থেকে?'

'আগে মুখোশধারীদের বিষয়টা বলি,' বাশার বলে উঠল। 'প্রথমত, আমি ওদের ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত নই। কিন্তু আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি এরা একটা কাল্ট এবং কোনো-না-কোনোভাবে এই পুরো বিষয়টার সাথে এদের গভীর যোগাযোগ আছে এদের এবং এই যোগাযোগটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তোমার মায়ের মাধ্যমে। এই কেসের দুটো বিষয় এখনও আমার কাছে পরিষ্কার নয়। একটা হলো, যে ট্রেজারটা আবিষ্কার হলো সেটা অনেক মূল্যবান হতে পারে। কিন্তু সেটাই এখানে সব নয়, এখানে আরও অনেক অনেক বড়ো কিছু আছে, যা আমি অন্তত বুঝতে পারিনি। মুখোশধারীদের নেতা এবং কালো কোট দুজনের একজনও এই ট্রেজারগুলো নিয়ে এক্সাইটেড ছিল না। ওরা দুজনেই আগ্রহের সাথে সিন্দুকের নিচের ওই বিশেষ পাথরটাকে পরখ করা নিয়ে বেশি ব্যস্ত ছিল। আমার বিশ্বাস রাজদ্রোহীর রহস্য যাই হোক না কেন সেটা ওটার সাথেই জড়িত। এই সিন্দুক ওখানে কীভাবে এলো, পানামের নিচে ওই পিতলের ডিভাইসটা কে প্ল্যান্ট করেছিল এবং পুরো বিষয়টা নিয়ে আসলে কী হচ্ছে এবং হতে যাচ্ছে এগুলো আমি এখনও পুরোপুরি জানি না।'

'তাহলে–'

সোহেলের কথাটাকে সম্পন্ন করতে দিলো না বাশার। 'এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে স্রেফ একজন মাত্র মানুষ। যে এই পুরো খেলাটার কেন্দ্রে ছিল এবং এখনও আছে–পুরো রচনার রচয়িতা যে,' বাশার এখন আবারও তাকিয়ে আছে পৃথার দিকে। 'তোমরা বলছিলে না যে ওরা আসলে আমাকে না, আমি ওদেরকে ব্যবহার করছিলাম? ভুল,' বলে বাশার মৃদু হেসে উঠল। 'আসলে এই পুরো খেলাটা নিয়ন্ত্রণ করছিল আরেকজন মানুষ।'

'সেটা কে–' অনেকক্ষণ পর প্রফেসর হামিদ জানতে চাইল।

'প্রফেসর ডক্টর ইফতেখার মাহমুদ,' বাশার শান্ত সুরে বলে উঠল।

'মানে, উনাকে তো আমরা খুঁজেই বের করেত পারিনি তবে উনি কীভাবে–'

'হ্যাঁ, আমরা তাকে খুঁজে বের করতে পারিনি এখন পর্যন্ত ঠিকই, কিন্তু তাই বলে পারবো না, সেটা তো হতে পারে না,' বলে সে নিজের মুখটাকে সামান্য ওপরে তুলল। 'কি, আমি ঠিক বলেছি, পৃথা?'

শেষ কথা

অতীত

কত্রাবো, ঈশা খাঁর রাজধানী

'ছেলেটার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল যুদ্ধের ময়দানে,' নিজের হাতে ধরা ছেঁড়া এক টুকরো কাপড়ে লেখা ছোট্ট পত্রটা থেকে চোখ তুলে তাকাল সুবাদারের স্ত্রীর দিকে। পাথরের কঠিন আর পর্বতের মটো অটল মানুষ, যে সদ্যই শুধু যুদ্ধ নয় বরং কঠিন মোঘল সেনাপতির হৃদয় জয় করে শান্তি ফিরিয়ে এনেছে বাঙাল মুলুকে, সেই মানুষটার চোখের অশ্রু যেন বাঁধ মানতে চাইছে না মাসুমের শেষ পরিণতির কথা শুনে। সুবাদারের স্ত্রী, নুক্কুন এবং তার সাথে সুলতানসহ গুটিকয়েকজন মানুষ এবং পাঙ্গুদের যে-দলটা এসেছে ওরা সবাই আছে। তবে এখানে সবাই উপস্থিত নেই। কথা হচ্ছে ঈশা খাঁ আর সুবাদারের স্ত্রীর ভেতরে। এরকম গোপন বৈঠকে, সবাইকে রাখা যায় না। আর সেটা সম্ভবও নয়, বিশেষ করে এরকম গোপন বৈঠকের জন্যে তো একেবারেই নয়।

ওইদিন দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসার পর পেছনে জ্বলন্ত দুর্গটাকে রেখে ওরা নদী পথে এগোতে থাকে। একটা সময় পরে রসুল খাঁর এলাকাতে পৌঁছানোর চেষ্টা করলেও সেখানে সরাসরি যেতে পারেনি। বরং একটা সময় ওরা জেলেদের একটা গ্রামে গিয়ে পৌঁছায়। সেখান থেকে খবর পাঠানো হয় রসুল খাঁর এলাকাতে। তারও আরও দুদিন পর রসুল খাঁর বাহিনী এসে উদ্ধার করে ওদেরকে এবং নিজেদের এলাকাতে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে ওরা জানায় কী ঘটেছে এবং ওরাও জানতে পারে মানসিংহের সাথে যুদ্ধে ঈশা খাঁ বিজয়ী হয়েছে। বলতে গেলে সমতা হয়েছে। মোঘল সেনাপতি বাঙালি মসনদে আলা ঈশা খাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তার সাথে সমঝতায় এসেছে। ঈশা খাঁ নিজের বাহিনী নিয়ে ফিরে গেছে নিজের পুনরুদ্ধার হওয়া রাজধানী কত্রাবোতে। রসুল খাঁর লোকের মাধ্যমে খবর পাঠানো হয় কত্রাবোতে। এরই মাঝে ওরা বিশ্রাম নিয়ে কিছুটা ঠিকঠাক হয়ে সেই পিপে থেকে জিনিসগুলো একটা সিন্দুকে তুলে নেয়। এরও প্রায় সপ্তাহখানেক পর কত্রাবো থেকে খবর আসে, সেই সাথে ঈশা খাঁর নিজের বিশ্বস্ত লোক পাঠায় ওদেরকে নিয়ে যাবার জন্যে। কত্রাবো আসার পর ওদেরকে দারুণ যত্ন-আত্তি করা হলেও ঈশা খাঁ

সরাসরি দেখা করেনি ওদের সাথে। আরও দুদিন পর রাতের বেলা ঈশা খাঁর সাথে দেখা করার জন্যে গোপন বৈঠকখানায় ডেকে পাঠানো হয় তাদেরকে। নুক্কুন আর পাঙ্গুদেরকে ডাকা হয়নি। সুবাদারের স্ত্রী মেহের আর ওদের বাকি সঙ্গীদেরকে ডেকে পাঠানো হয়। ঈশা খাঁর সাথে দেখা হবার পর সুবাদারের স্ত্রী সব খুলে বলে একে একে কী হয়েছিল জঙ্গলমহালে, তারপর সেখান থেকে কীভাবে তারা পালায় এবং এরপরে মাসুমরা কীভাবে সেখানে পৌঁছে ওদেরকে উদ্ধার করে এবং অবশেষে দুর্গে কী ঘটে। সব বলার পরে মাসুমের দেওয়া ছোটো বার্তাটা সে তুলে দেয় ঈশা খাঁর হাতে। সেটা দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে মসনদে আলা ঈশা খাঁ।

'ঠিক কী কারণে ছেলেটা আমাকে এতটা ভালোবাসত আমি নিজেও ঠিক জানি না,' বলে সে সে দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছাড়ল। তারপর মৃদু হেসে বলে উঠল, 'সবসময় বলত, একদিন প্রয়োজনে আমার জন্যে প্রাণ দিবে, পাগলটা করলও তাই,' বলে সে চোখ তুলে তাকাল সুবাদারের স্ত্রীর দিকে। 'সুবাদার আসলামও আমার ভালোবাসার মানুষ ছিল। আমি যেমন হারিয়েছি, আপনি হারিয়েছেন তারচেয়ে বেশি। স্বামী, প্রিয়জন—'

'সবচেয়ে কাছের মানুষ-বোন-বান্ধবী,' বলে সুবাদারের স্ত্রীও দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল। 'তবে আমি ছোটোবেলা থেকে এমন এক দায়িত্ব নিয়ে বড়ো হয়েছি যেখানে এভাবেই আমাকে পথ চলতে হবে। আমি জানি না আমার স্বামী সুবাদার আসলাম আপনাকে কী বলেছিল, কিন্তু এমন এক শক্তির আধার আমি ধারণ করে চলেছি যার বোঝা বইবার জন্যে আমাকে কঠিন হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।'

ঈশা খাঁ তাকিয়ে আছে তার দিকে। 'আপনার কাছে যা আছে এবং এর ব্যাপারে আমি যা শুনেছি তাতে আমার বেশ কয়েকটা কথা মনে হয়েছে। প্রথমত, আমার ধারণা সুবাদার আসলামও আপনার কাছে থাকা এই শক্তির আধারটাকে ঠিক বুঝতে পারেনি। যে কারণে সে আমাকে এমন একটা ধারণা দিয়েছিল যে এটা সরাসরি যুদ্ধে ব্যবহার করার মতো কোনো অস্ত্র কিন্তু আসলে তো বিষয়টা তা নয়,' বলে সে থেমে গেল। 'বরং তারচেয়েও অনেক বড়ো কিছু।'

'হ্যাঁ। এ-এমন এক শক্তি যা মানুষের জন্যে উপকার যেমন বয়ে আনতে পারে, ঠিক তেমনি বহন করে আনতে পারে ভয়াবহ বিপর্যয়। আজ থেকে হাজারো বছর আগে আমার পূর্বপুরুষেরা এক যুদ্ধের সময়ে যখন এই শক্তির সন্ধান পায় তখন থেকেই আমাদের সমাজে এটাকে একইসাথে পবিত্র এবং নিষিদ্ধ বস্তু হিসেবে বিবেচনা করে আসা হয়েছে। আমাদের রাজ্যও এর ভালোমন্দ দুটো দিকই দেখেছে।'

ঈশা খাঁ আনমনেই মাথা নাড়ল। 'আমি সুবাদারের কথা শুনে যা ভেবেছিলাম, সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়নি দেখে আমি খুশি। আমাকে যুদ্ধ জয়ের জন্যে সেই শক্তির আশ্রয় নিতে হয়নি, কিন্তু এখন কিছু প্রশ্ন রয়ে যায়,' বলে সে চোখ তুলে তাকাল সুবাদারের স্ত্রী মেহেরের দিকে। 'আমি নিজে এই শক্তি ব্যবহার করিনি এবং করবোও না। কিন্তু তাই বলে আমি শক্তি যে-কারও হাতেও পড়তে দিতে পারি না। তাছাড়া আপনি এবং আপনার সঙ্গীরা, নুক্কুন এবং পাঙ্গুরাও এখন আমার দায়িত্বের ভেতরে পড়েন। কাজেই আপনি কী ভাবছেন বলুন।'

'আমার সাথে বিপুল পরিমাণ সম্পদ আছে, যেহেতু আমার স্বামী আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল কাজেই সেটা আপনার কাছে থাকলেই সবচেয়ে ভালো হবে, আপনি এই সম্পদ এবং শক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পারবেন। আপনার মাধ্যমেই এই সম্পদ বাঙলার মানুষের কাজে লাগুক।'

ঈশা খাঁ গম্ভীর মুখে তাকিয়ে রইল তার দিকে। 'বরং আমার ভিন্ন এক প্রস্তাব আছে। যে-শক্তির আধার আপনার কাছে আছে সেটার সংরক্ষণ করাটা বেশি জরুরি। আমি আপনাকে সব ধরনের সহায়তা করব। আপনি একটা পরিবার প্রতিষ্ঠা করুন। আমার সহায়তা তো থাকবেই প্রয়োজনে এই সম্পদ সংরক্ষণ করুন। এই পরিবারের কাজ হবে গোপনে এই শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করা। নুক্কুনকে সম্ভব হলে আপনার এই বৃহত্তর পরিবারের অংশ করে নিন। যে পাঙ্গুরা আপনার সাথে আছে ওদেরও গতি হওয়াটা জরুরি। এরা সবাই পথ হারা, আপনার মাধ্যমে ওরা একটা পথের দিশা খুঁজে পেতে পারে। এই সম্পদ শুধু আমি কিংবা বাঙালার মানুষ নয়, এভাবে ব্যবহার করতে পারলে এটা সমগ্র মানবতার কাজে দিবে। আমি, আপনাকে সুরক্ষিত থাকায় জায়গা দেব। মোঘলরা যাতে এই বিষয় নিয়ে আর কোন ঝামেলা না করে সেটা আমি মানসিংহের সাথে বুঝে নিবো। ধীরে ধীরে সময় নিয়ে একটা পরিবার প্রতিষ্ঠা করে ফেলুন, যারা শুধু আপনার নয়–এই সমগ্র শক্তির ধারক হবে। আর যদি কখনও মনে হয় কোনো ভালো শাসক যার এই শক্তির বা সম্পদের প্রয়োজন পড়বে, তার হাতেও তুলে দিতে পারেন। অথবা–' ঈশা খাঁ ধীরে ধীরে বলে গেল কীভাবে কী ভাবছে সে আর সুবাদারের স্ত্রী শুনে গেল। দীর্ঘ সময় আলোচনার পর সে যখন বাইরে বেরিয়ে এলো। তখন তার মুখ উদ্ভাসিত। নতুন এক দিশা খুঁজে পেয়েছে সে জীবনের, যাতে করে তার মানুষদেরও সংস্থান করা হবে, যে দায়িত্ব নিয়ে সে জন্মেছে সেটাও পালন করা হবে, যে মানুষগুলো নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে তাদেরকে সম্মান জানানো হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা যে শক্তির আধার সে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেটাকেও সংরক্ষণ করা যাবে।

ঈশা খাঁর আলোচনা সভা থেকে বেরিয়ে সে অপেক্ষমাণ নিজের মানুষদের দিকে তাকিয়ে একটা চওড়া হাসি দিলো। অনেক কাজ করতে হবে তাদেরকে, অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

বর্তমান সময়

'ম্যাজিক দেখেছিস কখনও, সোহেল?' বাশারের প্রচণ্ড সিগারেটের তেষ্টা পেয়েছে, কিন্তু এমন অবস্থায় আছে চাইলেও এখন সিগারেট খাওয়া সম্ভব নয়। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ার ভঙ্গি করতে লাগল বাশার। ওদের গাড়ি তেজগাঁও থেকে মোহাম্মদপুরের দিকে যাচ্ছে। রাস্তার জ্যামের ভেতরে বসে ওরা কথা বলছে। কিশোরগঞ্জ থেকে হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় এসে ওরা নেমেছে তেজগাঁওয়ের পুরনো এয়ারপোর্টে। সেখান থেকে গাড়িতে করে ওরা যাচ্ছে মোহাম্মদপুরের দিকে। কিশোরগঞ্জে যাদেরকে আটক করা হয়েছে তাদেরকে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ঢাকায় আনা হয়েছে এবং রাখা হয়েছে স্পেশাল সেলে। আর ওরা চলেছে কেসের শেষ টুকরোটার সমাধান করার জন্যে। কিশোরগঞ্জে জঙ্গলবাড়ি দুর্গের সামনে বাশার যখন বলল রাজদ্রোহীর রহস্যের শেষ টুকরোটার সমাধান রয়েছে প্রফেসর ইফতেখারের কাছে এবং সেটার শেষ অংশটুকু একমাত্র প্রফেসর ইফতেখারই বয়ান করতে পারবেন, তখন সবাই চমকে ওঠে এবং ততধিক চমকে ওঠে বাশার পৃথার দিকে ইঙ্গিত করাতে। তবে অবাক করা বিষয় হলো, বাশার এ-কথা বলার পরও পৃথা কিছুই বলেনি। সে কিছু অস্বীকারও করেনি, আর কিছু স্বীকারও করেনি। সে স্রেফ চুপ করে ছিল। কিন্তু প্রফেসর হামিদ এবং সোহেলের অনেক প্রশ্ন থাকলেও ওদের আলোচনা সেখান থেকে খুব বেশি আগায়নি। কারণ স্পেশাল ফোর্সের ওরা এলাকা সিল করে ওখান থেকে বন্দিদের এবং পুকরের নিচ থেকে পাওয়া সম্পদ নিয়ে দ্রুত সরে পড়তে চাচ্ছিল নিরাপত্তাজনিত কারণে, তাই ওদেরকে দ্রুত মুভ করতে হয়। আর হেলিকপ্টারেও আলোচনা করার উপায় ছিল না। আর তাই তেজগাঁওতে নামার পর গাড়িতে ওঠার পর দিয়ে সোহেল এবং প্রফেসর হামিদ বাশারকে ধরে বসে আসলে বিষয়টা কী এবং ওরা কোথায় যাচ্ছে সেটা জানতে চায়। প্রথমেই বাশার মৃদু হেসে জানায় ওরা প্রফেসর ইফতেখারের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে তারপর সোহেলকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করে ম্যাজিক নিয়ে। 'কী রে উত্তর দিলি না?'

'ম্যাজিকে আবার কী হয়, জাদুকর জাদু দেখায়,' সোহেল সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে উঠল।

'হ্যাঁ, কিন্তু জাদুর ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে জাদুকর ইচ্ছে করেই টেকনিক্যালি এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করে যে সবার নজর থাকে ঠিক যেখানে সে নিয়ে যেতে চায় সেখানে। এর বাইরে সে তার কারুকাজ করে কিন্তু কেউ সেটা দেখতে পায় না, কারণ নজর আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ঠিক এই একই টেকনিক সিনেমাতেও ব্যবহার করা হয় ফ্রেমের আকারে। নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টে কী ঘটছে অর্থাৎ ফ্রেমের ভেতরে কী ঘটছে সেটাই আমরা দেখতে পাই এর বাইরে কী হচ্ছে সেটা দেখা যায় না।'

'বস, মাফ করে দেওয়া যায় না?' সোহেল দুই হাত তুলে ধরল মুখের সামনে। 'দুই দিন নাওয়া খাওয়া নাই, বিশ্রাম নাই–লেকচার মাফ করে বলো কী বলতে চাচ্ছ।'

বাশার হেসে উঠল, 'এখানেই তো মজা, এই ফ্রেম থিয়োরি বা ম্যাজিশিয়ানদের টেকনিকের সাথে আমাদের কেসের ব্যাপক মিল আছে। এই কেসটা নেওয়ার পরেই পাটোয়ারি স্যার বলেছিলেন, যা দেখছ তা কিন্তু না, এর বাইরেও অনেক কিছু আছে। প্রথমত, কালো কোট মানে মাস্টার জেড ভাবছিল সে এই কেসটা নিয়ন্ত্রণ করছে, মুখোশধারী কাল্টের ওরা ভাবছিল ওরা নিয়ন্ত্রণ করছে, আমি ভাবছিলাম সব আমার হাতে আছে,' বলে বাশার কাঁধ ঝাঁকাল। 'পুরোটা না হলেও কিছুটা। কিন্তু পুরো খেলাটা নিয়ন্ত্রণ করছে আসলে একেবারেই ভিন্ন একজন মানুষ,' বলে সে মৃদু ক্লান্ত হাসি দিলো। 'প্রফেসর ইফতেখার,' বাশার হাসছে পৃথার দিকে তাকিয়ে।

পৃথা তার দিকে তাকিয়ে আছে, তার চোখে কোনোর ভাষা নেই।

'কিন্তু কীভাবে?' সোহেল প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'আর তিনি আছেনই বা কোথায়?'

বাশার ঘড়ি দেখল, 'আমরা প্রায় চলে এসেছি। একেবারে হাতে-কলমে দেখাবো,' সে কথা শেষ করার কিছুক্ষণের ভেতরেই ওদের গাড়িটা এক জায়গায় এসে থামল। 'চলো সবাই।'

'এটা তো পৃথার মোহাম্মদপুরের সেই বাসা,' সোহেল গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলে উঠল। 'এখানে কেন আমরা?' সোহেল বলে উঠল। সে একবার পৃথাকে দেখছে আরেকবার বাশারকে দেখছে।

'ম্যাজিক দেখাবো,' বলে সে সামনেই দেখল পুরো অ্যাপার্টমেন্ট ভবনটাকেই ঘিরে রেখেছে পুলিশ। ওদের সবার সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে পেটমোটা ছোটোখাটো ভুঁড়িওয়ালা একজন মানুষ। বাশারকে দেখে সে হেসে উঠল। 'আরে, বস!'

'আরে টমি,' বাশার জড়িয়ে ধরল তাকে। 'তোর চট্টগ্রামের ট্রিপ কেমন হলো? ওই, যা বলেছি, এনেছিস?'

টমি এনেছে জানাতেই বাকিদেরকে নিয়ে সামনে এগোল বাশার। 'চল, যেতে যেতে বলছি। তার আগে আরেকটা প্রশ্ন, মানুষ চাইলেও কোনো জায়গাটা দেখতে পারে না, কিংবা সবচেয়ে বেশি অন্ধকার থাকে কোনো জায়গাতে?' বলেই সে হাত তুলল, 'আমিই বলছি। মানুষ ঠিক তার নাকের নিচেই দেখতে পারে না। আর অন্ধকার সবচেয়ে বেশি গাঢ় থাকে প্রদীপের ঠিক তলাতেই। এখন ধর তুই, তোকে যদি কোনো কারণে পালাতে হয় তুই কই পালাবি?'

'যেখানে কেউ আমাকে খুঁজে পাবে না?'

'সেক্ষেত্রে এমন কোনো জায়গায় কি তুই পালাবি, যেমন ধর তোর দাদাবাড়িতে?'

'না, কখনও না,' সোহেলের সরল স্বীকারোক্তি।

'একদম ঠিক। কিন্তু এটাও তো ঠিক ধ, তুই যদি এমন কোনো জায়গায় পালিয়ে বসে থাকিস, যেখানে তোকে কেউ খোঁজার কথা ভাববেও না। কারণ তুই বছরের-পর-বছর সময় নিয়ে আগে থেকেই এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছিস যাতে তোকে কেউই ওখানে খোঁজার কথা কারও মাথাতে না আসে। তাহলে ব্যাপারটা কেমন হয়?' বলে বাশার সবার দিকে তাকিয়ে রইল লিফট এসে থেমে গেল।

'প্রফেসর ইফতেখার ঠিক এই কাজটাই করেছেন। উনারা যখন পালালেন, প্রফেসর আবদেল পালিয়ে গেলেন চট্টগ্রামে, একেবারেই অচেনা অজানা এক জায়গায়। চৌধুরী গেল জেলে আর প্রফেসর ইফতেখার বেছে নিলেন এমন এক জায়গা,' কথা বলতে বলতেই ওরা পৃথার অ্যাপার্টমেন্টটা পার হয়ে ছাদে যাবার সিঁড়িতে উঠে পড়েছে বাশার। তার পেছনে পেছনে বাকিরাও তাকে অনুসরণ করতে করতে সিঁড়িতে উঠে পড়ল। 'উনি বেছে নিলেন এমন এক জায়গা যেটাকে আক্ষরিক অর্থেই বলা যায় সবার নাকের নিচে,' ওরা ছাদের দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। 'আর তাই কেউই তাকে ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু উনি রয়ে গেলেন একেবারে সব কিছুর কেন্দ্রে সেই শুরু থেকেই।'

'এখানে?' সোহেল খুব অবাক হয়ে পৃথার বাসার ছাদের চারপাশে দেখাল। ওরা ছাদে প্রবেশ করে দেখতে পেল ছাদে বেশ কয়েকজন পুলিশ। একপাশে সেই কেয়ারটেকার লোকটা, পৃথা সেদিন যার সাথে ঝগড়া করছিল সে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সোহেল লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বাশার হেসে ফেলল। 'লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান, আই গিভ ইউ প্রফেসর ইফতেখার,' বলে সে কেয়ারটেকারের থাকার কামরাটার দিকে দেখাল। 'চলুন, দেখি ভেতরে কী হচ্ছে।'

ওরা সবাই মিলে ভেতরে ঢুকে দেখতে পেল ভেতরে একজন পুলিশ সদস্য দাঁড়িয়ে আছে। আর ভেতরে সাধারণ দেখতে কয়েকটা আসবাবের ওপাশে একটা খাটে বসে আছেন বয়স্কমতন একজন মানুষ। ওদেরকে দেখে চোখ তুলে তাকাল মানুষটা। 'হ্যালো, প্রফেসর ইফতেখার,' বাশার বেশ আমুদে স্বরে বলে উঠল, 'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

বয়স্ক মানুষটা উঠে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এলেন। বাশার দেখল ছবির সেই মানুষটার স্রেফ চুলের পরিমাণ আরও কমেছে, গায়ের চামড়া আরও ফ্যাকাসে হয়েছে, শুকিয়ে গেছেন অনেকটাই, কিন্তু মানুষটা নিঃসন্দেহে প্রফেসর ইফতেখারই। 'হ্যালো, ইন্সপেক্টর বাশার,' মানুষটার হাতে ধরা ছিল একটা চিকন সিগার, সেটাকে ঠোঁটের কোণে চেপে ধরে বাশারের দিকে তাকিয়ে সে একটা হাসি দিলেন, বাকিদের দিকে দেখে নিয়ে সামান্য মাথা ঝাঁকালেন। 'আপনার সাথে পরিচিত হয়েও খুশি হলাম। আমার বিশ্বাস পরস্পরের প্রতি আমাদের অনেক প্রশ্ন এবং উত্তর রয়েছে।'

প্রফেসর ইফতেখারের কথার জবাবে মৃদু হেসে উঠল বাশার। 'অবশ্যই।'

***

'প্রথম প্রশ্ন আমি করবো,' প্রফেসর ইফতেখার সিগার টানতে টানতে বলে উঠলেন। বাশার মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল। 'আপনি ধরতে পারলেন কীভাবে আমি এখানে আছি?' বলে প্রফেসর ইফতেখার নিজের কাঁধ ঝাঁকালেন। 'প্রথম ক্লু পেলেন কীভাবে?'

বাশার মৃদু হাসল। 'ওটার মাধ্যমে,' বলে সে প্রফেসরের হাতে ধরে থাকা সিগারটা দেখাল। 'এটা?' প্রফেসরও অবাক হয়ে বলে উঠলেন।

'প্রথম যেদিন আমি আর সোহেল আপনাদের এই ছাদে আসি, আমরা আসার ঠিক আগে সম্ভবত পৃথা এসেছিল আপনার সাথে কথা বলতে। আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে আপনারা সেই ঝগড়ার নাটক সাজান। সত্যি কথা বলতে ওইদিনই আমার ভেতরে একটা অস্বস্তি কাজ করছিল। কি যেন একটা ঠিক মিলছিল না। কিন্তু তখন এত বেশি উত্তেজনার ভেতরে ছিলাম ঠিক ধরতে পারিনি। পরে যখন ভাবার সময় পাই তখন বিষয়গুলো ধীরে ধীরে ধরা পড়তে শুরু করে। ওইদিন আপনার কামরার বাইরে বিরাট একটা অ্যাশট্রে রাখা ছিল, ওটাতে এই সিগারের গোড়া পড়ে ছিল বেশ কয়েকটা। একজন কেয়ারটেকার এই সিগার খাবে, এটা হতেই পারে না। আপনার ফাইলে আমি পড়েছি আপনি দামি তামাক ছাড়া খেতে পারেন না, এটা একটা ক্লু ছিল। এরপর আরও কিছু বিষয় যেমন, আমরা যখন নারায়ণগঞ্জে

আর কিশোরগঞ্জে অভিযান চালিয়ে বেড়াচ্ছি তখন এই অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলি আমার কলিগ মৌসুমিকে, সে লোক লাগিয়ে জানতে পারে। পৃথা শুধু ওই অ্যাপার্টমেন্টটাই নয়, এই ছাদের একটা অংশ এবং এই কামরাটাও কিনে নিয়েছে হাউজিংয়ের কাছ থেকে–এটাও একটা ক্লু ছিল। যদিও তারা এই ভবন আনইউজুয়াল কিছু বের করতে পারেনি। নিঃসন্দেহে আপনারা খুবই সাবধান ছিলেন। আরও একটা ব্যাপার ছিল, পৃথার সাথে আপনি একটা লিসেনিং এবং ট্র্যাকিং ডিভাইস সেট করে দিয়েছিলেন সম্ভবত, ওটার ব্যাপারেও আমি আঁচ করতে পারছিলাম, কারণ পৃথা অনেক ক্ষেত্রেই তার সীমার চেয়ে বেশি গভীরে যেতে পারছিল আপনার কারণেই। উদাহরণ দিচ্ছি। পুরনো ঢাকায় চার্চে, পানামে সেই বেদি পরীক্ষার বিষয়টা, জঙ্গলবাড়িতে কিছু না পেয়ে যখন সবাই হতোদ্যম তখনও পৃথাই আলো দেখায়। আসলে আপনিই পৃথাকে গাইড করছিলেন? ঠিক কি না?' বাশার প্রফেসরকে প্রশ্ন করল পৃথাকে এবার দেখে নিলো। পৃথাকে আগে থেকে এখন সচ্ছন্দ দেখাচ্ছে।

'সবটা না হলেও কিছুটা আমি করছিলাম,' প্রফেসর ইফতেখার মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠলেন। 'আসলে পৃথার সাথে দুটো ডিভাইস ছিলো, দুটোই মাইক্রো ডিভাইস, দুটোই বিশেষ কায়দায় লুকানো ছিলো। একটা ছিলো ওর একেবাওে কানের ভেতরে বসানো। ওটা দিয়ে আমি ওর সাথে যোগাযোগ রাখছিলাম। আর ব্যাকআপ হিসেবে ওর হুডির বাটনের ভেতরে আরেকটা মাইক্রো ডিভাইস বসানো ছিলো।'

'এই কারণেই ওরা এতো সার্চ করেও কিছু পায়নি বা আমরাও কিছু টের পাইনি। কালো কোট মানে জেড বুদ্ধিমান হলেও কিছু ভুল করেছে সে। কোন স্ক্যানার দিয়ে চেক করেনি। কালো কোট অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক কিন্তু ওভার কনফিডেন্সে ভুগে কিছু ভুল করেছে সে। আমার বিলিভ চৌধুরীও পৃথার মতো কোন উপায়েই মুখোশধারীদের সাথে যোগাযোগ রাখছিল বা ওরা তাকে ট্র্যাক করছিল। যদিও আমি শিয়োর না এখনও,' বাশার একটু থেমে আবার বলতে লাগলো।

'আপনারা যখন কমলাপুরের বস্তি থেকে পালান তখনই আপনি এখানে এসে ওঠেন তাই না? একেবারে শুরু থেকেই আপনি এমন এক জায়গায় ছিলেন যেখানে কেউই আপনাকে খোঁজার কথা ভাবেনি। আর ইচ্ছে করেই পৃথার সাথে তার মায়ের সাথে সম্পর্ক খারাপ করে রেখেছিলেন যাতে ওটা কেউই ভাবতেও না পারে, ব্রিলিয়ান্ট,' বাশার মাথা নাড়ল। 'আমার খুব পছন্দের একটা মুভি প্রেসটিজের ডায়লগ মনে পড়ে যাচ্ছেঃ একটা ম্যাজিক ট্রিকের জন্যে পুরো জীবন সেক্রিফাইস। আপনিও তাই করেছেন। বহু বছর আগে থেকেই আপনারা প্রয়োজনের সময়ে কাজে লাগানোর জন্যে মঞ্চ সাজাচ্ছিলেন। ও বাই দ্য ওয়ে, আপনার পুরনো

জাদুকর হিসেবে কাজ করার ব্যাকগ্রাউন্ডটাও আমার জন্যে একটা ক্লু হিসেবে কাজে দিয়েছে,' বাশার মাথা নাড়ল। 'তবে আপনি চৌধুরীর সাথে খুব অন্যায় করেছেন। সে বেচারা বার বার শুধু ধরাই খেয়েছে।'

'ওর জন্যে আমি কিছু একটা অবশ্যই করবো। যদি আমি নিজে দাঁড়াতে পারি ওর জন্যে সুন্দর একটা জীবনের ব্যবস্থা আমি অবশ্যই করবো।'

'প্রফেসর আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি, এবার আমার পালা,' বাশার এইটুকু বলতেই প্রফেসর মাথা ঝাঁকালেন। 'প্রথম প্রশ্ন, কী কেন কীভাবে, একেবারে শুরু থেকে।'

'অলরাইট, আমি আর কিছু লুকাব না,' প্রফেসর মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠলেন। 'একেবারে শুরু থেকে বলছি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে সবার। আজ যা ঘটছে, এই এতো আয়োজন, এত রহস্য, এত ঘটনার ঘনঘটা সবকিছুর শুরু পৃথার মা ইলার মাধ্যমে। ইলা ইংল্যান্ডে বড়ো হওয়া মেয়ে। ওর সাথে ওখানেই আমার পরিচয়, বিয়ে। আজ থেকে বেশ অনেক বছর আগে তখন আমরা হ্যাপিলি ম্যারিড, ইলা একটা প্রজেক্টের কাজে বাংলাদেশে আসে। এখানে এসে সে জানতে পারে নিজের জন্ম পরিচয় সে যা জেনে এসেছে তা নয়। তার পরিবার এক বহু পুরনো কাল্টের সাথে জড়িত। সে নিজেও আসলে ওই কাল্টেরই ধারকদের একজন। ছোটোবেলা থেকেই তার পড়া, তার জীবন-যাপন সবই ওরা নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে, জাস্ট সে জানত না। এমনকি সে যাদেরকে ওর বাবা-মা হিসেবে জেনে এসেছে তারা ওর প্রকৃত বাবা-মাও নয়। ইলা ছোটোবেলা থেকে একেবারে কিছুই জানত না যে তা নয়। অন্তত অনুধাবন করতে পারত ওর জীবনটা আলাদা ছিল। দেশে এসে ওদের সাথে জড়িয়ে পড়ে সে। বাই দ্য ওয়ে ওই মুখোশ বাহিনী আসলে ওরাই। যাই হোক ইলা ওদের সাথে কাজ করতে করতে মজা পেয়ে যায় এবং আমাকেও এর সাথে ইনভলভড করে। আমিও তখন নিজের ক্ষেত্র পরিবর্তন করে এই ফিল্ডে চলে আসি এবং আমরা পুরো ব্যাপারটার এত গভীরে চলে যেতে থাকি যে আমাদের আরও স্কলার হেড প্রয়োজন হয়। আমি আবদেলকে ইনভলভ করি। এই কাল্টের অন্যতম একটা রহস্য হলো এরা পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো শক্তি এবং রহস্যগুলোর একটার ধারক। আপনারা যে- ট্রেজার আবিষ্কার করেছেন ওটা অনেক মুল্যবান কিন্তু ওটা আসলে কিছুই নয়। মূল বিষয় আরও অনেক গভীর এবং অনেক অনেক রহস্যময়। এমনকি পুরো ব্যাপারটা এতটাই শক্তিসম্পন্ন যে কাল্টের ওরাও গোটা ব্যাপারটা জানে না। আর তাই আমি আবদেল এবং ইলা মিলে যখন গবেষণা শুরু করি ওরা খুশিই হয়। কিন্তু গবেষণার এক পর্যায়ে আমরা ভয়াবহ কিছু বিষয় আবিষ্কার করে বসি। প্রথমত, এই বিষয়টার সাথে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো কিছু

রহস্যের সংযোগ আছে। দ্বিতীয়ত, এর সাথে অত্যন্ত বড়ো রকমের শক্তির ভারসাম্যের বিষয় জড়িয়ে আছে। শুধু ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশ নয়, এর ক্ষেত্র আরও বড়ো। আর তাই আমরা গবেষণার এক পর্যায়ে গোটা ব্যাপারটার ব্যপ্তি অনুভব করে ঘাবড়ে যাই এবং একটা পর্যায়ে আমরা অনেক বিষয় কাল্টের কাছে লুকাতে থাকি। আমরা জানতাম ওরা একটা সময় এই বিষয়গুলো টের পাবেই। আর তাই ইলা, আমি আর আবদেল—আমরা তিনজনেই আগে থেকে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে থাকি। সমাজের কাছে এমন একটা চিত্র দেখাই যে ইলার সাথে আমার সম্পর্ক খারাপ, পৃথার সাথে আমার সম্পর্ক খারাপ। আমরা আলাদা হয়ে যাই। সবার নিরাপত্তাও এর পেছনে একটা কারণ ছিল। ওপরে ওপরে আলাদা হলেও আমরা ভেতরে যোগাযোগ রাখতাম এবং গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকি। কিন্তু একটা পর্যায়ে আর হচ্ছিল না। এমন সময় হঠাৎ করে ইলা অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ও—' প্রফেসর থেমে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লেন। '—ওর মৃত্যুর পর আমরা বুঝতে পারি যে আর হবে না। আমরা বাংলাদেশ সরকারের সহায়তা চাই। তারা উলটো আচরণ করে। এমন সময় নেক্রপলিসের বড়ো কর্মকর্তা অনেক বড়ো অফার নিয়ে আসে। আমাদের অবস্থা তখন এমন কাল্টের হাত থেকে বাঁচতে যা খুশি তাই করতে রাজি। কিন্তু এটা বুঝতে পারিনি যে, এরা আরও বড়ো দানব। অল্প সময়ের ভেতরে সেটা অনুধাবন করেই আমরা আড়াল নিয়ে ফেলি। কমলাপুরে যা ঘটে তো ঘটেই। এরপর আবদেল পালিয়ে যায়, আমি চলে আসি পৃথার এখানে। আগে থেকেই আমি জানতাম এমন কিছু হতে পারে তাই সেভাবেই সব গোছানো ছিল। সবাই পৃথার ওপর নজরদারি করে কিন্তু আমি এতটা কাছাকাছি আছি কেউ ভাবতেও পারেনি। খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতাম আমরা। কিন্তু আবদেলের মৃত্যুর পর সব ভেঙে পড়ে। আমি জানতাম এবার আর রক্ষা হবে না। আর সেই সময়েই আপনি, ইন্সপেক্টর বাশার সেই ফাঁদের পরিকল্পনা করো আর আমি দেখতে পাই বিরাট একটা সুযোগ। ইলা আমার সাথে সেপারেট হবার পর নিজে বেশ কিছু জিনিস নিজের মতো করে লুকিয়ে রেখেছিল। ও নিজে খুব বড় ধরনের কিছু একটা আবিষ্কার করেছিলো ইনক্লুডিং সেই ট্রেজার, যেটা আপনারা উদ্ধার করেছেন। আমরা সেপারেট হবার পর ও সেই মসলিনের কাপড়ে ম্যাপ করে সেটাকে লকেটে ভরে পৃথাকে পাঠিয়ে যায়। কিন্তু আমাদেও কাছ পর্যন্ত পৌছাতে দেরি হয়ে যায়। আমরা যখন ওটা পাই ততোদিনে আমি এখানে লুকিয়ে পড়েছি। কাজেই ইলা আসলে কি আবিষ্কার করে কী লুকিয়ে রেখেছিলো সেগুলোর সন্ধান আমিও বের করতে পারিনি। পৃথার একার পক্ষে সেটা সম্ভব ছিলো না। তুমি ফাঁদটা পাতার পর আমি বেশ কয়েকটা সম্ভাবনা দেখতে পাই। এক, ইলা যা লুকিয়ে রেখেছে সেগুলো

উদ্ধার করার। দুই নেক্রপলিসের রাঘব বোয়ালদেরও সামনে নিয়ে আসার এবং তিন, কাল্টের হোতাদের পাকড়াও করার। আর পুরো কাজটা অনেকটা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো করে সাজাই আমি।'

বাশার মাথা নাড়ল। 'আপনি জানতেন ওরা কেউই এই সুযোগ ছাড়বে না। আপনি চান্স কাজে লাগান। কিন্তু ভয়াবহ ঝুঁকি ছিল–'

বাশারের কথা শুনে হেসে উঠলেন প্রফেসর। 'কিন্তু কাজ তো হয়েছে।'

'প্রফেসর ইফতেখার এখানে আসার আগে আমার বসের সাথে আমার কথা হয়েছে, আপনি আজ থেকে কত বছর আগে যে-সাহায্য সরকারের কাছে চেয়েছিলেন এবং বোকার মতো অথরিটি সেটা ডিক্লাইন করে আমার স্পেশাল ফোর্স থেকে সেটা দিব আপনাকে। বিনিময়ে আমাদেরকে এই রহস্যের গোড়ায় পৌঁছাতে হবে। এই কাল্ট, নেক্রপলিস, রেলিক–এদেরকে ধরতে হবে, কাজেই আপনি আমাদেরকে এই বিষয়ে সহায়তা করবেন। প্রয়োজনে প্রফেসর হামিদ আপনাকে সাহায্য করবেন। আমাদের হাতে বেশ কিছু অমীমাংসিত রহস্য রয়েছে আপনি সেগুলোর সমাধান করতে আমাদের সহায়তা করবেন। বিনিময়ে আপনার বিরুদ্ধে সব চার্জ তুলে নেওয়া হবে, আপনি এবং পৃথাকে সব ধরনের প্রটেকশন দেওয়া হবে। বলুন আপনার মতামত কী?'

প্রফেসর হেসে উঠলেন, 'ডু আই হ্যাভ আ চয়েস?' বলে তিনি একবার পৃথার দিকে দেখে নিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি রাজি।'

'প্রথম প্রশ্ন, রাজদ্রোহীর রহস্য আসলে কি, চট্টগ্রাম থেকে যে চিপ আমাদের এজেন্ট উদ্ধার করেছে সেটার কোড কী? আর কিশোরগঞ্জ থেকে আমরা যা পেয়েছি সেগুলো আসলে কী এবং কোথা থেকে এলো? সবচেয়ে বড়ো কথা, ওই ট্রেজার বক্সের ওই পাথর যেটার জন্যে কালো কোট মাস্টার জেড আর কাল্টের মুখোশধারীরা অস্থির হয়ে উঠেছিল এগুলো আসলে কী?'

'একটা প্রশ্ন বলে অনেক কথা জিজ্ঞেস করে ফেললেন, ইন্সপেক্টর। প্রথম কথা সব জবাব এখানে দেওয়া যাবে না। আপনি নিজেও জানেন না কীসের ভেতরে এসে পড়েছেন। কাজেই সবার অগে আমি হাই প্রটেকশন চাই। আমি লিখিত অ্যাগ্রিমেন্ট করতে চাই অথরিটির সাথে এরপর আমি কথা বলবো।'

'ঠিক আছে, আপনার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু আমরা কীভাবে বুঝবো, আপনি আসলে এসবের জবাব জানেন?'

'আপনাদের কাছে চট্টগ্রামের সেই চিপের ফরম্যাট আছে?'

'জি, আমি জানতাম আপনি ওটা চাইবেন,' বলে বাশার টমির দিকে ইশারা করল। 'শুধু এটুক বলি আপাতত। রাজদ্রোহীর যে রহস্যের কথা বলেছেন, সেটা আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে বারো ভূঁইয়াদের সাথে সংশ্লিষ্ট একটা ঘটনার

পর ঈশা খাঁর পরবর্তী যুগে পারস্য থেকে আসা একদল যোদ্ধার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটা কাল্ট। ওরা আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগের এক রহস্যকে লালন করে রেখেছে। তবে এই রহস্য বা শক্তি শুধু ওদের নয়, এটা পুরো পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো রহস্যগুলোর একটা, মিস্টার বাশার,' বলে সে টমির ল্যাপটপে সেই চিপের ফরম্যাটে কিছু টাইপ করল বাশার দেখল ল্যাপটপের স্ক্রিনে সেই চিপের ফাইলগুলো একটা একটা করে খুলতে শুরু করেছে।

'আজকে আপনারা, সেই পুকুরের নিচ থেকে যা উদ্ধার করেছেন, তার ভেতরের সেই পাথরটা তারই একটা অংশমাত্র। আপনাদেও টুইন কালী, বুদ্ধ মূর্তি, শাহ সুজার হারানো সম্পদ, রাজদ্রোহী শুধু নয় ইতিহাসের আরও অনেক ঘটনার সাথে এর সংযোগ আছে। পুরো ব্যাপারটা বুঝতে হলে আপনাদেরকে শুধু রাজদ্রোহী নয়, এক সিপাহী এবং অশ্বারোহীর গল্পও বুঝতে হবে।'

'এক মিনিট, আপনার কোড কাজ করছে এবং এটা প্রমাণিত যে আপনার কাছে অনেক মূল্যবান তথ্য আছে কিন্তু আপনি তো কাহিনি টেনেই চলেছেন। কীসব বলছেন, কালী, বুদ্ধ, সিপাহী, অশ্বারোহী—এসব কী?' বাশার বিরক্ত হয়ে বলে উঠল।

ওর কথা শুনে হেসে উঠল প্রফেসর। 'মিস্টার বাশার, আমরা এমন এক রহস্য নিয়ে ডিল করছি ইতিহাসের পাতায় যাকে

প্রফেসর তা কথা শেষ করতে পারল না তার আগেই একজন গার্ড দৌড়ে এলো। 'বাশার স্যার,' বাশার চূড়ান্ত বিরক্তি নিয়ে ফিরে তাকাল তার দিকে। 'কী বলো?'

'স্যার নিচে আনোয়ার পাশা স্যার এসেছেন, উনি এক্ষুণি আপনাকে যেতে বলেছেন। ইমার্জেন্সি।'

বাশার একবার তাকে দেখল তারপর প্রফেসরকে সোহেলের জিম্মায় রেখে চলে এলো ভবনের নিচে। সেখানে গাড়িতে বসে আছে পিবিআইয়ের স্পেশাল উইংয়ের প্রধান হাবিব আনোয়ার পাশা এবং সাথে মৌসুমি।

'কংগ্রাচুলেসন্স,' যদিও কথাটা আনন্দের কিন্তু আনোয়ার পাশা আর মৌসুমি দুজনেই মুখ ভার করে বসে আছে।

'কী ব্যাপার স্যার, কিছু হয়েছে?' বাশার চিন্তিত মুখে জানতে চাইল। 'আমি আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনা—'

'বাশার, রিফাত মজুমদার তোমার কী হয়?' আনোয়ার পাশার প্রশ্নটা শুনে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল বাশার।

'ইয়ে মানে, ও আমার গার্লফ্রে ফিয়াসেঁও বলতে পারেন স্যার—কেন মানে—'

'বাশার, ব্যাড নিউজ আছে,' আনোয়ার পাশা ভার মুখেই বলে উঠল। 'তুমি মাস্টার জেডকে গ্রেপ্তার করার পরেই একাধিক মহলে খুব জোর আলোড়ন তৈরি হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় তোমরা কিশোরগঞ্জ ছাড়ার পরেই ময়মনসিংহে একটা ঘটনা ঘটে।'

'শুধু ময়মনসিংহেই নয়, সিলেট এবং চট্টগ্রামেও,' এবার কথা বলে উঠল মৌসুমি।

বাশার বিস্তারিত কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বাশারের মাথার ভেতরে ঘণ্টা বেজে উঠল, তারমানে প্রফেসর ইফতেখার বা অন্যরা যা বলেছে সেটাই সত্যি, ওরা যা ভাবছে গোটা ব্যাপারটা সম্ভবত তারচেয়েও অনেক বড়ো কিছু।

অনেক বেশি বড়ো কিছু।



রবিন জামান খানের জন্ম ময়মনসিংহ শহরে, পৈতৃক নিবাস নেত্রকোনার কেন্দুয়াতে। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষাতত্ত্বে দ্বিতীয়বার মাস্টার্স সম্পন্ন করেন তিনি। পড়া-পড়ানো, শেখা-শেখানোর চর্চা থেকেই শিক্ষকতাকে পেশা ও লেখালেখিকে নেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। বেশ কিছু মৌলিক গল্প লেখার পাশাপাশি লিখেছেন একাধিক টিভি নাটক। তাঁর মৌলিক থ্রিলার উপন্যাস বিখণ্ডিত, মগরাজ, শব্দজাল, ব্ল্যাক বুদ্ধা, সপ্তরিপু ও ২৫ শে মার্চ এরই মধ্যে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের পাঠকমহলে অর্জন করেছে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা। ভারতবর্ষের ইতিহাসের রহস্যময় ঘটনাবলি, সেইসঙ্গে মানব মনের জটিল মনোস্তত্ত্ব বিষয়ে আগ্রহ থেকে উনি বর্তমানে কাজ করে চলেছেন একাধিক ইতিহাসনির্ভর ও সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার উপন্যাস নিয়ে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে খুব শিগ্‌গির প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাঁর মৌলিক থ্রিলার উপন্যাস ধূম্রজাল, সিপাহী, স্বপ্নজাল, অশ্বারোহী ও মুক্তি। রবিন জামান খান বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণা করছেন। ইতিহাসআশ্রিত উপন্যাস 'রাজদ্রোহী' তাঁর 'সময় উপাখ্যান' সিরিজের চতুর্থ বই। এই সিরিজের প্রকাশিত তিনটি বই– 'সপ্তরিপু', 'ব্ল্যাক বুদ্ধা' ও 'মগরাজ'। সিরিজের প্রকাশিতব্য উপন্যাসগুলো যথাক্রমে 'সিপাহী', 'অশ্বারোহী' এবং 'মুক্তি'।

ওয়েবসাইট : www.robinzamankhan.com
ই-মেইল : robinzamankhan21@gmail.com
ফেসবুক প্রফাইল : Robin Zaman Khan
ফেসবুক পেইজ : কথাসাহিত্যিক রবিন জামান খান- Robin Zaman Khan